ঋজুদাসমগ্র ২
বুদ্ধদেব গুহ

ঋজুদা সমগ্র ২

বুদ্ধদেব গুহ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

এই লেখকের অন্যান্য বই

অ্যালবিনো
ঋজুদা সমগ্র (১)
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে
ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গি বনে
ঋজুদার সঙ্গে সুফকর-এ
ঋভুর শ্রাবণ
গুগুনোগুম্বারের দেশে
টাঁড় বাঘোয়া
নিনিকুমারীর বাঘ
বনবিবির বনে
বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার
মউলির রাত
রু আহা

আমার কিশোর-কিশোরী পাঠক পাঠিকারা,

"ঋজুদা সমগ্র"র দ্বিতীয় খণ্ডে সবসুদ্ধ আটটি বই সঙ্কলিত হল।

এই বইগুলি লেখার সময়কাল, এপ্রিল তিয়াত্তর থেকে সেপ্টেম্বর তিরানব্বুই ; অর্থাৎ প্রায় কুড়ি বছর বিস্তৃত। উনিশশ তিয়াত্তরের এপ্রিলে ঋজুদার প্রথম বই, "ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে" প্রকাশিত হয়েছিল।

বনে-জঙ্গলে নানা আধিভৌতিক ঘটনাই ঘটে, যে সব আলো-ঝলমল শহরে বসে বিশ্বাস না করলেও চলে। জঙ্গলে বসেও যে বিশ্বাস করি, এমনও নয়। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে নানা আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় শিকারী মাত্রকেই।

জিম করবেট-এর বই যারা পড়েছ, তারাই "টেম্পল টাইগারের" কথা জানো। "ম্যানইটার অফ কুমাঁয়ূনে" শার্দার গিরিখাতে রাত কাটানোর সময়কার অলৌকিক আলোর বর্ণনা বা এর "থক"-এর মানুষখেকো বাঘ মারতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা ওঁর হয়েছিল সে কথাও নিশ্চয়ই তোমরা জানো।

অনেকে বলেন, যে-লেখা, কিশোর-কিশোরীরা পড়বে, সেই সব লেখাতে এমন অতিপ্রাকৃত ঘটনা রাখা উচিত নয়। আমার কিন্তু মনে হয় যে, শিকারী ও বনচারীর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে যা থাকে, তা তোমাদের কাছেই উপুড় করে দেওয়াই ভাল। আজকালকার কিশোর-কিশোরীরা আমাদের চেয়ে অনেকই বেশি বুদ্ধি ধরো। গ্রহণ-বর্জন যতটুকু করার, তা তোমাদের নিজেদেরই করা ভাল। যতটুকু বিশ্বাস করার করবে, যতটুকু ফেলে দেবার ফেলে দেবে।

'মউলির রাত' গল্পটি, অস্বীকার করব না ; ছেলেবেলায় পড়া উত্তর আমেরিকার পটভূমিতে লেখা অ্যালগারনন ব্ল্যাকউড-এর একটি MOOSE শিকারের গল্প এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আরণ্যক"-এ উল্লিখিত বুনোমোষেদের দেবতা "টৈড়েবারোর" দ্বারা প্রভাবিত।

পৃথিবীবিখ্যাত হাতি-বিশেষজ্ঞ প্রকৃতীশ চন্দ্র বড়ুয়ার (লালজী), মুখে হাতিদের বনদেবী 'সাহানিয়া দেবীর কথা শুনেছিলাম। সাহানীয়া দেবীর সঙ্গে নাকি লালজীর

দেখা হয়েছিল একবার। অল্পবয়সী নেপালি মেয়ে কথা বলেন না, শুধুই হাসেন।

লালজীকে নিয়ে পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্যর লেখা একটি চমৎকার বই আছে "হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর"। ভারতীয় বুনো-হাতি সম্বন্ধে এবং লালজী সম্বন্ধে যাদের ঔৎসুক্য আছে, তারা ঐ বইটি পড়তে পারো। আফ্রিকান হাতি যদিও ভারতীয় হাতির চেয়ে অনেকই বড় হয় কিন্তু স্বদেশী হাতি আমার বেশি প্রিয়। তবে আফ্রিকান হাতির একটি গুণ আছে। তারা কোনওদিনই পোষ মানে না। পোষ মানাতে গেলে, না খেয়ে মরে যায়।

ঋজুদা'র সব বইই আমার প্রিয়। তবে এই খণ্ডে সঙ্কলিত বইগুলির মধ্যে বেশি প্রিয় "বাঘের মাংস" এবং "অন্য শিকার"। কারণ, ঐ দুটিতে গল্পকে ছাপিয়ে গভীরতর কিছু বলার চেষ্টা করেছি। পেরেছি কি না, সে বিচার তোমরাই করবে।

তোমাদের প্রত্যেককে নতুন বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে, তোমাদের প্রীতিধন্য।

বুদ্ধদেব গুহ
২৫-১-৯৩

সূচী

ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ১৩
মউলির রাত ৭১
বনবিবির বনে ১২৯
টাঁড়বাঘোয়া ১৯১
বাঘের মাংস ২৩৭
অন্য শিকার ২৬৭
ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গি বনে ৩০৯
ঋজুদার সঙ্গে সুফ্‌কর-এ ৩৫৭

গ্রন্থপরিচয় ৪০১

ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে

ঋজুদা হাসল ; বলল, "তুই কি কাবলিওয়ালা ? হাতিকে হাঁতি বলছিস কেন ?

ভাল করে চারধারে চেয়ে একদিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, ঐদিকে।

ঋজুদা বলল, দূর বোকা। যেদিকে দেখালি, ঠিক তার উল্টোদিকে।

আমরা যেখানে বসেছিলাম, সে জায়গাটা একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে। আমাদের পায়ের নীচে, অনেক নীচে, খাড়া খাদের নীচে একটা পাহাড়ি ঝর্ণা বয়ে চলেছে। আমরা এখন এত উপরে আছি নদীটা থেকে যে, নদীটা প্রচণ্ড শব্দ করে বয়ে গেলেও একটা ক্ষীণ কুলকুল শব্দ ছাড়া অন্য কোনোরকম শব্দ শোনা যাচ্ছে না এখান থেকে।

ঋজুদা আঙুল দেখিয়ে বলল, দ্যাখ, ঐ দূরে ঝর্ণাটার কাছাকাছি কতগুলো বড় গাছের মাথা কারা ঝাঁকাঝাঁকি করছে। দেখতে পাচ্ছিস ?

আমি নজর করে দেখলাম ; বললাম, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।

ঋজুদা বলল, হাতিগুলো ঐ ঝর্ণাটার আশেপাশেই আছে। ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে পাতা খাচ্ছে।

আমি সবে একটা আস্ত ডিমসেদ্ধ মুখে পুরেছিলাম, আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল।

ঋজুদা আমার অবস্থা দেখে হেসে ফেলল। বলল, ক্যাল্‌কেসিয়ান, কোনো ভয় নেই। তুমিও তোমার খাবার খাচ্ছ, ও বেচারীরাও তাদের খাবার খাচ্ছে। ওদের গলায় গাছের ডাল আটকাচ্ছে না, আর তোমার গলায় ডিম আটকালো কেন ?

আমি লজ্জা পেয়ে, ওয়াটার-বট্‌ল খুলে তাড়াতাড়ি জল খেলাম ঢকঢক করে।

ঋজুদা আড়াই কাপ চা খেয়ে পাইপটা জমিয়ে ধরিয়েছে, এমন সময় জঙ্গলের পাকদণ্ডী পথ দিয়ে কেউ আসছে বলে মনে হল।

উড়িষ্যার এ সব অঞ্চলে নানা উপজাতি আদিবাসীদের বাস। তাদের সম্বন্ধে কত কি যে জানার আছে, শোনার আছে, তা বলার নয়। তাদের কথা কেউ লেখে না। লোকেরা শহরের লোকদের দুঃখ-কষ্টর কথা নিয়ে হৈচৈ করে, মিছিল বের করে, কিন্তু এইসব লোকেরা, যাদের নিয়ে আমাদের আসল দেশ, আসল ভারতবর্ষ, তারা যে কত গরীব, তাদের যে কত কষ্ট, তা বুঝি কেউ জানেই না !

আমি যদি বড় লেখকদের মত লিখতে জানতাম তাহলে শুধু এদের নিয়েই লিখতাম। এদের নিয়ে বড় লিখতে ইচ্ছে করে, সত্যিকারের সৎ লেখা।

দেখতে দেখতে আমাদের পিছনে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এসে হাজির। ওরা জঙ্গলের পথে খালি পায়ে এমন নিঃশব্দে চলাফেরা করে যে, শব্দ শুনে মনে হয়, কোনো জংলী জানোয়ার আসছে।

দুজনের পরনেই একটি করে ছোট কাপড়। মেয়েটির পিঠে আবার একটি বাচ্চা (এই এক বছরের হবে) সেই কাপড়টুকু দিয়েই বাঁধা। ছেলেটির কোলে আর একটি বাচ্চা, কিন্তু মানুষের নয়। বিচ্ছিরি কিম্ভূতকিমাকার দেখতে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে ঋজুদা বলল, ওটা কি বল তো ?

আমি বললাম, কি ? তুমি বল।

সজারুর বাচ্চা। ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, ওরা কি ওটা খাবে ?

ঋজুদা বলল, বিক্রি করার চেষ্টা করবে। ভাল দাম না পেলে নিজেরাই খেয়ে নেবে, আর কি করবে !

ঋজুদা লোক দুটিকে বসাল।

তারপর বাস্কেটের মধ্যে অবশিষ্ট স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদি যা ছিল সব ওদের দিয়ে দিল। ওরা যে কি ভাবে চোখ বড় বড় করে ওগুলো খেল তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ঋজুদা যে ভিখিরীর মত করে ওদের খেতে দিল তা নয়, লোকে নিমন্ত্রিত অতিথিকে যেমন করে খাওয়ায়, তেমন করে আদর করে খাওয়াল। ওদের খাওয়া হলে, ওদের দুজনকে একটা একটা করে টাকা দিল।

ছেলেটি আর মেয়েটি কি সব বলতে বলতে চলে গেল।

আমি বললাম, কি বলল ওরা ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, ওরা আমাকে এক্ষুনি মরে যেতে বলল।

—সে কি ? তার মানে ?

—তার মানে আমার অনেক আয়ু হোক। ওদের বলার ধরনই এমন।

ওরা চলে গেলে আমরা উঠে পড়লাম। পিকনিক বাস্কেটটা গুছিয়ে নিয়ে পিঠের রাকস্যাকে পুরে ফেললাম।

ঋজুদা উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেলটা, দূরবীনটা আর টুপিটা তুলে নিল। তারপর বলল, চল, দেখি তোর ভাল্লুকমশাই কি করছেন।

ভাল্লুকমশাই-এর খোঁজেই তো বেরিয়েছিলাম আমরা ক্যাম্প থেকে সেই ভোরে। এখনো তো তার টিকিটি দেখলাম না।

গতকাল ঋজুদার একজন কাঠ-কাটা কুলীকে একটা বিরাট ভাল্লুক ভরদুপুরে এমনভাবে আঁচড়েছে যে, সে বেচারীকে এখন বাঁচানোই মুশকিল ! কালই তাকে অঙুল শহরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই অঞ্চলে, হাঁটতে হাঁটতে যেখানে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি, সেখানে কতগুলো বড় বড় গুহা আছে। তার মধ্যে নাকি অনেকগুলো ভাল্লুকের বাস। এই ভাল্লুকগুলোকে এখান থেকে তাড়াতে না পারলে এখানে কাঠের কাজ চালানোই মুশকিল।

এবার আস্তে আস্তে পাহাড় ছেড়ে আমরা সামনের সবুজ সমতল তৃণভূমিতে নেমে এলাম। উপর থেকে যে ঝর্ণাটা দেখছিলাম সেটা এখান দিয়ে কিছুটা পথ

গড়িয়ে গেছে।

তৃণভূমিটি বেশী বড় নয়। এই এক হাজার বর্গফিট হবে। তার এক পাশে পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে। এবং সেই দেওয়ালের মত পাহাড়ে পর পর কতগুলো গুহা।

আমাদের সামনে দিয়ে জানোয়ারের একটা চলার পথ, আমরা যে পায়ে-চলা পথটা দিয়ে পাহাড় থেকে নামলাম, সেটাকে কোনাকুনি ভাবে কেটে গেছে।

ঋজুদা সেই মোড়ে গিয়ে পথটাকে ভাল করে দেখল, তারপর বলল, সত্যিই তবে এখানে ভাল্লুক আছে। ওদের যাওয়া-আসার চিহ্নে পথটা ভর্তি।

তারপর বলল, কথা বলিস না। এই বলে, সেই তৃণভূমির ডানদিকে একটু এগিয়ে গিয়ে, গুহাগুলো ভালমত দেখা যায় এমন একটা জায়গা দেখে, একটা বড় পাথরের আড়ালে আমাকে বসতে বলল। বলল, ভাল্লুক জানোয়ার বড় বিচ্ছিরি। তুই এখানেই বসে থাক রুদ্র। তবে এখান থেকে গুহাটা তোর বন্দুকের পাল্লার মধ্যেই পড়বে। আমি রাইফেল নিয়ে গুহার কাছে যাচ্ছি। আমি গুহার পাশে পৌঁছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকব। আর তুই এখান থেকে পর পর চারটে গুলি করবি ছর্‌রা দিয়ে গুহার মুখের নীচে। দেখিস, আমাকে মারিস না আবার। ভাল্লুকমশাইরা যদি থাকেন তবে হয় বাইরে বেরোবেন, নইলে আওয়াজ দেবেন। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

এই অবধি বলে ঋজুদা নিঃশব্দ পায়ে ঐদিকে এগিয়ে গেল রাইফেলটা বগলের নীচে বাগিয়ে ধরে।

আমি পাথরের উপরে বন্দুকটা রেখে, গুলির বেল্ট থেকে ছর্‌রা বের করতে লাগলাম। ছর্‌রা বের করে, দুটো বন্দুকের দু' নলে পুরে, দুটো পাশে রাখলাম। একটা বুলেট ও একটা এল-জিও রেডি করে রাখলাম, যদি আমার ঘাড়ে এসে কোনো ভাল্লুক হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তার দাওয়াই হিসেবে।

আমি পর পর দুটো গুলি করলাম।

সেই গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে এমনভাবে ছড়িয়ে গেল তা বলার নয়। এবং সেই শব্দর সঙ্গে হনুমানের ডাকের শব্দ, টি-টি পাখির ডিড-ইট-ডু-ইট্—ডিড-ইট-ডু-ইট্ করে কৈফিয়ত চাওয়ার চেঁচামেচিতে মাথা খারাপ হবার যোগাড় হল।

দেখলাম, ঋজুদা মনোযোগ সহকারে সামনে চেয়ে আছে।

এমন সময় খুব একটা চিন্তাশীল মোটাসোটা ভাল্লুক বড় গুহাটা থেকে বেরিয়ে গুহার সামনের পাথরে দাঁড়িয়ে পড়েই একবার ডন মারল। তারপর যখন দেখল, ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই, তখন আকাশের দিকে চেয়ে মেঘ ডাকল কিনা তা বোঝবার চেষ্টা করল। আকাশে মেঘ না দেখে, ও বাতাসে নাকটা উঁচু করে শুঁকল এবং শুঁকতেই বাতাসে বন্দুকের টোটার পোড়া বারুদের গন্ধ পেল।

সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ি-কি-মরি করে গুহার মধ্যে ঢুকে যাবার জন্যে এ্যাবাউট-টার্ণ করতে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদার ফোর-সিক্সটি-ফাইভ ব্বিগবী রাইফেলের গুলি ভাল্লুকটার শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। ভাল্লুকটার শরীরের মধ্যে গুলিটা একটা ঝাঁকি তুলেই বেরিয়ে গেল।

ভাল্লুক জাতটাই সার্কাসের জোকারের মত। এ ভাল্লুকটাও মরবার সময় জোকারের মত মরল।

ওর শরীরটা পাথর গড়িয়ে এসে নীচের ঘাসে ধপ করে পড়ল।

ভাল্লুকটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই করে আওয়াজ শুনতে পেলাম, ঐদিক থেকে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, কালো রাগবী বলের মত দেখতে দুটো ভাল্লুকের গাবলু-গুবলু বাচ্চা ঐ গুহাটা থেকে বেরিয়ে ওরকম আওয়াজ করছে।

ওগুলোকে দেখেই ঋজুদা চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার, গুলি করিস না রুদ্র।

আমি ও ঋজুদা দুজনেই ওদের কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলাম।

বাচ্চা দুটো পাথরের কোণা অবধি এসে নীচে একবার তাকাল, যেখানে ওদের মা (মা-ই হবে নিশ্চয়ই) পড়ে আছে। পাথরের কোণা অবধি আসতেই তারা তিন-চারবার ডিগবাজী খেল। তারপর প্রথম বাচ্চাটা নীচে একটু ভাল করে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ একেবারে চার-পা শূন্যে তুলে পপাত ধরণীতলে। পরের বাচ্চাটাও তার দাদা অথবা দিদির অধঃপতনে অনুপ্রাণিত হয়ে, আমরা যেমন করে সুইমিং পুলে ডাইভ দিই, তেমনি করে উপর থেকে নীচে ডাইভ দিল।

আমি আর ঐ উত্তেজনা সহ্য করতে পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ঋজুদা, ওদের ধরব ?

ঋজুদা ঐখানেই দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, ধর্।

যেই না অর্ডার পাওয়া, অমনি আমায় আর দেখে কে ? বন্দুক আর গুলি ঐখানেই ফেলে রেখে বাঁই বাঁই করে আমি ওদিকে দৌড়ে গেলাম। ওখানে পৌঁছে দেখলাম, বাচ্চা দুটো মায়ের পিঠের ওপর একবার উঠছে আবার গড়িয়ে পড়ছে। প্রথম বাচ্চাটা যেটা চার-পা-তুলে পড়েছিল, সেটার বোধহয় চোট লেগেছে কোথাও। সেটা বারবার মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। জর্দা-দেওয়া পান খেয়ে কৃষ্ণা পিসীর বিয়েতে আমি যেমন পড়েছিলাম।

আমি দৌড়ে গিয়ে একটাকে কোলে তুলে নিতে গেলাম। কোলে নেওয়া তো দূরের কথা, এত সলিড ও ভারী বাচ্চা যে, আমিই মাটিতে পড়ে গেলাম। বুঝলাম, যতক্ষণ ওদের মা এখানে শুয়ে আছে, ওদের এখান থেকে পালিয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

আবার উপরে তাকাতেই আমার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। হঠাৎ দেখলাম, উপরের একটা গুহা থেকে একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক দ্রুত লাফিয়ে নেমে

আসছে ঋজুদাকে লক্ষ্য করে।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, ঋজুদা!

আমার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদা ঘুরে দাঁড়াল।

ততক্ষণে সেই অতিকায় ভাল্লুকটা অদ্ভুত একটা উক্ উক্ চীৎকার করে একেবারে ঋজুদার ঘাড়ে এসে পড়েছে বলা চলে।

ঋজুদা মুখ থেকে পাইপটা বের করার সুযোগ পর্যন্ত পেল না। ঐ অবস্থাতেই রাইফেল তুলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল।

গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুকটাও ঋজুদার উপরে এসে পড়ল। ভাল্লুকটা উপর থেকে আসছিল, তাই তার গতির সঙ্গে ভারবেগ যুক্ত হয়েছিল। ঐ ভারী ভাল্লুকের তীব্র ধাক্কা ও আক্রমণে ঋজুদা উপর থেকে নীচে ছিটকে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুকটাও। ঋজুদার রাইফেলটাও হাত থেকে ছিটকে পড়ল।

ওদের উপর থেকে ঐভাবে পড়তে দেখেই আমি প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে আমার বন্দুকটা নিয়ে এলাম। ফিরে আসবার সময় দৌড়তে দৌড়তেই গুলি ভরে নিলাম।

কাছে এসে দেখি, ভাল্লুকটা আর ঋজুদা প্রায় দশ হাত ব্যবধানে পড়েছে। ভাল্লুকটা তখনো পায়ে দাঁড়িয়ে ঋজুদার দিকে উঠে আসবার চেষ্টা করছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি ওর কানের কাছে একটা এল-জি মেরে দিলাম। ওর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ঋজুদার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখি, শরীরের নানা জায়গা কেটে গেছে। এবং কপালের ডানদিকে একটা জায়গা কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

ঋজুদা আমাকে কাছে ডাকল।

বুঝলাম, নিজের পায়ে উঠে চলার ক্ষমতা নেই ঋজুদার। ঋজুদা বলল, আমার রাকস্যাকে একটা বাঁশী আছে। বাঁশের বাঁশী। উপরে উঠে গিয়ে ওই বাঁশীটা বাজা, যত জোরে পারিস।

তখন আর কেন-টেন শুধোবার উপায় ছিল না।

দৌড়ে পাহাড়ের গায়ে একটা উঁচু জায়গায় উঠে গিয়ে বাঁশীটা বাজাতে লাগলাম। বাঁশীটা কয়েকবার বাজাতেই জঙ্গলের বিভিন্ন দিক থেকে গম্ভীর গর্‌গর্‌ে আওয়াজে ঢাক বাজতে লাগল। দেখতে দেখতে চারদিকের বন-পাহাড় সে আওয়াজে ভরে উঠল।

ঋজুদা হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকল।

আমি ঋজুদার মুখে একটু জল দিলাম ওয়াটার-বটল্ থেকে। পরিষ্কার জলে মুখের রক্ত ধুয়ে দিতেই আবার ফিনকি দিয়ে নতুন রক্ত বেরোতে লাগল। আমার খুব ভয় করতে লাগল।

কিন্তু ভয় বেশিক্ষণ রইল না। দেখতে দেখতে প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যে পাহাড়ের চতুর্দিক থেকে অদৃশ্য সব পাকদণ্ডী পথ বেয়ে কোল্‌হো, খন্দ্, মালো ইত্যাদি নানা আদিবাসীরা এসে হাজির।

তারাই সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গি দিয়ে বাঁশ কেটে স্ট্রেচার বানিয়ে পাতার গদী করে তাতে ঋজুদাকে শুইয়ে আদর করে বয়ে নিয়ে চলল। অন্য কয়েকজন মরা ভাল্লুক দুটো ও বাচ্চা দুটোকে নিয়ে আসতে লাগল।

আধঘন্টার মধ্যে আমরা ঐখানে পৌঁছে গেলাম কিন্তু মুশকিল হল—জীপ চালাবে কে? আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তখন একটু-একটু গাড়ি চালানো শিখেছিলাম, কিন্তু আমার লাইসেন্স ছিল না। ঐ জঙ্গলে অবশ্য লাইসেন্স দেখবার কোনো লোকও ছিল না, কিন্তু লাইসেন্স থাকলেও অত্যন্ত ভাল ড্রাইভার না হলে ঐ জঙ্গল ও পাহাড়ের রাস্তায় জীপ চালানো সম্ভব নয়।

ঋজুদা ব্যাপারটা বুঝে নিল। তারপর কোল্‌হোদের ভাষায় ওদের বলল, ওকে ধরাধরি করে জীপের ড্রাইভিং সীটে বসিয়ে দিতে।

ড্রাইভিং সীটে বসে, ঋজুদা অনেকক্ষণ পর এই প্রথম হাসল। বলল, কী রে রুদ্র? ভয় পেয়েছিস? কোনো ভয় নেই। হাম্ ঠিক হ্যায়। এই বলে, পাইপটাতে তামাক ভর্তি করে নিল ঋজুদা। আমি দেশলাইটা জ্বেলে ঋজুদার পাইপটা ধরিয়ে দিলাম। তারপর পাইপটা দাঁতে কামড়ে ধরে ঋজুদা জীপ স্টার্ট করল।

সঙ্গের লোকদের মধ্যে জনাচারেক পেছনের সীটে উঠে বসল—তারা কিছুতেই এ অবস্থায় ঋজুদাকে একা ছাড়তে চাইল না।

জীপ চালাতে খুবই যে কষ্ট হচ্ছিল তা ঋজুদার বসার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছিলাম। পথের ঝাঁকুনিতে তার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে, ঋজুদার পিঠের কোনো হাড় ভেঙ্গে গেছে। এত যন্ত্রণা হলে কি হবে, ঋজুদার মুখের দিকে যতবার তাকাই, ঋজুদা বলছিল, ঠিক হ্যায়, সব ঠিক হ্যায়! ঘাবড়াও মত্।

আমরা ক্যাম্পে পৌঁছতেই ক্যাম্পের মুহুরীরা এবং ট্রাকের ড্রাইভার অমৃতলাল এগিয়ে এল। এক কাপ গরম চায়ে কিছুটা ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে ঋজুদার খেতে যা সময় লাগে, তার জন্যে দাঁড়িয়েই আমরা আবার রওয়ানা হলাম।

ঋজুদাকে পাশের সীটে সাবধানে সরিয়ে দিয়ে অমৃতলাল জীপ চালিয়ে চলল অঙ্গুলের হাসপাতালে। ওখানে ছাড়া হাসপাতাল নেই কোথাও কাছে-পিঠে।

হাসপাতালে ঋজুদার কতদিন থাকতে হবে কে জানে?

॥ ২ ॥

সেদিন সকালবেলা আকাশ মেঘলা করেছিল।

ক্যাম্পের আশপাশের জঙ্গল থেকে ময়ূর ডাকছিল, কেঁয়া কেঁয়া করে। ঝিরঝির করে একটা হাওয়া ছেড়েছিল মহানদীর দিক থেকে।

মুহুরীরা সকলেই ভোর বেলা চান করে জঙ্গলে চলে গেছিল। ক্যাম্পের বাথারীর বেড়ার উপর তাদের মেলে দিয়ে যাওয়া নানারঙা লুঙ্গিগুলো হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছিল। একটা বাদামী লেজঝোলা কুম্ভাটুয়া পাখি সাহাজ গাছ থেকে নেমে এসে ক্যাম্পের চারধারে লাফিয়ে লাফিয়ে এক্কাদোক্কা খেলছিল, আর কি যেন বলছিল নিজের মনে।

ঋজুদা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিল।

আমি পাশের চেয়ারে বসে বন্দুক ও রাইফেলগুলো পরিষ্কার করছিলাম।

ঋজুদা এখন প্রায় ভাল হয়ে গেছে। কাল থেকে জঙ্গলে বেরোবে নিয়মিত কাজ দেখাশুনো করতে। এরপর থেকে শিকার-টিকারও একটু-আধটু হতে পারে।

ঋজুদা বলল, ভাল করে পুল-থ্রু দিয়ে টেনে টেনে রাইফেলগুলো পরিষ্কার কর, তারপর তেল লাগা। ওদের যত্ন না করলে ওরা ভারী অভিমান করে, বুঝলি।

আমি ঋজুদার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছি, এমন সময় একটা ভারী সুন্দর হলদে-কালোতে মেশা পাখি এসে ক্যাম্পের সামনের কুরুম্ গাছটার ডালে বসল।

আমি অবাক হয়ে পাখিটাকে দেখতে লাগলাম।

ঋজুদা আমার চোখ দেখে পাখিটার দিকে চাইল, বলল, কি পাখি জানিস?

আমি বোকার মত বললাম, না।

ঋজুদা বলল, নাঃ, তুই সত্যিই একেবারে ক্যাল্‌কেসিয়ান—কোলকাতায় থেকে থেকে একেবারে নিরেট ইঁট হয়ে গেছিস্। এটা হলুদ-বসন্ত পাখি। নাম শুনিসনি?

আমি বললাম, নাম শুনেছি, কিন্তু আগে দেখিনি। সত্যি! কী সুন্দর দেখতে, না?

ঋজুদা যেন নিজের মনেই বলল, জঙ্গলে যখনি আসবি, চোখ-কান খুলে রাখবি, নাক ভরে শ্বাস নিবি, দেখবি, কত সুন্দর সুন্দর পাখি, প্রজাপতি, পোকা, আর কত সুন্দর সুন্দর গাছ লতাপাতা ফুল চোখে পড়বে।

বুঝলি রুদ্র, মাঝে মাঝে ভাবি, চোখ-কান তো আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোকই তো কাজে লাগাই না।

আমি কিছু বললাম না। চুপ করে রইলাম।

দেখতে দেখতে রাইফেল দুটো পরিষ্কার হয়ে গেল। বন্দুকটাতে হাত দিয়েছি, এমন সময় সামনের ডিঙ্গুলি গ্রাম থেকে কয়েকজন লোক এসে ঋজুদাকে দণ্ডবৎ হয়ে কি যেন সব বলল।

দেখলাম, ঋজুদা ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসল। তারপর ওদের ভাষায় কড়মড় করে অনেকক্ষণ কি সব কথাবার্তা বলল।

আমি কিছুই বঝলাম না ওদের ভাষা, খালি "বারা" "বারা" এই কথাটা শুনলাম। কিছুক্ষণ পর ওরা হাত নেড়ে নেড়ে উত্তেজিত গলায় কি আলোচনা করতে করতে চলে গেল।

ঋজুদা বলল, বুঝলি কিছু?

আমি বললাম, বারা বারা।

ঋজুদা হাসল। বলল, তাহলে তো বুঝেইছিস্। বারা মানে শুয়োর। লোকগুলো বলে গেল যে, সারা রাত ধরে শুয়োরের দল এসে ওদের ক্ষেত সব তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে, যদি আমি ক'টা শুয়োর মেরে দিই তাহলে খুব ভাল হয়। তাছাড়া শুয়োরের মাংসও ওরা খুব ভালবাসে।

তুমি কি বললে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঋজুদা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, রুদ্রবাবুর কি ইচ্ছা?

আমার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; হেসে বললাম, শিকারে যাওয়ার।

ঋজুদা বলল, রুদ্রবাবুর যখন ইচ্ছা, তখন যাওয়া হবে।

তারপর আবার হাসতে হাসতে বলল, তোর দাদা এত বড় বৈষ্ণব, যিনি গায়ে মশা বসলে মশাটি পর্যন্ত মারেন না, আর তাঁর ভাই হয়ে কি না তুই এতবড় জন্তুাদ হলি? তোর দাদা আমার মুখও দেখবেন না আর। তার ভাইকে আমি একেবারে জংলী করে দিচ্ছি, তাই না?

এমন সময় অমৃতলাল কটক থেকে ট্রাক নিয়ে এল। কটকে কাঠ নামিয়ে দিতে গেছিল সে কাল ভোরে। আজ ফিরে এল।

অনেকদিনের খবরের কাগজ, ঋজুদার জন্যে পাইপের টোব্যাকো, চা, কফি, বিস্কুট, আরো অনেকানেক জিনিসের বাণ্ডিল হাতে করে নামল অমৃতলাল।

এই অমৃতলালকে আমার বেশ লাগে। আমি বলতাম, অমৃত্ দাদা।

ফর্সা, রোগা দাড়িহীন পাঞ্জাবী। বয়স এই তিরিশ-টিরিশ হবে। হাসিটা খুব মিষ্টি আর দারুণ উৎসাহী। শিকারে যেতে বললে তো কথাই নেই। না-খেয়ে না-দেয়ে সে সারাদিন পনেরো-কুড়ি মাইল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরবে।

অমৃত্ দাদা পায়জামা পাঞ্জাবি আর নাগরা জুতো পরত ট্রাক চালাবার সময়, মাথায় একটা গামছাও লাগাত। গামছাটাতে রুপোর চুমকির মত কি সব চকমকি লাগানো ছিল।

অমৃত্ দাদা বলত, সম্ঝা লোস্তা, ঈ রোলেক্স গামছা।

শিকারে যাবার সময় কিন্তু অমৃত্ দাদার সাজ বহু বিচিত্র হতো। দিনে যদি

যেত তো ও একটা হাফ প্যান্ট, বুশ-কোট ও কালো বুট জুতো পরত। এই তিনটি জিনিসই তাকে তার ফৌজী কাকা ভালবেসে কোনোদিন দিয়েছিল। কিন্তু অমৃত্ দাদার কাকার জামা-কাপড় এতই ঢোলা ছিল যে তার মধ্যে দু'জন অমৃত্ দাদা বিনা কষ্টে ঢুকে যেতে পারত। তাই সেই জামা-কাপড়ে ওকে অদ্ভুত দেখাত। আর পায়ে বুটটা এতই বড় হতো যে হাঁটলেই সবসময় খপ্‌র-খাপ্‌র, গবর্-গাবর্ শব্দ হতো।

ঋজুদাও ওকে ঐ জন্যে কক্ষনো শিকারে নিয়ে যেতে চাইতেন না। কিন্তু অমৃত্ দাদা ঐ জামা-কাপড় কিছুতেই ছাড়বে না, ওর মিলিটারী কাকা ভালবেসে দিয়েছে, ও কি তার অমর্যাদা করে? যতবার বুট পরত, প্রতিবারই বুটের মধ্যে ট্রাকের এঞ্জিন মোছার একগাদা তুলো গুঁজে নিত, যাতে পায়ে ফোস্কা না পড়ে।

রাতের পোশাক ছিল তার আরো বিচিত্র। সারা শরীরে একটা ঢোলাঢালা মেকানিকদের তেল-কালি মাখা ওভার-অল্ পরত, আর মাথায় সেই রোলেক্স গামছা এবং গায়ে ওয়াটারপ্রুফ। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যে কোনো সময়ই রাতে শিকারে বেরোলেই ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে সে চাপাবেই। আর পায়ে সেই গবর্-গাবর্ বুট জুতো।

খুব মজার লাগত আমার অমৃত্ দাদাকে।

অবকাশের সময় নানা গল্প করত অমৃত্ দাদা আমার সঙ্গে।

বেলা বাড়লে রোদটা যখন কড়া হল তখন চান করতে গেলাম আমি। বারোটা বাজলেই চান করতে যেতে হবে, তারপর ঠিক একটার সময় ঋজুদার সঙ্গে খেতে বসতে হবে।

ঋজুদা রোজ ভোর বেলা চান করে নেয়।

এখানে চান করতে ভারী আরাম। ঋজুদা বলত, সবসময় সারা গায়ে যত পারিস রোদ লাগাবি।

এখানে তো আর বাথরুম নেই। কলও নেই। চান করতে যেতাম প্রায় তিনশ' গজ দূরে একটা পাহাড়ের উপরের ঝর্ণায়। ঝর্ণাটার নাম ছিল মিঠিপানি। মিঠিপানির মত সুন্দর ঝর্ণা আমি খুব কম দেখেছি।

হাতে সরষের তেলের শিশি ও জামা-কাপড় তোয়ালে নিয়ে চলে যেতাম পাহাড়টাতে। যেখান থেকে ঝর্ণা নেমেছে সেটা ঠিক পাহাড় নয়, একটা টিলামত, সেই টিলাই পরে উঁচু হয়ে উঠে গেছে বড় পাহাড় হয়ে।

সে জায়গাটাতে বিশেষ গাছগাছালি ছিল না। একটা সমান চেটালো কালো পাথরের উপর দিয়ে ধাপে ধাপে বয়ে গেছে মিঠিপানি ঝর ঝর করে। এক-একটা ধাপের নীচে গর্ত হয়েছে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে—সেই সব গর্তে প্রায় এক কোমর জল। উপর থেকে সমানে জল পড়ায় জল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।

এই জলাধারটা সমানভাবে একটু বয়ে গিয়ে নীচে, বেশ নীচে লাফিয়ে

পড়েছে একটা বড় ঝর্ণা হয়ে। তারপর মিঠিপানি নদী হয়ে গড়িয়ে গেছে ডিম্বুলি গ্রামের দিকে।

ঝর্ণাটা যেখানে নীচে পড়ে নদী হয়েছে সেখানে একটা বড় গর্ত। জল বেশ গভীর। সেখানে গাঁয়ের লোকেরা, মেয়ে-বউরা, গরু-মোষরা সব চান করতে আসে।

কিন্তু আমরা যেখানে যাই চান করতে, সেখান থেকে ঐ জায়গা দেখাই যায় না। কারণ আমরা থাকি টিলার মাথায়। আর টিলাটা একেবারে খাড়া নেমে গেছে ঝর্ণার সঙ্গে, তাই নীচ থেকে কোনো লোক এদিকে আসেও না।

এইখানে পাথরের উপরগুলো পরিষ্কার। মাঝে মাঝে শুধু কি সব বুনো ঝোপ—বেগুনী বেগুনী ফুল ফুটে আছে তাতে। বেশ লাগে দেখতে। পাথরের উপরে সবুজ গাছের ঘন ঝোপ—আর মাঝে মাঝে জল বয়ে চলেছে ঝর ঝর করে।

ঋজুদা বলেছিল, এখানে লজ্জা-শরমের কিছু নেই। ঝোপের আড়ালে সব জামাকাপড় খুলে ফেলে সমস্ত শরীরে অনেকক্ষণ ধরে সর্ষের তেল মাখবি বসে বসে। তারপর পাথরের উপর শুয়ে থাকবি এখানে উপুড় হয়ে, তারপর চিত হয়ে, দেখবি সমস্ত শরীর রোদ লেগে কেমন গরম হয়ে ওঠে। তারপর ঝর্ণায় চান করে জামাকাপড় পরে ক্যাম্পে ফিরবি।

শুধিয়েছিলাম, তুমিও কি তাই কর?

ঋজুদা বলেছিল, নিশ্চয়ই। তুইও কর্-না। এমন আরামে চান করলে দেখবি কোলকাতায় গেলে এই ক্যাম্পের জন্যে কেমন কষ্ট হয় তোর।

প্রথম প্রথম লজ্জা করত। ক্যাম্পের দিক থেকে যদি কেউ চলে আসে? কিন্তু ক্যাম্পের সকলেই ভোরবেলা চান করে নিত, তখনই রান্নার জল নিয়ে নিত, কাপড়-টাপড় কেচে নিত এখানে পাথরে বসেই; তাই দুপুর বেলায় আমার চানের সময় কেউই আসত না এদিকে। তাছাড়া, ক্যাম্পের সব লোক তো কাজেই বেরিয়ে পড়ত সাত-সকালে।

বেগুনী ফুলে ছাওয়া ঝোপের পাশে পাথরে জামা-কাপড় ছেড়ে সারা শরীরে তেল মাখতাম। মাঘ মাস, প্রথমে হাত-পা বেশ কনকন করত। কিন্তু সর্ষের তেল মাখতে মাখতে রোদ আর পাথরের গরমে একটু পরেই শরীর গরম হয়ে যেত। উপরে তাকিয়ে দেখতাম যতদূর দেখা যায়—নীল, দারুণ নীল আকাশ। চতুর্দিকে ঘন গহন জঙ্গল। বড় বড় ডালে বাদামী-রঙা কাঠবিড়ালিগুলো লাফালাফি করে পাতা ঝাঁকাত। কত কি পাখি ডাকত দু'পাশ থেকে। পাহাড়ের মধ্যের জঙ্গল থেকে ডিম্বুলি গ্রামের মোষেদের গলার কাঠের ঘন্টা বাজতো ডুঙ্-ডুঙিয়ে। মোষগুলো খুব কাছে চলে এলে, আমার লজ্জা করত, আমি আঙ্গাপাঙ্গা হয়ে থাকতাম, তাই মোষগুলো বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকালে প্রথম প্রথম আমার খুব লজ্জা করত। কিন্তু সত্যি বলছি,

দারুণ লাগত।

কেউ কোথাও নেই—কি সুন্দর শান্তি চারদিকে। মাথার উপরে নীল ঝকঝকে আকাশ, পায়ের নীচে কালো চেটালো পাথর আর লাফিয়ে-লাফিয়ে চলা ফেনা-ছিটানো বহুবিভক্ত ঝর্ণা, আর চতুর্দিকে গভীর সবুজ বন।

মধ্যে আমি আঙ্গাপাঙ্গা, একা।

ঋজুদা বলত, বুঝলি রুদ্র, আমাদের আসল মা কিন্তু এই আকাশ, পাহাড়, নদী, এই প্রকৃতি। আমি জানি, ছোটবেলায় তোর মা মরে গেছেন, তাই তোর কষ্ট। কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তবে তুই যদি এই মাকে ভালবাসতে পারিস তবে দেখবি কত ভালো লাগে।

ঋজুদার কোনো কারণে মন খারাপ থাকলে বলত, জানিস, আমি এদের সবাইকে বলি যে, আমি যেখানেই মরি না কেন, তোরা আমাকে জঙ্গলে এনে কবর দিয়ে যাস। পোড়াস না আগুনে। চারদিকে গাছঘেরা একটা দারুণ সূর্যালোকিত জায়গায়, পাখির ডাকের মধ্যে, হাওয়ার শীষের মধ্যে তোরা আমাকে কবর দিয়ে রাখিস।

তখন ঋজুদার কথা শুনতে শুনতে চোখে জল এসে যেত।

ঋজুদা সত্যি ভীষণ ভালবাসে জঙ্গল পাহাড়কে। ভীষণ ভালবাসে। ঋজুদার সঙ্গে থেকে আমিও ভালবাসতে শিখেছি। আস্তে আস্তে এই জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে আমার ছোট্টবেলার হারিয়ে-যাওয়া মাকে খুঁজে পাচ্ছি যেন।

চান করার মাঝে মাঝে জল থেকে উঠে এসে ভেজা শরীরে পাথরের উপর হেঁটে বেড়াতাম। পাথরের উপর আমার নিজের শরীরের ছায়াকে দৌড়ে তাড়া করতাম। পিছন ফিরে আমার ভেজা পায়ের ছাপ দেখতাম পাথরের উপর। কখনো বা হাত নাড়িয়ে ইংরিজী-স্যারের মত ইংরিজী বলতাম, একা একা, আঙ্গাপাঙ্গা—হাওয়ার সঙ্গে, রোদের সঙ্গে, বনের সঙ্গে।

তখন, সেই সমস্ত মুহূর্তগুলোতে আর সবকিছুই ভুলে যেতাম। আমার মনে হতো আমিই এই পাহাড়, জঙ্গল, ঝর্ণা আর এই আদিগন্ত সবুজ সাম্রাজ্যের রাজা। আঙুল নেড়ে নেড়ে হাওয়ার ধমক দিয়ে দিয়ে ওদের সবাইকে শাসন করতাম।

॥ ৩ ॥

জানিসাহীর দিকের জঙ্গলের কূপে কাজ হচ্ছিল।

সেখানে গিয়েছিল অমৃত্ দাদা ট্রাক লোড করতে। ট্রাক লোড করে ক্যাম্পে এসে খাওয়াদাওয়া করে কাল শেষরাতে ও আবার কটক রওয়ানা হয়ে যাবে।

অমৃত্ দাদার সঙ্গে ঋজুদার সাতটি কুকুর—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি সঙ্গে

গেছে ট্রাকে চড়ে একটু হাওয়া খেতে।

নি-কে নিয়ে একটু ঝামেলা যাচ্ছে। পরশু দিন নি-বাবু ক্যাম্পের সীমানার পাশেই একটি খরগোশকে দেখতে পেয়ে তাকে তেড়ে যান। তখন সবে সন্ধ্যে হব-হব। পথ ছেড়ে নি-বাবু তো কানখাড়া খরগোশের পিছু পিছু ধেয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোট ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল। সেখানেই ছিল খরগোশদের গর্ত। খরগোশ ভায়া তো গর্তে ঢুকে গেল। নি-বাবু জিভ বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে এদিক-ওদিক দেখছেন, এমন সময় নি-বাবুর গা-টা কেমন ছমছম্ করে উঠল। লেজটা অজান্তে কেমন গুটিয়ে গেল। হঠাৎ, নি-বাবু দেখলেন, সেই মাঠের ওপাশে ঝোপের মধ্যে কি যেন একটা জানোয়ারের গোল মাথা নড়ে উঠল।

বেলা পড়ে গেছিল, আলোও যাই-যাই; নি-বাবুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ভয়ে।

চিতাবাঘের গন্ধ পেয়ে সে তো প্রাণপণে পড়ি-কি-মরি বলে ছুট্।

মজা করার জন্যে কিনা জানি না, চিতাবাঘটাও তার পেছনে একটুক্ষণ ছুটে এসে নি-বাবুকে ভীষণ রকম ভয় খাইয়ে দিয়ে বনের মধ্যের গাছতলায় বসে জিভ বের করে হাঃ হাঃ করে ভীষণ হাসতে লাগল।

এদিকে নি-বাবু দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে আসতে আসতে কাঁটায় পাথরে সারা গা ছড়ে ফেললেন। এসে একেবারে ক্যাম্পের বারান্দায় হাত-পা ছড়িয়ে প্রায় অজ্ঞান।

ঋজুদা বলছিল, নি-টা আজ খুব বেঁচে গেল।

জানিস তো রুদ্র, চিতাবাঘের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি!

আমি বললাম, কি?

পোষা কুকুর।

সত্যি? আমি শুধোলাম। তারপর বললাম, তাহলে বাঘের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি?

ঋজুদা বলল, দেশী পোষা ঘোড়া।

আমি বললাম, যাঃ, তুমি ঠাট্টা করছ।

ঋজুদা বলল, আরে! বিশ্বাস কর। সত্যিই তাই।

প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল।

আমি ক্যাম্পের সামনের রাস্তায় একটু হাঁটতে গেছিলাম। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি সঙ্গে নেই, তাই বাঁচোয়া, নইলে ওরা সবসময় এমন পায়ে পায়ে হাঁটে না যে, হোঁচট খেয়ে মরতে হয়। আর নি-বাবুটা সবচেয়ে ছোট বলে ও তো সবসময়ই দু'পায়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওর জন্যে হাঁটাই মুশকিল।

এই সন্ধ্যেবেলাটা ভারী সুন্দর লাগে।

শীতকালের সোনালি নরম বেলা পড়ে এসেছে। গাছগাছালির গায়ে একটা

হালকা আবছা সোনালি আভা লেগেছে। আভা লেগেছে পথের নরম লাল ধুলোয়। ডিম্বুলি গ্রাম থেকে নানারকম শব্দ ভেসে আসছে। গলায় কাঠের ঘন্টা দোলানো গরু-মোষগুলো গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। তাদের পায়ে পায়ে লাল ধুলোর মেঘ উড়ছে তাদের মাথার উপর। সেই ধুলোর চোখেও সূর্যের আঙুল লেগেছে।

গরু-মোষের গায়ের গন্ধ, ধুলোর গন্ধ, জঙ্গলের বুনো বুনো গন্ধ সব মিলেমিশে এমন একটা গন্ধ উঠছে চারদিক থেকে যে, কি বলব!

গাছে গাছে, ঝোপে-ঝাড়ে পাখিরা নড়েচড়ে সরে সরে বসছে; রাতের জন্যে তৈরী হচ্ছে। চারপাশ থেকে ঝিঁঝি ডাকতে আরম্ভ করেছে ঝি-ঝি করে। কতগুলো শ্যাওলা-ধরা পাথরের আড়াল থেকে একটা কালো বুড়ো কট্‌কটে ব্যাঙ ঘুম ভেঙ্গে হাই তুলল। নাকি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল! কে জানে? বুড়োর বোধহয় আর কেউই নেই।

দুপুরে চান করার সময় আঙ্গাপাঙ্গা হয়ে পাথরের উপর, জলের উপর দাঁড়িয়ে, যেমন দু'হাত তুলে সূর্যকে ধন্যবাদ জানাই, এখন এই দিনশেষের নরম বেলাতেও মনে মনে সূর্যকে হাত নেড়ে বলি, আবার এসো। তুমি না এলে, না থাকলে সব অন্ধকার, শীতল আর একাকার। তুমি আবার এসো।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ঋজুদা বলল, কি রে? যাবি না শুয়োর মারতে? চল্, ঘন্টা দু-তিন বসে চলে আসি।

তাড়াতাড়ি ভাল করে গরম জামা চাপিয়ে, মাথায় টুপী পরে তৈরী হয়ে নিলাম। ঋজুদা একটা বড় পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ নিল সঙ্গে আর তার রাইফেল। রাতে নিশানা নেবার সুবিধার জন্যে ঋজুদার রাইফেলে আলো লাগানো আছে। আন্দাজে নিশানা নেবার পর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে আলোর সঙ্গে লাগানো একটা পাতলা লোহার পাতকে ছুঁলেই আলোটা জ্বলে ওঠে, তখন ঠিক করে নিশানা নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে গুলি করতে হয়।

সঙ্গে আমিও আমার বন্দুকটাকে নিয়ে নিয়েছি। বন্দুকের সঙ্গে ক্ল্যাম্পে টর্চ লাগানো আছে। আসলে বন্দুকটা আমার নয়। ঋজুদারই। ঋজুদা আমাকে আপাতত এটা দান করেছে।

আঠারো বছর না হলে কাউকে বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয় না।

ঋজুদা কাঁধের উপর একটা কম্বলও ফেলে নিয়েছে। বাইরে জঙ্গলের মধ্যে অতক্ষণ বসে থাকতে হলে খুবই শীত করবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ডিম্বুলি গ্রামের সীমানায় পৌঁছে গেলাম।

গ্রামের মধ্যেই পুরোনো মহুয়া গাছতলায় প্রধানের ঘর।

গ্রামের প্রধানকে ডাকতেই সে বেরিয়ে এল। সে এবং আর একটি লোক নিঃশব্দে আমাদের নিয়ে চলল ক্ষেতের মধ্যের ঝোড়াতে, যেখানে আমরা বসব।

ক্ষেতের মধ্যে ছোট্ট একটা খড়ের চালাঘর চারটে খুঁটির উপর বসানো। এত ছোট যে, পাশাপাশি দুজনের কষ্ট করে বসতে হয়। উপরেও খড়, নীচেও খড়।

প্রধানের সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল, সে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা কালো হাঁড়ি রেখে দিল। হাঁড়িটাতে হাত লাগাতেই হাতে ছেঁকা লাগল। তাকিয়ে দেখি, হাঁড়িটার মধ্যে কাঠকয়লার আগুন।

আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি করে অথচ আগুনটা ভিতরে থাকায়, বাইরে থেকে দেখাও যাচ্ছে না। তাই আগুন দেখে জানোয়ারদের ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার কোনো কারণ নেই।

প্রধান এবং লোকটি ঋজুদাকে ফিসফিস করে কি সব বলে গ্রামে ফিরে গেল।

ঋজুদা শুধু একবার বলল, কম্বলটা জড়িয়ে বোস্, খুব ঠাণ্ডা আছে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

আমরা দুজনে নিঃশব্দে সেই খড়ের ছাউনির নীচে বসে রইলাম।

শিশিরে সমস্ত ক্ষেত ভিজে চপচপ করছে। হাঁটতে গেলে প্যান্ট ভিজে যায়।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ক্ষেতের উপরের অন্ধকারকে ঘিরে রয়েছে চারপাশের বনের ঘনান্ধকার। মিঠেপানির পিছনের পাহাড়টাকে আকাশের পটভূমিকায় ঠিক একটা হাতির পিঠ বলে মনে হচ্ছে। উপরে তাকালে দেখা যায় আকাশময় তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। তারাগুলোরও যেন খুব শীত করছে, তাই যেন ওরা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

হঠাৎ একটা কোটরা হরিণ ডেকে উঠল বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে। কয়েকবার ভীষণ ভয়-পাওয়া ব্বাক্ ব্বাক্ আওয়াজ করে ডাকতে ডাকতে পাহাড়তলির জঙ্গলে দৌড়ে বেড়াল।

তারপর সব চুপচাপ। শুধু একটা কুম্ভাটুয়া পাখি আমাদের ক্যাম্পের কাছ থেকে সমানে একটানা ডেকে চলল—গুব গুব গুব গুব।

আধঘন্টাখানেক পর একটা বড় হায়না এল। হায়নাটা কোথাও যাচ্ছিল। শর্টকাট করার জন্যে বোধহয় এই মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। হায়না দেখলেই আমরা গা কেমন করে ওঠে। যে ক'বার হায়না দেখেছি জঙ্গলে, ততবারই এমন মনে হয়েছে। পিছনের পা দুটো ছোট, কেমন একটা চোর চোর চেহারা, গায়ে বোঁটকা গন্ধ। হায়নাটা একটু করে হাঁটে, একটু করে থেমে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে। অন্ধকারে ওকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না, তবে জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, অন্ধকারের মধ্যেও জানোয়ারদের আয়তন ও চলন দেখে মোটামুটি বোঝা যায়।

হায়নাটা চলে যাবার পর আর কিছুই ঘটল না।

রাতে ভুনি-খিচুড়ি খেয়েছিলাম, মুগের ডালের। নারকোল কুচি আর কিশমিশ দেওয়া। খিচুড়িটা খুব ভাল হয়েছিল। তাই খাওয়াটাও বেশি হয়ে গেছিল। এখন এই ঠাণ্ডায় ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

মাচায় অথবা এরকম ঝোড়াতে বসে যখনি ঋজুদার মুখের দিকে তাকিয়েছি, তখনি আমার মনে হয়েছে, ঋজুদা যেন কিসের ধ্যান করছে। চোখের পলক পড়ছে না, শরীর নড়ছে না, এমনকি শ্বাস নিচ্ছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। রাইফেলটা কোলের উপর আড়াআড়ি করে শোওয়ানো আছে। নিজে সহজ ঋজু ভঙ্গিমায় বসে আছে।

প্রথম প্রথম ভাবতাম, ঋজুদা বুঝি একদৃষ্টে জানোয়ার দেখে।

একদিন জিজ্ঞেস করাতে ঋজুদা হেসে বলেছিল, এই অন্ধকারে জানোয়ার নিজে না দেখা দিলে কি তুই দেখতে পাবি ? তাছাড়া ওদের দেখতে পাবার আগেই তো ওদের আসার শব্দ শোনা যায়। তাই চোখ বন্ধ করে থাকলেও বোঝা যায় যে ওরা আসছে, বা এসেছে।

আমি শুধিয়েছিলাম যে, তুমি তাহলে অমন করে বসে আছ কেন ?

ঋজুদা হেসেছিল। বলেছিল, ওরকমভাবে অনড় হয়ে না বসলে জানোয়াররা টের পেয়ে যাবে যে, আমরা এখানে বসে আছি। তাছাড়া কি জানিস রুদ্র, একা একা এরকম জায়গায় বসে থাকলে মনের মধ্যে কত কি ভাবনা আসে। তুই এখন ছোট আছিস, বুঝবি না, বড় হলে বুঝতে পারবি, যে-দিনগুলো চলে যাচ্ছে সেগুলোই ভাল। আমার বসে বসে পুরোনো কথা ভাবতে ভালো লাগে ; অনেকের কথা, হয়ত ভবিষ্যতের কথাও কিছু ভাবি। ঠিক কি ভাবি, তোকে বলতে পারব না, তবে দারুণ ভাল লাগে ভাবতে।

আমি অবাক হয়ে ঋজুদার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। এখন কি ভাবছে ঋজুদা ! কার কথা ভাবছে ! কে জানে ?

বসে বসে আমি বোধহয় খুঁটিতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আমার হাঁটুতে ঋজুদার হাত এবং আমাদের চারধারে ঘোঁত-ঘোঁত আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখি, ঋজুদা দু'হাতে রাইফেল ধরে রয়েছে, গুলি করার জন্যে তৈরী হয়ে।

ঋজুদা আমাকে ওখানে বসার আগেই বলে রেখেছিল যে, তৈরী হয়ে থাক। জানোয়ার এলেই আমি গুলি করার পর তুইও গুলি করবি। ভাল করে দেখে, তবে মারবি। মিছিমিছি আহত করিস না। যাকে মারবি সে যেন মরে।

আজ ঋজুদা তার ডাবল ব্যারেল রাইফেল আনেনি। এনেছে সিঙ্গল-ব্যারেল ম্যাগাজিন রাইফেল—যাতে পর পর তাড়াতাড়ি অনেকগুলো গুলি ছোঁড়া যায়।

ঋজুদা এবার তৈরী হয়ে নিজের রাইফেলের সঙ্গে লাগানো বাতির বোতাম টিপল।

আমিও বন্দুক সামনে নিশানা করে আলোর বোতাম টিপলাম। দুটি টর্চের

আলো সমস্ত ক্ষেতে ছড়িয়ে যেতেই যা চোখে পড়ল, তা বহুদিন মনে থাকবে।

সমস্ত ক্ষেতময় দেড়শ' বুনো শুয়োরের একটা দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা আধঘন্টা এ ক্ষেতে থাকলে কোনো ফসলের 'ফ'-ও আর অবশিষ্ট থাকবে না। দলের মধ্যে বড় বড় দাঁতওয়ালা প্রায় গাধার সমান উঁচু শুয়োরও আছে, আবার ছোট ছোট সুনটুনি মুনটুনি বাচ্চারাও আছে। সকলেরই লেজ খাড়া। মুখ দিয়ে, পা দিয়ে অনবরত বিচ্ছিরি সব ফোঁ-ফোঁ, ঘ্যাঁত-ঘোঁত আওয়াজ করছে।

আমি শুয়োরের দল দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছি, এমন সময় কানের কাছে ঋজুদার রাইফেল গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও একটা বড় দাঁতাল শুয়োরের ঘাড় লক্ষ্য করে গুলি করলাম। গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরটা পড়ে গেল। আমি অন্য শুয়োরের দিকে নিশানা নেব কিনা ভাবছি, ইতিমধ্যে সেই শুয়োরটা মাথা তুলে উঠে পড়ে ভোঁ দৌড় লাগাল।

ঋজুদা ইতিমধ্যে তিন-চারটে শুয়োর ফেলে দিয়েছে। রাইফেলের বোল্ট্ খোলার চটাপট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, পোড়া কার্তুজের মিষ্টি গন্ধ, নল থেকে একটু একটু নীলচে ধোঁয়া। আর মাঠময় প্রলয় কাণ্ড হচ্ছে। শুয়োরের দলের ধাড়ি, মাদী ও বাচ্চাদের তীক্ষ্ণ চিৎকারে ও চতুর্দিকে ছোটাছুটিতে মনে হচ্ছে, কি যেন একটা দারুণ যুদ্ধ লেগেছে এখানে।

দেখতে দেখতে সব শান্ত হয়ে গেল। শুয়োরের দল নিরাপদে পাহাড়ের নীচের অন্ধকারে ফিরে গেল। মাঠের মধ্যে চারটে বড় বড় শুয়োর পড়ে রইল। সবগুলোই ঋজুদা মেরেছে। আমার শিকার আমাকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গেল, তা কি করব ? আর সেই ধোঁকায় আমি এমন বোকা বনে গেলাম যে আর গুলিই করতে পারলাম না।

ঋজুদা শুধোলো, কি রে রুদ্র, পড়েছে ? তুই যেটাকে মেরেছিলি, পড়েছে ?

বললাম, না। পড়েছিল, কিন্তু উঠে দৌড় লাগিয়েছে।

ঋজুদা বলল, কোন্‌দিকে ?

সোজা।

চল্ তো দেখি ব্যাটা কতদূর গেছে। রুদ্রবাবুর শিকার এমনভাবে হাতছাড়া হবে, এটা কি ভাল কথা ? তোকে কিনা একটা বিচ্ছিরি শুয়োর ধোঁকার ডালনা খাওয়াবে ?

আমি বললাম, এই অন্ধকারে অত বড় আহত শুয়োরকে ফলো করবে, কাজটা কি ভাল হবে ?

ঋজুদা বলল, চল্ তো তুই।

আমরা দুজনেই যে যার হাতিয়ারে গুলি পুরে ঘন অন্ধকার পাহাড়তলির দিকে এগোলাম। আমরা যখন ঝোড়া ছেড়ে নামি, তখনই দেখি যে, গ্রাম থেকে একটা মশাল হাতে নিয়ে কয়েকজন লোক ক্ষেতের দিকে আসছে। গুলির শব্দে ওরা বুঝেছে যে শিকার হয়েছে।

আমরা দুজনে ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চললাম। একটু যেতেই আমাদের গরম জামাকাপড় ডালপাতার শিশিরে ভিজে জবজবে হয়ে গেল। আমরা দুজনে পাশাপাশি যাচ্ছিলাম।

আমরা বেশ অনেকখানি এগিয়ে গেলাম কিন্তু আমার শিকার পাওয়া গেল না। এমন সময় আমাদের আলোতে হঠাৎ একজোড়া লালচে-সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো।

সামনেই একটি শুকনো নালা। সেই নালার মধ্যে আমরা প্রায় নেমে পড়েছি এমন সময় চোখদুটো দেখা গেল। দেখি, নালার ঐ পাড়ে একটা মরা গাছের গুঁড়ির আড়ালে শরীরটা লুকিয়ে রেখে একটা চিতাবাঘ আমাদের দিকে চেয়ে আছে। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে আছে যেন। সেই জ্বলজ্বলে ভুতুড়ে চোখের দিকে চাইতেই বুকের ভিতরটা কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হঠাৎ ঋজুদা আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, মার রুদ্র, ভয় নেই, আমি তোর পাশে আছি।

কি হয়ে গেল জানি না, আমি বন্দুক তুলে চিতাটার জ্বলজ্বলে দু'চোখের মধ্যে নিশানা নিয়ে দিলাম গুলি চালিয়ে। আর অমনি চিতাটা মারল এক লাফ আমাদের দিকে। আশ্চর্য! আমি ভাবলাম ঋজুদা তক্ষুনি গুলি করবে, ঋজুদা কিছু করল না, শুধু রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে, দাঁড়িয়েই রইল। সামনে তাকিয়ে দেখি চিতাটা নালার মধ্যে, যেখানে কতগুলো বড় বড় পাথর আছে, সেখানে আছড়ে এসে পড়ল। একটু হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ির আওয়াজ হলো। তারপর সব চুপ। আশ্চর্য! এই সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

ঋজুদা আমার দু' কাঁধে দু' চড় মেরে বলল, সাব্বাস রুদ্র। যাঃ, তুই তো আজ বাঘ শিকারী হয়ে গেলি। তোর দাদা জানতে পেলে নির্ঘাৎ হার্টফেল করবে।

আমরা একটুক্ষণ পর ওদিকে নেমে গেলাম। যাবার আগে ঋজুদা কয়েকটা পাথর ছুঁড়ে মারল। তারপর বলল, চল্, সব ঠিক হ্যায়।

নালায় ঢুকতে ঢুকতে আমি বললাম, তুমি গুলি করলে না কেন? আমার এত ভয় করেছিল না, আর একটু হলে তো ঘাড়ে এসে পড়ত।

ঋজুদা হাসল; বলল, আরে আমি তো তৈরীই ছিলাম। তোর গুলিটা একেবারে মগজ ভেদ করে দু'চোখের মধ্যে দিয়ে ঢুকে গেছিল, আর কী করবে সে? তবে, বুঝলি রুদ্র, বাঘ, চিতা কি অন্য যে কোনো বিপজ্জনক জানোয়ারকে কখনো সামনাসামনি গুলি করিস না। একেবারে নিরুপায় না হলে। সবসময় চেষ্টা করবি পাশ থেকে মারতে।

আমরা যখন পাথরগুলোর কাছে পৌঁছে আমার প্রথম শিকারের বাঘটাকে তারিফ করছি, এমন সময় গাঁয়ের লোকেরা মশাল নিয়ে টর্চের আলো দেখে দেখে আমাদের কাছে চলে এল। তারা বলল যে, আমাদের কাছে আসার সময়

এই দিকের ঝোপে তারা একটা বড় শুয়োর পেয়েছে—সেটা গুলি খেয়েও দৌড়ে এসেছিল অনেকদূর।

ঋজুদা বলল, আলো বাপ্পালো, (ঋজুদা মাঝে মাঝেই মজা করার জন্যে বলে—আলো বাপ্পালো। উড়িয়াতে একথার মানে হলো ওরে বাবা।) একই সন্ধ্যায় শুয়োর এবং বাঘ মেরে দিলি—নাঃ, তোকে তো দেখছি এবার সমীহ করতে হবে!

আমি রেগে বললাম, ভাল হবে না ঋজুদা। কিন্তু মনে মনে বেশ খুশিই হলাম।

শুয়োরগুলো পেয়ে লোকগুলো ভারী খুশি। কিছুদিন আর কোনো শুয়োর নিশ্চয়ই এ-মুখো হবে না। তাছাড়া কাল ডিম্বুলি গ্রামে যে দারুণ খাওয়াদাওয়া হবে সে তো জানা কথাই। গ্রামের যে প্রধান, সে তখনই আমাদের নেমন্তন্ন জানিয়ে রাখল, আমরা যেন সন্ধ্যেবেলা অবশ্য অবশ্য গ্রামে আসি ওদের ভোজে ও উৎসবে যোগ দিতে।

মশাল-টশাল জ্বেলে আমরা ক্যাম্পের কাছে যখন এলাম, তখন অমৃত্ দাদা ডোরাকাটা পায়জামা পরে মাথায় গামছা জড়িয়ে খড়ের বিছানায় আরামে ঘুমিয়ে ছিল। সে দৌড়ে এসে ঘুমচোখে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আরে রুদ্দর দাদা, তুমনে ক্যা কিয়া? তুমনে কামাল্ কর্ দিয়া।

সেদিন অনেক রাত অবধি আমার ঘুম এল না। কারণ পরদিন আলো ফুটলেই ঋজুদা বাঘটার ছবি তুলবে। আর বলেছে, বাঘটার সঙ্গে শিকারীরও একটা তুলবে।

॥ ৪ ॥

চামড়া-টামড়া ছাড়াতে অনেক বেলা হয়ে গেল। শুয়োরগুলো ওরা গ্রামেই নিয়ে গেছিল। দাঁতাল শুয়োরগুলোর দাঁত দিয়ে যেতে বলেছিল ঋজুদা, ওরা দাঁতগুলো না ছাড়িয়ে দিয়ে গেছিল। ইয়াব্বড় সব দাঁত।

ঋজুদা বলল, কোলকাতা নিয়ে গিয়ে কার্থবার্টসন হার্পারের দোকানে দিয়ে দিবি, যা বলবি তাই বানিয়ে দেবে ওরা।

কি বানানো যায় শুয়োরের দাঁত দিয়ে? ঋজুদাকে শুধোলাম।

ঋজুদা বলল, অনেক কিছু। টেবলে রাখার পেন হোল্ডার বানাতে পারিস, চাবির রিঙ বানাতে পারিস মধ্যে ফুটো করে নিয়ে, কিংবা জাস্ট সুভ্যেনির হিসাবে রেখে দিতে পারিস।

চিতাবাঘের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাতে ফিটকিরি-টিটকিরি লাগিয়ে যত্ন করে রেখে দেওয়া হলো। কাল ভোরে অমৃত্দাদা কটক যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, সেখান থেকে ঋজুদার এক বন্ধু এটাকে ম্যাড্রাসে পাঠিয়ে দেবে

ভ্যান ইনজেন্ এণ্ড ভ্যান ইনজেন্ কোম্পানীতে। ওরা নাকি সবচেয়ে ভাল ট্যান করে শিকারের চামড়া-টামড়া।

ঋজুদা বলল, তাড়াতাড়ি চান করে খেয়ে নে রুদ্র। আমরা খাওয়া-দাওয়ার পর টিকরপাড়া যাব, মহানদীর ঘাটে। অনেকদিন মাছ খাওয়া হয়নি, ঘাট থেকে মাছ কিনব। তাছাড়া তোর নয়নামাসীরা ওখানের বাংলোয় আছে। নয়নামাসী আর তোর মেসো। দ্যাখ, যদি ওদের রাজী করাতে পারিস এই জঙ্গলে এসে এক-দু'দিন থাকতে। তোর মেমসাহেব মাসীর কি জঙ্গলে থাকতে ভাল লাগবে?

আমি তো শুনে অবাক। নয়নামাসী টিকরপাড়ায় এসে রয়েছে, আর আমি জানি না? কেন, তা বলতে পারব না, নয়নামাসীকে আমার খুব ভাল লাগে। নয়নামাসী ভীষণ মেয়ে-মেয়ে। মেয়েরা যদি ছেলে-ছেলে হয় তাহলে আমার একদম ভালো লাগে না। কবরীপিসী কেমন ছেলে-ছেলে। কবরীপিসির একটু একটু গোঁফ আছে, কেমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে, পিসের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করে, আমার একটুও ভাল লাগে না। নয়নামাসী যদিও আমার আপন মাসী নয়, কিন্তু আমার সব পিসী-মাসীর চেয়ে আমি নয়নামাসীকে বেশী ভালোবাসি। নয়নামাসীর কাছে গেলেই ভাল লাগে।

খাওয়াদাওয়ার পর আমরা জীপে উঠে বসলাম। ঋজুদা আর আমি। আমি আমার বন্দুকটা নিচ্ছিলাম, ঋজুদা বলল, তুই কি আমায় জেলে পাঠাবি? স্যাংচুয়ারীর মধ্যে দিয়ে রাস্তা। কোনো কিছু শিকার করা মানা।

জীপের উইণ্ডস্ক্রীনটা নাবিয়ে দিলাম আমরা, নইলে ভীষণ ধুলো হবে। জীপের পর্দাও খুলে ফেলা হলো, কারণ এখন দুপুরবেলা, এ সময়টা ভারী আরামের। রোদ খেতে খেতে যাওয়া যাবে।

আমরা রওয়ানা হয়ে পড়লাম। কাঁচা রাস্তাটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগাছালিতে ভরা পাহাড়গুলোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে টুল্বকা, পূর্ণাকোট হয়ে টিকরপাড়ার দিকে।

টিকরপাড়া উড়িষ্যার সবচেয়ে বড় নদী মহানদীর একটি ঘাট। এখানে নদী পারাপারের জন্যে নৌকো আছে। মানুষজন, গাড়ি, ট্রাক সব নদী পেরিয়ে যায় এখানে। পূর্ণাকোট থেকে আমরা বাঁয়ে যাব—আর ডাইনে যদি যেতাম তাহলে অঙুল হয়ে ঢেন্‌কানলে পৌঁছে যেতাম।

টুল্বকা থেকে পূর্ণাকোটের রাস্তাটা সত্যিই অপূর্ব। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে, এমন কি গাড়িতে যেতেও। এ পথে রোজ গাড়ি যায় না। সময় যদি কখনো কোনো ঠিকাদারের কাজ এ অঞ্চলে চালু থাকে তাহলেই কাজ চালু থাকলেও ট্রাক এ রাস্তা দিয়ে বড় একটা যায় না কটকে, কা ঘটাবে হয়। জানিসাহী হয়ে, আটগড় হয়ে চলে যায় কটক।

পথের মধ্যে ঘাস, বুনো ফুল গজিয়ে আছে। এখানে ওখা সার সম ময়লা,

লাল ধুলোয় নানা জানোয়ারের পায়ের দাগ। দু'পাশের জঙ্গল এত ঘন যে, ভিতরে ঢুকতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

ঋজুদার ক্যাম্প থেকে আমরা মাইল তিনেক এসেছি, জীপ চলছে আস্তে আস্তে—এ পথে জোরে যাওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ পথের ডানদিকে একটা ছোট টিলার সামনে ঋজুদা জীপ থামিয়ে দিল। তারপর ঐ টিলাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, দেখছিস, কী সুন্দর ফুলগুলো! ফিকে নীল থোকা থোকা ফুটে আছে। ওগুলোর নাম গিলিরী। তারপরই বলল, যা তো রুদ্র, কয়েক তোড়া ফুল তুলে নিয়ে আয়। তোর নয়নামাসী চুলে ফুল গুঁজতে ভালবাসে। তোর মাসীকে দিবি—খুশী হবে।

আমি জীপ থেকে নেমে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতেই আমার ভয় করতে লাগল। যদিও দুপুরবেলা, তবুও খালি হাতে এই জঙ্গলে ঢুকতে বড়ই ভয় করে। আস্তে আস্তে টিলাটার উপরে উঠে গিয়ে ফুল তুলছি, এমন সময় টিলার ওপার থেকে একটা জোর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। ওদিকে তাকিয়ে দেখি, টিলাটার ওপাশে, একফালি সমান জমি। তাতে ঘন সবুজ বড় বড় নরম ঘাস। পিছন দিয়ে একটা পাহাড়ী নালা বয়ে চলেছে তিরতির করে। আর সেই ঘাসের মধ্যে পা-ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কুচকুচে মোষ। মোষগুলোর ইয়া ইয়া শিং; আর আশ্চর্য, প্রত্যেকটা মোষের কপালের কাছটা সাদা এবং পায়ের কাছে, আমরা যেমন মোজা পরি, যেন তেমনি সাদা লোমের মোজা। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, তারপর আর থাকতে না পেরে উৎসাহে চেঁচিয়ে ডাকলাম, ঋজুদা, ঋজুদা!

ঋজুদা পাইপ ধরাচ্ছিল, স্টীয়ারিং-এ বসে—আমার ডাক শুনে মুখ তুলে বলল, কি রে?

আমি বললাম, একদল দারুণ দারুণ মোষ।

ঋজুদা বলল, এই জঙ্গলে মোষ? তারপরই তড়াক করে স্টীয়ারিং ছেড়ে লাফিয়ে নেমে তাড়াতাড়ি আমার দিকে আসতে লাগল; আসতে আসতে বলল, কথা বলিস না, ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।

ইতিমধ্যে আমার ডাকাডাকিতে ঐ মোষগুলো সব এক জায়গায় হয়ে গেল—এক জায়গায় হয়ে গিয়ে সব আমার দিকে মুখ করে মাথা নীচু করে বিরাট বিরাট শিং বাগিয়ে রইল। ওদের নাক দিয়ে ভোঁস ভোঁস করে নিশ্বাস পড়তে লাগল।

ঋজুদা আমার পাশে এসে পৌঁছল। পৌঁছেই বলল, বাইসন।

এগুলোই তাহলে বাইসন, যাদের কথা এত শুনেছি।

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, দ্যাখ, ভাল করে দেখে নে। তারপর কথা না বলে আস্তে আস্তে নীচে নেমে যা, গিয়ে জীপে বসবি।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, চল এক্ষুনি যাই, ওরা যদি তেড়ে আসে?

ঋজুদা আস্তে আস্তে বলল, কিচ্ছু করবে না, ভাল করে দেখে নে। দিনের বেলায় এতবড় বাইসনের দল এমন দেখা যায় না।

আমাদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওরা আস্তে আস্তে এক এক করে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেল ঐ মাঠ ছেড়ে। সবচেয়ে শেষে গেল সবচেয়ে বড় বাইসনটা। ঋজুদা বলল, দ্যাখ, এই হচ্ছে সর্দার।

বাইসনের দল চলে যেতেই আমরা আস্তে আস্তে নেমে এসে জীপে বসলাম। ঋজুদা জীপ স্টার্ট দিল। বলল, ফুলগুলো ভাল করে রাখ, উড়ে না যায়।

অনেক পাহাড়ের গা ঘেঁষে গিয়ে, অনেক শুকনো শাল সেগুনের পাতা মচমচিয়ে মাড়িয়ে, অনেক পাহাড়ী নালার তিরতিরানি গান শুনতে শুনতে আমরা পূর্ণাকোটের কাছাকাছি প্রায় এসে গেলাম।

ঋজুদা বলল, কি রে, চা তেষ্টা পেয়েছে ?

আমি বললাম, তুমি যদি খাও।

আরে তোর পেয়েছে কি না বল-না ?

আমি মুখ ফিরিয়ে হেসে বললাম, পেয়েছে।

ফরেস্ট চেক-পোস্ট পেরিয়ে এসে পূর্ণাকোটের বড় রাস্তায় একটা ছোট চায়ের দোকানে দাঁড়ালাম আমরা। দোকানী ছোট ছোট গ্লাস সাজিয়ে চা বানাতে লাগল। আমার মনে হলো পুরোনো মোজা দিয়ে চা ছাঁকছে। ঋজুদাকে বলতেই ঋজুদা আমাকে ধমক দিয়ে বলল, কি করে চা ছাঁকচে তা তোর দেখার দরকার কি ? চা পেলেই তো হলো। অন্যদিকে কি তাকাবার কিছুই নেই ?

পথের ঐ দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি চোখ ফেরানো যায় না। দূরের ঐ পাহাড়গুলো আর এই রাস্তার মধ্যে অনেকখানি সমান জমি। ফসল লাগানো হয়েছিল—সমস্ত মাঠটা সোনালী আর হলুদে মেশা একটা গালচে বলে মনে হচ্চে। মধ্যে মধ্যে শর্ষের চোখ-ধাঁধানো হলুদের ছোপ। এখানে ওখানে ফসল পাহারা দেওয়ার জন্যে তৈরী খড়ের মাচা। মাঠময় বগারী পাখির একটা বড় ঝাঁক দোলা-লাগা কাঁপা কাঁপা মেঘের মত একবার মাটি ছুঁয়ে আবার পরক্ষণেই যেন মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশের হাসপাতালের কুয়োর লাটাখাম্বাটা উঠছে নামছে। তার ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর শব্দ সমস্ত শান্ত শীতার্ত দুপুরের নির্জনতা একটা গোঙানিতে ভরে দিয়েছে।

চায়ের দোকানী চা নিয়ে এল। আমরা গেলাস হাতে নিয়ে চা খেলাম। তারপর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম টিকরপাড়ার ঘাটে।

পূর্ণাকোট থেকে টিকরপাড়ার পথের দু'পাশে পাহাড় নেই বটে, তবে জঙ্গল এত গভীর যে দিনের বেলাতে যেতেও গা-ছমছম করে। ধুলোয় ধুলোয় দু'পাশের গাছপালার পাতা লালচে হয়ে আছে।

দুপুরবেলার বনের গায়ে একটা আশ্চর্য গন্ধ আছে। ঋজুদার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হয়েছে কিনা জানি না, এ ক'দিনেই আমি জঙ্গলের শব্দ, গন্ধ, চেহারা সব খুব খুঁটিয়ে দেখতে শিখেছি। সকালের বনের গায়ের গন্ধের সঙ্গে রাতের কিংবা দুপুরের বনের গায়ের গন্ধ মেলে না ; যেমন মেলে না রাতের বনের শব্দের সঙ্গে সকালের বনের শব্দ।

এখানে রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত চওড়া ও পথ সমান বলে ঋজুদা বেশ জোরে জীপ চালিয়ে চলল। এখানেও দু'পাশে ঘন জঙ্গল, তবে যে জঙ্গল পেরিয়ে এলাম, তেমন নয়।

টিকরপাড়ার কাছাকাছি আসতেই জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। মাঠের চারপাশটা ফাঁকা ফাঁকা। কিছু কিছু ঘরবাড়ি, ছোট ছোট দোকান এই সব।

চুলে লাল নীল রিবন্ দিয়ে ফুলের মত করে ঝুঁটি বেঁধে কালো কালো ছটফটে ঘাসিয়ানি মেয়েরা ঘাটের চারধারে দাঁড়িয়ে-বসে রোদ পোয়াচ্ছে।

ঘাটের পাশে জীপ থেকে নেমেই আমার দু' চোখ জুড়িয়ে গেল। এত সুন্দর দৃশ্য এর আগে কখনও দেখিনি। কী-ই বা দেখেছি ছাই দেখার মত !

দু'পাশে মাথা-উঁচু পাহাড়—ঘন সবুজ জঙ্গলে ভরা। মধ্যে দিয়ে ঘন নীলচে-সবুজরঙা জল বয়ে চলেছে মহানদীর। এখানে মহানদী যে কত গভীর তা কেউ জানে না। ঘাটের কাছে এবং ওপাশে বাদামী-রঙা বালির চর পড়েছে সামান্য জায়গায়। এই জায়গাটুকু ছাড়া মহানদীর এই গণ্ডে কোথাও চর নেই। ঋজুদা বলল, লোকে একে বলে সাতকোশীয়া গণ্ড। চোদ্দ মাইল পাহাড়ে পথ কেটে মহানদী এমনি এক গভীর গণ্ডের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে এখানে। বিন্‌কেই থেকে বড়মুল।

নৌকো করে গাড়ি বা ট্রাক পার করে দেয় ওরা। ঐ পারে পৌঁছে ডানদিকের পথ ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে শীতলপানি হয়ে লোকে চলে যায় বৌধ রাজ্যে। চারছক্, ফুলবানী এইসব জায়গায়। আর একটা পথ বাঁয়ে চলে গেছে ছবির মত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বড়মুল হয়ে, বড়সিলিঙা হয়ে টাক্‌রা—দশপাল্লা রাজ্যে।

গভীর জঙ্গলে ভরা মাথা-উঁচু পাহাড়গুলোর নদীর নীল আরসিতে সারা দুপুর মুখ দেখে। পাহাড়ী বাজেরা সারা দুপুর নদীর উপরে ও পাহাড়ের কোলে কোলে ঘুরে ঘুরে ওড়ে। তাদের খয়েরী ডানায় দুপুরের রোদ ঠিকরোয়। ঠাণ্ডা জল ছেড়ে মেছো কুমীররা বালিতে উঠে রোদ পোয়ায়। মাছের নৌকো বাদামী পাল তুলে গণ্ডের নীল জলে বড় বড় আঁশের মহাশোল, রুই আর কাৎলা মাছের খোঁজ করে।

মাঝে মাঝে জল বেয়ে হিলজার্স্ কোম্পানীর বাঁশ যায় চৌদুয়ারের কাগজের কলে। একসঙ্গে হাজার হাজার বাঁশ লখীন্দরের ভেলার মত ভেসে চলে স্রোত বেয়ে।

গল্পের বইয়ে, ইংরিজী সিনেমায় অনেক সুন্দর এবং ভয়াবহ জায়গার বর্ণনা পড়েছি এবং দেখেছি, কিন্তু আজ এই অপরাহ্ণবেলায় ঋজুদার হাত ধরে এমনই এক জায়গায় এসে দাঁড়ালাম যে, এমন কিছু-যে আমাদের দেশেই আছে, এ কথা ভেবে আমার গর্ব হলো। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, কী সুন্দর দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ!

কি আশ্চর্য বিচিত্র আর অপূর্ব এর নিসর্গসৌন্দর্য।

ঘাট থেকে দুটো বড় বড় রুইমাছ কিনলো ঋজুদা ; বলল, একটা তোর মাসীকে দিবি, অন্যটা আমাদের। অবশ্য তোর মাসী আমাদের সঙ্গে গেলে দুটোই আমরা নিয়ে যাব।

ঋজুদা বলল, চল, এবার বাংলোয় যাই। তোর ফুলগুলো শুকিয়ে যাওয়ার আগে আগে তো নয়নামাসীকে দিতে হবে, তাই না ?

বাংলোয় যেতে ঘাট থেকে পিছিয়ে এসে বাঁয়ে যেতে হলো আমাদের।

বাংলোটা ভারী সুন্দর। একেবারে নদীর উপর।

জীপটা বাংলোর হাতায় ঢুকে যখন বাংলোর সামনে দাঁড়াল তখন দেখলাম, মেসো আরো তিন-চারজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গাছতলায় রোদে শতরঞ্জি পেতে বসে তাস খেলছে। আর নয়নামাসী একা, দূরে, একটা গাছতলায় চেয়ার পেতে বসে আছে নদীর দিকে চেয়ে।

ঋজুদা মেসোদের কাছাকাছি যেতেই মেসো চিনতে পেরে বলল, আরে কি ব্যাপার, ঋজুবাবু যে ! বসে পড়ুন, বসে পড়ুন, আরে মশাই, আমরা দিনের মধ্যে বাইশঘন্টা তাস চালাচ্ছি এখানে। তাস খেলার এমন জায়গা ভূ-ভারতে নেই।

ঋজুদা হেসে বলল, মাপ করবেন, ঐ খেলাটা আমি শেখবারই সুযোগ পাইনি।

মেসো বলল, বলেন কি ? জীবনে তাহলে করলেন কি ? তাহলে যান মিসেসের সঙ্গে গল্প করুন। চা না খেয়ে যাবেন না কিন্তু। এখানে এরা এমন তন্ময় হয়ে খেলছে যে, এদের রসভঙ্গ না করাই ভাল।

সঙ্গের ভদ্রলোকেরা আমাদের দিকে ভাল করে তাকালেনও না। দেখলেন, মাঝখানে একটা ডিসের উপর অনেকগুলো টাকা চাপা দেওয়া।

ততক্ষণ নয়নামাসী আমাদের দেখতে পেয়েছিল। দেখতে পেয়ে এদিকে আসছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে ফুলগুলো দিলাম।

মাসী আমাকে আদর করে বলল, বাঃ বাঃ, তুই তো ভারী মিষ্টি ছেলে হয়েছিস। কোথা থেকে পেলি রে ফুলগুলো ? কি নাম ?

আমি কৃতিত্বের সঙ্গে বললাম, গিলিরী। ঋজুদা পাড়তে বলেছিল তোমার জন্যে। তারপরই বললাম, জানো মাসী আজ বাইসন দেখলাম।

বাইসন ? সত্যি ?

আমি বললাম, সত্যি। তারপর বললাম, মাসী, তোমাদের জন্যে ঋজুদা মাছ

এনেছে। খাবে তো ?

মাসী হাসল, আমাকে আদর করে বলল, খাব না কেন ?

ঋজুদাকে আসতে দেখে মাসী প্রথমে মুখ নামিয়ে নিল, যেন দেখেইনি।

আমার মনে হলো, মাসীর সঙ্গে ঋজুদার নিশ্চয়ই এর আগে কখনো খুব ঝগড়া-টগড়া হয়েছিল। নইলে কাউকে দেখে মুখটা অমন করে ?

তারপর হঠাৎ মাসী মুখ তুলে হেসে বলল, তারপর ঋজুদা, কি মনে করে ! পথ ভুলে এলেন বুঝি ?

ঋজুদা হাসল। হাসলে ঋজুদাকে ভারী ভাল লাগে।

ঋজুদা বলল, পথ ভুলে কেন ? আমার এই-ই তো পথ। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। এ পথেই যাওয়া-আসা।

তারপর হঠাৎই বলল, তুমি কেমন আছ বলো ?

মাসী একবার মেসোদের দিকে চোখ তুলে দেখল, তারপর বলল, ভাল। খুব ভাল। দেখতেই তো পাচ্ছেন। খারাপ আছি বলে মনে হচ্ছে কি ?

ঋজুদা বলল, জানি না, আমার নিজের দেখার চোখ থাকলে তো দূর থেকেই দেখতে পেতাম।

এমন সময় আমি বলতে গেলাম, মাসী, তোমাদের আমরা নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছিলাম, কিন্তু আমি কথা আরম্ভ করার আগেই ঋজুদা আমাকে চোখ দিয়ে ধমকে দিল। কিন্তু কেন, তা আমি জানি না।

মাসী বলল, আপনি কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছেন ঋজুদা। অনেকদিন পরে দেখলাম আপনাকে।

ঋজুদা জবাবে কিছু বলল না, নদীর দিকে চেয়ে রইল।

মাসী বলল, আপনারা বসবেন না ? বসুন। এতদূর থেকে এলেন, এখানে রাতে খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। কি রে রুদ্র ? থাকবি না ?

ঋজুদা বলল, জঙ্গলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে যে একটু পরে। দেরী করা যাবে না নয়না।

নয়নামাসী একটু রাগ-রাগ গলায় বলল, এমন ভাবে আসার কি মানে হয় ? না এলেই হতো।

ঋজুদা আবার হাসল ; বলল, হয়ত তাই। না এলেই হয়ত হতো। তবু এলাম। এলাম বলে দেখা হলো তোমার সঙ্গে। কি ? তাই না ?

এবার মাসী আমার দিকে চেয়ে বলল, রুদ্র তুই যা তো, গিয়ে দ্যাখ, চৌকিদার কি করছে। চৌকিদারকে ডেকে নিয়ে আয় তো। লক্ষ্মী ছেলে।

আমি চলে গেলাম। কিন্তু আমার মন বলল, চৌকিদার ব্যাটা উপলক্ষ। কোনো কারণে মাসী আমাকে তাড়াতে চাইছে। কেন যে তাড়াতে চাইছে সেটা বুঝতে পারলাম না।

চৌকিদারবাবু ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে নিয়ে আমি যখন

ফিরলাম, দেখি ঋজুদা চলে এসে জীপের কাছে পৌঁছে গেছে। মাসী জীপের স্টীয়ারিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাসীর মুখটা খুব শুকনো দেখাল। মনে হলো, মাসী যেন কাঁদছে।

আমি বললাম, মাসী, এই যে চৌকিদার।

মাসী বলল, তোর ঋজুদা একটুও বসতে পারবেন না, আর চৌকিদারকে দিয়ে কি করব বল ? তারপরই চৌকিদারকে বলল, চৌকিদার, আমার ঘরে ঢেনকানল থেকে আনা পোড়-পিঠের একটা ঠোঙ্গা আছে, নিয়ে এসো-না।

চৌকিদার ঠোঙ্গাটা আনতেই মাসী আমার হাতে ওটা দিয়ে বলল, রুদ্র, এটা তোরা নিয়ে যা। জঙ্গলে দিনের পর দিন কি খাস রে ?

আমি হাসলাম ; বললাম, কত কি খাই !

ঋজুদা বলল, চল রুদ্র, উঠে পড়।

স্টীয়ারিং-এ বসে ঋজুদা মেসোদের দিকে হাত নাড়ল।

মেসো বাঁ হাতে তাস ধরে, সিগারেট মুখে দিয়ে ডান হাত নাড়ল, তারপর সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, সাংঘাতিক জিতছি, জিতছিই ; এখন আসা সম্ভব নয়। ডোন্ট মাইণ্ড। প্লিজ। সী-ইউ।

ঋজুদা মাসীর দিকে চেয়ে শুধোল, গজেন কি বলল ? জিতছে ?

মাসী ডান হাতে কপালে-পড়া চুল ঠিক করতে করতে বলল, সাংঘাতিক জিতছে।

ঋজুদা এঞ্জিনটা স্টার্ট করল। স্টীয়ারিং-এ রাখা ঋজুদার হাতের উপর আঙুল ছুঁইয়ে মাসী বলল, পরশু কোলকাতা ফিরব, চিঠি লিখবেন, কেমন ? লিখবেন তো ?

ঋজুদা উত্তর দিল না, শুধু মুখ ঘুরিয়ে একবার মাসীর দিকে তাকাল। তারপর জীপ ব্যাক করে নিয়ে ঋজুদা একসিলারেটরে ভীষণ জোরে চাপ দিয়ে খুব স্পীডে গাড়ি চালাতে লাগল। সময়মত যেতে না পারলে জঙ্গলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে। রাতে আর ফেরা যাবে না ডিম্বুলিতে।

আমার মনে হলো, ঋজুদার বোধ হয় ভীষণ দেরী হয়ে গেছে।

ফেরার পথে সারা রাস্তা ঋজুদা কোনো কথা বলল না আমার সঙ্গে। মাঝে মাঝে কি যে হয় ঋজুদার, সে-ই জানে। পাইপটা ভরবার জন্যে শুধু একবার একটা নালার পাশে দাঁড়াল—তারপর সারা রাস্তা আর একবারও দাঁড়াল না।...

আমরা প্রায় ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে গেছি, ক্যাম্প থেকে পাঁচশ মিটার দূরে একটা বাঁক আছে মারাত্মক। একটা সাঁকো—কাঠের। একেবারে নড়বড়ে। সাঁকোটা পেরিয়েই পথটা হঠাৎ কোনাকুনি ঘুরে গেছে বাঁয়ে। সেই বাঁকটা ঘুরতেই আমার মনে হলো, সামনে পথটা বুঝি শেষ হয়ে গেছে—আর পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাহাড়।

কি হলো বোঝার আগেই ঋজুদা জোরে ব্রেক কষল। জীপের হেডলাইটের আলোতে দেখলাম, পথ জুড়ে একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে। একা হাতি। হাতিটা পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। জীপটা তার কাছে গিয়ে পৌঁছতেই হাতিটা অতবড় শরীরটা ঘুরিয়ে আমাদের দিকে মুখ ফেরাল।

আমি ঋজুদার দিকে মুখ ফেরালাম, দেখলাম ঋজুদার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, ঋজুদা ডান হাতটা ট্রাফিক কনস্টেবলের মত তুলে আমার বুকে ছোঁয়াল, আর ইশারায় আমাকে চুপ করে থাকতে বলল।

আমি এমনিতেই চুপ করে গেছিলাম, আমাকে ঋজুদার বলার কোনও দরকার ছিল না কোনো।

হাতির চোখ বলে কিছু আছে বলে মনে হলো না। তখন চোখে চোখে তাকাবার মত অবস্থাও ছিল না আমার। সামনের সমস্তটুকু পথ বন্ধ করে হাতিটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান নাড়তে লাগল। শুঁড়টা একবার তুলে জীপের বনেটের উপর দিয়ে, ছোটবেলায় ঠাকুমা যেমন বাচ্চাদের "হাত ঘোরালে নাড়ু পাবে" বলে হাত ঘোরাতেন, তেমন করে ঘুরিয়ে নিল।

ঋজুদারও বোধহয় কিছুই করার ছিল না। আমরা দুজনে যেন বিরাট এক দৈত্যের সামনে লিলিপুটিয়ান মানুষদের মত কতক্ষণ যে নিশ্চল হয়ে বসে থাকলাম মনে নেই।

বহুক্ষণ পর ডালপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, আপন মনে, যেন কিছুই সে করেনি, এমন ভাব করে হাতিটা রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

ঋজুদা জীপটা আবার স্টার্ট করে আস্তে আস্তে ক্যাম্পের দিকে যেতে লাগল।

ঋজুদা বলল, বুঝলি রুদ্র, এই হাতিটাকে যেমন ভালোমানুষ দেখলি, ও কিন্তু তেমন নয়। এ পর্যন্ত ও তিনবার জঙ্গলে ট্রাক উল্টে দিয়েছে, তিন-চারজন লোক মেরেছে এবং ঘর ভেঙ্গেছে অনেকগুলো। প্রত্যেক পূর্ণিমার দিনে হাতিটার পাগলামি বাড়ে।

আমি বললাম, তুমি এত আস্তে চালাচ্ছ কেন ঋজুদা, তাড়াতাড়ি চালাও না, যদি ও আবার আমাদের তাড়া করে আসে ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, ভয় নেই, এখন ও আর কিছু করবে না।

আশ্চর্য লাগে ভাবলে, ঋজুদা কি করে সব বোঝে, সবকিছু জানে ? কখন কোথায় গেলে চিতল হরিণকে কি খেতে দেখা যাবে, অশ্বত্থ গাছ ছেড়ে উড়ে যাওয়া হরিয়ালের ঝাঁক আবার ফিরে আসবে কিনা, এবং এলে কখন আসবে ? ভালিয়া-ভুলুর পাহাড়ের উঁচু রাস্তায় আমরা বিকেলে হাঁটতে যাওয়ার সময় সেই বুড়ো ভাল্লুকমশাইর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে কি হবে না, এ-সবই ঋজুদা ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে।

কি করে বলতে পারে জিজ্ঞেস করলেই ঋজুদা হাসে ; বলে, ওদের সকলের

কুষ্ঠি আমার কাছে আছে।

॥ ৫ ॥

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।

কি যেন একটি জানোয়ার ডাকতে ডাকতে পাহাড় থেকে নামছে। ডাকটা এমন অদ্ভুত আর ভয়াবহ যে, গা ছমছম করে এই ক্যাম্পের মধ্যে, কম্বলের তলায় শুয়েও।

প্রথমে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি সাতজনেই ভুক্-ভুক্, কুঁই-কুঁই, কুঁক্-কুঁক্ করে ডেকে উঠে সেই জানোয়ারকে, অন্যায়ভাবে আমাদের ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে বকে দিল। কিম্বা পরক্ষণেই বুঝলাম, তারা বারান্দার আগুনের কাছে, ঋজুদার খাটের একেবারে পাশে গুড়ি-সুড়ি মেরে বসল চুপটি করে।

আবার জানোয়ারটা ডাকল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে।

ডাকটা এমন যে, শুনলে বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে। বিশেষ করে এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে—শীতের শিশিরে-ভেজা মাঝ-রাতে!

আবার ডাকতেই বুঝলাম, এটা একটা হায়না।

শুয়ে শুয়েই আমি বুঝতে পারছিলাম, ভিজে ধুলো মাড়িয়ে, পাথরনুড়ি, ঘাস-পাতা, ফুল-লতা সবকিছু এড়িয়ে এড়িয়ে হায়নাটা পাহাড় থেকে নেমে আসছিল। শিশিরে তার অফ-হোয়াইট-রঙা লোমে ভরা গা'টা ভিজে গেছে। গায়ের কালো কালো রেখাগুলো নিশ্চয়ই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাহাড় বেয়ে নামছে আর মাঝে মাঝে পেছনের ছোট দুটো পায়ে ভর দিয়ে সামনের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে এদিকে-ওদিকে দেখছে।

ঝিঁঝি ডাকছে অন্ধকারে, একটা কুস্তাটুয়া পাখি ডাকছে একটানা ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব করে। সে ডাক অন্ধকার শীতার্ত ভিজে জঙ্গলে-পাহাড়ে, ফিনফিনে বাঁশ পাতায়, গিলিরী ফুলে, ঝর্ণার পাশে গজিয়ে-ওঠা নতুন-চিকন-সবুজ ঘাসে ঘাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ধ্রুবতারাটা চুপ করে দাঁড়িয়ে তার নীল চোখে রাতের এই একটুকরো জঙ্গলে কোথায় কি হচ্ছে দেখছে।

হায়নাটা আবার ডেকে উঠছে হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ করে।

হায়নাটা যেন সকলকে বিদ্রূপ করছে—ও যেন ঘুমিয়ে-থাকা সব প্রাণীর ঘুমন্ত বুকে ওর এই ঠাট্টার তীক্ষ্ণ অস্বস্তি উলের কাঁটার মত ফুটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

হায়নাটা পাহাড় থেকে নেমে আমাদের ক্যাম্পের পাশের পথ বেয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল।

অনেকক্ষণ আর ঘুম এল না। কুস্তাটুয়া পাখিটা ডেকেই যেতে লাগল। ও কি রাতে ঘুমোয় না? ও খালি ডাকে ঢাব-ঢাব করে। বাঁশঝাড়ে, সাহাজ ও কুরুমের জঙ্গলে, ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে-যাওয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ওর ডাক ধাক্কা খেয়ে

ফিরে আসে।

কি জানি, এমনি রাতেই বাঘডুম্বা ডাকে কিনা। যে-সব মানুষ নরখাদক বাঘের হাতে মারা যায় তারা এসব পাহাড়ে জঙ্গলে বাঘডুম্বা ভূত হয়ে যায়। তারা হঠাৎ হঠাৎ কিরি-কিরি-কিরি-কিরি—ধূপ্-ধূপ্-ধূপ্-ধূপ্ করে আচমকা ডেকে ওঠে। ডাকতে ডাকতে অন্ধকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। জানি না, হয়ত এরকম রাতের বুনো-মোষদের দেবতা টাঁড়বাড়ো মোষের দলের সঙ্গে পাহাড়ের উপরের কোনো শিশির-ভেজা ঘাসে ভরা মাঠে দাঁড়িয়ে কথা বলে।

এই বন, এই পাহাড়, রাতের বেলায় এই গা-ছমছম করা পরিবেশ, এই পরিবেশেই বুঝি যারা দিনের আলোয় ঘুমিয়ে থাকে, সোনালি রোদে দেখাই যায় না, তারা সব ঘুম ভেঙে উঠে চলাফেরা করে, ফিসফিস করে।

শুয়ে শুয়ে আমি টিকরপাড়ার কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, আমাদের দেশটা সত্যিই কত সুন্দর, কত বিচিত্র!

এখন টিকরপাড়ার ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন লাগবে ভাবছিলাম।

নিস্তব্ধ রাত্রি। শুধু কুলকুল করে গভীর অতল গণ্ড দিয়ে জল বয়ে চলেছে—কোনো মাছের নৌকোর রাত-জাগা মাঝি বুঝি একা ছইয়ের নীচে বসে হুঁকো খাচ্ছে। বাঁশের ভেলা যাচ্ছে ঘুমন্ত মাঝিদের নিয়ে চৌদুয়ারের দিকে। নদীর ওপারের বৌধ রাজ্যের মাথা-উঁচু পাহাড়ের সায়ান্ধকারে একলা শিঙাল শম্বর নদীর দিকে চেয়ে কত কি ভাবছে।

ভাবছিলাম, এখন বড়মুল আর বড়সিলিঙার জঙ্গল কেমন দেখাচ্ছে। তারাভরা আকাশের নীচে বিস্তীর্ণ দুধ্লি-ফুল-ভরা মাঠ পেরিয়ে গুহায় ফিরছে বড় বাঘ। চিতল হরিণের দল আমলকী তলায় জলের তলার মাছের ঝাঁকের মত চমকে উঠছে বাঘকে দেখে, তারপর পিছল অন্ধকার পেরিয়ে অন্য কোনো মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে।

কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে না, শুধু টুপটাপ করে শিশির পড়ছে, শুধু ধ্রুবতারা তাকিয়ে আছে নীল চোখে, শুধু ঝিঁঝিদের ঝিম-ধরা কান্নায় ভরে আছে মাঠ, বন, পাহাড়; ভরে আছে শুকিয়ে-যাওয়া ঝর্ণার হলুদ কোল; ভরে আছে পাহাড়তলির স্যাঁতসেঁতে, শ্যাওলা-ধরা খোল।...

বোধহয় মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেছিল, আর সেজন্যেই সকালে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। কখন যে পুবের রোদ বড় পিয়াশাল গাছটার ডাল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার কম্বলে, আমার মুখে, কিছু টের পাইনি।

চোখ মেলে দেখি, অমৃতদাদা আমার চৌপায়ার পাশে দাঁড়িয়ে। বলছে, কেয়া ইয়ার? আজ দিন ভর্ শোনা কেয়্যা?

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

বাইরে বেরিয়ে দেখি, রোদে ভরে গেছে চারপাশ। একদল টিয়া পাশের গাছগাছালিতে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে—ক্যাম্প-ফায়ারের পোড়া কাঠের গন্ধ বেরুচ্ছে,

সামনের টুন্ গাছের ডালে একজোড়া খয়েরী-কালোয় মেশা বড় কাঠবিড়ালি পাতায় পাতায় ঝরঝরানি জাগিয়ে উঁচু ডালময় দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে। শীতের সকালের খুশীভরা উষ্ণ রোদ এসে পড়েছে ওদের ভেলভেটের মত নরম গায়ে।

মুখ-টুখ ধুয়ে ক্যাম্পচেয়ারে বসলাম, চা খেলাম।

এমন সময় দেখি ঋজুদা গ্রামের দিকে ফিরল। ঋজুদা অলিভগ্রীন-রঙা শিকারের পোশাক পরেছে। ইতিমধ্যেই চান-টান করে তৈরী।

ঋজুদার আমি সত্যি সত্যিই একজন দারুণ ভক্ত। বোধহয় আমার দাদা, বাবা, মামা, জামাইবাবু কাউকেও আমার এত ভাল লাগে না। ঋজুদার হাঁটা, বসা, ঋজুদার কথা বলা, ঋজুদার একলাফে জীপে ওঠার ভঙ্গী, ঋজুদার সকলের প্রতি ভালো ব্যবহার, ছোট-বড় সকলের প্রতি ভালোবাসা, এসব মিলে আমার চোখে ঋজুদা আমার আইডল হয়ে উঠছে। ঋজুদা আমাকে যা-ই করতে বলুক না কেন, আমি বিনা-প্রতিবাদে তাই করতে রাজী আছি।

ঋজুদা এসে আমার সামনে বসল। বলল, ঘুম ভাঙল রুদ্রবাবুর ?

—হুঁ। তুমি কোথায় গেছিলে ?

গেছিলাম গ্রামের প্রধানের কাছে—একটা কাজে। তোমাকে আর আমাকে এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে। আজকে রাতে ফেরা নাও হতে পারে।

—কোথায় যাব ? আমি আনন্দে নেচে উঠলাম।

ঋজুদা পাইপটা ভরতে ভরতে বলল, চলোই না। আজ ক্যাল্‌কেসিয়ান বাবু মজা বুঝবে। জীপে যাওয়ার রাস্তা নেই—পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। সারাদিনে পনেরো মাইল পথ হাঁটতে পারবি না ?

—প—নে—রো মাইল ? আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম।

ঋজুদা হাসল ; বলল, তা তো হবেই। পনেরো না হলেও বারো-তেরো মাইল তো বটেই।

আমি একটু মিইয়ে গেলাম। বললাম, কোথায় যাবে, যাবে কেন ?

ঋজুদাকে একটু অন্যমনস্ক দেখাল। ঋজুদা বলল, একটা আশ্চর্য কথা শুনলাম। যম-গড়া পাহাড়ের একটা বড় গুহার কাছে নাকি অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়।

আমি বললাম, কি ? ভূত ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, তুই কি ভূতে বিশ্বাস করিস নাকি ?

আমি বললাম, কখনো তো দেখিনি, না দেখে বিশ্বাস করব কি করে ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, চল আজই তোকে দেখিয়ে দেবো। ডিম্বুলি গ্রামের ওরা অনেকেই নাকি দেখেছে। তাই চল, আমরাও দেখে আসি ব্যাপারটা কি ? এমন একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, শোনার পরও না দেখার কোনো মানে হয় না।

আমি বললাম, কি ব্যাপার বলো না ?

ঋজুদা আবার হাসল ; বলল, না, তা এখন বলা চলবে না। তোমাকে দেখাতেই যখন নিয়ে যাচ্ছি, তখন মুখে আর বলব কেন ? তারপর ঋজুদা বলল, তাড়াতাড়ি চান সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও, আমাদের ন'টার মধ্যে বেরোতে হবে।

আমি বললাম, বেশ।

তারপর ঋজুদা হঠাৎ বলল, রুদ্র, তোর ভয় করবে না তো ?

ভয় আমার ইতিমধ্যেই করতে শুরু করেছিল, কিন্তু ঋজুদার সঙ্গে গেলে ভয় কি ? তাছাড়া ভয়ের কথা কি মুখ ফুটে বলা যায় ?

আমি হাসলাম, মুখে খুব সাহসের ভাব এনে বললাম, না না, ভয় কিসের ?

—না করলেই ভাল। ঋজুদা বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তৈরী হয়ে নিলাম। ব্রেকফাস্ট সেরে, জামাকাপড় পরে নিলাম। তারপর আমার ও ঋজুদার দুটো হ্যাভারস্যাকে কিছু খাবারদাবার, চায়ের সরঞ্জাম, পেয়ালা এবং একটা করে বেশী জামা পুরে দিল মহান্তী। আরো অনেক টুকটাক জিনিস। ঋজুদা দূরবীনটা নিল আর কোমরে বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নিল ছোট্ট কালো চকচকে পয়েন্ট-টুটু পিস্তলটা।

আমি বললাম, কি ঋজুদা ? বন্দুক রাইফেল কিছু নেবে না ?

—না রে। শিকারে যাচ্ছি না তো আমরা, ভূত দেখতে যাচ্ছি। তোর বন্দুকও রেখে যা। বন্দুক রাইফেল ছাড়া খালি হাতে জঙ্গলে ঘোরার আনন্দ আলাদা—তাতে ভয় থাকে নিশ্চয়ই—কিন্তু ভয় থাকে বলেই তার আনন্দটাও অন্যরকম। তবে ভয়ের আর কি ? সত্যিই যদি খালি হাতে গেলেই লোকে বিপদে পড়ত, তাহলে এই ডিম্বুলি গ্রামের ওরা সারাজীবন বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় কি করে ?

আমি বললাম, বাঃ রে। ওদের বিষ-মাখানো তীর আর ধনুক থাকে না ? টাঙ্গী থাকে না ?—ওরা কি একেবারে খালি হাতে যায় ?

ঋজুদা বলল, মেয়েরা ? তারা তো হাতে কিছু না নিয়েই জঙ্গলে চলাফেরা করে। যাই হোক, তোকে একটা টাঙ্গী নেওয়ার পারমিশান্ দেওয়া গেল। বলেই অমৃতদাদাকে ডেকে একটা ভাল ধারওয়ালা চকচকে টাঙ্গী এনে আমাকে দিতে বলল।

একটু পরেই ডিম্বুলি গ্রাম থেকে দুজন লোক এসে হাজির, তাদের কাঁধেও টাঙ্গী। পিঠে গামছা-বাঁধা পুঁটলি, বোধহয় খাবার আছে কিছু। ওদের গা খালি, খালি-পা, একটা মোটা ধুতি পরেছে সামনে কোঁচা ঝুলিয়ে—এদিকে ধুতি উঠে রয়েছে প্রায় হাঁটু অবধি। ওরা দু' ভাই। একজনের নাম শিব্ব, অন্যজনের নাম ভীম।

ঋজুদা মহান্তীকে ডেকে কিছু চাল, ডাল, তরকারী ওদের পুঁটলিতে দিয়ে

দিতে বলল। মহান্তী চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ এসব দিয়ে দিল।

আমি বললাম, কি ব্যাপার ? আমরা কি পিকনিকে যাচ্ছি ?

ঋজুদা বলল, পিকনিকই তো।

তারপর আমরা, যে পাকদণ্ডী পথটা ক্যাম্পের পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠে গেছে—যে-পথে কাল রাতে হায়না নেমেছিল পাহাড় থেকে—সে-পথ বেয়ে উঠতে লাগলাম।

যাওয়ার আগে, ঋজুদা মহান্তীকে বলেছিল, খিচুড়ির বন্দোবস্ত রেডি করে রাখতে—আগামী কাল আমরা দুপুর বারোটা থেকে রাত বারোটার মধ্যে যে-কোনো সময় ফিরতে পারি, এবং ফেরার আধঘন্টার মধ্যে গরম গরম খিচুড়ি, আলুভাজা এবং ডিমসেদ্ধ এবং শুকনো লঙ্কা ভাজা চাই-ই।

পাহাড়ে যখন উঠতে লাগলাম, তখন দু'পাশে দেখার বিশেষ কিছু ছিল না। কারণ দু'পাশে জঙ্গল বেশ ঘন ছিল এবং জায়গাটা দিনের বেলাতেও সায়ান্ধকার ছিল। বড় বড় উঁচু গাছের পাতার আড়াল থেকে রোদের টুকরো-টাকরা এসে নীচে পড়েছে। নানারকম লতা, ফুল, নানারকম প্রজাপতি, পাখি। উঁচু ডালে বসে বড় ধনেশ পাখিগুলো (গ্রেটার ইন্ডিয়ান হর্নবিলস) ওদের বড় বড় ঠোঁট ফাঁক করে হ্যাঁক্ হ্যাঁক্ করে ডাকাডাকি আর ঝগড়া করছে।

পাখিগুলো যেখানেই থাকে, বড় গোল বাধায়, চেঁচামেচি করে জঙ্গল সরগরম করে তোলে। এগুলোকে বেশীর ভাগ দেখা যায় কুচিলা (নাক্স-ভমিকা) গাছে বসে থাকতে। কুচিলা গাছগুলো বেশ বড় হয়, পাতার মধ্যেটার রঙ একটু সাদাটে সাদাটে দেখায়। ধনেশ পাখি যখন একেবারে মগডালে বসে থাকে এবং যখন আওয়াজ করে না, তখন বোঝাই যায় না যে ওখানে পাখি আছে—ওদের সাদা বুকটাকে মনে হয়, আর একটা কুচিলা গাছের পাতা বুঝি।

আমি আর এতসব জানব কোথা থেকে ? ঋজুদাই বলছিল তাই শুনছিলাম। ঋজুদা বলছিল, আরেকরকম ধনেশ পাখি আছে, ছোট ; তাদের বলে (লেসার ইন্ডিয়ান হর্নবিলস্) ; তারাও চেঁচামেচি করতে ভালবাসে, তবে এত না। এখানে ভালিয়া বলে একরকমের গাছ আছে, ওদের সে গাছে ফল খেতে দেখা যায়। এখানের লোকরা তাই বড় ধনেশকে বলে কুচিলা-খাঁই, ছোট ধনেশকে বলে ভালিয়া-খাঁই।

এই ভালিয়া-খাঁই পাখিগুলোকেই গতকাল দেখছিলাম সন্ধের আগে আগে।

আমি ডিম্বুলি গ্রামের পথে হাঁটছিলাম।

গোধূলির আলো এদিকের পাহাড়, ওদিকের বন এবং বন ও পাহাড়ের মধ্যের বিস্তৃত স্তব্ধ শান্ত ক্ষেতকে কেমন এক সোনা-রঙে ভরিয়ে দিয়েছিল। দূরের জঙ্গলের কিনারে মাঠ পেরিয়ে কতগুলো বুনো তালগাছ ছিল, সেই তালগাছগুলোর পাশ দিয়ে বহুরঙা-মেঘে রঙীন আকাশের পটভূমিতে একটি ছোট ভালিয়া-খাঁইর ঝাঁক তাদের ছিপছিপে শরীর নিয়ে ভেসে যাচ্ছিল—রঙীন

আকাশের পটভূমিতে সেই ছবিটি আমার চোখে গাঁথা হয়ে গেছিল ; বুঝি গাঁথা হয়ে থাকবে চিরদিন।

আমরা মাথা নীচু করে উঠছি—কারণ পথটা খাড়া। ঋজুদা বলে, পাহাড়ে পথ চলার নিয়ম হলো, "চড়াইমে বুড্ডা ঔর উৎরাইমে জওয়ান।" মানে, উঠবার সময় শরীরের ভারটা মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে সামনে করতে হয়, আর নামবার সময় মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা পেছনে করে নামতে হয়।

আমরা উঠছি, এমন সময় কি একটা জানোয়ার খড়খড় করে বাঁদিকের জঙ্গল বেয়ে ওপাশের খাদে নেমে গেল।

শিব্ব অমনি ওদিকে চেয়ে বলল, "বাব্বু গুট্টে বড্ড শম্বর চালি গল্বা।"

ঋজুদা বলল, তা যাক। যে যাচ্ছে, তাকে যেতে দাও। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, দেখতে পেলি ?

আমি বললাম, না। দেখার আগেই তো চলে গেল।

আরো কিছুদূর ওঠার পর যখন প্রায় রীতিমত হাঁফ ধরে গেছে, তখন আমরা পাহাড়ের উপরে এসে পৌঁছলাম। সে জায়গাটা যে কি সুন্দর তা বলার মত ভাষা আমার নেই। আমি যদি কোনো কবি বা সাহিত্যিক হতাম, তবে হয়ত বলতে পারতাম।

সেই মালভূমি একটি গড়ানো তৃণভূমি—সকালের রোদ সবেমাত্র এই শিশির-ভেজা তৃণভূমিকে শুকিয়ে খটখটে করে তুলেছে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে একটি-দু'টি বড় গাছ। এদিকে ওদিকে ছোট-বড় শৌখীন বাগানের টিলার মত কালো পাথরের টিলা। একপাশে একটা কবরখানা। এলোমেলোভাবে অনেকগুলো এবড়ো-খেবড়ো কিন্তু চোখা পাথর মাটিতে পোঁতা আছে।

কতরকম যে ঝোপ-ঝাড় চারিদিকে। মুতুরী, গিলিরী, শিয়ারী লতা আর না-নউরিয়া ফুলের ঝোপ। প্রতিটি ঝোপে ও লতাতেই প্রায় ফুল ধরে আছে। এক জায়গায় পাঁচ-ছ'টি আমলকী গাছ—ঝুরু ঝুরু পাতা ঝরা তাদের শেষ হয়ে গেছে তখন। যতদূর চোখ যায়—সবজে-পাটকিলে-রঙা মালভূমিটি দূরের নীল দিগন্তরেখায় মিশে গেছে।

কথা না বলে আমি অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঋজুদা আমার কাঁধে হাত ছোঁওয়াল ; হেসে বলল, কি রে ? ভাল লাগছে ?

আমি বললাম, দা-রু-ণ !

ঋজুদা বলল, কষ্ট করে যে পাহাড় চড়লি এতটা, তাই তো এমন সুন্দর জায়গায় আসতে পেলি। কষ্ট না করলে, পাহাড় না চড়লে, কোনো সুন্দর কিছুই যে পাওয়া বা দেখা যায় না, বুঝলে রুদ্রবাবু !

বললাম, হুঁ। ভাবছিলাম এইজন্যেই ঠাকুমা বলেন, কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে। দেখছি, কথাটা তো সত্যিই।

ঋজুদা বলল, তুই তো একেবারে হাঁপিয়ে গেছিস রে ; ঠিক আছে, বসে নে এই গাছতলায় দশ মিনিট, তারপর আবার যাওয়া যাবে।

আমি আর দেরী না করে একটা পাথরে বসে পড়লাম, তারপর ঋজুদার কথানুযায়ী ফ্লাস্ক থেকে একটু কফি নিজে নিলাম এবং ঋজুদাকে দিলাম।

ঋজুদা কফির প্লাস্টিকের গ্লাসটা পাশে রেখে পাইপ ভরতে ভরতে শিব্ব আর ভীমকে পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করে দিল।

আমি কফিটা শেষ করে গ্লাসটা ওয়াটার-বট্‌লের জলে ধুয়ে হ্যাভারস্যাকে রাখতে যাব, এমন সময় ঋজুদা আমার কাঁধে হাত ছোঁওয়াল। চমকে উঠে দেখি, দূরের আমলকী গাছগুলোর তলায় একদল চিতল হরিণ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চরছে।

দলটা বেশ বড়। কিছু হরিণ শুয়ে-বসে আছে, জাবর কাটছে। আর অন্যগুলো দাঁড়িয়ে।

যেগুলোর মাথায় বড় বড় শিং তারা এদিকে ওদিকে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। একটা হরিণের রঙ কেমন কালচে হয়ে গেছে।

ওর রঙ কালচে হয়ে গেছে কেন শুধোতেই ঋজুদা বলল, ও খুব বুড়ো হয়ে গেছে—তাই হলুদ রঙে কালচে ছোপ লেগেছে। এই মালভূমি ভগবানের। এখানে কেউ শিকার করে না। এখানে শুধু শান্তি। দ্যাখ-না, এটা আগে আদিবাসীদের গোরস্থান ছিল।

আমি বললাম, ওরা কি কেউ মরে গেলে কবর দেয় নাকি ? পোড়ায় না ?

ঋজুদা বলল, সাধারণত পোড়ায়, কিন্তু যদি কেউ দুর্ঘটনায় মারা যায়, অথবা যদি কোনো শিশু মারা যায়, অথবা যাদের সন্তান হবে এমন কোনো মেয়েমানুষ যদি মারা যায়, তাহলে তাদের এখানে এনে কবর দেয়। জানিস তো, এই সব অঞ্চলে খন্দ্ বলে একটা উপজাতি ছিল, ওরা মানুষ বলি দিত। জীবন্ত অবস্থায়ই কোনো মানুষের গা থেকে খুবলে খুবলে মাংস কেটে নিত। লোকটা যখন দৌড়ত, তার পেছন পেছন দৌড়ে ওরা ওরকমভাবে মাংস খুবলে খুবলে তাকে অর্ধমৃত করে ফেলার পর তার মাথার খুলিতে আঘাত করে মেরে ফেলত। সেই সব লোককে ওরা বলত "মেরিয়া"।

—এদিকে খন্দ্‌রা আছে ? আমি ভয়ে ভয়ে শুধোলাম।

—আছে। তবে এদিকে বেশী নেই, খন্দ্‌দের বাস খন্দ্‌মালে—মহানদীর ওপারে—দশপাল্লা, আর বৌধে বেশী আছে। তবে এখন কি আর ও সব প্রথা আছে ? আগে ছিল।

আমি শুধোলাম, ঋজুদা, তুমি কখনো বাঘ্‌ভুম্বা দেখেছ ?

ঋজুদা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হাসল একবার, তারপর বলল, চলো-না, তোমাকে আজ রাতেই দেখাব।

আমাদের এই ফিসফিসানিও বোধহয় হরিণগুলোর কানে গিয়ে থাকবে।

ওরা আস্তে আস্তে আবার ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালের সবুজ অন্ধকারে ফিরে গেল হলুদ আলোর রাজ্য থেকে।

ঋজুদা লাফিয়ে উঠল। বলল, চল। আর দেরী নয়।

আমরা মালভূমিটা যেখানে সবচেয়ে কম চওড়া—(এই দেড়শ' মিটার মত হবে) সেখান দিয়ে মালভূমিটা পেরিয়ে পাহাড় থেকে নামতে লাগলাম।

এখন পথ বলতে কিছুই নেই। এখন যে পথে আমরা নামছি, তাতে কোনো মানুষের পা ছ'মাসে ন'মাসে পড়ে কি না সন্দেহ। এটা একটা জানোয়ার চলার পথ, ইংরিজীতে যাকে "গেম-ট্র্যাক" বলে।

পায়ের খুরে খুরে মাটি উঠে গেছে, দাগ সরে গেছে। যেখানে যেখানে সেই পথ ধুলো বা নরম মাটির উপর দিয়ে গেছে সেখানে কত যে জানোয়ারের পায়ের দাগ তা কী বলব !

ভীম আমাদের আগে আগে যেতে যেতে ধারাবিবরণী দিতে দিতে চলেছে। —এইটা চিতল হরিণের দাগ, এই যে কালো কালো ছাগল-নাদির মত নাদি পড়ে আছে এগুলো কুটরা হরিণের। এইখান দিয়ে শুয়োরের দল পথ ছেড়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেছে। এটা নীলগাই। এগুলো একজোড়া চিতার পায়ের দাগ। এটা শম্বরের। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এই যে এত জানোয়ার এপথে যাওয়া-আসা করে, তারা এখন কোথায় ?—তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে না কেন ? শেষকালে কথাটি জিজ্ঞেস করেই ফেললাম ঋজুদাকে।

ঋজুদা বলল, এ কি আর কোলকাতার রাস্তা পেয়েছিস ! এরা বেশীর ভাগ সময়েই চলাফেরা করে রাতের অন্ধকারে, তবে দিনেও যে করে না এমন নয়—এখনও অনেকে হয়ত এ পথেই আসছিল, কিন্তু আমরা যেরকম গল্প করতে করতে হাঁটছি তা তো ওরা আধমাইল দূর থেকেই শুনতে পাবে, হাওয়ায় আমাদের গন্ধ পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের জঙ্গলে ঢুকে যাবে ; আড়াল নেবে। ওদের মধ্যে অনেকে হয়ত আড়াল থেকে আমাদের লক্ষ্যও করবে। জঙ্গলের পরিবেশে জংলী জানোয়ার তোর থেকে মাত্র পাঁচ হাত দূরে এমন করে লুকিয়ে থাকবে যে, তুই টেরও পাবি না।

কিছুদূর যাওয়ার পর পথটা পাহাড়ের একটা খাঁজ ধরে প্রায় সমান্তরাল রেখায় চলেছে। বাঁদিকে জঙ্গলময় পাহাড় উঠে গেছে—আর ডানদিকে খাড়া খাদ। খাদের অনেক নীচে একটা নদী বয়ে চলেছে। নদীর নাম—সহেলী। উপর থেকে সহেলী নদীর শীর্ণ বুক দেখা যাচ্ছে—পাথর আর বালির মধ্যে মধ্যে তিরতির করে জল বয়ে চলেছে।

একটা মোড় ঘুরেই চোখে পড়ল, নদীর ধারে অনেকগুলো পাতার কুঁড়ে। অত উপর থেকে দেখার জন্য কুঁড়েগুলোকে ক্ষুদে ক্ষুদে দেখাচ্ছিল। রান্না হচ্ছে তার মধ্যে কতগুলোতে—ধোঁয়ার কুণ্ডলী খাদ বেয়ে উঠে উপরের দিকে

আসছে। অনেকগুলো রঙীন শাড়ি মেলা রয়েছে নদীর বালিতে ; পাথরে।

ঋজুদা শিব্বর দিকে চেয়ে বলল, অঙুলের ব্রজ দাস এখানে ক্যাম্প করেছে বুঝি ?

শিব্ব বলল, হ্যাঁ। সাঁওতাল রেজা কুলি এনেছে পথ বানাবার জন্যে।

আমি বললাম, রেজা কুলি কাকে বলে ? আর পথ বানাবে কেন ঋজুদা ?

ঋজুদা বলল, রেজা কুলি মানে মেয়ে কুলি। আর যারা বড় ঠিকাদার, তাদের প্রত্যেককেই নিজেদের পথ নিজেদেরই বানিয়ে নিতে হয় জঙ্গলে—নইলে কাঠ কেটে সে পাহাড় থেকে নামাবে কি করে লরী দিয়ে ? যে জঙ্গল উনি ইজারা নিয়েছেন তা হয়ত পাহাড়ের মাথায়—সেখানে কাঠ কাটলেই তো হলো না, কাঠ তো নামিয়ে এনে শহরে পৌঁছাতে হবে। তাই প্রত্যেককেই নিজের নিজের পথ বানিয়ে নিতে হয়।

আমি বললাম, তুমি বানাওনি !

ঋজুদা হাসল ; বলল, এ বছরে আমার সব জঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পথের আশেপাশেই। তাই আমাকে আর আলাদা করে পথ বানাতে হয়নি। নইলে অন্যান্য বছরে পথ বানাতে হয় বৈকি। পথ বানানোটাও খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ব্লাস্টিং করে করে পাথর ফাটিয়ে একটু একটু করে কোদাল আর গাঁইতি চালিয়ে চালিয়ে পথ তৈরী করতে হয়। একবার ঐ সময়ে আসিস, এলে দেখতে পাবি।

ব্রজ দাসের ক্যাম্প আর দেখা যাচ্ছে না।

যখন আমরা হরিণ দেখেছিলাম তখন থেকে প্রায় দেড়ঘন্টা আমরা হাঁটছি। এখন রোদটা বেশ কড়া হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে বেশ ক্ষিদেও পেয়েছে। কিন্তু পথের যা দৃশ্য তাতে ক্ষিদে তেষ্টা সব ভুলে গেছি।

হঠাৎ দুটো নীল-রঙা রক-পিজিয়ন্ আমাদের সামনে পথের উপর উড়ে এসে বসল। ওরা পাহাড়ী নদীর বুকে এতক্ষণ বসে ছিল। জানি না, কি করছিল। ভারী সুন্দর দেখতে পাখিগুলো—পায়রাই, তবে নীলচে-সবজে রঙ। এরা পাহাড়ে জঙ্গলে পাথুরে জায়গায় থাকে—তাই এদের নাম রক্-পিজিয়ান্।

পাখির কথা আর কি বলব ? কত যে পাখি সকাল থেকে দেখলাম—কতরকম যে তাদের গায়ের রঙ, কতরকম যে তাদের গলার স্বর !

হলুদ-বসন্ত পাখির হলদে-কালো নরম শরীর—পাখিগুলো সুন্দর ডাকে। ঋজুদা এই পাখি ভীষণ ভালোবাসে। আমি একদিন একটা পাখি মারতে গেছিলাম, ঋজুদা এমন বকুনি লাগিয়েছিল আমায় যে, জীবনে তা ভুলব না। সত্যি এমন সুন্দর পাখি মারা উচিত নয়।

নীলকণ্ঠ পাখির ঘন নীল রঙ, টিয়ার সবুজ কচি কলাপাতা সবুজ, টুই-এর পাখনার গাঢ় সবুজ, বনমোরগের সোনালি কালো, ময়ূরের মেঘের মত নীল,

রাজঘুঘুর মখমল বাদামি, মৌ-টুশকি পাখির মুঠিভরা মেটে রঙ।

টিয়া ডাকছে ট্যাঁ ট্যাঁ, টুই ডাকছে টি-টুই-টি-টুই। টুই বসে বসে যত না ডাকে তার চেয়ে বেশী ডাকে হাওয়ায় দোল খেতে খেতে—হাওয়ার নাগরদোলায় চেপে শীষ দেয় ওরা। রাজঘুঘুর গম্ভীর ঘুঘুর-ঘু দুপুরের নির্জনতায় ঘুম পাড়িয়ে দেয় যেন। নানারঙা মৌ-টুশকিরা তাদের ছোট ছোট চিকন ঠোঁটে কি যে সব ফিসফিস করে বলে, বোঝা যায় না। কোনো কোনো অনামা অজানা পাখি ডাকে তো না, যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কারো ডাক শুনলে মন আনন্দে নেচে ওঠে—কারো ডাক শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়। আর এইসব ছোট বড় নানান পাখির ডাক ছাড়িয়ে উপত্যকার উপরে চক্কর-মারা খয়েরী চিল আর বাজেদের তীক্ষ্ণ চিকন বাঁশী বেজে ওঠে চিঁ চিঁ করে আর কানে আসে পাহাড়ের অন্ধকারে কুচলিগাছে বসে থাকা ধনেশ পাখিদের হেঁড়ে গলার ডাক—হ্যাঁক্ হ্যাঁক্, হক্—হক্।

আমরা আরো এগিয়ে গেলাম। সেই সহেলী নদী কিন্তু বরাবরই আমাদের ডান পাশেই চলেছে। এক এক জায়গায় নদীর এক এক চেহারা। কোথাও শুধু বালি, কোথাও শুধু পাথর, কোথাও শুধু ছায়ায়-জমা গভীর জল। তার চারপাশের পাথরে শ্যাওলা ধরে আছে, নানারকম অর্কিড গজিয়েছে গাছের গুঁড়ি থেকে, সে সব জায়গায় ঝর্ণা নেমেছে এ-পাশ ও-পাশ থেকে নদীতে।

আরো মিনিট পনেরো হাঁটার পর হঠাৎ আমার চোখ পড়ল নদীটার দিকে। গেরুয়া বালি, এক জায়গায় খুব বড় বড় চেটালো পাথর অনেকগুলো। সেই পাথরের উপরে লাল লাল তিনটে কি জানোয়ার শুয়ে আছে।

ঋজুদা আমার সামনে সামনে যাচ্ছিল, কিন্তু বাঁদিকের ঝোপের মধ্যে ফুটে-থাকা একরকমের হলুদ গোল-গোল ফলের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে হাঁটছিল !

আমি দু' পা দৌড়ে গিয়ে পেছন থেকে ঋজুদার বেল্ট ধরে টানলাম।

ঋজুদা চমকে গিয়ে ও একটু বিরক্ত হয়ে থেমে পড়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, কি রে রুদ্র ?

আমি ঋজুদাকে নদীর দিকে দেখালাম।

ঋজুদা পথের একেবারে ডানদিকে চলে গিয়ে একটা গাছের নীচে বসে পড়ল। বলল, তোর বরাত তো খুব ভাল রে রুদ্র। জঙ্গলে একশ' বছর থাকলেও এমন দৃশ্য দেখা যায় না।

আমি ঋজুদার পাশে বসে বললাম, ওগুলো কি জানোয়ার ঋজুদা ?

ঋজুদা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি জানোয়ার তা-ই বুঝতে পারিসনি ? বাঘ রে বাঘ। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। মা বাঘ তার দুই বাচ্চা বাঘকে নিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

শিব্ব আর ভীমও আমাদের পাশে বসে পড়ল। মুখে দুজনেই সমস্বরে

বলল, 'আলো বাপ্পালো।'

আমি ঋজুদাকে ভয়ে ভয়ে বললাম, এখানে যে খুব বসে পড়লে, যদি তিনজনে একসঙ্গে উপরে উঠে আসে ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, ওদের পায়ে বাত আছে ; আসবে না।

আমার তখন বিশেষ অবস্থা ভাল নয়, এদিকে ওদিকে বড় গাছ আছে কিনা দেখছি, যাতে বাঘে তাড়া করলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে পারি।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার ঋজুদার উপর রাগ হতে লাগল—এই রকম ভয়াবহ জঙ্গলে কেউ খালি হাতে আসে ? ঐ পুঁচকে পিস্তলটা থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি ? ঋজুদাটার সবই বেশী বেশী ; কি যে করে না !

আমি ফিসফিস করে বললাম, ঋজুদা, তুমি বললে যে ঐ দুটো বাচ্চা, কিন্তু তিনটেই তো সমান। তিনটেই যে বেশ বড়।

ঋজুদা কথা না বলে দূরবীনটা আমার হাতে দিল। বলল, ভাল করে দেখে নে, সারা জীবনে এমন দৃশ্য আর দেখার সুযোগ নাও আসতে পারে। বলে, নিজে পাইপ বের করে পাইপ পরিষ্কার করতে লাগল।

আমার মন বলল, এখন তো কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিলেই পারে, একটু আগেই তো পাইপ খেল, এমনি করে বাঘের মাথার উপরে পা ঝুলিয়ে বসে পাইপ খাওয়ার কি যে দরকার জানি না।

দূরবীনটা চোখে লাগাতেই বাঘগুলো যেন লাফিয়ে কাছে চলে এল শুয়ে শুয়েই।

পরিষ্কার দেখতে পেলাম, বড় বাঘিনীটা চার পা শূন্যে তুলে কিরকম মজা করে রোদ পোয়াচ্ছে। তার তলপেটের সাদা লোমগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে নাকের কালো অংশ। অপেক্ষাকৃত ছোট বাঘ দুটো পাশ ফিরে শুয়ে আছে। একজন তো তার মাকে কোল-বালিশ করে সামনের এক পা তুলে দিয়েছে তার গায়ে।

আমরা কতক্ষণ বসে ছিলাম হুঁশ ছিল না।

শিব্ব বলল, বাবু, একটা ঢিল ছুঁড়ব ?

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না, না।

ঋজুদা বলল, কেন ? ওরা রোদ পোয়াচ্ছে তাতে তোমার কি অসুবিধাটা হলো ?

কিন্তু আমাদের কথাবার্তা বলার জন্যেই হোক কি ঋজুদার পাইপের মিষ্টি গন্ধেই হোক, একটা বাচ্চা বাঘ তড়াক করে ডিগবাজী খেয়ে উঠে বসে উপরের দিকে তাকাল। ও ওদের ভাষায় চাপা গলায় কিছু বলেছিল কি না তা আমি শুনতে পাইনি, কিন্তু তারপরেই দেখলাম মা-বাঘ এবং অন্য বাচ্চাটাও ঘুম ভেঙ্গে উঠে উপরে তাকাল।

মা-বাঘ একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ তুলে ডাকল,

উঁ—আও।

সমস্ত বন পাহাড় গমগম করে উঠল সেই ডাকে।

কিন্তু তারা আমাদের দিকে উঠে না এসে, পরক্ষণেই নদী পেরিয়ে সুন্দর সহজ দৌড়ে ওপারের ঘন জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, চল্ এবার যাওয়া যাক। তারপর বলল, বাচ্চা দুটো বেশ বড় হয়ে গেছে। দিন দশ-পনেরোর মধ্যেই ওরা মাকে ছেড়ে চলে যাবে।

আমি বললাম, কেন, চলে যাবে কেন ?

কারণ, তাই-ই নিয়ম।

ওরা যখন ছোট থাকে—মা'র কাছে থাকে। শহরের মায়েরা যেমন বাচ্চা নিজে খেতে শিখলে, চান করতে শিখলে, কারো হাত না-ধরে বড় রাস্তা পেরোতে শিখলে নিশ্চিন্ত হন, বাঘেদের মায়েরাও তেমনি জঙ্গলের নিয়ম-কানুন, শিকার ধরার কায়দা ইত্যাদি সব শেখানো হয়ে গেলে বাচ্চাদের ছেড়ে দেয় স্বাধীনতা দিয়ে। প্রত্যেকটা বাঘ তাদের স্বাধীনতাকে ভীষণ ভালবাসে। এমনকি বাঘ ও বাঘিনীও একসঙ্গে থাকে না। ঘর-সংসার করার জন্যে বছরের কিছু সময় তারা একসঙ্গে থাকে—তারপরই যে যার স্বাধীন। খুব ভাল সিস্টেম, তাই না ?

আমি বললাম, ঠিক বলেছ, মা আর বাবা আলাদা আলাদা ভাবে থাকলে বেশী ঝগড়া-ঝাঁটি হতে পারত না, না ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, দাঁড়া তোর বাবাকে আমি লিখে দিচ্ছি।

আমি বললাম, এ্যাই, ভাল হবে না বলছি।

ওখান থেকে ওঠবার আগে ঋজুদা শিব্বকে শুধোল, আমরা যেখানে যাব, সে জায়গাটা এখান থেকে কতদূর ?

শিব্ব বলল, আরো ঘন্টাখানেকের পথ।

আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ছ-সাত ঘন্টা হেঁটেছি।

ঋজুদা বলল, এমনি ভাবে হাঁটলে সমান রাস্তায় একজন মানুষ ঘন্টায় চার মাইল হাঁটতে পারে। আর এই পাহাড়ী রাস্তায় ঘন্টায় দু'-আড়াই মাইল হাঁটা যায়, বিশেষ করে চড়াই-এর রাস্তায় রুদ্রবাবুর মত ক্যালকেসিয়ান সঙ্গে থাকলে।

আমি বললাম, তাহলে আমরা কত মাইল এলাম ?

তা প্রায় মাইল সাতেক হবে। একটু বেশীও হতে পারে, ঋজুদা বলল। তারপরই আবার বলল, চল্ ওঠা যাক। ওখানে পৌঁছে আবার দিনের আলো থাকতে থাকতে খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। তোর তো ক্ষিদে পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

আমার রাগ হলো। আমি বললাম, আহা ! আমার একারই যেন পেয়েছে, তোমার বুঝি আর পায়নি !

ঋজুদা হাসল ; বলল, চটছিস কেন ? সকলেই খাব—পেট ভরে। রাতে কি না কি দেখতে হবে তা কে জানে ? এই হয়তো শেষ খাওয়া। বলে আমার দিকে আড়চোখে তাকাল।

তারপর আমরা সকলে উঠে পড়লাম।

এবার আর একটু গিয়েই আমরা সেই নদীর পাশের পথ ছেড়ে বাঁদিকে ঢুকে গেলাম।

শিব্ব ঋজুদাকে বলল, ঐ নদীর পাশের পথটায় একটু গিয়েই একটা 'নুনী' আছে, পথটা ওখানে শেষ হয়ে গেছে।

আমি শুধোলাম, 'নুনী' কি ঋজুদা ?

ঋজুদা বলল, 'নুনী' বলে এখানে, বাংলায় বলে নোনামাটি, ইংরিজীতে বলে সল্ট-লিক্। পাহাড়ে জঙ্গলে এক একটা জায়গা থাকে, যেখানে মাটিতে নুন থাকে। জানোয়ারেরা সেখানে আসে মাটি চেখে নুন খেতে। নুন খেলে আফিং-এর মতো ওদের নেশা হয়ে যায়। যে সব জানোয়ার ঘাসপাতা খেয়ে থাকে, তারাই সাধারণত আসে এসব নুনীতে, আর তাদের পেছনে পেছনে তাদের ধরবার জন্যে আসে বাঘ।

আমি বললাম, একদিন জানোয়ার দেখবার জন্যে এখানে নিয়ে আসবে আমাকে ?

ঋজুদা বলল, এতদূরে আসবি কেন ? আমাদের ক্যাম্পের দু' মাইলের মধ্যেই একটা ভাল 'নুনী' আছে, নিয়ে যাব একদিন, তবে এখন নয়। পূর্ণিমার রাতে। ওখানে তো আর টর্চ জ্বালিয়ে দেখতে পাবি না।

এখানে রাস্তাটা আবার চড়াইয়ে উঠেছে। তাই সকলেই একটু আস্তে আস্তে চলছে।

আমরা প্রায় আধঘন্টাটাক হলো বাঘের জায়গা থেকে চলে এসেছি। রোদের তেজ আর এখন তেমন নেই।

চড়াইটা ওঠা শেষ হলেই দেখলাম সামনে একটা ফাঁকা মাঠ। একেবারে ফাঁকা না—জংলী ঘাস, দুধলি ফুল, মাঝে মাঝে নাম-না-জানা ফুলের ঝোপ-ঝাড় আর সেই মাঠ পেরিয়ে ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে একটা পাহাড়, তার পাশে একটা ভাঙ্গা গড় মতো। গড়ের গা বেয়ে বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে।

ভীম বলল, 'গড় আসি গুলা।'

আমরা সকলে অবাক হয়ে ঐ দিকে তাকিয়ে এগোতে লাগলাম।

সূর্য ততক্ষণে পশ্চিমে বেশ হেলে পড়েছে।

গড়ের কাছাকাছি এসে আমরা পাহাড়টা ভাল করে দেখলাম। পাহাড়টা ছোট, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে একটা বিরাট গুহামুখ।

আমরা যখন সেই গড়ের ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম তখন প্রায় চারটে বাজে।

ফটকই আছে, চারপাশের দেওয়াল সব ধ্বসে গেছে।

ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকছি এমন সময় আমাদের পেছনে দূর থেকে ঘন ঘন বাঘের ডাক শোনা গেল। বোধহয় যে বাঘগুলোকে আমরা দেখলাম, সেই বাঘগুলোই ডাকছিল, নদীর ওপার থেকে। নির্জন জঙ্গলে পাহাড়ে বাঘ ডাকলে তার প্রতিধ্বনি দু-তিন মাইল দূর থেকে সহজে শোনা যায়।

আমি ঋজুদাকে বললাম, ঐ বাঘগুলো রাতে আমাদের এখানে চলে আসতে পারে কি, এতদূরে ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, ইচ্ছা করলে বাঘ এক রাতে পঞ্চাশ মাইলের চক্কর লাগায়, আর এ তো বাঘের ঘরের বারান্দা। আসতে পারে বই কী। কিন্তু রুদ্রবাবু কি ভয় পাচ্ছ ? ভয় পেলে তোমাকে আর কখনও আমার সঙ্গে নিয়ে আসব না।

আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, না, না, ভয় পাব কেন ? এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

ঋজুদা শিব্ব আর ভীমের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কি সব কথাবার্তা বলল, তারপর গড়ের বারান্দায় একটা জায়গা পরিষ্কার করতে বলল ওদের।

ভাঙ্গা গড়, মধ্যে বাদুড় চামচিকেতে ভর্তি। সাপ-খোপ থাকাও স্বাভাবিক। তাই ঋজুদা বলল, আমরা বাইরের বারান্দাতেই থাকব রাতে। তিন দিকে দেওয়াল পাব, আর যেদিক খোলা সেদিকেই গুহার মুখ। যদি কিছু দেখার থাকে তো দেখা যাবে।

শিব্ব আর ভীম আশপাশের ঝোপ-ঝাড়ে গিয়ে টাঙ্গী দিয়ে ডালসুদ্ধ পাতা কেটে আনল, এবং সেই ডাল ধরে পাতাগুলোকে ঝাঁটা মত ব্যবহার করে বারান্দাটা পরিষ্কার করতে লাগল।

ঋজুদা বলল, দূরবীন-টুরবীন সব এখানে থাক। আয় রুদ্র, আমরা খাওয়ার বন্দোবস্ত করি।

শিব্বর পুঁটলি থেকে একটা মাটির হাঁড়ি বেরোল ; চাল, ডাল ইত্যাদিও বেরোল। মহাস্তী যা যা দিয়ে দিয়েছিল সব। এ সব নিয়ে ঋজুদার সঙ্গে আমি গিয়ে গড়ের পাশের ঝর্ণাতলায় পৌঁছলাম।

কুলকুল করে জল বয়ে যাচ্ছে, পরিষ্কার জল, পাথরে পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। এপাশে ওপাশে অসংখ্য পাথর—বড়, ছোট, গোল আর সমান ; বিভিন্নাকৃতি।

ঋজুদার কথামতো, হাঁড়ি ধুয়ে, হাঁড়িতে জল ভরে, হাতে করে মুঠো মুঠো চাল-ডাল ধুয়ে আমি হাঁড়িতে পুরলাম, তারপর তার মধ্যে আলু পেঁয়াজ ইত্যাদি যা ছিল সব দিলাম।

শিব্ব এসে তিনটে গোল পাথর এক করে তার মধ্যে কিছু শুকনো কাঠ ও পাতা গুঁজে দিয়ে, ঋজুদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দেশলাই ঠুকে দিল।

আগুন দেখতে দেখতে গনগনে হয়ে উঠল।

ঋজুদা বলল, তুই এখানে বসে রান্না কর রুদ্র। জঙ্গলে এলে সব করতে হয়, সব কিছু শিখতে হয়। এই বলে একটা শুকনো ডাল ভেঙ্গে আমায় দিয়ে বলল, এই তোর হাতা বা খুন্তী যাই-ই বলো তাই। মাঝে মাঝে এ দিয়ে হাঁড়ির ভিতরের খিচুড়ি নাড়বি, নইলে তলায় ধরে যাবে।

ঋজুদা চলে গেল।

ওখানে বসে দেখতে পেলাম, অনেক শুকনো কাঠ এনে জড়ো করছে শিব্ব আর ভীম। সারা রাত বোধহয় আগুন জ্বলবে, তাই।

ঝর্ণার কাছে আমি একা বসে আছি, হাঁড়ি সামনে করে। আগুন বেশ জোর হয়েছে। একটু পরেই টগ্‌বগ্ করে জল ফুটবে—খিচুড়ি পাকবে।

ঝর্ণায় ঝর ঝর করে জল বয়ে চলেছে। নানারকম পাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বিকেলের রোদ পড়ে আসছে—সমস্ত মাঠটা, দূরের জঙ্গল, পেছনের পাহাড় ও গুহা সব কেমন এক সোনালি রহস্যের আঁচল মুড়ি দিয়ে ফেলেছে। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। সন্ধ্যাতারাটা উঠবে একা একা—তারপর দিগন্তরেখার উপরে স্থির হয়ে শান্তি ছড়াবে সমস্ত রাতের পৃথিবীতে।

হঠাৎ আমার মাথার কাছ থেকে ছিক্ ছিক্ করে একটা আওয়াজ শুনলাম।

মুখ তুলেই দেখি, আমার পেছনের কুরুম গাছটার মাঝের ডাল থেকে দুটো বড় বাদামী কাঠবেড়ালি কুতকুতে চোখ মেলে আমাকে দেখছে।

এই কাঠবিড়ালিগুলো দেখতে ভারী ভাল। এখানের লোকেরা বলে 'নেপালী মুসা'। মানে নেপালি ইঁদুর। কেন এমন বলে জানি না।

আমি মুখ তুলে ওদের দিকে ভাল করে তাকাতেই আবার একটা ছিক্ ছিক্ আওয়াজ হলো এবং তারপরই ওরা দুজনে পাতায় পাতায় ঝরঝর আওয়াজ তুলে এ ডাল থেকে ও ডালে, ও ডাল থেকে সে ডালে এবং দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল। ওরা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ পাতায় পাতায় হিসহিসানি শোনা যেতে লাগল।

এবার খিচুড়ি আবার আওয়াজ দিতে লাগল—টগবগ, বগবগ করে। আমিও আমার ভাঙ্গা ডাল নিয়ে তাকে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। খিচুড়ি তো প্রায় হয়ে এল। কিন্তু আমার ভাবনা হলো, খাব কোথায়? তাড়াতাড়ি তো প্লাস্টিকের ডিশটিশ কিছুই আনা হয়নি।

একটু পর ঋজুদা এল। বলল, কি রে? ও কিসের আওয়াজ? ক্ষিদেয় তোর পেট কাঁদছে, না খিচুড়ি কাঁদছে?

আমি বললাম, হয়ে গেছে।

ঋজুদা একটু দেখে নিল। আমি কাগজে মোড়া নুনের থেকে একটু নুন মিশিয়ে দিয়ে সেই ডালটা দিয়ে নেড়ে দিলাম হাঁড়ি।

শিব্ব আর ভীমও এল।

ওরা নীরব কর্মী, বিনা বাক্যব্যয়ে আঁজলা করে জল নিয়ে, উনুনের আশপাশের চার-পাঁচটা পাথর ধুয়ে দিল, তারপর শালপাতা আর জংলী-কাঁটা দিয়ে গেঁথে গেঁথে অনেকগুলো দোনা বানিয়ে ফেলল। সেই বড় বড় পাতার দোনা পেতে দিল সেই পাথরগুলোর ওপর।

আমরা সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম ঝর্ণাতে—তারপর বসে গেলাম খেতে।

শিব্ব হাঁড়িটা কচি পাতা দিয়ে ধরে আমাকে ও ঋজুদাকে ঐ গাছের ডালের হাতা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে দিল।

ঋজুদা খুব অল্প খায়—অল্প একটু নিল ঋজুদা। আমার কিন্তু দারুণ ক্ষিদে পেয়েছিল। আমি অনেকখানি নিলাম।

আমাদের দেওয়ার পর হাঁড়িসুদ্ধ নিয়ে শিব্ব আর ভীম বসে গেল।

খিচুড়িটা দারুণ হয়েছে—গন্ধ যা বেরোচ্ছে তা কি বলব! কিন্তু একবার মুখে দিতেই আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি মুখ নীচু করে আড় চোখে ঋজুদার দিকে তাকালাম।

দেখলাম, ঋজুদার মুখেও খিচুড়ি। খিচুড়ি গেলা হলে ঋজুদা আমার দিকে চেয়ে বলল, কেমন লাগছে? নিজের রান্না করা খাবার!

আমি জিভ বের করে বললাম, উঃ।

ঋজুদা হাসতে হাসতে বলল, উঃ-ই করো আর আঃ-ই করো, এখন পেটভরে খেয়ে নাও, নইলে সারারাত ক্ষিদেতে মরবে।

আমিই নুন দিয়েছিলাম, কিন্তু এত নুন দিয়ে ফেলেছিলাম যে একেবারে নুন-কাটা হয়ে গেছে। মোটে মুখে দেওয়া যাচ্ছে না।

শিব্বদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওরা দুজনে বেশ তৃপ্তি করেই খাচ্ছে।

ঋজুদাও যেন বেশ তৃপ্তি সহকারে খেতে খেতে বলল, প্রথম প্রথম এরকম সকলেরই হয়। পরে আন্দাজ হয়ে যায়।

আমার বেশ লাগছিল। এই মাটির হাঁড়িতে খোলা-আকাশের নীচে গড়ের পাশে রান্না, পাথরে বসে পাথরের উপরে শালপাতার দোনায় খাওয়া। পশ্চিমে অস্তগামী সূর্য, পুবে অন্ধকার গুহা, মনের মধ্যে রাতের ভয়ের প্রতীক্ষা। দারুণ লাগছিল।

ঋজুদার সঙ্গে না থাকলে তো এতসব অভিজ্ঞতা হতো না।

ঋজুদা ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ করে পাইপ ধরিয়েছে।

শিকারের পোশাক-পরা পাইপ-মুখে ঋজুদা একটা পাথরের উপর মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। পশ্চিমাকাশের পটভূমিতে দারুণ দেখাচ্ছে ঋজুদাকে। দারুণ হ্যাণ্ডসাম্।

বড় হলে আমি ঋজুদার মত হব। সমস্ত জীবন আমি এমনি করে পাহাড়ে জঙ্গলে কাটাব। এই জীবনের সঙ্গে কোলকাতার জীবনের কোনো তুলনা চলে ? কত কী শোনার আছে, দেখার আছে এখানে ; কত কিছু জানার আছে, ভাবার আছে ; চাওয়ার আছে, পাওয়ার আছে। এই জীবনে আমার নেশা লেগে গেছে—বড় হলেও সারা জীবন এই জঙ্গল, পাহাড়, এই দুধ্‌লি ফুল, এই শাখায় শাখায় ঊর্ধ্বপুচ্ছ কাঠবিড়ালি—এরা সবাই আমাকে চিরদিন হাতছানি দেবে। আমার শরীরটা যেখানেই থাকুক, আমার মনটা পড়ে থাকবে এইরকম কোনো জঙ্গলে পাহাড়ে।

আমাদের খাওয়া শেষ হতে হতে বেলাও পড়ে এল। এখন বেশ শীত। আমরা হাত-মুখ ধুয়ে রাতের মতো তৈরী হয়ে নিলাম। ওয়াটার-বট্‌লে জল ভরে নেওয়া হলো।

তারপর আমরা সকলে সেই গড়ের ভিতরে ঢুকে বসলাম।

বারান্দার যে কোণটা পরিষ্কার করা হয়েছিল সেখানে বড় বড় কাঠের টুকরো এনে রেখেছিল শিব্ব আর ভীম।

বারান্দার পাশেই সারা রাতের মতো আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করা হলো, যাতে ভাল দেখা যায় এবং জংলী জানোয়ার না আসে কাছে।

এখনো অন্ধকার হয়নি। অন্ধকার পুরো হলে তখন আগুন জ্বালানো হবে। আয়োজন সব প্রস্তুত রয়েছে।

আমি একটা কাঠের গুঁড়িতে কম্বল বিছিয়ে আরেকটাতে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেছি। খাওয়াটা একটু বেশী হয়ে গেছে। ঋজুদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে গুহাটার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন দেখছে। একবার দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে দেখল। ঠিক তক্ষুনি শিব্ব আর ভীম বলল যে, ওরা আমাদের সঙ্গে এখানে থাকবে না রাতে।

শুনে আমার খুব রাগ হয়ে গেল, কিন্তু ঋজুদা হেসে বলল, তাহলে কোথায় থাকবি ? এখানে থাকার আর জায়গা কোথায় ?

ওরা বলল যে, এখান থেকে আধমাইল দূরে একটা পরিষ্কার গুহা আছে, সেখানে গিয়ে ওরা আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটাবে।

ঋজুদা বলল, এখন তোদের আমি ছাড়তে পারি না—কারণ সন্ধে হয়ে এসেছে ; এই সময় আধমাইল পথ যেতে রাত হয়ে যাবে। তোরাই বলিস যে সন্ধের মুখে এ জায়গা ভীষণ বিপদের জায়গা। এ ভাবে তোদের ছেড়ে দেওয়া যায় না। যদি যেতেই হতো তো অনেক আগেই তোদের যাওয়া উচিত ছিল।

এ কথাটা শুনে ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, এবং বাইরের সায়াহ্নকারে বিস্তীর্ণ মাঠ, জঙ্গল আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে নিজেরা কি যেন বলাবলি করল। তারপর বলল যে, ওরা থাকতে পারে, কিন্তু গুহার দিকে মুখ করে থাকবে না—উল্টোদিকে মুখ করে বসে থাকবে।

ঋজুদা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, তোদের যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে মুখ করে বসে থাকিস। তোরা ঘুমিয়েও থাকতে পারিস। কিন্তু এখান থেকে তোদের আমি আমার দায়িত্বে ছাড়তে পারব না। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, জংলী জানোয়ারের ভয় ওরা করে না, কিন্তু অন্য ভয়ে হার্টফেলও করতে পারে।

এ কথা শুনে ওরা মহা খুশী।

ওদের দুজনের মধ্যে ভীম একটু সাহসী। ও বলল, ভয় আমি পাইনি, এই শিব্বটা পেয়েছিল, ও ঘুমোক। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, বুঝলে সানোবাবু।

সানো মানে ছোট—তাই ওরা বলছে আমাকে সানোবাবু।

এর পর আর কোনো কথাবার্তা হলো না।

ঋজুদা কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটা খুলে ম্যাগাজিনটা বের করে গুলি সব ভরা আছে কিনা দেখে নিল, তারপর ঠেলে ম্যাগাজিনটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। ক্লিক্ করে একটা শব্দ হলো। তারপর হ্যাভারস্যাক থেকে আরেকটা গুলি-ভরা ম্যাগাজিন বের করে নিজের পকেটে রাখল।

সন্ধে প্রায় হয়ে গেছে। এখন চতুর্দিক অন্ধকার। কিন্তু বনে জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ যে আলোর অন্তর্মিত আভাস থাকে তা স্থির হয়ে ফিকে গোলাপী ও বেগুনী রঙ ধরে জঙ্গল আর পাহাড়ের মাথা-ছোঁওয়া দিগন্তে কাঁপছে।

অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, ভীম গিয়ে আগুনটা জ্বালাল।

প্রথমে কিছু ভুসভুস্ শব্দ হলো পাতা পোড়ার, খড়কুটো পোড়ার ফুটফাট, তারপরই বড় কাঠে আগুন ধরার চট্‌পট্ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

দেখতে দেখতে আগুনটা ধরে গেল।

ঋজুদা গিয়ে একটা আগুন-ধরা ডালকে নেড়েচেড়ে ঠিক করে বসাল আর অমনি আকাশে আগুনের ফুলঝুরি ফোয়ারার মতো লাফিয়ে উঠল।

এখন কোথাও কোনো শব্দ নেই, কিছু দেখার নেই। চতুর্দিকে জমাট-বাঁধা নয়, তরল অন্ধকার। আগুনের আলো যতদূর যায় ততদূর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেই বৃত্তের বাইরের অন্ধকারের রহস্য আরো বেড়ে গেছে।

আমি আগুনের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে গেছিলাম। আমার আর কোনোদিকে খেয়াল ছিল না। আগুন যে এমন আরতি করে, আগুনের মধ্যে যে এত রঙ তা কোনোদিনও জানতাম না আগে। লাল, বেগুনী, গোলাপী, নীল আগুন যে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে কতশত রঙে রঙীন করে তোলে, তা আগুনের দিকে চেয়ে থাকলে বোঝা যায়। তার জিভ দিয়ে কোনো প্রাচীন সরীসৃপের মতো হিস্ হিস্ শব্দ বেরোয়, আর সে মাঝে মাঝে উল্লাসে লাফিয়ে উঠে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করে। সহসা রঙীন ফুলঝুরি তার সহস্র আঙুল হয়ে

ভীমসেন যোশীর গানের মতো আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে।

কতক্ষণ অমনি তাকিয়ে ছিলাম মনে নেই, হঠাৎ আমার হুঁশ হলো একটা আওয়াজে।

চমকে উঠে দেখলাম, ঋজুদা দাঁড়িয়ে উঠে গুহার উল্টোদিকের অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

সেখান থেকে যেন অনেকগুলো টি-টি পাখি ডাকছে উড়ে উড়ে, ডাকছে একসঙ্গে।

প্রথমে মনে হলো বোধ হয় দশ-বারোটা পাখি। তারপরই বুঝতে পারলাম, ওখানে কম করে একশ' পাখি ডাকছে। সমস্ত অন্ধকার মাঠ তাদের টী-টীর্-টি-টি-টীটীর-টি-টি, ডিড্-ইউ-ড্-ইট্ আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

ঋজুদা নিজের মনেই বলল, ইটস্ স্ট্রেঞ্জ, ইটস্ রিয়্যালি স্ট্রেঞ্জ।

এমন সময় পাখিগুলো যেন একসঙ্গে কোনো রেসে নেমেছে এমনভাবে দল বেঁধে আকাশ জুড়ে আমাদের এই আগুনের দিকে উড়ে এল—আগুনে লাল আকাশটুকু ওদের পাখায় পাখায় ছেয়ে গেল—শূন্যে ওদের লম্বা লম্বা সরু সরু পাগুলো ঝুলতে লাগল, দুলতে লাগল। ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে আগুনের কাছ অবধি উড়ে এসেই আবার ফিরে যেতে লাগল, আবার পরক্ষণেই দল বেঁধে উড়ে আসতে লাগল।

এমন সময় সেই গুহার মধ্যে হঠাৎ একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোটা সাদা। বেশী এলুমিনিয়াম চূর্ণ দিয়ে বানানো রংমশালের আলোর মতো। আলোটা দপ করে জ্বলে উঠে কয়েক সেকেণ্ড থেকেই নিভে গেল।

এবার মাঠের শেষের জঙ্গলের ধার থেকে হাতির বৃংহণ শোনা গেল। মনে হলো কোথা থেকে যেন এক বিরাট দলে ওরা এসে ওদিকে জমায়েত হয়েছে। যেদিকে 'নুনী' ছিল, সেদিক থেকে নানারকম হরিণের চীৎকার শোনা যেতে লাগল। কোট্‌রা, শম্বর, খুরাস্টি, চিতল, নীলগাই সবাই এক সঙ্গে ডাকতে লাগল।

আমি ঋজুদার মুখের দিকে তাকালাম।

ঋজুদাকে বেশ বিস্মিত দেখাল, কিন্তু সেই বিস্ময়ে তাঁর এতই আনন্দ যে তাঁর ঠোঁটে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠছে।

আমার কিন্তু মোটেই হাসি পাচ্ছিল না।

আমি আমার টাঙ্গীটা পাশে রেখে সোজা হয়ে বসে রইলাম।

পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, শিব্ব চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টায় নাক-মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। আর ভীম একটা কাঠের উপর বসে টাঙ্গী হাতে করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ ঋজুদা আমাকে ডেকে নিয়ে আগুনের কাছে গেল। বলল, আগুনটা নিভাতে পারবি?

আমি বললাম, কেন?

হ্যাঁ, নেভাও।

আমি ওয়াটার-বট্‌লটা থেকে সব জল আগুনে ঢাললাম, কিন্তু অত বড় আগুন তাতে নেভে না।

ঋজুদা আমার হাত থেকে ওয়াটার-বট্‌লটা নিয়ে ঝর্ণার দিকে চলে গেল অন্ধকারে; জল ভরে নিয়ে এল। এমনি করে তিন-চারবার জল ঢালল, আমি আমার টাঙ্গী দিয়ে জ্বলন্ত কাঠগুলো সরিয়ে আগুনটাকে আলগা করে দিলাম।

ততক্ষণে শিব্ব ঘুম থেকে উঠে আগুন নিভাতে দেখে খুব চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। ভীম মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু খুবই অসন্তুষ্ট।

ঋজুদা শিব্বকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল।

আগুনটা নিভে আসতেই ঋজুদা আমাকে বলল, রুদ্র, ভিতরে চলে আয়।

আমি আর ঋজুদা দুজনেই গড়ের বারান্দায় উঠে এলাম।

চতুর্দিক থেকে তখনো নানারকম জানোয়ার ও পাখিদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আগুন নিভে যেতেই চতুর্দিকে যেন ঝড় উঠল।

টি-টি পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকতে ডাকতে গড়ের পাশ দিয়ে সেই গুহার মুখের সামনে গিয়ে পৌঁছল; তারপর গুহার মুখের পাশে উড়তে উড়তে ডাকতে লাগল।

মাঝে মাঝে হাতির দলের বৃংহণ শুনতে পাচ্ছিলাম। এবার মনে হলো তারা যেন চলতে শুরু করেছে, এদিকেই আসছে যেন।

ঋজুদা বারান্দার কোনায় গিয়ে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, রুদ্র দেখবি আয়।

আমি ঋজুদার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালাম—বাইরে তাকিয়ে দেখি, তারার আলোয় ভরা শীতের আকাশের পটভূমিতে এক বিরাট হাতির দল হেলতে-দুলতে এদিকে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে বড় হাতিগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে শুঁড় তুলে পৃথিবী-কাঁপানো চিৎকার করছে।

এমন সময় হঠাৎ ভীম বলল, বাবু, সাপ!

আমরা চমকে পেছন ফিরেই দেখি, একটা তিন-চার হাত লম্বা সাপ বিদ্যুতের মতো ফণা তুলে গড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে নেভানো আগুনের পাশ দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ঋজুদাকে এবার একটু চিন্তিত দেখাল।

আমি ফিসফিস করে বললাম, ওটা কি সাপ?

ঋজুদা বলল, শঙ্খচূড়।

আমরা আর কথা না বলে, সবাই বারান্দার কোনায় একত্র হয়ে বসলাম।

ঋজুদা পিস্তলটা এবার হাতে নিল।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, কি?

ঋজুদা বলল, কিছু না, যদি কেউ ঘাড়ে এসে পড়ে তাই।

তারপর বলল, কথা বলিস না। গুহার দিকে তাকিয়ে থাক। যেদিকে সাদা আলো দেখা গেছিল সেদিকে নিশ্চয়ই কিছু দেখা যাবে।

একটু পরই আমাদের সামনের আকাশ কালো হয়ে অন্ধকার হয়ে গেল।

হাতির দলটা গড়ের সামনের মাঠে এসে পৌঁচেছে। আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ। আমরা চুপ করে বসে রইলাম। ধীরে ধীরে ওরা সামনের মাঠ পেরিয়ে ঝর্ণার পাশের ডালপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গুহার দিকে যেতে লাগল।

অন্যদিক থেকেও নিশ্চয়ই হরিণ এবং অন্যান্য জানোয়াররা আসছিল। চতুর্দিকে এত বিচিত্র সব আওয়াজ হচ্ছিল তখন যে, কোন্‌টা কোন্ জানোয়ারের আওয়াজ তা বোঝার উপায় ছিল না কোনো।

টি-টি পাখিগুলো তখনো গুহাটার মুখের উপরে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে।

দশ-পনেরো মিনিট এমনিই চলল। সমস্ত আওয়াজ, জঙ্গল তোলপাড়—সব এখন পাহাড়ের দিকে। এমন সময় হঠাৎ আবার সেই আলোটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। এবং সমস্ত গুহা একটা চোখ ঝলসানো সাদা আলোয় ভরে গেল। আর কিছুই দেখা গেল না। আলোটা বোধহয় মিনিট খানেক রইল। তারপরই আবার যেমন জ্বলেছিল, তেমনি হঠাৎই নিভে গেল।

হাতিগুলো আর ফিরে এল না এ পথে। ঐ পাহাড়ের তলা দিয়ে কোন্-না-জানি-কোন্ জঙ্গলে চলে গেল।

অনেকক্ষণ অবধি ঐ দিক থেকে জানোয়ারদের আওয়াজ আসতে শোনা গেল। তারপর আধঘণ্টাখানেক পর সব চুপচাপ।

আবার ঝিঁঝির ডাক শোনা যেতে লাগল চারপাশ থেকে, আবার শিশির পড়ার শব্দ। উত্তেজনা নিভে গেলে, যার জন্যে প্রতীক্ষা করা তা দেখা শেষ হলে, বড় শীত করতে লাগল।

ভীম বলল, বাবু, আগুনটা জ্বালাই?

ঋজুদা ঘড়ি দেখে বলল, মোটে সাড়ে আটটা বেজেছে এখন। এই শীতে সারারাত এখানে কষ্ট পেয়ে মরে কি লাভ? চল, ক্যাম্পে ফিরে যাই।

শিব্ব আপত্তি করল; বলল, এই রাত্তিরে যাবে বাবু? কি দরকার?

ঋজুদা বলল, চল্-না। হাতিরা তো ঐ দিকে চলে গেছে। ভয় তো হাতিদেরই। চল্ চল্, এখানে বসে ঠাণ্ডায় মরতে হবে।

আমার কিন্তু শুনেই দারুণ ভয় লাগল। এ এক দারুণ অভিজ্ঞতা। রাতের বেলায় এই গহন বনে এতখানি পথ হেঁটে-যাওয়া! কত জানোয়ারের ডাক, কত ফুলের গন্ধ, কত রাতচরা পাখির গান শুনতে শুনতে যেন এক স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নময় সেতু পেরিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছনো।

কতক্ষণ যে হাঁটলাম, তার হিসাব ছিল না। তবে এখন বরাবরই প্রায় উৎরাই। তাই খুব তাড়াতাড়ি আসা যাচ্ছিল। শীত যতই থাকুক, হাঁটতে

হাঁটতে গা গরম হয়ে শেষে রীতিমত ঘাম হতে লাগল।

আশ্চর্য! অতখানি রাস্তা ঐ গভীর বনের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে এলাম, কিন্তু দেখা হলো মাত্র একটা বিরাট বড় শজারুর সঙ্গে। আরো দেখা হয়েছিল একদল জংলী কুকুরের সঙ্গে। ভীম বলল, জংলী কুকুরের দল এদিকে ঘুরছে বলেই অন্য সব জানোয়ার সরে পড়েছে এ জঙ্গল থেকে।

আমরা যখন ঋজুদার ক্যাম্পে পৌঁছলাম তখন রাত দেড়টা।

পাহাড়ের উপর থেকেই নীচে ক্যাম্পটা দেখা যাচ্ছিল। আগুন জ্বলছিল বাইরে। হ্যাজাকটা ঝুলছিল বাঁশে। জীপটা দাঁড়িয়ে ছিল শিশুগাছের তলায়। ঘরের মধ্যে কমানো হ্যারিকেনের মিটমিটে আলো মাটির দেওয়ালের ফাটাফুটো দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে।

বড় ভাল লাগল। ভাল লাগল সেই আশ্চর্য বনজ ও অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার পর; ভালো লাগল শীতের রাতে গরম বিছানার কথা ভেবে, মাথার উপরে ছাদের কথা ভেবে; ভালো লাগল অন্য মানুষের সঙ্গর কথা ভেবে।

মহাস্তী খিচুড়ি রেডি করে রেখেছিল ঋজুদার কথামতো।

শিব্ব ও ভীমকেও খেয়ে যেতে বলল ঋজুদা।

সে রাতে, আমার রান্না খিচুড়ির পর মহাস্তীর রান্না খেয়ে এখন বুঝতে পারলাম যে, সে কতখানি ভাল রাঁধে।

॥ ৬ ॥

ঋজুদা দু'দিনের জন্যে কটকে গেছিল কি সব কাজে, কনসার্ভেটর অব ফরেস্টস্-এর সঙ্গে দেখা করতে।

আমাকেও বলেছিল সঙ্গে যেতে। কিন্তু আমি বলেছিলাম, দূর্, কটকে তো তুমি তোমার বন্ধুর বাড়িতে থাকবে—শহরে থাকতে আমার ভালো লাগে না। তুমি যাও, আমি এখানেই থাকি।

ঋজুদা বলেছিল, আমি যখন থাকব না, তখন জঙ্গলে একা-একা যেতে পারিস, কিন্তু একেবারে যেন একা বড় রাস্তা ছেড়ে যাস না। যদি যাস তো দুর্গা মুহুরীকে সঙ্গে নিয়ে যাস। অথবা অমৃতলালকে।

আমি শুধিয়েছিলাম, কেন? ভয় আছে?

ঋজুদা হেসেছিল; বলেছিল, এখনও ভয় আছে। তারপর বলেছিল, তুমি এখনও একা একা যাওয়ার মত শিকারী হওনি। হবে একদিন—যেদিন হবে সেদিন মানা করব না।

জীপে ওঠার সময় ঋজুদা বলেছিল, সাবধানে থাকিস; বাহাদুরী করিস না।

ঋজুদার অবর্তমানে এই দু'দিন আমি ক্যাম্পের এবং সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি-এর মালিক হয়ে গেলাম।

তবে, মালিকেরও মালিক থাকে। ঋজুদা অমৃতদাদাকে আমার লোকাল গার্জেন করে গেছিল। সে মাঝে-মধ্যেই হাঁক ছেড়ে আমার স্বাধীনতা খর্ব করত।

এর মধ্যে একদিন সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি-কে মিঠিপানি ঝর্ণাটায় চান করাতে নিয়ে গেছিলাম।

সে এক কাণ্ড।

কেউ জলে ডিগবাজী খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, কেউ বা দৌড়ে সেই প্রপাতের দিকেই চলে গেল। কেউ বা পাথরের খাঁজের মধ্যে, জল যেখানে বেশী, এমন ভাবে গা ডুবিয়ে বসল যে, দূর থেকে শুধু তার লেজটুকুই দেখা যেতে লাগল। ঝাঁপাঝাঁপি, চেঁচামেচি, ধাঁই-ধাপ্পর করে আছাড় খাওয়া কিছুই বাদ রাখেনি তারা। আমার প্রায় পাগল হবার অবস্থা।

এক-একটিকে ধরে যেই আমি ডগ-সোপ মাখাচ্ছিলাম গায়ে, অমনি অন্যরা আমার চারধারে হুড়োহুড়ি করছিল। সাবান মাখাই তার সাধ্য কি?

আমি মুখ নীচু করে সারমেয়দের সংস্কারসাধন করছি, এমন সময় এক কাণ্ড হলো।

অনেকক্ষণ থেকে কতকগুলো মোষ মিঠিপানির অন্যপাশে জঙ্গলের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছিল। তাদের গলার তামার ঘন্টার শব্দ শোনা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে ঘুটুঙ্ ঘুটুঙ্ করে।

হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে বিনা নোটিশে একটা মোষ সোজা আমাদের দিকে শিং উঁচিয়ে তেড়ে এল। জানি না, কেন।

আমি সেদিন একটা লাল-রঙা শর্টস্ পরেছিলাম, তার জন্যেও হতে পারে।

মোষটা তেড়ে আসা মাত্র সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি সাতজনেই সাত স্বরের মত, সূর্যের সাত রঙের মত সাতদিকে জলের সঙ্গে ছিটকে উঠল, আর আমি জীবনে যত জোরে কখনো দৌড়ইনি তত জোরে প্রাণ নিয়ে দৌড়লাম।

কিন্তু মোষ বাবাজীও নাছোড়বান্দা।

তিনিও অজস্র কাঁটা, পাথর ইত্যাদি মাড়িয়ে আমার পিছনে হড়বড় হড়বড় করে ধেয়ে চললেন।

আমি জঙ্গলের মধ্যে ঝর্ণার পাশে, ঝর্ণার মধ্যে গোল হয়ে ঘুরতে লাগলাম; সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি সকলে সমস্বরে পেট কুঁচকে, মুখ উপরে তুলে ভেউ ভেউ করে হেঁচকি তুলতে লাগল। কিন্তু তাতে সেই মোটা মোষের কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

প্রাণের দায়ে মানুষ অনেক কিছু করে।

আমি প্রাণ বাঁচাতে দৌড়তে দৌড়তেই আমার শর্টস্-এর বোতাম খুলে ফেলে শর্টস্টা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মোষ বাবাজী ভোঁস্ ভোঁস্ করে সেটার উপর কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলে সেটাকে শিং-এ গলিয়ে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তখন আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করল। মেজদি পূজার সময় ঐ শর্টস্টা কিনে দিয়েছিল গতবারে। আরো কাঁদতে ইচ্ছা করল এই ভেবে যে, আমি এখন ক্যাম্পে ফিরব কি করে?

কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে, কতগুলো বড় পাতাওয়ালা সেগুনের ডাল সেগুন গাছের চারা থেকে ভেঙ্গে নিয়ে কোমরের কাছে আগে-পিছনে চেপে ধরে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি'র সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে এসে ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

ক্যাম্পে তখন কেউই ছিল না। শুধু মহান্তী কি যেন করতে রান্নাঘর থেকে বাইরে এসেছিল। মহান্তী আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেই, আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দুলে দুলে হাসতে লাগল।

আমি সভ্য হয়ে বাইরে বেরোতেই দেখলাম আমার দুরবস্থার কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সকলেই মজা করছে আমাকে নিয়ে। তবুও, কি দারুণ বিপদে পড়েছিলাম, তা মহান্তীকে বললাম।

আমি যখন মোষ কি করে আমাকে তাড়া করল তার বর্ণনা দিচ্ছি, ঠিক তক্ষুনি আমাদের ক্যাম্পের পাশের পথ বেয়ে পাহাড়ের পাকদণ্ডী দিয়ে নেমে দুটি ছোট ছোট ছেলে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল।

ছেলে দুটির বয়স আমার চেয়ে অনেক কম—। ভীতু ভীতু, রোগা-পাতলা দেখতে। একজনের হাতে একটি বাঁশের লাঠি, আরেকজনের হাতে দুটো সাদা জংলী ইঁদুর। বোধহয়, কোনো গর্ত থেকে ধরেছে, খাবে আগুনে সেঁকে নুন লাগিয়ে।

মহান্তী ওদের কি যেন বলল; বলতেই, ছেলেগুলো হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে ঠাট্টার চোখে চেয়ে মিঠিপানির দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি, ছেলে দুটো একটা বিরাট মোষের উপরে বসে আমাদের ক্যাম্পের দিকেই আসছে। দেখি, মোষের কাঁধে আমার লাল শর্টস্টা মাফলারের মত ঝুলছে।

এই মোষটাই আমাকে তাড়া করেছিল কি না তা বুঝতে পারলাম না।

আমার মানিব্যাগে এক টাকার নোট ছিল পঞ্চাশটা। আসার আগে দাদা দিয়েছিল। তার থেকে দুটো টাকা এনে ওদের দু'জনকে দিলাম। ওরা খুব খুশী হয়ে আবার মোষের পিঠে চড়েই জঙ্গলে উধাও হয়ে গেল।

এ মোষ নিশ্চয়ই ওদেরই গ্রামের।

ওদের চলে-যাওয়া দেখতে দেখতে আমার মনে হলো, এই ঘটনাতে আমার লজ্জারও কিছু নেই, ওদেরও বাহাদুরির কিছু নেই। জঙ্গলের মধ্যে মোষে তাড়া

করলে খালিহাতে আমার ভয় লাগা স্বভাবিক, অথচ ওরা মোটেই এসবে ভয় পায় না। হাতিতে তাড়া করলেও বোধহয় ওরা আমার মত ভয় পাবে না। আবার ওদের যদি কোলকাতায় গড়িয়াহাটের মোড়ে বিকেলবেলা নিয়ে গিয়ে রাস্তা পেরুতে বলা হয় তো এই ওরাই ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে থাকবে। আমি এবং ওরা অন্যভাবে মানুষ—ওরা জঙ্গলে আর আমি গ্রামে।

সেদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর, বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে, কয়েকটা গুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম একা একা।

এখন ঋজুদা নেই। অমৃতদাদাও নেই, আজ জঙ্গলে গেছে কাঠ লোড করতে। এখন আমি স্বাধীন।

অন্য সময়ের মত দুপুর বেলার জঙ্গলের একটা আলাদা জাদু আছে। শীতের মিষ্টি রোদ জঙ্গলের বুকের ভিতরে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সোনা আর সবুজে, হলুদে আর সোনাতে চতুর্দিক ঝলমল করছে।

জঙ্গলে পা বাড়ালেই আমার কেন ঝিম্ ধরে আসে—ভাল লাগার। নেশা করা কাকে বলে আমার জানা নেই, কারণ আমার কোনো নেশা নেই, চায়ের নেশাও নয়; কিন্তু মনে হয়, আমি যখন বড় হব, এই জঙ্গলকেই আমার নেশা করতে হবে।

জঙ্গলের পথে একা একা বন্দুক-কাঁধে অনেক কিছু নিজের মনে ভাবতে ভাবতে চলতে আমার কী যে ভাল লাগে সে আমিই জানি!

হাঁটতে হাঁটতে কতবার কল্পনায় বাইসন কি বাঘ মেরে ফেলি আমি, কতবার জঙ্গলের রাজার অদেখা রাজকন্যার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কত কি কথা শুনি, কত কি গান। গাছেদের, পাখিদের, পোকা, ফুল, প্রজাপতি এমন কি আকাশ, বাতাস, পথের রাঙা ধুলো—এদেরও যে কত কি বলার আছে তা আমি নতুন করে বুঝতে পাই। বারে বারে ঋজুদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে আসে। মনে মনে বলি, তোমাকে ভালোবাসা ছাড়া দেবার মত আর কিছুই নেই আমার ঋজুদা—কারণ, আমি তো নিজেই এখনও বড় হইনি, লেখাপড়া শেষ করিনি। যখন আমার তোমাকে কিছু দেওয়ার মত সামর্থ্য হবে, তখন দেখবে, তুমি আমাকে যা দিয়েছ সেই অসামান্য দানের বিনিময়ে আমি তোমাকে কত সামান্যই দিতে সমর্থ হই। আমি জানি, তোমার কি কি পছন্দসই জিনিস—পাইপ, বন্দুক, কলম, ভাল ভাল আনকোরা গন্ধের নতুন সব গাদা গাদা বই। তুমি দেখো ঋজুদা, দিই কি না তুমি দেখো!

ক্যাম্প থেকে একটু গেলেই মিঠিপানি পেরুতে হয়।

এখানে মিঠিপানি উপর থেকে ঝর্ণা হয়ে নীচে পড়েছে, তারপর পথটার উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে। অথবা বলা যায়, পথটাই মিঠিপানির উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে।

নরম পেঁজা পেঁজা রাঙামাটির পথ।

পথের পাশে ছোট ছোট শালের চারায় টুই পাখি বসে পীটি-টুঙ্ পীটি-টুঙ্ পিটি-পিটি-পীটি-টুঙ্ করে শীষ দিচ্ছে।

পথের বাঁদিকে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। জঙ্গল কেটে একসময় হয়ত চাষাবাদ করত। এখন কি কারণে চাষাবাদ বন্ধ, তা জানি না। কিন্তু গত বর্ষার জল পেয়ে সমস্ত ফাঁকা মাঠটি এখন সবুজ ঘাস-লতায় ছেয়ে গেছে। মাঠের মধ্যে মধ্যে বেগুনী ফুল ফুটেছে থোকা থোকা। মাঠের এক পাশে একটা খড়ের তৈরী ভেঙ্গে-যাওয়া একচালা ঘর। অনেক-বর্ষায় খড় ধুয়ে গেছে, খড়ের নরম হলুদ রঙ এখন কালচে হয়ে গেছে। ভেঙে-যাওয়া দরজার পাশে একটা না-নউরিয়া ফুলের গাছ ছাদের ওপর হেলে রয়েছে। না-নউরিয়ার লাল রঙ সেই ক্ষয়ে-যাওয়া খড়ের ঘরের কালো পটভূমিতে, সেই নিস্তব্ধ দুপুরের রোদ পিছলানো চিকন সবুজ মাঠের রঙের সঙ্গে মিশে একটা দারুণ ছবি হয়েছে।

আমি অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইলাম।

এই বনের পথে পথে এরকম কত শত দারুণ ছবি থাকে। চোখ থাকলে, সে-সব ছবি দেখা যায়; চোখ না থাকলে, শুধু পথের ধুলো, পথের কষ্টই চোখে পড়ে।

মনে আছে, একদিন ছুলোয়া শিকারের পর আমি আর ঋজুদা হেঁটে হেঁটে ক্যাম্পে ফিরছিলাম। ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে পথের পাশে একটা ঝড়ে-পড়া বড় গাছের গুঁড়ির উপর আমি আর ঋজুদা বসেছিলাম। তখন সন্ধে হয়ে আসছিল। সমস্ত আকাশটাতে একটা অদ্ভুত গোলাপী আর বেগুনীতে কে যেন প্রলেপ বুলিয়েছিল। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, আমাদের সামনের একটা গাছে। গাছটা বেশী বড় ছিল না, এই দু'মানুষ সমান উঁচু হবে। গাছটার সব পাতা ঝরে গেছিল। শুকনো কাটা ডালগুলো সেই নরম স্বপ্নময় আকাশের পটভূমিতে কি যে এক ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির সৃষ্টি করেছিল, কি বলব!

আমি অপলকে সেদিকে তাকিয়েছিলাম। মুখ তুলতেই দেখেছিলাম, ঋজুদাও সেদিকে তাকিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর ঋজুদা আমার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। আমাদের চোখে চোখে একটা ইশারা হয়েছিল। দারুণ ইশারা।

দিদিদের সঙ্গে আমি অনেক আর্ট একজিবিশানে গেছি, কিন্তু এই সব ছবির সঙ্গে মানুষের আঁকা কোনো ছবিরই তুলনা হয় না।

সেই মাঠমতো জায়গাটা পেরুনোর পরই পথটা ঘন জঙ্গলে ঢুকে গেছিল। এখানে পথের পুরো অংশে রোদ পড়ে না। দু' পাশে বড় বড় প্রাচীন গাছ। ভিতরে নানারকম ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গলের পর জঙ্গল—মাঝে মাঝে এক-এক ঝাঁক চিরুনি-চিরুনি রোদ পাতার আড়াল ভেদ করে এসে পড়েছে। সায়ান্ধকার জঙ্গলের মধ্যে যেখানে যেখানে রোদ পড়েছে, মনে হচ্ছে সেই জায়গাগুলোয় যেন সোনা জ্বলছে।

নানারকম পাখি ডাকছে দু'পাশ থেকে। শীষ দিয়ে দিয়ে দোল খেতে খেতে

ছোট ছোট মৌটুসী পাখিরা, বুলবুলিরা, মুনিয়া আর টুনটুনীরা এ ডাল থেকে ও ডালে, এ লতা থেকে ও লতায়, পাতা নাচিয়ে, লতা দুলিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদের উড়ে যাওয়া শীষ আমার মনকে হঠাৎ হঠাৎ কোনো অদেখা অজানা অচিনপুরের হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে।

কোথাও বা দিনের বেলাতেই ঝিঁঝি ডাকছে—সমস্ত জায়গাটা ঝিম্ ধরে আছে। গা শিরশির করছে।

আমার আগে আগে ঘুরে উড়ে চলেছে একটা বড় নীল কাঁচপোকা। তার ঘন নীল পাখনায় রোদের কণা লাগলেই রোদ ঠিকরে উঠছে—সে বুঁ-উ-উ-ই-ই-ই-ই আওয়াজ করে আমার নাকের সামনে দিয়ে একা-দোক্কা খেলতে খেলতে চলেছে।

কি একটা খয়েরী-মত জানোয়ার হঠাৎ পথের ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে দৌড়ে গেল। ছোট জানোয়ার।

অভ্যাসবশে আমি বন্দুক কাঁধে তুলে ফেলেছিলাম।

জানোয়ার ভাল করে না দেখে মারার কথা নয়। কিন্তু এসব জানোয়ার এত দ্রুতগতি যে, আমার মত শিকারীর জন্যে তারা দাঁড়িয়ে থেকে ভাল করে চেহারা কখনোই দেখায় না।

জঙ্গলে যে-সব লোকের অনেকদিনের চলাফেরা, অনেকদিনের অভিজ্ঞতা, ঋজুদার মতে তারা জানোয়ার বা পাখি বুঝতে অত সময় নেয় না। তারা যে-কোনো জানোয়ারের গায়ের রঙ, চলন বা দৌড়ের ঢঙ, এবং পাখির ওড়ার লয় ও ভঙ্গী দেখেই একমুহূর্তে বলে দিতে পারে জানোয়ারটা বা পাখিটা কি। কিন্তু তেমন হতে আমার এখনও অনেক দেরী আছে।

জানোয়ারটা বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়ার পর আমি বন্দুক নামিয়ে ফেললাম। যখন বন্দুক নামালাম, তখন আমার মনে হলো, এ জানোয়ার যেন কোথায় দেখেছি। তারপরই মনে পড়ল, এর নাম খুরান্টি—ইংরিজীতে বলে, মাউস্-ডিয়ার। খুব ছোট্ট ক্ষুদে একরকমের হরিণ। ঋজুদার সঙ্গে একদিন ভোরের বেলায় দেখেছিলাম, ঋজুদা বলেছিল, এ জানোয়ার কখনও মারবি না, এদের বংশ প্রায় নির্মূল করে এনেছে সকলে মিলে। এখানকার জংলী লোকেরা জাল দিয়েও ধরে এদের। এদের মাংস কিন্তু দারুণ খেতে, জানিস্।

ভালই করেছি চিনতে না পেরে, নইলে এই খুরান্টি মেরে পরে ঋজুদার কাছে কানমলা খেতে হতো।

পথটা সামনেই একটা বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখেই বড় বড় ঘাসে ভরা একটা ছোট মাঠ। বাঁক ঘুরেই দেখি হনুমানেদের সভা বসেছে সেখানে। তাদের হাবভাব দেখে না হেসে উপায় নেই। কতরকম যে মুখভঙ্গী করছে, তা বলার নয়। লম্বা লম্বা লেজগুলো ছড়িয়ে বসে আছে কেউ। কেউ কেউ বা লেজ পাকিয়ে গোল করে লেজ নিয়ে সার্কাস করছে।

আমাকে দেখে, পথের পাশেই যারা ছিল, তারা একটু নড়েচড়ে বসল শুধু। অন্যরা ভ্রুক্ষেপ মাত্র করল না।

ওদের পেরিয়ে প্রায় আরো আধমাইলটাক গিয়ে হুঁশ হলো, এবার ফেরার কথা ভাবা উচিত। কারণ এই গহন জঙ্গলে, যেখানে দিনের বেলাতেও লোকে একলা আসে না, এলে দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে, সেখানে সন্ধের মুখে আমার একা একা ঘুরে বেড়ানো বোকামির কাজ হবে।

ঋজুদার কাছে থেকে, তার সঙ্গে ঘুরে, একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, কেউই একদিনে সাহসী হয় না ; হতে পারে না। যারা বনজঙ্গলকে না চিনে, বনজঙ্গলের হালচাল আদব-কায়দা না জেনেই রাতারাতি বনে এসে সাহস দেখায় এসব ব্যাপারে, তাদের ঠাট্টা করে "বাহাদুর" বলে ঋজুদা।

ঋজুদা বোধহয় ঠিকই বলে, পৃথিবীতে কোনো কিছুই অত সহজে আর তাড়াতাড়ি শেখা যায় না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সাহসী হতেও সময় লাগে।

অভিজ্ঞতার পর যে সাহস আসে, সেটাই সাহস, আর বাহাদুরির নাম হঠকারিতা। সেটাকে বলা উচিত সস্তা দুঃসাহস। এইসব জঙ্গল এমন একটা স্টেজ, এখানে এমন এমন সব থিয়েটার হয়, এমন এমন সব চরিত্র অভিনীত হয় যে, এখানে কোনো কিছুই "স্টেজে মারা" যায় না। রিহার্শাল না দিয়ে এখানে থিয়েটার করা বারণ।

যখন প্রায় ফিরব ভাবছি, ঠিক তখনই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম।

পথের পাশে, বাঁদিকে বড় বড় গাছের নীচে একটুখানি খোলা জায়গায় চার-পাঁচটি নীলগাই দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে মুখ করে। নীলগাইকে এখানের লোকেরা বলে "ঘড়িঙ"। সেই শীতের দুপুরের মেঘ-মেঘ ছায়ায় দাঁড়ানো নীল-ছাই রঙা নীলগাইয়ের দল গাছ-গাছালির মাথা থেকে যে একটা বড় বলের মত গোল রোদ এসে পথে পড়েছিল, সেই দিকে চেয়ে ছিল। অন্ধকার আদিম বন থেকে ওদের আশ্চর্য চোখ তুলে এই সূর্যালোকিত বৃত্তের দিকে চেয়ে ছিল।

ওদের দেখেই আমিও 'স্ট্যাচু' হয়ে গেলাম।

আমাকে ওদের না দেখার কথা ছিল না—কিন্তু মনে হলো, ওদের দেখামাত্র আমি থমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়াতে ওরা আমাকে দেখতে পেল না। আমি জলপাই-সবুজ শিকারের ক্যামোফ্লেজিং-রঙের পোশাক পরে ছিলাম।

নীলগাইগুলো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, খেলতে শুরু করল। ওরা যেন কেমন ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে দৌড়য়—মোটা মেয়েরা দৌড়লে যেমন দেখায়, ওরা দৌড়লেও ওদের শরীরের পিছনটা অমনি ঝাঁকতে থাকে।

সে খেলা দেখার মত।

সেই ঠাণ্ডা, গা-ছমছম, ভর-দুক্কুরের বনে ওরা একে অন্যকে ধাওয়া করে করে সেই মাঠময় খেলতে লাগল। দূরে যেতে লাগল, আবার কাছে আসতে

লাগল। এক একবার দলবদ্ধ হতে লাগল, দলবদ্ধ হয়ে পরক্ষণেই আবার দলছুট হতে লাগল।

কতক্ষণ যে ওরা এরকম খেলল জানি না।

আমার হঠাৎ হুঁশ হলো যখন আমার ঘাড়ে কার যেন ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগল। সে ছোঁয়া আসন্ন রাতের।

জঙ্গলে ও পাহাড়ে শীতের বিকেলে রোদটা আড়াল হলেই, আলো সরে গেলেই, কার অদৃশ্য ঠাণ্ডা হাত যেন ঘাড়ে ও কানের পেছনে এসে চেপে বসে। তখন বুঝতে হয়, ঘরে যাবার সময় হয়েছে। আর দেরী নয়।

আমি ফেরবার জন্যে যেটুকু নড়াচড়া করেছি তাতেই বোধহয় নীলগাইয়েরা আমাকে নজর করে থাকবে। আমি, এই বিশ্বাসঘাতক দু'পেয়ে একটি প্রাণী, যে ওদের এত কাছে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা যেন ওরা বিশ্বাসই করতে পারেনি। কিন্তু বিশ্বাস হতেই, সকলে একসঙ্গে প্রথমে দুলকি চালে, তারপর দ্রুত গতিতে পাহাড়ে বনে খুরের দ্রুত খটাখট্ আওয়াজ তুলে আলোর সীমানা পেরিয়ে আধো-অন্ধকার দিগন্তে হারিয়ে গেল।

আমি ক্যাম্পের দিকে ফিরতে লাগলাম। বড় বড় পা ফেলে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর দূর থেকে ক্যাম্পের শুঁড়িপথ চোখে পড়ল।

ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি মনে মনে বলছিলাম, ঋজুদা, তোমার কাছে আমি বারবার আসব। এই জঙ্গলে, কি অন্য জঙ্গলে ; কিন্তু জঙ্গলে। যে-কোনো জঙ্গলে।

আসব শীতে, বসন্তে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, এমনকি হেমন্তেও।

মনে মনে বলছিলাম, ঋজুদা, এই স্বর্গ থেকে তুমি আমাকে তাড়িও না। কোনোদিনও তাড়িও না কিন্তু।

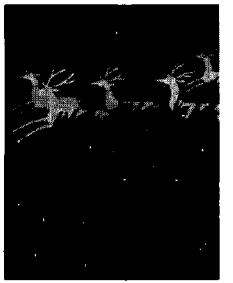

মউলির রাত

কাড়ুয়া

একপাশে গোন্দা বাঁধ, অন্য পাশে শালের জঙ্গল, টাঁড় ; বড় বড় মহুয়া ও অশ্বত্থ গাছ। মধ্যে দিয়ে লাল পাথুরে পথটা করোগেটেড শিটের মতো ঢেউ খেলানো। সেই পথ ছেড়ে পায়ে-চলা পথে তিতির আর কালিতিতিরের ডাক শুনতে শুদতে খোয়াইয়ে ও টাঁড়ে টাঁড়ে হেঁটে গেলে একটু এগিয়ে গিয়েই বোকারো নদী পড়ে। নদীর হাঁটুজল পেরিয়ে অন্য পাশের খাড়া পাড় ডিঙিয়ে আরও আধ মাইলটাক্ গেলেই কুসুমডা গ্রাম।

প্রথম আমার সঙ্গে কাড়ুয়ার এখানেই দেখা হয়। সেদিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে।

গাঁয়ের সীমানায় ও কতগুলো কালো ছাগল চরাচ্ছিল। এক ফালি কাপড় মালকোচা মেরে পরা। হাতে একটা ছোট লাঠি। মাথার চুল কদম-ছাঁটে ছাঁটা— পিছনে একটা আধহাত লম্বা টিকি।

ছেলেটাকে দেখতে একেবারে কাকতাড়ুয়ার মতো।

আমাদের দেখতে পেয়েই কাড়ুয়া দৌড়ে এল। তাড়াতাড়িতে আসতে গিয়ে একটা ছাগল-ছানার পা মাড়িয়ে দিল। সেটা ব্যাঁ—অ্যা—অ্যা করে ডেকে উঠল।

কাড়ুয়া যখন এগিয়ে আসছিল, ঠিক সেই সময় দেখি ওর পিছনে পিছনে একটা এক-ঠ্যাঙা সাদা গো-বক লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে।

কাড়ুয়া এসে কোমর ঝুঁকিয়ে বলল, পর্‌নাম।

গোপালের পুরোনো সাকরেদ ও। গোপাল আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

কাড়ুয়ার কথা এত শুনেছি যে, নতুন করে শোনার কিছু ছিল না। আমাদের দেখামাত্র ছাগলদের আপন মনে চরতে দিয়ে ও আমাদের সঙ্গে হেঁটে চলল। খোঁড়া বকটাকে কোলে তুলে নিল।

গোপাল বকটার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়ে বলল, কেয়ারে বগুলা, আচ্ছা হ্যায় ?

বগুলা মুখ ঘুরিয়ে গোপালের দিকে তাকাল।

দেখলাম, তার এক চোখ কানা।

গোপাল বলল, এ হচ্ছে কাড়ুয়ার বুজুম্-ফ্রেণ্ড।

কাড়ুয়াদের গ্রামে একটা বড় দাঁতাল শুয়োর খুব অত্যাচার আরম্ভ করেছে। কাড়ুয়াও শিকারী। ওর নিজের একটা গাদাবন্দুক আছে। গোপাল সেটার নাম দিয়েছে যন্তর।

কাড়ুয়ার বন্দুকটা সম্বন্ধে একটু বলে নিই। বন্দুকটা কথা-টথা বলত কাড়ুয়ার সঙ্গে। একেবারে মন-মৌজী বন্দুক। রাতে হয়তো ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে— কাড়ুয়ার মাটির ঘরের দেওয়ালে বন্দুকটা টাঙানো আছে— হঠাৎ বন্দুক ফিসফিস করে কাড়ুয়াকে বলল, শটিক্ষেতোয়ামে শুয়ার আওল বা।

কাড়ুয়া শুনতে না পেলে আবারও বলল আর একটু জোরে, আর অমনি কাড়ুয়া হুম্মচ্‌কে তিন অংগ্‌লি কস্‌কে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শটিক্ষেতের উদ্দেশে।

হুম্মচ্‌কে মানে বাংলায় কী বলব জানি না। ধরো, বলা যায়, তেড়ে-ফুঁড়ে। আর তিন অংগ্‌লি কস্‌কে মানে হচ্ছে, জোরসে তিন আঙুল বারুদ গাদা বন্দুকে পুরে। জানোয়ার বুঝে ঐ বন্দুকে বারুদ গাদাগাদির তফাত হয়। মুরগী মারতে এক আঙুল, কোট্‌রা হরিণ মারতে দু' আঙুল, তার চেয়ে বড় জানোয়ার মারতে তিন আঙুল। আরও বেশি আঙুল গাদলে অনেক সময় বন্দুকের মুঙ্গেরী নল ফেটে গিয়ে শিকারীই হয়তো আঙুল-হারা হয়ে যায়। শিকার-ফিকার করলে এসব রিসক্ একটু থাকেই। কী করা যাবে!

আমরা গিয়ে গাঁয়ের তেঁতুলতলায় বসলাম, আসোয়ার ঘরের পাশে। খিচুড়ি চাপালাম। খেয়ে-দেয়ে ঘুম। তারপর সন্ধের পর শুয়োরের কল্যাণে লাগা যাবে।

কাড়ুয়া স্বভাব-কবি। ইতিমধ্যেই শুয়োরটার উপরে একটা কবিতা বানিয়ে ফেলেছে দেখলাম।

"আর এ-এ শুয়ারোয়া
ব—ড়কা শুয়ারোয়া,
কা—কহি তুমহারা বাত
ছুপ্‌কে-ছুপ্‌কে গাঁওমে ঘুষতা
হর্ শনি—চ্চর্ রাত।
কালা বিলকুল্ বদন তুমহারা
হাম্‌সে ভি কালা, কোই বাত্?
ভোগল্-ভুচুন্দর্ বড়কা ছুছুন্দর
কিঁউ মজাক্ হামারি সাথ্?
বোলা লিয়া ম্যায় দোস্তলোগোঁকো
নিকাল্ লেগা তেরী দাঁত,
গোপালবাবু লায়া ভোপাল্‌সে বন্দুক
আজ-হি আখীর্ কা রাত।"

গোপাল বলল, সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্! বহত্-খুউব।

তারপর ও বলল, কাড়ুয়া, তোকে নিয়ে আমিও একটা কবিতা লিখেছি, শোন্ বলি।

কাড়ুয়া টিকিটা এদিক-ওদিক নাড়িয়ে কুচকুচে কালো মুখে সাদা দাঁতের সুন্দর হাসি হেসে বলল, বোলো গোপালবাবু, বোলো—

গোপাল ছড়ার মতো করে ছন্দ মিলিয়ে বলল :

"আরে এ—এ কাড়ুয়ারে
কাক—হি তাড়ুয়ারে,
তুম্‌হারা নেহি কোই জওয়াব—
বগুলাসে দোস্তি, খাতা হায় জাস্তি
তিতির্‌কা বনা-হুয়া কাবাব।
শোচ্ সমঝ কর, শিকার তু খেল্‌না,
কই রোজ ঝামেলামে গিড়ে গা—
বড়কা শুয়ারোয়া দাঁতোয়া ঘুষানেসে
দাওয়াই ত হিঁয়া নেহি মিলেগা।
বহত সামহাল্‌কে কদম্ বাড়হা তু
জল্‌দি— বাজী নেহি, আইস্—তা—
তিন—অংগলি কস্‌কে,
হু-হু-হু হুম্মিচকে—
শুয়ার্‌কা পেট তব্‌হি ফাস্‌তা।"

আমি তো দুই কবিয়ালের কবিতা শুনে থ!

সন্ধের পর পরই গোপাল আর কাড়ুয়ার সঙ্গে নয়াতালাওর পাশের শটিক্ষেতের দিকে রওনা হলাম আমরা।

বর্ষাকাল। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মেঘগর্জনের সঙ্গে। সেই বিজলীতে চতুর্দিকের জঙ্গল আর টাঁড় রুপোলি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

আমরা গ্রামের দেওতার ঠাঁই পেরিয়ে, ঝুরিওয়ালা অশ্বত্থ গাছটার পাশ দিয়ে অনেকখানি হেঁটে গিয়ে নয়াতালাওর পাশের শটিক্ষেতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

কাড়ুয়া দেখাল শুয়োরটা সাধারণত কোন্ দিক দিয়ে এসে ঢোকে

শটিক্ষেতে।

আমরা তিনজনে ভিজে মাটির উপরেই সাপ-খোপ বাঁচিয়ে শটিক্ষেতের আড়ালে গা-লুকিয়ে বসলাম।

গোপাল মারবে আগে। কোন্ এক মহারাজার পরিবারের এক লোকের কাছ থেকে সদ্য-কেনা বারো বোরের ওভার-আণ্ডার দশ-হাজারী বন্দুক দিয়ে। গোপালের নিবেদনের পর, কাড়ুয়া তার মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক দিয়ে মহার্ঘ্য নিবেদন করবে।

আমি দর্শক।

বসে বসে মশার কামড় খেয়ে খেয়ে সারা গা-মুখ সিন্দূরের মতো লাল হয়ে উঠল। শুয়োরের বাচ্চার কোনও পাত্তা নেই।

বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকার পর তিনি এলেন। দাঁতের জোরে এবং লাথি মেরে মেরে ভিজে নরম মাটি ফুলঝুরির মতো ছিটোতে ছিটোতে এবং শটিগাছ ও কচুগাছ উপড়োতে উপড়োতে আসতে লাগলেন।

জঙ্গলের দিক থেকে একটা ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। গা শিরশির করছিল। চারধারে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, আমার পেছনে একটা পন্নন্ গাছ আছে। আমিই একমাত্র নিরস্ত্র।

শুয়োরটা দেখতে দেখতে একেবারে কাছে এসে গেল।

এমন সময় মেঘ ফুঁড়ে এক ফালি চাঁদ বেরোল। সেই চাঁদের লাজুক আলোয় শুয়োরটার ইয়া-ইয়া দাঁত দুটো চক্‌চক্ করছিল।

গোপাল ভাল করে নিশানা নিয়ে গুলি করল। কিন্তু গুলি হল না। কট্ করে আওয়াজ হল একটা।

আওয়াজটা শুনেই শুয়োরটা শটি খাওয়া থামিয়ে এদিকে মুখ তুলল।

গোপাল আবার মারল। আবারও কট্। নট-কিচ্ছু!

এবার শুয়োরটা আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

কলকাতা থেকে আসার আগে নতুন গুলি নিয়ে এসেছিল গোপাল চৌরঙ্গীর এক দোকান থেকে। দু-দুটো এল-জির একটাও ফুটল না। দোকানদার গোপালের বন্ধু। বিনি পয়সার গুলি তো। বড় ভালবাসার গুলি।

আবারও গুলি ভরার জন্যে ও যেই বন্দুকটা খুলেছে, ইজেকটরটা গুলি দুটোকে পটাং শব্দ করে বাইরে যেই ছুঁড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রে—রে করে বড়কা শুয়ারোয়া সটান আমাদের দিকে একটা ট্যাঙ্কের মতো তেড়ে এল।

আর আমি ওখানে থাকি?

এক দৌড়ে আমি পন্নন্ গাছে এসে উঠলাম।

ওদের ঘাড়ের কাছ দিয়ে আমার হুড়মুড় করে দৌড়ে পালানোর শব্দে গোপাল ও কাড়ুয়া চমকে উঠে ভাবল, অন্য একটা শুয়োর বুঝি অন্যদিক থেকে টুঁ মারার জন্যে তেড়ে আসছে।

ওরা ব্যাপারটা কী বোঝার আগেই আমি গাছে।

ততক্ষণে শুয়োরটাও ওদের একেবারে কাছে এসে গেছে। গোপাল আর গুলি ভরার সময় পেল না। দেখলাম কাড়ুয়া ওর বন্দুকটাকে শুয়োরের দিকে বাগিয়ে ধরে কখন শুয়োরের নাকের সঙ্গে ওর বন্দুকের নলের ঠেকাঠেকি হয় সেই অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে রইল। সেকেন্ডের মধ্যে শুয়োরও এসে পৌঁছল ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ করতে করতে আর কাড়ুয়ার বন্দুকও ছুটল।

দূর থেকে আবছা-আলোয় ঘটনাটা কী ঘটল বুঝলাম না। কিন্তু মারাত্মক কিছু যে একটা ঘটল, সেটা বুঝলাম। দেখলাম, তিনটে জিনিস তিনদিকে ছিটকে পড়ল আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে।

শুয়োরটা উল্টে পড়ে শটিক্ষেতে অনেকক্ষণ হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে গুচ্ছের শটিগাছ ভেঙে নষ্ট করে মাটি ছিটিয়ে একাক্কার করল। অনেকক্ষণ পর একেবারে স্থির হল।

কিন্তু শুয়োর-শিকারীরা নড়েও না, চড়েও না।

বড়ই বিপদে পড়লাম।

পরিস্থিতি শান্ত হলে, গাছ থেকে নেমে আমি পা টিপে-টিপে ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।

গিয়ে যা দেখলাম, তা বলার নয়।

গোপাল তার ওভার-আণ্ডার বন্দুকের আণ্ডারে শুয়ে আছে। তার নাকটা বারুদে কালো।

কাড়ুয়া অজ্ঞান—তার সমস্ত মুখ, ডান হাত পুড়ে যাওয়ার মতো হয়ে গেছে।

আমি ওর গায়ে হাত ছোঁয়াতে, গোপাল কোঁকাতে কোঁকাতে উঠে বলল, কাড়ুয়ার বন্দুকের নল ফেটে গেছে।

আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, ক-আংগ্‌লি গেদেছিল?

গোপাল বলল, ও জানে!

এমন সময় কাড়ুয়া চার হাত-পায়ে কোনওরকমে উঠেই হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল, হামারা বন্দুকোয়া, হামারা বন্দুকোয়া বলে।

গোপাল ধমক দিয়ে বলল, প্রাণে বেঁচে গেছিস, এই-ই ঢের; আর বন্দুকের জন্যে কেঁদে কাজ নেই।

কাড়ুয়া তবু কাঁদতে লাগল। বলতে লাগল, হাম্‌কো ভি এক গোলি ঠুক্ দেও, হাম্‌ভি হামারা বন্দুককা সাথ্ মর্‌না চাহতা হ্যায়।

গোপাল কাড়ুয়ার মুখের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

তারপর বলল, হামারা এক্কো গুলি নহী ফুটল্। শুয়ারকাই মার্‌নে নহী শেকা, তুমকো মারেগা কৈসে?

মউলির রাত

পাকদণ্ডীটা সামনে বড় খাড়া।

দুপুরে ঝরনার পাশে খিচুড়ি ফুটিয়ে খাওয়ার পর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল হেঁটেছি আমি আর জুড়ু ; তাও প্রায় বেশির ভাগই চড়াইয়ে-চড়াইয়ে। উৎরাই প্রায় পাইনি বলতে গেলে।

এদিকে বেলা যেতে আর বেশি দেরি নেই। পশ্চিমের দূরের পাহাড় দুটোর মাঝখানে যে একটা ত্রিকোণ ফাঁক, সূর্যটা সেই ফাঁকের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে একটা পাঁচনম্বরী লাল ফুটবলের মতো স্থির হয়ে রয়েছে। বলটা গড়িয়ে পাহাড়ের ঢালে নামলেই ঝুপ করে আলো কমে যাবে।

কিন্তু রাতের মতো তাঁবু খাটাবার জায়গার হদিস এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

হঠাৎ জুড়ু বলল, এখানেই থাকব। আর যাব না।

এখনও যা আলো আছে, তাতে মিনিট পনেরো-কুড়ি যাওয়া যেত, কিন্তু হঠাৎ জুড়ুর এমন জোর গলায়— এখানেই থাকব— কথাটার মানে বুঝলাম না।

এতক্ষণ ও আমাদের পাতলা তাঁবু, আমার স্লিপিং ব্যাগ, ওর কম্বল ও রসদের ঝুলিটা কাঁধে নিয়ে আমার পেছন-পেছন আসছিল।

হঠাৎ যেখানে ছিল ও সেখানেই থেমে গেল।

দাঁড়িয়ে পড়ে, জায়গাটা ভাল করে দেখলাম।

তাঁবু যে ফেলা যায় না, তা নয় ; তবে এর চেয়েও ভাল জায়গা নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। জায়গাটা একটা পাহাড়ের একেবারে গায়ে। পুবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীতে উঠে গেছে ঘন জঙ্গলাবৃত পাহাড়টা। পশ্চিমে সোজা গড়িয়ে গিয়ে নীচে মিশেছে একটা উপত্যকায়। উপত্যকায় গভীর জঙ্গল। কত রকম যে গাছগাছালি তার লেখাজোখা নেই। সেই উপত্যকার গভীরে-গভীরে বয়ে গেছে একটা পাহাড়ী নদী। জুড়ু তার নাম জানে না।

আসলে ওড়িশার দশপাল্লা রাজ্যের বিড়িগড় পাহাড়ের এই অঞ্চলটা জুড়ুরও যে ভাল জানা নেই, তা আমি জানতাম। আমার তো নেই-ই।

আমি আর জুড়ু কাল বিকেল থেকে সেই বিরাট শম্বরটার খুরের দাগ দেখে দেখে পেছন-পেছন যাচ্ছি, কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি।

আমারও জেদ চেপে গেছে।

এরকম অতিকায় শম্বর আমার জীবনে দেখিনি আমি। দশ বছর বয়স থেকে জঙ্গলে ঘুরছি, তবুও। আমি তো কোন্ ছার, জুড়ু বলেছিল, সেও দেখেনি। এমন দাড়িগোঁফওয়ালা ও জটাজুট-সংবলিত শম্বর যে এই বিংশ শতাব্দীতেও কোনও জঙ্গলে থাকতে পারে, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। আমার এবং আমার

বন্ধু জর্জ ট্রব ও কেন্ ম্যাকার্থির পারমিটে একটা বাইসন, একটা শম্বর, একটা ভালুক ও একটা চিতা মারার অনুমতি ছিল। কিন্তু আজ সকালে একটা পাহাড়ী নদীর নালায় বসে যখন রোদ পোহাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ তিনশ গজ দূরে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা শম্বরটাকে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছিল। তখন আমার সঙ্গে রাইফেল ছিল না, থাকলে তক্ষুনি গুলি করতাম। তাই, জর্জ আর কেন্‌কে বলে, জুড়ুকে সঙ্গে নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম— শম্বরটাকে তার খুরের দাগ দেখে দেখে অনুসরণ করে।

আমার সঙ্গে থ্রি-সিক্সটিসিক্স বোরের একটি ম্যানলিকার রাইফেল ছিল। আজ বিকেলে শম্বরটাকে আর একবার পাল্লার মধ্যে পেয়েছিলাম। এক মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই উচিত ছিল প্রথম দর্শনেই তাকে ভূপাতিত করা। রাইফেলটা আমার হাতের রাইফেল এবং নিখুঁত মার মারত। তখন কেন যে মারলাম না, এ-কথা ভাবলেই নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল।

শম্বরটাও অদ্ভুত। এ পর্যন্ত অনেক জানোয়ারকে ট্র্যাকিং করেছি, আহত ও অনাহত, কিন্তু এমনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর থেকে গভীরতর, দুর্গম থেকে দুর্গমতর জঙ্গলে কোনও জানোয়ারই এরকম গা-ছমছম্ অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যায়নি। এমনভাবে বরাবর রাইফেলের পাল্লার বাইরেও কেউ থাকেনি। ট্র্যাকিং আরম্ভ করার পর বিকেলে সেই প্রথমবার যে তার চেহারা দেখেছিলাম, তারপর থেকে তার চেহারা সে আর একবারও দেখায়নি। দ্বিতীয়বার দেখা গেলে, সে যত দূরেই হোক না কেন, গুলি আমি নিশ্চয়ই করতাম।

হঠাৎ জুড়ু মালপত্রগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে নাক উঁচু করে বাতাসে কিসের যেন গন্ধ শুঁকতে লাগল কুকুরের মতো।

পরক্ষণেই দেখলাম, তার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে।

আমি কাঁধে-ঝোলানো রাইফেলটাকে তাড়াতাড়ি রেডি-পজিশনে ধরে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

ও কথা না বলে বাঁ হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে রাইফেলের নলটাকে সরিয়ে দিল।

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম, কী রে জুড়ু ?

জুড়ু মুখে কথা না-বলে শুধু দু পাশে মাথা নাড়তে লাগল জোরে জোরে। মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর দু চোখে ভয় ঠিকরোতে লাগল।

পরক্ষণেই মালপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, বাবু, এখুনি চলো এখান থেকে পালাই। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।

আমি তেমনি অবাক হয়ে আবারও শুধোলাম, কী রে ? একলা গুণ্ডা-হাতি ? কিসের ভয় পেলি ?

জুড়ু ফ্যাকাশে মুখে বিড়বিড় করে বলল, মউলি।

আবারও বিড়বিড় করে বলল, মউলি, মউলি, মউলি।

বলেই, পেছন দিকে দৌড় লাগাল।

আমি দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরলাম।

ধমকে বললাম, কী, হলো কী তোর ? আমার সঙ্গে তুই কি এই-ই প্রথম এলি জঙ্গলে ? আমি সঙ্গে থাকতে তোর কোন্ জানোয়ারের ভয় ?

ওড়িশার জঙ্গলে মউলি বলে কোনও জানোয়ার আছে বলে শুনিনি। প্রায় সব জানোয়ারেরই ওড়িয়া নাম আমি জানি, যেমন শজারুকে ওরা বলে ঝিংরু, নীল গাইকে বলে ঘড়িং, মাউস-ডিয়ারকে বলে খুরান্টি। কিন্তু মউলি ? নাঃ মউলি বলে তো কোনও-কিছুর নাম শুনিনি !

ততক্ষণে জুডু থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। ওর বুকে একটা জানোয়ারের সাদা হাড় ঝোলানো ছিল লকেটের মতো, কালো কারের সঙ্গে, সেটাকে মুঠো করে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ঋজুবাবু, এক্ষুনি পালিয়ে চলো। আমরা মউলির এলাকায় এসে পড়েছি। এখানে থাকলে আমাদের দুজনের মৃত্যু অনিবার্য। ঐটা শম্বর নয় ; মউলির দূত। ও আমাদের ওর পেছনে-পেছনে দৌড় করিয়ে মউলির রাজত্বে এনে ফেলেছে। এর মানে আমাদের মরণ। এতে কোনও ভুল নেই।

আমি ওকে ধমকে বললাম, মউলি কী ? আর তোর ব্যাপারটাই বা কী ?

জুডু বলল, মউলি জঙ্গলের দেবতা, জানোয়ারদের দেবতা। জানোয়ারদের রক্ষা করেন মউলি। ওঁর রাজত্বে যে শিকারী ঢোকে, তাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হয় না।

আমি এবার খুব জোরে ধমক দিয়ে বললাম, থামবি তুই ? তোর মউলির নিকুচি করেছি আমি।

তারপর বললাম, শীগগিরি আগুন কর, কফির জল চড়া ; তারপর রান্নার ব্যবস্থা কর। ততক্ষণে আমি তাঁবু খাটিয়ে নিচ্ছি।

মনে মনে বললাম, যত সব অশিক্ষিত কুসংস্কারাবদ্ধ জংলী লোক। জঙ্গলের দেবতা না মাথা। কত জঙ্গলে রাতের পর রাত কত অচেনা অজানা ভয়াবহ পরিবেশে কাটালাম, আর ও আমাকে মউলির ভয় দেখাচ্ছে !

জুডু হঠাৎ আমার দিকে একবার চকিতে চেয়েই, মালপত্র ফেলে রেখে সটান দৌড় লাগাল। পেছন দিকে।

রাইফেলটা হাতেই ছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, ওকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে বললাম, জুডু, তোকে আমি গুলি করব, যদি পালাস।

কিন্তু জুডু তবুও শুনল না।

তখন মুহূর্তের মধ্যে জুডুকে সত্যি ভয় পাওয়াবার জন্যে আমি আকাশের দিকে ব্যারেল তুলে একটা গুলি ছুঁড়লাম।

গুলির শব্দে জুডু থমকে দাঁড়াল। ভাবল, ওর দিকে নিশানা করেই বুঝি বা

গুলি ছুঁড়েছিলাম।

আমি বললাম, এক্ষুনি ফিরে আয়, নইলে তোকে এই জঙ্গলেই মারব আমি, তোর মউলি তোকে মারবার আগে।

জুডু কাঁপতে কাঁপতে, মউলির ভয়ে না আমার ভয়ে জানি না, ফিরে এল।

ওকে ভয় দেখানো ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। কারণ, জঙ্গল-পাহাড়ের এদিকটা আমার একেবারেই অচেনা। আমি একা-একা কিছুতেই আমাদের ক্যাম্পে ফিরতে পারতাম না। সেখান থেকে বহু দূরে চলে এসেছিলাম আমরা। সঙ্গের রসদও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। শুধু এক রাতের মতো তৈরি হয়ে এসেছিলাম। জুডু চলে গেলে আমার সত্যিই বিপদ হবে।

বাধ্য হয়ে জুডু এবার আগুন করল, কফির জল চাপাল, তারপর তাঁবুটা খাটাতে ও আমাকে সাহায্য করল।

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। প্রথম রাতেই চাঁদ ওঠার কথা ছিল, কিন্তু আমরা মাথা-উঁচু পাহাড় ঘেরা এমন একটা খোলের মধ্যে এসে পৌঁছেছি যে, এখান থেকে চন্দ্র-সূর্য কিছুই সহজে দেখা যাবার কথা নয়।

গরমের দিন হলেও, এ জায়গাটা বেশ ভিজে স্যাঁতসেঁতে, বোধ হয় অনেক নদী-নালা আছে বলে। নইলে শম্বরটাকে পায়ের দাগ দেখে ট্রাক করা সম্ভব হত না আমাদের পক্ষে।

এদিকটা ভিজে-ভিজে হলেও, পশ্চিমের পাহাড়গুলোতে দাবানল লেগেছে।

একটা বড় পাথরে বসে কফি খেতে খেতে, পাইপটাতে তামাক ভরতে ভরতে আমি সেই আগুনের মালার দিকে চেয়ে ছিলাম। ভারী চমৎকার লাগছিল এক পাহাড়ের গায়ে বসে, উপত্যকা-পেরুনো দূরের অন্য পাহাড়ের গায়ের আগুনের মালা দেখতে। ঐদিকে আগুন জ্বলাতে চারদিক দিয়ে গরম হাওয়া ছুটে আসছিল এদিকে।

হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, জুডু কফি খাচ্ছে না, হাঁটু গেড়ে বসে সেই পশ্চিমের আগুনের দিকে চেয়ে কী সব মন্ত্র-টন্ত্র পড়ছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে যে, ও এ-জগতে নেই। ওর চোখের ভাব এমন হয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে ও আমাকে চেনে না।

ওর ঐসব প্রক্রিয়া শেষ করে জুডু আবারও আমাকে অনুনয়-বিনয় করে বলল, তোমার পায়ে পড়ি, এখনও পালিয়ে চলো।

আমি নিঃশব্দে ওকে পাশে রাখা আমার রাইফেলটিকে ইশারা করে দেখালাম।

ও চুপ করে গেল। রান্নার বন্দোবস্ত করতে লাগল। রান্না মানে চাল, ডাল আর তার সঙ্গে দু একটা আলু, পেঁয়াজ ও কাঁচালঙ্কা ছেড়ে সেদ্ধ করে নেওয়া।

খিচুড়িটা চাপানো হয়ে গেলে, পাইপটা ধরিয়ে, জুডুকে ডাকলাম আমি। ব্যাগ থেকে একটা বিড়ির বাণ্ডিল বের করে ওকে দিয়ে বললাম, এবার বল দেখি

তুই, এই মউলির ব্যাপারটা কী ? সব ভাল করে বল, খুলে বল।

জুডু একটা বিড়ি ধরিয়ে, পশ্চিমের দিকে পেছন ফিরে উবু হয়ে জানোয়ারের মতো বসে, বিড়বিড় করে বলতে লাগল।

জুডু উপজাতীয় মানুষ। ওরা খন্দ্। ওদের মধ্যে অনেক সব বিশ্বাস, সংস্কার আছে ; কিন্তু জুডুকে ভীতু আমি কখনোই বলতে পারব না। বরং বলব যে, আমার দীর্ঘ শিকারী জীবনে এমন সাহসী ও অভিজ্ঞ ট্র্যাকার আমি খুব কমই দেখেছি। ওর সাহস আমার চেয়ে কম তো নয়ই, বরং বেশিই।

তাই পাইপ টানতে টানতে জুডুর এই মউলি-বৃত্তান্ত আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলাম।

জুডু চোখ বড় বড় করে, কিন্তু ফিসফিস করে বলছিল। যেন ওর কথা অন্য কেউ শুনে ফেলবে।

বলছিল— ঋজুবাবু, আমাদের অনেক দেবতা। টানা পেনু, ডারেনী পেনু, টাকেরী পেনু, স্রিভি পেনু, কাটি পেনু, এসু পেনু, সারু পেনু।

টানা পেনু আর ডারেনী পেনু একই দেবী। তিনি হচ্ছেন গ্রামের দেবী। গ্রামকে বাঁচান। প্রতি গ্রামের পাশে এই দেবীর পাথরের ঠাঁই থাকে। ডারেনী পেনুর বন্ধু টাকেরী পেনু এবং ডারেনী পেনুর ভাই স্রিভি পেনু। স্রিভি পেনুর মারফতই যত পুজো, আরজি, আবদাব করতে হয় আমাদের।

কিন্তু মউলি ?

নামটা উচ্চারণ করেই জুডু একবার এদিক-ওদিক দেখে নিল, তারপর গলা আরও নামিয়ে বলল, মউলি জঙ্গলের দেবতা। আমরা তাকে বড় ভয় পাই। তাকে পুজো দেওয়া তো দূরের কথা, মউলি যেখানে থাকে আমরা তার ধার-কাছ পর্যন্ত মাড়াই না।

জুডু এই অবধি বলে, থেমে গিয়ে বলল, ঐ শম্বরটা আসলে শম্বর নয়। ওটা মউলির চর। আজ রাতেই মউলি আমাদের মারবে।

আমি বললাম, চুপ কর্ তো। তোর মতো সাহসী, জবরদস্ত্ শিকারী— তুইও কি না ভয় পাস ? সঙ্গে রাইফেল নেই ? তোর মউলি-ফউলি সকলের পেট ফাঁসিয়ে দেব হার্ড-নোজড্ বুলেট মেরে।

জুডু ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো চমকে উঠল। দু কানে দু হাত দিয়ে বলল, অমন বলতে নেই বাবু। পাপ হবে, পাপ হবে। ঐ রাইফেলটা সঙ্গে থেকেই যত বিপদ। আজ রাত কাটলে হয় !

আমি আবার ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, তোর কোনও ভয় নেই, ভাল করে খিচুড়িটা রাঁধ দেখি, খিদে পেয়ে গেছে। আর আগুনটা জোর কর। অজানা-অচেনা জায়গা, হাতি থাকতে পারে, বাঘ থাকতে পারে, আগুনে আরও কাঠকুটো এনে ফেল যাতে সারা রাত আগুনটা জ্বলে। একেবারে অচেনা জায়গায় তাঁবু ফেলে নিশ্চিন্ত থাকা ঠিক নয়। হয়তো এর ধারেকাছেই

জানোয়ার-চলা সুঁড়িপথ থাকবে।

জুডুকে বললাম বটে আগুনটা জোর করতে, কিন্তু মনে হল না, ও এই তাঁবুর সামনে থেকে এক পা-ও নড়বে।

তাই পাইপের ছাই ঝেড়ে উঠে আমিই এদিক ওদিক গিয়ে শুকনো ডাল, খড়কুটো কুড়িয়ে আনতে গেলাম।

যখন নিচু হয়ে ওগুলো কুড়োচ্ছি, তখন হঠাৎ আমার মনে হল, আমার চারপাশে যেন কাদের সব ছায়া সরে সরে যাচ্ছে। কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে।

একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্রই আমার মনে হল, আমি যেন আমার সামনের অন্ধকার থেকে সেই অন্ধকারতর অতিকায় শম্বরটাকে সরে যেতে দেখলাম। শম্বরটা সরে গেল, কিন্তু কোনও শব্দ হল না।

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম এক মুহূর্ত।

পরক্ষণেই আমার হাসি পেল। নিজেকে মনে মনে আমি খুব বকলাম। লেখাপড়া শিখেছি, বিজ্ঞানের যুগে এসব কী যুক্তিহীন ভাবনা ? তা ছাড়া, এরকম অচেনা পরিবেশে গভীর জঙ্গলে এই-ই তো আমার প্রথম রাত কাটানো নয়। ছোটবেলা থেকে আমি এই জীবনে অভ্যস্ত। এতে কোনও বাহাদুরি আছে বলে ভাবিনি কখনও। বরং চিরদিনই এই জীবনকে ভালবেসেছি। উপরে তারা-ভরা আকাশ, রাত-চরা পাখির ডাক, দূরের বনে বাঘের ডাক আর হরিণের টাঁউটাঁউ, এ সমস্ত তো চিরদিনই ঘুমপাড়ানী গানের মতোই মনে হয়েছে। এসবের মধ্যে কখনই কোনও ভয় বা অসঙ্গতি তো দেখিনি !

অথচ আজ কেন এমন হচ্ছে ?

ফিরে এসে আগুনটা জোর করে দিয়ে পাথরটার উপরে বসে আমি পশ্চিমের পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। দাবানলের মালা পাহাড় দুটোকে যেন ঘিরে ফেলেছে। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে, তা বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার নেই। নীচের খাদ থেকে একটা নাইট-জার পাখি সমানে ডেকে চলেছে— খাপু-খাপু-খাপু-খাপু-খাপু।

মাঝে-মাঝে বিরতি দিচ্ছে, আবার একটানা ডেকে চলেছে অনেকক্ষণ।

আগুনে ফুট্‌ফাট্ শব্দ করে কাঠ পুড়ছে। আগুনের ফুলঝুরি উঠছে। তারপর ফুলঝুরির মাথায় উঠে গিয়ে কাঠের কালো ছাইয়ের গুঁড়ো গোলমরিচের গুঁড়োর মতো নীচে এসে পড়ছে।

ঐদিকে তাকিয়ে বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎই আমার খেয়াল হল যে, আজ চারিদিকের পাহাড়-বনে একক নাইট-জারটার খাপু-খাপু-খাপু-খাপু আওয়াজ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। আমাদের পাশেই তিরতির্ করে একটা ঝরনা বইছে, সেটা গিয়ে মিশেছে উপত্যকার নালায়, যেখানে ভাল জল আছে। এই গরমের দিনে সাধারণত এমন জায়গায় বসে থাকলে নীচের

উপত্যকায় নানারকম জানোয়ারের চলাফেরার বিভিন্ন আওয়াজ শোনা যেত। হায়েনা হেঁকে উঠল হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে বুক কাঁপিয়ে। হয় উইয়ের ঢিবির কাছে, নয় মহুয়াতলায় ভাল্লুক নানারকম বিশ্রী আওয়াজ করে উই খেত বা মহুয়া খেত। আমলকীতলায় কোটরা হরিণের ব্বাক্ ব্বাক্ ডাক শোনা যেত। অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ডাকের মতো।

কিন্তু আজ রাতের সমস্ত প্রকৃতি যেন নিথর, নিস্তব্ধ। এমন কী, পেঁচার ডাক পর্যন্ত নেই। চতুর চিতার তাড়া-খাওয়া হনুমান দলের হুপ্-হুপ্-হুপ্-হুপ্ ডাকে রাতের বনকে মুখরিত করা নেই। আজ কিছুই নেই।

বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ আমার মনে হল, আমি যে পাথরটায় বসেছিলাম, ঠিক তার পেছনে আমার গা-ঘেঁষে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। কোনও মানুষ! আমি যেন আমার খাকি বুশ-শার্টের কলারের কাছে তার নিশ্বাসের আভাস পেলাম।

চমকে পেছন ফিরেই দেখি, না, কেউ নেই তো!

একটা একশো বছরের পুরোনো জংলী আমগাছ থেকে ঝুপ্ করে শুকনো পাতার উপর হাওয়ায় একটা আম ঝরে পড়ল। সেই নিস্তব্ধ রাতে সেই আওয়াজটুকুকেই যেন বোমা পড়ার আওয়াজ বলে মনে হল।

ওখানে বসে বসে আমি লক্ষ করছিলাম যে, জুড়ু রান্না করতে করতে মাঝে মাঝেই বাঁ হাত দিয়ে ওর গলার হাড়ের লকেটটাকে মুঠি করে ধরছিল।

আমি উৎসুক হয়ে শুধোলাম, ওটা কিসের হাড় রে জুড়ু?

জুড়ু আমার কথায় চমকে গিয়ে কেঁপে উঠল।

তারপর সামলে নিয়ে বলল, এটা অজগরের হাড়, মন্ত্রপড়া। আজ আমাকে বাঁচালে এই হাড়টাই বাঁচাবে মউলির হাত থেকে। আমার দিদিমা আমার ছোটবেলায় মন্ত্র পড়ে এই হাড়টা আমায় দিয়েছিল।

আমি হাড়টার দিকে অপলকে চেয়ে রইলাম। অজগরের হাড় আমি কখনই দেখিনি। আগুনের আলোকে সেই হাড়টা রঙ বদলাচ্ছে বলে মনে হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আবার পাইপ ধরিয়ে বাইরে বসেছি পাথরটার উপর, এমন সময় জুড়ু যা কখনও করেনি তাই করল।

আমার কাছে এসে বলল, বাবু, আজ আমি কিন্তু তাঁবুর মধ্যে তোমার কাছে শুয়ে থাকব।

আমি অবাক হলাম।

তারপর বললাম, তাই-ই শুস।

যাকে মানুষখেকো বাঘের জঙ্গলে কখনও গালাগালি করেও তাঁবুর মধ্যে শোয়াতে পারিনি, সে বরাবর বলেছে, আমার দম-বন্ধ লাগে তাঁবুর মধ্যে— সেই জুড়ু আজ স্বেচ্ছায় তাঁবুর মধ্যে শুতে চাইছে!

আমি পশ্চিমের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। জুড়ু আগুনের

পাশেই বসে সেই তিরতিরে ঝরনায় আমাদের অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা, এনামেলের থালা দুটো ও কফির কাপ দুটো ধুচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, যেন কোনও মন্ত্রবলে পশ্চিমের পাহাড়ের দাবানলগুলো সব একই সঙ্গে নিভে গেল। মনে হল, কে যেন পা দিয়ে মাড়িয়ে জঙ্গল-পোড়ানো শত সহস্র হস্ত প্রসারিত লেলিহান আগুনগুলোকে একসঙ্গে নিভিয়ে দিল।

আগুনগুলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের দিক থেকে একটা জোর ঝড়ের মতো হঠাৎ হাওয়া উঠল।

অথচ পূর্ব মুহূর্তে সব কিছু শান্ত ছিল।

হাওয়াটা জঙ্গলের গাছগাছালিতে ঝর ঝর করে সমুদ্রের আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের মতো শব্দ করে আমাদের দিকে ধেয়ে এল। এত জোরে এল হাওয়াটা যে, তাঁবুটাকে প্রায় উড়িয়েই নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকেও পাথর থেকে ফেলে দেওয়ার মতো জোর ছিল হাওয়াটার।

কিন্তু আশ্চর্য! হাওয়াটা আমাদের তাঁবু অতিক্রম করে গিয়েই একেবারে মরে গেল।

কী ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করছি, এমন সময় নীচের উপত্যকা থেকে, ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়ার সময় চাষারা বলদের লেজ-মুচড়ে যেরকম সব অদ্ভুত ভাষা বলে, তেমন ভাষায় কারা যেন কথা বলতে লাগল। মনে হল, কারা যেন এই এক রাতে পুরো উপত্যকাটা চষে ফেলবে বলে ঠিক করেছে।

সেই আওয়াজটাও দু মিনিট পর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

একটু পরে চাঁদ উঠল।

জুড়ু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, বাবু, শুয়ে পড়ো। আজ আর বাইরে বেশি বসে কাজ নেই। চলো, শুয়ে পড়বে।

সত্যি কথা বলতে কী, আমার একটু যে ভয় করছিল না তা নয়। কিন্তু ভয়ের চেয়েও বড় কথা, পুরো জায়গাটা, এই রাতের বেলার জঙ্গলের অদ্ভুত শব্দ ও কাণ্ড দেখে আমার দারুণ এক ঔৎসুক্য জেগেছিল। ভূত-প্রেতে আমি কখনও বিশ্বাস করিনি। হাতে একটা রাইফেল থাকলে পৃথিবীর যে কোনও বিপদসঙ্কুল জায়গায় আমি হেঁটে যেতে পারি, রাতে ও দিনে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মানুষখেকো বাঘের থাবায় নিহত মানুষের অর্ধভুক্ত শবের কাছেও কাটিয়েছি। একবার শুধু একটা মরামানুষের পা সটান সোজা হয়ে উঠেছিল। তখনও ভয় পাইনি, কারণ তারও একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য কারণ ছিল। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আমি কখনও হইনি এর আগে। ঠিক কী ভাবে এই অনুভূতিকে গ্রহণ করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

এই খন্দমালে আমার এই-ই প্রথম আসা নয়। আগেও বহুবার আমি এই অঞ্চলে এসেছি। খন্দদের নিয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা যায় করেছি। তাদের

রীতি-নীতি দেব-দেবতা, সংস্কার-কুসংস্কার সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল।

কিন্তু জঙ্গল-জীবনের সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এইসব কাণ্ডের কোনও ব্যাখ্যাতেই আমার পক্ষে পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছিল না।

খন্দ্‌রা ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের সীমানার গঞ্জাম জেলার একটি জায়গায় বাস করত বহু-বহু বছর আগে। জায়গাটা ছিল খুব উঁচু-উঁচু পাহাড়শ্রেণী আর জঙ্গলে ঘেরা। জায়গাটার নাম ছিল শ্রাম্বুলি-ডিম্বুলি। সেখান থেকে এসে এরা এইখানে বাসা বাঁধে অন্যদের তাড়া খেয়ে।

ওরা মনে করত যে, এইসব মাথা-উঁচু পাহাড়ের পরই পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে। ওদের রাজ্য থেকে সামনে যতদূর চোখ যায়, ততদূর আদিগন্ত এমন গভীর জঙ্গলাবৃত পাহাড় ও জমি দেখা যেত যে, তাতে মানুষ কখনও বসবাস করতে পারে একথা কেউই ভাবেনি। ওদের মধ্যে একটা জনশ্রুতি আছে যে, যখন খন্দ্‌রা এইসব পাহাড়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখন তৎকালীন পাহাড়ী আদিবাসী কুর্মুরা তাদের সমস্ত জমি-জমা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি খন্দ্‌দের হাতে দিয়ে এইসব পাহাড়ের উপরের সমতল মালভূমি থেকে মেঘের ভেলায় চেপে চিরদিনের মতো অন্তর্ধান করেছিল।

খন্দ্‌রা মনে করত যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা জামো পেনুর বড় ছেলের থেকে কুর্মুরা উদ্ভূত হয়েছে এবং খন্দ্‌রা উদ্ভূত হয়েছে জামো পেনুর সবচেয়ে ছোট ছেলের থেকে।

কিন্তু মউলি সম্বন্ধে আমি কখনও কিছু পড়িনি বা শুনিনি।

জুড়ু আবারও বলল, বাবু, শুয়ে পড়ো। বাইরে থেকো না আর।

তাঁবুর দু'পাশের পর্দা তোলা ছিল। গরমে এমন করেই আমরা শুই। জঙ্গলে গরমের দিনেও শেষ রাতে ভারী হিম পড়ে। তাই মাথার উপর তাঁবু থাকলেই যথেষ্ট। প্রথম রাতে গরম লাগে, তাই যাতে হাওয়া চলাচল করতে পারে তার জন্যে পর্দা খোলা থাকে।

তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই জুড়ু বলল, বাবু, আজ পর্দা খুলে শুয়ো না।

ওকে আমি ধমকে বললাম, চুপ কর তো তুই। গরমে কি মারা যাব নাকি?

তারপর প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে বললাম, শম্বরটা কোন্‌দিকে গেছে বল তো? আমার মনে হয়, ও ধারেকাছেই আছে। হয় নীচের নালার পাশে, নয়তো সামনের মালভূমির উপরে। কাল ভোরেই ওর সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হবে।

জুড়ু তাঁবুর মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে সেই অজগরের হাড়টা ছুঁয়ে কী সব বিড়বিড় করে বলল। একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। ও বলল, বাবু, তুমি বিশ্বাস করছ না যে ওটা শম্বর নয়? অতবড় শম্বর যে হয় না এ-কথা আমার ও তোমার দুজনেরই বোঝা উচিত ছিল। তোমাকে বলছি আমি যে ওটা মউলির চর।

আমি যত না জুড়ুকে সাহস দেবার জন্যে বললাম, তার চেয়েও বেশি নিজেকে সাহস যোগাবার জন্যে আবারও বললাম, তোর মউলির নিকুচি করেছি।

বলেই, রাইফেলের বোল্ট খুলে, আরও দুটি গুলি ভরে নিয়ে ম্যাগাজিনে পাঁচটা ও ব্যারেলে একটা রেখে, সেফটি ক্যাচ্‌টা দেখে নিয়ে জুতোটা খুলে ফেলে স্লিপিং ব্যাগের উপরে শুয়ে পড়লাম।

জুড়ু আমার পাশ ঘেঁষে শুলো।

সারাদিনে প্রায় দশ-বারো মাইল হাঁটা হয়েছে চড়াইয়ে-উৎরাইয়ে, বেশির ভাগই জানোয়ার-চলা সুঁড়িপথ দিয়ে। পথ বলতে এখানে কিছুই নেই। তারপর পেটে খাবার পড়েছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল।

বাইরে এখন কোনও শব্দ নেই। শব্দহীন জগতে জঙ্গল-পাহাড় উদ্ভাসিত করে চাঁদ উঠেছে। তাঁবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে। নীচের উপত্যকার সাদা-সাদা পত্রশূন্য গেণ্ডুলী গাছগুলোর ডালগুলোতে চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে।

মাঝে-মাঝে এই নিস্তব্ধ শব্দহীন পরিবেশকে চমকে দিয়ে একলা রাত-জাগা নাইট-জার পাখিটা খাপু-খাপু-খাপু-খাপু করে ডেকে উঠছে শুধু।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

হঠাৎ জোর ঝড়ের মতো হাওয়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ খুলেই, জঙ্গলে অস্বস্তি লাগলে যে-কোনও শিকারী যা করে, আমি তাই-ই করলাম। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, তাঁবুর গায়ে হেলান দিয়ে যেখানে লোডেড রাইফেলটা রেখেছিলাম সেদিকে।

কিন্তু রাইফেলটা পেলাম না।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখি রাইফেলটা লোপাট।

জুড়ুও নেই।

কোথায় গেল জুড়ু?

বাইরে তাকিয়ে দেখি, চাঁদ ডুবে গেছে পাহাড়ের আড়ালে। আর সেই অন্ধকারে শুধু সবুজ তারাগুলো নরম আলো ছড়াচ্ছে গ্রীষ্মের বাদামী জঙ্গলের উপর।

বালিশের তলা থেকে টর্চটা বের করে তাঁবুর বাইরে বেরোলাম। টর্চ জ্বেলে এদিক-ওদিক দেখলাম। বার বার ডাকলাম, জুড়ু, জুড়ু, জুড়ু।

সেই ঝড়ের মতো হাওয়াটা শুকনো ফুলের মতো আমার ডাককে উড়িয়ে নিয়ে গেল। পাহাড়ে-পাহাড়ে যেন চতুর্দিক থেকে ডাক উঠল: জুড়ু-জুড়ু-জুড়ু।

কিন্তু জুড়ুকে কোথাও দেখা গেল না। তাঁবুর ভিতরে ফেরার চেষ্টা করলাম। আমার টর্চের আলোয় তাঁবুর মধ্যে কী একটা সাদা জিনিস পড়ে

থাকতে দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখি জুডুর গলার সেই অজগরের হাড়টা।

কে যেন আমাকে বলল, হাড়টা কুড়িয়ে নাও। এক্ষুনি কুড়িয়ে নাও হাড়টা।

আমি দৌড়ে গিয়ে হাড়টা কুড়িয়ে নিয়ে আমার বুক-পকেটে রাখলাম।

ততক্ষণে হাওয়াটা এত জোর হয়েছে যে, তাঁবুর মধ্যে থাকাটা নিরাপদ বলে মনে হল না আমার। যে-কোনও মুহূর্তে তাঁবু চাপা পড়তে হতে পারে।

আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে সেই পাথরটার উপরে বসলাম। নিজেকে স্বাভাবিক করার জন্যে পাইপটা ধরাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঐ হাওয়াতে কিছুতেই দেশলাই জ্বলল না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হাওয়ার তোড়ে তাঁবুটাকে উল্টে ফেলল। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা হাওয়ার তোড়ে গড়িয়ে গিয়ে একটা পাথরে গিয়ে ধাক্কা খেল। টং করে আওয়াজ হল।

ধাতব আওয়াজটা শুনে ভাল লাগল। এটার মধ্যে অন্তত কোনও অস্বাভাবিকতা নেই।

হাওয়াটা যত জোর হতে লাগল, আমার মনে হতে লাগল নীচের উপত্যকা থেকে সবগুলো গাছ মাটি ছেড়ে উঠে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। পিছনে তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ের গা থেকেও যেন গাছগুলো নেমে আমার দিকে হেঁটে আসছে। তাদের যেন পা গজিয়েছে। হাওয়াতে ডালপালাগুলো এমন আন্দোলিত হচ্ছিল যে, আমার মনে হল ওরা যেন ওদের হাত নেড়ে নেড়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে।

জঙ্গলে কখনও রাইফেল-বন্দুক ছাড়া থাকিনি। নিদেনপক্ষে কোমরে পিস্তলটা গোঁজা থাকেই। অস্ত্র থাকলেও করার আমার কিছুই ছিল না, কিন্তু তবুও হয়তো এতটা অসহায়, নিরাশ্রয় লাগত না নিজেকে।

ভয়ে আমার কপাল ঘেমে উঠল।

আর একবার জুডুকে ডাকবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বার হল না।

হঠাৎ দেখলাম, দক্ষিণ দিকে গাছের গুঁড়িতে আটকে থাকা ভুলুণ্ঠিত তাঁবুটার ঠিক সামনে সেই শম্বরটা দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পিঠের উপরে ভীষণ লম্বা রোগা একজন ঝাঁকড়া চুলওয়ালা নগ্ন লোক বসে আছে।

হঠাৎ আমার চতুর্দিকে গাছেদের সঙ্গে সঙ্গে যেন নানা জানোয়ারও আমাকে ঘিরে ফেলতে লাগল। শম্বর, হরিণ, কোট্‌রা, নীলগাই, শুয়োর, শজারু—যেসব জানোয়ার আমি ছোটবেলা থেকে সহজে শিকার করেছি। আমার মনে হল, ঐ মহীরুহগুলো আর জানোয়ারগুলো সবাই মিলে আমাকে পায়ে মাড়িয়ে আজ পিষে ফেলবে।

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বলবার চেষ্টা করলাম, আর করব না। আর শিকার করব

না। আমাকে ক্ষমা করো।

কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বের হল না।

আমি পেছন ফিরে দৌড়ে পালাতে গেলাম। কিন্তু আমার চারিদিকে ঐ শম্বরটা ঐ লোকটাকে পিঠে নিয়ে ঘুরতে লাগল। আমার পালাবার পথ বন্ধ করে দিল। আমি পাগলের মতো এদিক ওদিক দৌড়তে লাগলাম। পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে লাগলাম বারে বারে।

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এল। আমি কাঁদতে গেলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে তবু স্বর বেরোল না।

আমি আরকেবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না, পড়ে গেলাম।

তারপর আর কিছু মনে নেই আমার।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে আমার চোখের সামনে সেই প্রাগৈতিহাসিক ধূসর-রঙা জটাজুট-সম্বলিত শম্বরটার বড় বড় সবুজ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

॥ ২ ॥

কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছিল।

যেন অনেক দূর থেকে ডাকছিল, যেন স্বপ্নের মধ্যে ডাকছিল। যেন আমার মা ছোটবেলা স্কুল থেকে ফেরার পর আমার খাবার দিয়ে আমাকে ডাকছিলেন।

কে যেন বড় আদর করে, আনন্দে আমাকে ডাকছিল।

আস্তে আস্তে আমি চোখ খুললাম।

দেখি, আমার মুখের দিকে ঝুঁকে তিন-চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রবল জ্বরে যেমন ঘোর থাকে, তেমনই ঘোরে ছিলাম আমি।

চোখ খুলতে আমার ভারী কষ্ট হল।

অনেক কষ্টে চোখ খুলতেই রোদে আমার চোখ ঝলসে গেল। কে যেন আমার মাথাটাকে তুলে ধরে নিজের কোলে নিয়ে বসল।

আবার আমি তাকালাম, এবার দেখলাম, আমার মাথাটাকে কোলে নিয়ে বসে জুডু আমার মুখের উপর মুখ ঝুঁকিয়ে বসে আছে।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, আমার দুই বন্ধু জর্জ আর কোন্ আমার দুপাশে বসে আছে।

জর্জ বলল, হাই ঋজু! হাউ ডু ইউ ফিল?

জর্জ মাটিতে পড়ে-থাকা আমার পাইপটা তুলে নিয়ে নিজের টোব্যাকো-পাউচ থেকে বের করে গ্রী-নান টোব্যাকো ভরে দিতে লাগল।

আমি উঠে বসলাম।

আমার কফি খাওয়া শেষ হলে, জর্জ পাইপটা ধরিয়ে দিল ওর লাইটার

দিয়ে।

ওরা দুজনে হাসছিল।

কেন্ হাসতে হাসতে আমাকে বলল, হোয়াট ডিড ইউ সী লাস্ট নাইট। ঘোস্ট ?

আমি উত্তর দেবার আগেই জর্জ হাসতে হাসতে বলল, মাই ফুট।

আমি উত্তর দিলাম না।

শুধু জর্জ বা কেন্ বলে কথা নেই, আমার সভ্য শিক্ষিত, শহুরে বন্ধুদের কেউই যে আমার কথা বিশ্বাস করবে না, তা আমি বুঝতে পারছিলাম।

কফি খেয়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম। মাথাটা ভার। চোখে ব্যথা।

জর্জ বলল, ইউ আর এ সীলি গোট। কেন্ শট আ টাইগার দিস্ মর্নিং ইন দি ফার্স্ট বীট্। অ্যান্ড ইউ কেম্ হিয়ার টু শুট আ ঘোস্ট্!

জুড়ু ইংরেজী বোঝে না।

ও মালপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে রওয়ানা হবার জন্যে তৈরি হল।

জর্জ আর কেন্ আগে-আগে হাঁটতে লাগল।

জুড়ু ফিসফিস করে বলল, বাবু, আমাকে মাপ করো, আমি না পালিয়ে পারিনি। আমার কিছু হত না। অজগরের মন্ত্রপড়া হাড় শুধু আমার কাছেই ছিল। তুমি আমার কথা শুনলে না— তাই তোমাকে ওটা দিয়ে আমি পালাতে বাধ্য হলাম।

জর্জ পিছন ফিরে শুধোলো, আর য়ু ডিসকাসিং বাউট দ্য ফিচারস্ অফ দ্য ঘোস্ট্ ? ইউ সিলি কাওয়ার্ড!

আমি জবাব দিলাম না।

যেই ওরা আবার অন্যদিকে মুখ ফেরাল, আমি তাড়াতাড়ি বুক-পকেটে হাত ঢুকিয়ে অজগরের হাড়টাকে জুড়ুর হাতের মুঠোয় লুকিয়ে দিয়ে দিলাম।

কেন্ বলল, ইউ হ্যাভ সীন সাম পি-ফাউলস্ অন আওয়ার ওয়ে আপ্ হিয়ার। লেট্স্ শুট আ কাপ্ল্। জর্জ হ্যাজ হিজ শটগান উইথ্ হিম।

আমি বললাম, আই অ্যাম গোয়িং টু গিভ্ আপ্ শুটিং ফর গুড্।

জর্জ আর কেন্ দুজনে একই সঙ্গে কল্‌কল্ করে হেসে উঠল।

বলল, ওঃ ডিয়ার ; ডিয়ার। দ্যাটস্ দ্য জোক অফ দ্য ইয়ার।

আমি আর জুড়ু পাশাপাশি হেঁটে চললাম। আমার বন্ধুদের কথার কোনও জবাব দিলাম না। কারণ, জবাব দিয়ে লাভ ছিল না কোনও।

তিনকড়ি

পর পর পাঁচ ভাই মারা যাওয়ার পর যখন কড়িদা জন্মাল, তখন কড়িদার মা তাঁর নাম রাখলেন তিনকড়ি। ঠিক যে নাম রাখলেন তা নয়, তিন কড়ি দিয়ে কড়িদার কাকিমা কিনে নিলেন তাকে তার মার কাছ থেকে।

সকলের ভয় ছিল যে, কড়িদাও বুঝি বাঁচবে না। কিন্তু কড়িদা শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল।

কড়িদাকে আমি প্রথম দেখি যখন আমি কলেজে ঢুকেছি তখন। আমার পিসীমার বাড়ি ছিল আসামের ধুবড়ি শহর থেকে কচুগাঁওয়ের দিকে যাবার রাস্তায় তামাহাট বলে ছোট একটা গঞ্জে। কড়িদারা থাকত তামাহাটের আগে কুমারগঞ্জ বলে আরেকটা গ্রামে।

কড়িদা যখন ছোট তখনই কড়িদার বাবা মারা যান। বিধবা মা তাঁর অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য ও সিন্দুকের যৎসামান্য পুঁজি দিয়ে কড়িদাকে মানুষ করেন। কিন্তু তিনি কখনও নিজের ছেলেকে নিজের ছেলে মনে করার মতো সাহসী হয়ে উঠতে পারেননি। পারেননি এই ভয়ে যে, পাছে তাঁর অন্য পাঁচ ছেলের মতোই কড়িদাও পালিয়ে যায়।

পিসীমা ও পিসেমশাই কড়িদাকে নিজেদের ছেলেদের সঙ্গে একইরকম করে বড় করতে থাকেন। এখানে ওখানে হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত কড়িদা আমার অন্য দুই প্রায়-সমবয়সী পিসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে। তাই কলকাতায় থাকতাম বলে তাদের কারও সঙ্গে আমার বড় একটা দেখা হত না।

কলেজের গরমের ছুটিতে ধুবড়ি গেলাম। রাত কাটালাম কড়িদার কাকা পূর্ণকাকার বাড়িতে। আজকে আমার পিসেমশাই বা পূর্ণকাকা কেউ আর বেঁচে নেই।

বাড়িতে বিজলীর আলো ছিল না। পাখাও ছিল না। সে রাতে বড় ভ্যাপসা গুমোট গরম ছিল। ব্রহ্মপুত্রর দিক থেকে হাওয়াও আসছিল না একটুও। এদিকে প্রচণ্ড মশা। বাধ্য হয়ে মশারি টানিয়ে শুতে হয়েছিল। কড়িদার খুড়তুতো দিদি ভারতীদি যত্ন করে মশারি টানিয়ে দিয়ে গেছিলেন। কড়িদা আর আমি পাশাপাশি খাটে শুয়েছিলাম। আমাকে জানলার পাশের খাটে যেখানে হাওয়া লাগার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে শুতে দিয়েছিল কড়িদা।

আমি আজন্ম কলকাতায় মানুষ, বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় অভ্যস্ত ; সাহেবী কলেজে পড়ি, সমস্ত মিলিয়ে সেই পাখাহীন ঘরে, মশারির দুর্গের মধ্যে বন্দী হয়ে একজন গ্রাম্য ছেলের পাশে শুয়ে, যাকে আমি সেদিনই প্রথম দেখলাম বলতে গেলে, আমার ভারী অস্বস্তি লাগছিল। কড়িদার সঙ্গে গল্প যে কী করব তার বিষয়ও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কলকাতার সেই-আমির সঙ্গে ছোট-ছোট অনগ্রসর জায়গায় স্কুলের হস্টেলে-মানুষ গেঁয়ো ছেলেটির সঙ্গে ভাব হচ্ছিল না।

কড়িদা তখন পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বলেনি। হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে দু-একটা কথা বলেছিল মাত্র। তবে সেই মুখের দিকে প্রথমবার চেয়েই আমার মনে হয়েছিল যে, এমন নিষ্পাপ, স্বর্গীয় মুখ আমি আগে কখনও দেখিনি।

রাত গভীর হচ্ছিল। মশারির মধ্য গরম এবং বাইরে মশার পিন্‌পিনানি বেড়েই চলছিল। ঘরের পাশে একটা কী-যেন ফুলের ঝোপ ছিল। সেই ঝোপ থেকে ঝিম-ধরা গরমের মতো একটা ঝিম-ধরা গন্ধের ঝাঁজ উঠছিল।

আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কিন্তু কড়িদার যে কেন ঘুম আসছিল না, তা বুঝতে পারছিলাম না। এটাই তার ঘর, এই ঘরেই সে রোজ শোয়, বৈদ্যুতিক পাখাতে সে অভ্যস্তও নয়। তাহলে ?

ছটফট করতে করতে বোধহয় চোখ জুড়ে এসেছিল এক সময়। চোখ জুড়ে আসার পরই বেশ একটা হালকা হাওয়া আসতে লাগল মাথার দিক থেকে। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ভাবলাম, বোধহয় নদীর দিক থেকে হাওয়া দিল।

পাশের বাড়ির কতগুলো রাজহাঁসের প্যাঁকপ্যাঁক আওয়াজে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে দেখি কড়িদা খাটের মাথার দিকে একটা চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। অসহায় ভঙ্গিমায় তার শরীরটা চেয়ারের উপরে ছড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে হাত-পাখাটা মাটিতে পড়ে আছে।

কড়িদা কখন ঘুমিয়েছে জানি না ; হয়তো বা সারারাত আমাকে হাওয়া করে এই একটু আগেই। মশার কামড়ে হাত দুটো লাল চাকা-চাকা হয়ে ফুলে গেছে। কিন্তু মুখে সেই অম্লান অনুযোগহীন অভিযোগহীন হাসি।

এই কড়িদা !

যাকে সে জানে না ভাল করে, চেনে না, যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নেই, বন্ধুত্ব নেই, যার সঙ্গে নেই কোনও দেনা-পাওনার সম্পর্ক, সেই কলকাতার ছেলেটাকে নিজে সারারাত মশার কামড় খেয়ে হাতপাখা চালিয়ে ঘুম পাড়ানোর অযাচিত সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ভার একমাত্র কড়িদাই নিতে পারত।

সকলের প্রতিই ঠিক একই রকম ব্যবহার ছিল তার।

তামাহাটে পৌঁছে খুব মজা করতাম আমরা। পূর্ণকাকার দোনলা বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে-বনে ঘুরে বেড়াতাম।

সাত-বোশেখীর মেলা বসেছিল রাঙামাটি পাহাড়ে। টুঙ-বাগানের ছায়া-শীতল ভয়-ভয় সাপ-সাপ বাঘ-বাঘ গন্ধভরা বুনো পথ মাড়িয়ে রাঙামাটি-পর্বতজুয়ারের জঙ্গল। ম্যাচ-সর্দারদের বাসা সেখানে। সারা দুপুর নিকোনো দাওয়ায় বসে তেল-চুকচুক সটান চুলে কাঠের কাঁকই গুঁজে, তাঁত বোনে সেখানে ম্যাচ-মেয়েরা। আর হলুদ-লাল কাঁঠাল পাতা ঝরে পাহাড়ী হাওয়ায় টুপ-টাপ, খুস্‌স্-খাস্ করে। সেখানে নিয়ে গেল কড়িদা আমায়। ম্যাচ-সর্দার লম্বা বিড়ি মুখে দিয়ে বাইরে বসে দা দিয়ে একটা কাঠ কেটে কেটে

কী যেন বানাচ্ছিল।

কড়িদা বলল, আছে কেমন ?

বুড়ো সর্দার ঘোলাটে চোখ তুলে বলল, ভাল আছি।

কড়িদা হাসল ; বলল, তুমি তো ভাল থাকবেই। সে আছে কেমন ?

সর্দার এবার অবাক হল।

বড় বড় বিস্মিত চোখ তুলে, নিজের বাতে-ধরা শরীরটাকে কোনওক্রমে ওঠাল, হাড়ে-হাড়ে কটাকট শব্দ তুলে, তারপর দাওয়ার এক কোনায় একটা বাঁশের চালায় নিয়ে গেল আমাদের।

দেখি, একটা বাদামী-রঙা ভুটিয়া কুকুর খড়ের উপর শুয়ে আছে। তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি দগদগে ঘা। কী-সব পাতা-টাতা বেটে লাগানো আছে তাতে। ঘরময় ঘিনঘিন করে মাছি উড়ছে।

কড়িদা বিড়বিড় করে বলল, নাঃ, অবস্থা ভাল নয়। ধুবড়ি গিয়ে ওষুধ আনতে হবে।

আমি শুধোলাম, কী হয়েছিল ?

কড়িদা বলল, সাতদিন আগে ওকে একটা ছোট চিতা কামড়ে দিয়েছিল।

তুমি জানলে কী করে ?

এই সর্দার হাটে এসেছিল পরশুদিন, ওর মুখে শুনেছিলাম।

কুকুরটা বুঝি তোমার খুব প্রিয় ?

কড়িদা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। কী যেন ভাবল অল্পক্ষণ।

তারপর হেসে বলল, হ্যাঁ ! খুব প্রিয়।

কী নাম কুকুরটার ?

কড়িদা বলল, জানি না তো।

সর্দার বলল, ডালু।

তারপর সর্দারই বলল, দিন দশ হল আমার বেয়াই কচুগাঁও থেকে আমার জন্যে জামাইয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমি আরও অবাক হলাম সে-কথা শুনে।

কড়িদা বলল, কুকুরটাকে আগে দেখিনি। তবে বেচারীকে চিতাবাঘে কামড়েছে শুনে বড় কষ্ট হয়েছিল। তা ছাড়া বুড়োর মুখ দেখে মনে হয়েছিল, কুকুরটাকে বুড়ো বড় ভালবেসে ফেলেছে। আর বুড়োর খুব ভাল লাগবে যদি আমি আসি, তাই তোমাকে নিয়ে চলে এলাম।

আমি বললাম, এই জন্যে সাইকেলে ও হেঁটে বারো মাইল এলে তুমি ? মিছিমিছি ? বুড়ো কি তোমাকে পাটের ব্যবসায় সাহায্য করে ?

কড়িদা আবার অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল আমার দিকে। বলল, না তো ! বুড়োর সঙ্গে হাটে দেখা হয় মাঝে মাঝে।

কড়িদা পকেট থেকে পটাশ-পারমাঙানেটের লাল লাল কুচি বের করল, কাগজে মোড়া। বুড়োকে বলল, গরম জলে এই ওষুধ একটু গুলে ঘা-টাকে ভাল করে ধোবে বারবার। কাল আমি আবার আসব ওষুধ নিয়ে।

পর্বতজুয়ার থেকে অনেকখানি হেঁটে এসে তারপর সাইকেলে ফিরছিলাম আমরা। মাইল তিনেক রাস্তা চষা-ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে সাইকেল চালাতে হয়। পেছনের হাড়গোড় প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল আমার।

রেগেমেগে কড়িদাকে বললাম, কোনও মানে হয়? একজন প্রায় অচেনা-অজানা লোকের জন্যে আর তার একটা সাধারণ কুকুরের জন্যে এই হয়রানির?

কড়িদা হাসল। সাইকেল চালাতে চালাতে বলল, একটু জিরিয়ে নাও। এসো, ওই বড় গাছটার নীচে বসি একটুক্ষণ।

সাইকেল দুটো গাছে ঠেস দিয়ে রেখে আমরা মুখোমুখি বসলাম। পশ্চিমের আকাশে সবে সন্ধ্যাতারা উঠেছে। ভারী একটা শান্তির পরিবেশ চারিদিকে। সন্ধে হবার ঠিক আগে নিরিবিলি জায়গায় থাকলে বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে ওঠে।

কড়িদা বলল, তুমি বোধহয় লক্ষ করোনি ম্যাচ-সর্দার যখন হাসল, তখন তার মুখটা কেমন দেখাচ্ছিল। তুমি কি কুকুরটার চোখের দিকে তাকিয়েছিলে? তাকাওনি তো? তোমার দোষ নেই। কেউই তাকায় না। কিন্তু তাকালে বুঝতে পারতে, কুকুরটাও কত খুশি হয়েছিল আমাদের দেখে।

তারপর আবার ও হাসতে হাসতে হঠাৎ বলল, জানি, তোমার খুব কষ্ট হল। ঠিক আছে। কাল আমি একাই আসব। ওষুধ আনতে হবে সকালে গিয়ে। ঘায়ের অবস্থা ভাল না কুকুরটার।

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, কলকাতার পথে-ঘাটে এমন কত কুকুর তো রোজ মরে। বড়লোকদের শৌখিন কুকুর ছাড়া কুকুরের চিকিৎসার কথা তো কখনও শুনিনি। কুকুরটা মরে গেলে তোমার কী যাবে-আসবে?

কড়িদার মুখটা এক মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেল। তার পরেই আবার সেই আশ্চর্য, উদার অনাবিল হাসিতে ভরে গেল। ডান হাতে এক মুঠো দুর্বাঘাস ছিঁড়ে বলল, দ্যাখো, কেউ মরে গেলে কারও কিছু এসে যায় না। আমাদের মতো সাধারণ লোক, কুকুর-মুকুর এইসব। কিন্তু···

কিন্তু···বলেই কড়িদা থেমে গেল।

আর কিছুই বলল না।

খানিকক্ষণ পরে বলল, তোমার মতো ভাষা আমার নেই, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু অন্য কাউকে খুশি দেখলে, সুখী দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। কী যে ভাল লাগে তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। সে যেই-ই হোক না কেন। আর, কাউকে দুঃখী দেখলে আমার বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হয়।

আমি গেঁয়ো মানুষ; আমি অমনিই। আমাকে কেউ বোঝে না।

এরপর কড়িদা কর্মজীবনে কলকাতায় এসেছিল। আমার চেয়ে বয়সে দু বছরের মাত্র বড় ছিল। সেই গেঁয়ো লোকটা শহরে এসেও একটুও বদলাল না। কলকাতার কেজো জগতের সমস্ত স্বার্থপর লোকই তাকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছিল। যার যা অসুবিধা, ডাকো কড়িকে। ডাক না-পাঠালেই বা কী, অসুবিধার কথা জানতে পারলেই হল, কড়িদা ঠিক সেখানে গিয়ে পৌঁছত। নিজের কাজকর্ম করে এবং রীতিমত ক্লান্ত থাকার পরেও যে কড়িদা কী করে এত লোকের জন্যে এত কিছু করত তা ভাবলেও অবাক লাগে।

কেউ যদি কখনও কড়িদার ছোট্ট বাড়িতে গিয়ে পৌঁছত, তাহলে তার যে কী আনন্দ হত তা তার মুখের হাসি যে না দেখেছে, সে বুঝবে না।

কড়িদা বলত, বুঝলে, আমরা হচ্ছি সাধারণ লোক, আমাদের উপর কোনও দায়-টায় নেই, কোনও বড় কাজ আমাদের দ্বারা হবে না, আমরা মরে গেলে কারও কিছু যাবে-আসবে না, ময়দানে স্ট্যাচু বানাবে না কেউ, এই রকম হেসে-খেলে বেঁচে থাকলেই খুশি।

হেসে-খেলেই থাকত কড়িদা। নিজের যে কোনওরকম অসুবিধে ছিল, দুঃখ ছিল মানসিক, কষ্ট ছিল শারীরিক, তা কেউ কখনও জানতে পারেনি। সমস্তক্ষণ সে অন্যের কষ্ট লাঘব করার জন্যেই এমন ব্যস্ত থাকত যে, নিজের দিকে তাকাবার অবকাশ পায়নি কখনও। অন্যের জন্যে, অন্যের কারণে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার স্বর্গীয় সুখের আস্বাদ সে পেয়েছিল, আর সেই সুখেই বুঁদ হয়ে থাকত।

শুনলাম, কড়িদার পেটে নাকি ব্যথা হয়। শরীরে কী সব গোলমাল। চেহারা ও হাসি দেখে কিছু বোঝার উপায় ছিল না কারও।

হঠাৎ শুনলাম, কড়িদা হাসপাতালে ভর্তি হবে। কী সব পরীক্ষা-টরীক্ষা হবে—সিস্‌টোগ্রাফ—বায়োপ্‌সি ইত্যাদি বায়োপ্‌সি করে ধরা পড়ল ক্যান্‌সার।

যেদিন অপারেশন, তার আগের দিন নার্সিং হোমে তাকে দেখতে গেলাম।

আমি যেতেই কড়িদা উঠে বসল, জমিয়ে গল্প জুড়ে দিল, যেন ওটাও তার বাড়ির বৈঠকখানা। চমৎকার দেখাচ্ছিল কড়িদাকে। ধুতি আর পাতলা লংক্লথের পাঞ্জাবিতে।

আমি যখন উঠলাম, বলল, শরীরের যত্ন নিও, তুমি বড় বেশি খাটো, অত্যাচার করো বড়।

পরদিন অপারেশন হল। আর জ্ঞান ফিরল না। কড়িদা হাসতে হাসতেই বলতে গেলে, অত বড় দুরারোগ্য রোগটাকে হারিয়ে দিয়ে, আমাদের মতো খাটো মাপের সব মানুষদের মাথা ছাড়িয়ে তার যেখানে জায়গা সেখানে চলে গেল!

প্রায়ই মনে পড়ে, এবং চিরদিন পড়বে যে, কড়িদা একদিন সন্ধ্যাতারাকে সাক্ষী রেখে বলেছিল, কেউ মরে গেলে কারও কিছু আসে যায় না। কিন্তু···

আজ আমি জানি, তুমি সেদিন ঠিক বলোনি কড়িদা। কেউ কেউ মরে গেলে কারও কারও যায়-আসে নিশ্চয়ই, বড় বেশি যায়-আসে।

কড়িদার মা এখনও বেঁচে আছেন। আমার পিসীমা বড় সস্ত দামে কড়িদাকে কিনেছিলেন। মাত্র তিনটি কড়ি দিয়ে!

কিন্তু পৃথিবীর সব কড়ি দিয়েও কি তোমার দাম দেওয়া যেত কড়িদা?

টেনাগড়ে টেনশন্

খগা সরকার আর ভগা সরকারকে চিনত না এমন লোক টেনাগড়ে কেউ ছিল না। পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট শহর এই টেনাগড়। এখানে সকলেই সকলকে চেনে।

খগাদার বয়স হয়েছে ষাট-টাট। শৌখিন লোক। যৌবনে বেহালা বাজাতেন, শিকার করতেন, ওকালতিও। পিতৃপুরুষের বহু সম্পত্তি ছিল বিহারের নানা জায়গায়। তাই "খেটে খেয়ে" তিনি জনগণের সামিল হতে চাননি। কিন্তু প্রয়োজন না থাকলেও খাটতে তিনি ভালবাসতেন এবং পরিশ্রমে বিশ্বাস করতেন।

খগাদার ভাই ভগাদার বয়স তিরিশ-টিরিশ হবে। টেনাগড়ে তিনি প্রায়ই নানা ধরনের খবরের সৃষ্টি করে থাকেন। লোকটি ভাল।

খগাদা এখন রিটায়ার্ড। ইদানীং চটের উপরে গুনছুঁচে রঙিন সুতো পরিয়ে "সদা সত্য কথা বলিবে", "ভগবান ভরসা", "যাকে রাখো সেই রাখে" ইত্যাদি লিখে লিখে বস্তির লোকেদের সেগুলো দান করেন। মাঝে মাঝে কাহার-বস্তির অনিচ্ছুক শুয়োরগুলোকে ধরে এনে কুয়োতলায় তাদের জবরদস্তি সাবান মাখান। সন্ধেবেলায় ওঁর বাড়িতে ভজন গান হয়। সকালে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। খগাদার ডিসপেনসারিতে লোম-ওঠা পথের কুকুর, কুঁজে-ঘা-হওয়া বলদ এবং হাড্ডিসার মানুষ— সকলেই চিকিৎসার জন্যে আসে এবং আশ্চর্য, কেউ কেউ ভালও হয়ে যায়।

খগাদা মৃতদার। ছেলেমেয়েও নেই। ভগাদা বিয়েই করেননি। দুই ভাইয়ের সুন-সান্নাটা সংসার। থাকবার মধ্যে একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর, তার নাম মোহিনী। চাকর-বাকর আছে, গাই-বয়েল, খেতি-খামার, খিদ্‌মদ্‌গার। আর আছে বারান্দায় দাঁড়ে-বসা একটা কুৎসিত কাকাতুয়া। ভগাদার আদরের পাখি। কুকুরটাও আদরের। কাকাতুয়াটাকে ভগাদা আদর করে ডাকত 'কাকু' বলে। আমরা বলতাম "কাঁড়িয়া পিরেত"। ওদের বাড়ি ঢুকলেই কাকাতুয়াটা

বলে উঠত, "ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো হিঁয়াসে।"

খগাদা আধুনিক কবিতা, পশুপালন, বাজরা-মকাই, তাইচুং ও আই-আর এইট ধান, ভগাদার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি তাবৎ বিষয় নিয়েই আমাদের সঙ্গে জোর আলোচনা করতেন এবং গলার জোর বাড়ানোর জন্যে তেজপাতা-আদা-এলাচ দেওয়া গোরখপুরী কায়দায় বানানো চা ও ভৈষালোটনের জঙ্গল থেকে আনানো খাঁটি ঘিয়ে ভাজা সেওই খাওয়াতেন।

সেদিন সকালে খগাদার বসবার ঘরে ঢুকতেই দেখি খগাদার মুখ গম্ভীর, থমথমে।

গুনছুঁচ ঢুকে গেছে কি বুড়ো আঙুলে?

বীরু নিজের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, খুব লেগেছে?

খগাদা বললেন, লেগেছে, তবে আঙুলে নয়, হৃদয়ে।

ঢোক গিলে বললাম, স্ট্রোক! মাইল্ড অ্যাটাক?

খগাদা বললেন, তার চেয়েও মারাত্মক।

আমরা বসে পড়ে সমস্বরে বললাম, কী, তবে কী?

খগাদা বললেন, চুরি।

কোথায়, কোথায়? চোর কোথায়? কী চুরি? বলে আমরা প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

এমন সময় ভগাদাকে দেখা গেল একটা লাল রঙের শর্টস্ পরে, কাবুলী জুতো পায়ে, খালি গায়ে কাকাতুয়াটাকে খাওয়াচ্ছেন নিজে হাতে, বারান্দায় এসে।

খগাদা আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ যে কালপ্রিট, ঐ দাঁড়িয়ে আছে সশরীরে। সহোদর আমার। সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ!

আমাদের খারাপ লাগল, বিশ্বাসও হল না। আপন ভাই কখনও চুরি করতে পারে?

খগাদা কী বলছে বুঝতে না পেরে ভগাদা সাঁ করে বারান্দা ছেড়ে সরে গেল ভিতরে। ধরে-থাকা খাঁচাটা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ায় কাকাতুয়ার খাঁচাটা জোরে নড়ে উঠল। কাকাতুয়াটা বলল, কাঁচকলা খা! কাঁচকলা খা! ভগাদাকেই বলল বোধহয়।

খগাদা আস্তে আস্তে বললেন, গত শনিবার রাতে এ-বাড়িতে যত কাঁসার ও রুপোর বাসন ছিল, সব চুরি করে নিয়ে গেছে চোরে, শুনেছ তোমরা?

বীরু বলল, সে কী? বাড়িতে বন্দুক ছিল না?

আমি বললাম, অত বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুরও তো ছিল!

ছেল। খগাদা বললেন, ছেল সবই। কিন্তু বন্দুক রাখা ছেল গ্রীজ্ মাখানো অবস্থায় বেহালার বাক্সে। আর কুকুর মজাসে ঘুমোচ্ছিল।

আমরা বোকার মতো বললাম, কুকুর ঘুমোচ্ছিল মানে?

তাহলে আর বললুম কী ? খগাদা সখেদে বললেন। তারপর আবার বললেন, যে বাড়িতে কুকুর ঘুমোয়, সে-বাড়িতে চুরি হবে না ?

এরপর গড়গড়ায় গয়ার তামাকে দুটো টান দিয়ে বললেন, বুঝলে ভায়ারা, রোজ রাতে পড়াশুনো করি, আর শুনতে পাই বারান্দায় মোহিনীর পায়ের পায়জোড়ের আওয়াজ। মোহিনীকে ভগা রুপোর পায়জোড় বানিয়ে দিয়েছিল। পা ফেললেই ঝুমুর-ঝুমুর করে বাজে। আওয়াজ শুনতে পাই, কিন্তু এগারোটা বাজলেই দেখি আওয়াজ থেমে যায়। একদিন মনে সন্দ হওয়াতে পা টিপে টিপে ভগার ঘরের সামনে গিয়ে দেখি ভগা মশারির মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর মেঝেতে শুয়ে মোহিনীও দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। আমি ডাকলুম, ভগা ! তাতে 'কে রে' বলেই ভগা উঠে বসে জানলার ধারে আমায় দেখতে পেয়েই ঘুমন্ত মোহিনীর পেটে মারলে ক্যাক্ করে এক লাথি। ঘুমঘোরে লাথি খেয়ে মোহিনী তো মারলে বডি থ্রো। —

বীরু বলল, আর ভগাদা ?

ভগাদা ? বলে, খগাদা বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। বললেন, ভগা আবার তক্ষুনি শুয়ে পড়ল।

তারপর বললেন, তোমরাই বলো, এ-বাড়িতে চুরি হবে না তো কোন্ বাড়িতে হবে ?

আমরা সত্যিই বড় চিন্তায় পড়লাম খগাদার জন্যে। সরি, ভগাদার জন্যে। আসলে ভগাদা মাঝে মাঝেই আমাদের এবং খগাদাকে ঝামেলায় ফেলতেন।

একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই শুনলাম, খগাদা আমাদের জরুরি তলব দিয়েছেন।

আমরা দৌড়ে গেলাম। দেখি, খগাদার অবস্থা খুব খারাপ। কোলে বার্ট্রান্ড রাসেলের 'কনকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস্' বইটানা আধ-খোলা পড়ে আছে, আর খগাদার চোখের কোণে জল চিক্-চিক্ করছে।

বীরু বলল, খগাদা, কী ? দুঃখ কিসের ?

খগাদা বললেন, আর কী, একমাত্র ভাইটাকে বুঝি হারালাম এবার !

কী, হয়েছে কী ? আমি উত্তেজিত হয়ে শুধোলাম।

খগাদা বললেন, ভগা আর ওর বন্ধু গিদাইয়া পদ্মার রাজার বিলে হাঁস মারতে গেছে সেই ভোর চারটেয়— বাড়িতে মশলা বাটতে বলে গেছে। হাঁসের শিক্‌কাবাব বানাবে বলে শিক ঘষামাজা করে রাখতে বলেছে, টক দই, পেঁপে, গরম-মশলা, ভাঙা পিরিচ, সবকিছুর জোগাড় রেখে গেছে। আর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল, এখনও তাদের দেখা নেই। নির্ঘাত কোনও অঘটন ঘটেছে। আমার পায়ের গেঁটে বাতটা বেড়েছে কয়েকদিন হল। আজ আবার অমাবস্যা। রোজ রসুন খাই, তবু ব্যথা যায় না। আমি তো চলচ্ছক্তিরহিত। তোমরা বাবা যাও একটু। আমার জীপগাড়িটা নিয়ে যাও। ভগা গিদাইয়াকে

নিয়ে মোটর সাইকেলে করে গেছে।

বীরু বলল, নো-প্রবলেম্। আপনি চিন্তা করবেন না খগাদা, আমরা বন্দোবস্ত করছি। তার আগে আমি চট করে পোস্ট অফিস থেকে পদ্মার রাজবাড়ির ম্যানেজারকে একটা ফোন করে খবর নিয়ে নিই। তাঁকে আমি চিনি, আমার কাকার বন্ধু।

খগাদা বললেন, বাস্ বাস্, তাহলে তো কথাই নেই। এই নাও, টাকা নিয়ে যাও। বলেই, কোমরের গেঁজ থেকে একটা লাল রঙের নাইলনের মোজা বের করে তার থেকে একটা দশটাকার নোট দিলেন বীরুকে।

বীরু আমাকে বলল, তুই থাক। খগাদা নিড্‌স্ কম্পানি।

খগাদা বললেন, বুঝলে ভায়া, আজ কত কথাই মনে পড়ছে। ভগা যখন হাসপাতাল থেকে মায়ের সঙ্গে বাড়ি এল, তখন ওকে দেখতে একেবারে বাচ্চা একটা খরগোশের মতো ছিল। কী গাবলুগুবলু ! তার উপর আবার খিল খিল করে হাসত। আমার চেয়ে কত ছোট। কিন্তু পড়াশোনা করল না, কিছুই করল না, জীবনটাকে নষ্ট করল পাখি আর কুকুর নিয়ে। আমিই এখন ওর মা, ওর বাবা, ওর দাদা, সব। কী বিপদ হল কে জানে। বিলে কি ডুবে মরল, না কি সাপে কামড়াল ?

একটু পর ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে চাকায় কির্-র্-র্ শব্দ তুলে বীরু ফিরল।

খগাদা একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেই মুখ বিকৃত করে 'উঃ মাগো' বলে পায়ের ব্যথায় বসে পড়লেন।

বসেই বীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, খবর পেলে ?

বীরু অধোবদনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বলল, হুঁ।

কী ? খগাদা চিৎকার করে উঠলেন। তারপর বললেন, বলে ফেল সোজাসুজি। আছে, না নেই ? তারপরই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভগা রে ! আমার ভগাবাবু !

বীরু বলল, ভগাদা আছে। কিন্তু রাজার কয়েদখানায়।

হোয়াট ? বলে খগাদা আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়েই 'গেছি গেছি গেছি' বলে বসে পড়লেন।

তারপর হাতের 'কনকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস্'টাকে মাটিতে ছুঁড়ে বললেন, হোয়াই ? হাউ কাম ?

বীরু বলল, বিলের ধারে রাজার পোষা হাতি চরছিল, ভগাদা তাকে গুলি করেছে।

হাতিকে ? গুলি ? পাখি-মারা ছররা দিয়ে ? ইমপসিবল্ ! নিশ্চয়ই অ্যাকসিডেন্ট। তা বলে কয়েদখানায় ? খগা সরকারের ভাই কয়েদখানায় ?

বীরু, বীরুর কাকা ও আমি যখন খগাদার জীপ নিয়ে গিয়ে পদ্মার রাজার কয়েদখানা থেকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়ে ভগাদা, গিদাইয়া আর মোটর সাইকেলটাকে ছাড়িয়ে আনলাম, তখন রাত হয়ে গেছে।

আসবার পথে বীরু বলল, ভগাদা, কী করে এমন হল ? হাতি কি তোমাকে তেড়ে এসেছিল ?

ভগাদা বললেন, আরে না-না। এই গিদাইয়া ইডিয়টটার জন্যেই তো।

গিদাইয়া মাথা ঘুরিয়ে টিকি নেড়ে মহা প্রতিবাদ জানাল।

ভগাদা বললেন, বুঝলি টিকি নেড়ে মহা প্রতিবাদ জানাল।

ভগাদা বললেন, বুঝলি, বিলে এক ঝাঁক পিনটেইল হাঁস ছিল। একটা পুটুস্ ঝোপের পাশে শুয়ে এইম্ করছিলাম। ভাবছিলাম, লাইনে পেলেই একেবারে গদাম করে ঝেড়ে দেব, গোটা ছয়েক উল্টে যাবে। এমন সময়···

আমি বললাম, এমন সময় কী ?

ভগাদা বললেন, এমন সময় গিদাইয়া কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ভগা ! ওয়াইল্ড এলিফ্যান্ট। তাকিয়ে দেখি, আমাদের পাশেই একটা হাতি দাঁড়িয়ে ভোঁস-ভোঁস করে শুঁড় ঘুরিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে আর কান নাড়াচ্ছে। আমার মন বলল, নিশ্চয়ই পোষা হাতি ; রাজার। কিন্তু গিদাইয়া বলল, এক-একটা দাঁত— পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা। অত হাজার টাকার কথা শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল। দিলাম দেগে এক নম্বর ছর্‌রা।

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুধোলাম, তারপরে কী হল ?

তারপর আর কী ! হাতি বলল, প্যাঁ—অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা। আর আমি ও গিদাইয়াও একসঙ্গে ভ্যাঁ—অ্যা-অ্যা-অ্যা।

বীরু অবাক হয়ে বলল, কেঁদে ফেললে ? এ মা, এত বড় লোক হয়ে কেঁদে ফেললে ?

ভগাদা বললেন, হুঁ-হুঁ বাবা, কান্না পেলেও না যদি কাঁদো তবে সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌কিমিয়া, মায়াকার্ডিয়াক অ্যাটাক্। হার্ট এক্কেরে কিমা। জানিস না তোরা কিছুই।

বীরু বলল, তারপর ?

তারপর আর কী ? হাতি এসে ঘাড়ে পড়ার আগেই মাহুত আর রাজার পেয়াদা এসে ঘাড়ে পড়ল। বন্দুক কেড়ে নিল। আর কী রদ্দা, কী রদ্দা !

হাতিটাকে কোথায় মেরেছিলেন ? আমি শুধোলাম।

ভগাদা বললেন, এইম্ করেছিলাম কানের পাশেই নিয়ম-মাফিক।

গিদাইয়া এতক্ষণ পর কথা বলল। বলল, কিন্তু কুল্লে চার দানা ছর্‌রা গিয়ে লেগেছিল হাতির সামনের পায়ের গোড়ালিতে।

ভগাদা চটে উঠে বলল, য়্যু শাট্ আপ্। দোস্ত তো নয়, সাক্ষাৎ দুশমন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরই খগাদা আমাদের নেমন্তন্ন করে খুব একচোট খাওয়ালেন। ভগাদা চাকরিতে জয়েন করেছেন। অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করে যোগাড় করেছেন। এতদিনে ভাইয়ের একটা গতি হল। সকলেই খুশি, আমরাও। ভগাদা রোজ সময়মত প্যান্ট আর হাওয়াইন শার্ট পরে অফিস যান।

দিন পনরো বাদে খগাদা আবার আমাদের জরুরি তলব দিলেন। গেলাম। বুঝলাম, আবার কেস গড়বড়।

খগাদা বললেন, আবার একটা উপকার করতে হবে।

আমরা বললাম, বলুন কী করতে পারি ! ভগাদা কি আবার কোনও ঝামেলা···

খগাদা বললেন, শোনো আগে। চাকরি করছিল ভগা, খুশি ছিলাম কত। কিন্তু গত কয়েকদিন অফিস যাচ্ছিল না। প্রথমে বলছিল পেটে ব্যথা। নাক্স-ভমিকা খারটি দিলাম। তারপর বলতে লাগল গায়ে ব্যথা। আর্নিকা দিলাম। তারপর বলল, রাতে ঘুম হয় না। কালিফস্ দিলাম। তাতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবার কথা, কিন্তু সমানে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভায়া আমার শুয়ে থাকে। কথাও বলে না, খায়ও না। তারপর ওআরস্ট অব অল, কাল থেকে পলাতক। কোথায় যে চলে গেল না বলে-কয়ে !

বীরু হঠাৎ বলল, চাকরির ব্যাপারটা একটু খোঁজ করলে হত না ? সেখানে কোনও গোলমাল ?

খগাদার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, ব্রিলিয়ান্ট ! সাধে কি বলি, তোমাদের মতো ছেলে হয় না।

বীরু আমাকে বলল, চল, এক্ষুনি ব্যাপারটা জেনে আসা যাক।

খগাদার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বীরু বেরিয়ে পড়ল সাইকেলে আমাকে ডাবল-ক্যারি করে।

সবজিমন্ডির পাশে মসজিদ, মসজিদের থেকে খানিকটা দূরে কাবুলি মিঞার কাবাবের দোকান, তার পাশে একটা ছোট দোকানঘর— সবুজের উপর সাদায় লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে, ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্স। কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কেরোসিন তেলের টিন দিয়ে তৈরি দরজাটাতে একটা মস্ত বড় তালা ঝুলছে।

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম সাইকেল থেকে নেমে।

ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্সের উল্টোদিকে একটা দর্জির দোকান। খয়েরি আর সাদা খোপ-খোপ লুঙ্গি আর বেগুনে কামিজ পরে মাথায় সাদা টুপি চড়ানো কালো চাপ-দাড়িওয়ালা দর্জি আপনমনে ঝটপট করে পা-মেশিনে রজাইয়ের ওয়াড় সেলাই করে যাচ্ছিল।

আমরা গিয়ে একটু কেশে দাঁড়ালাম।

দর্জি মুখ তুলে নিকেলের ফ্রেমের চশমার কাচের ফাঁক দিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল, ফরমাইয়ে।

বীরু বলল, খাস কাম কুছ নেহী। এই যে উল্টোদিকের অফিসটা, সেটা বন্ধ কেন ? তালা ঝুলছে কেন ?

দর্জি বলল, দফ্তর বন্ধ্ হ্যায়। উঠ্ গ্যায়া।

উঠে গেছে মানে ? আমরা শুধোলাম।

দর্জি বলল, জী হাঁ। তারপর ডান হাতের তিনখানা আঙুল বীরুর নাকের সামনে নেড়ে নেড়ে বলল, আপিস তো ছিল দুজনের— হেডবাবু গিরধারী পাণ্ডে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ভগা সরকার। সেদিন কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে অ্যাসিস্ট্যান্ট গিয়ে হেডবাবুর মাথায় হঠাৎ কাঠের রুলার দিয়ে মারল এক বাড়ি। সাথে সাথ্ মাথা ফট্। হেডবাবু হাসপাতালে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেরার। আপিস আর চালাবে কে ? কিওয়ারি বন্ধ্।

আমরা ফিরলাম। খগাদা উদ্গ্রীব হয়ে বসেছিলেন। বললেন, কী খবর ?

বীরু গম্ভীরমুখে বলল, আপিস উঠে গেছে। হেডবাবু হসপিটালে, অ্যাসিস্ট্যান্ট এবস্কন্ডিং।

খগাদা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে "মার্ডারার, মার্ডারার, কোথায় গেলি, কোথায় গেলি" বলেই দৌড়ে বারান্দার দিকে গেলেন, যেন ভগাদা বারান্দাতেই বসে আছেন।

খগাদা বারান্দাতে গিয়ে পৌঁছতেই ভগাদার ঠোঁটকাটা কাকাতুয়াটা খ্যান্‌খেনে গলায় বলে উঠল, হাইপারটেন্‌শান্। হাইপারটেন্‌শান্!

লাওয়ালঙের বাঘ

ঋজুদার সঙ্গে সীমারীয়ার ডাকবাংলোয় আজ রাতের মতো এসে উঠেছি। আমরা যাচ্ছিলাম কাড়গুতে, চাত্রার রাস্তায় ; কিন্তু কলকাতা থেকে একটানা জীপ চালিয়ে এসে গরমে সবাই কাবু হয়ে পড়েছিল বলে রাতের মতো এখানেই থাকা হবে বলে ঠিক করল ঋজুদা।

সবাই বলতে, ঋজুদা, অমৃতলাল আর আমি।

এখন রাত আটটা হবে। শুক্লপক্ষ। বাইরে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। চৌকিদার হ্যারিকেন জ্বালাবার তোড়জোড় করছিল, ঋজুদা বলল, তুমি বাবা আমাদের একটু খিচুড়ি আর ডিমভাজা বানিয়ে দাও। অমৃতলালও গিয়ে বাবুর্চিখানায় জুটেছে। আলুকা ভাত্তা বড় ভাল বানায় অমৃতলাল, ওর নানীর কাছ থেকে শিখেছিল। আলুসিদ্ধ, তার মধ্যে ঘি, কুচিকুচি কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে এমন করে রগড়ে রগড়ে মাখত যে, তার নাম শুনলেই আমার

জিভে জল আসত।

ঋজুদা ঝাঁকড়া সেগুনগাছের নীচের কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে নিজেই লাটাখাম্বাতে জল তুলে ঝপাং ঝপাং করে বালতি বালতি জল ঢেলে চান করছিল। চাঁদের-আলোর-বন্যা-বয়ে-যাওয়া বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে ছিলাম আমি একা। ঋজুদা বলেছিল, তোর আর রাতে চান করে দরকার নেই। কোলকাত্তীয়া বাবু, শেষে সর্দি-ফর্দি লাগিয়ে ঝামেলা বাধাবি।

সামনে লালমাটির পথটা চলে গেছে ডাইনে টুটিলাওয়া-বানদাগ হয়ে হাজারীবাগ শহরে। বাঁয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে গেলেই বাঘড়া মোড়। সেখান থেকে বাঁদিকে গেলে পালামো'র চাঁদোয়া—টোড়ি। ডানদিকে গেলে চাত্‌রা। এই সীমারীয়া থেকেই একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে চাত্‌রাতে। আরও একটা পথ টুটিলাওয়া আর সীমারীয়ার মাঝামাঝি মূল পথ থেকে বেরিয়ে গেছে লাওয়ালঙ্।

বাইরে নানারকম রাত-চরা পাখি ডাকছে। সকলের নাম জানি না আমি। ঋজুদা জানে। আমি শুধু টী-টী পাখির ডাক চিনি। আসবার সময় সন্ধে হওয়ার আগে জঙ্গলের মধ্যে যে জায়গাটায় জীপ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেখানে একদল চাতক পাখি ফটিক-জল-ফটিক-জল করে ঘুরে ঘুরে একটা পাতা-ঝরা ফুলে-ভরা শিমুল গাছের উপরে উড়ছিল। ঐ শিমুল গাছের সঙ্গে ওদের আত্মীয়তাটা কিসের তা বুঝতে পারিনি। আত্মীয়তা নিশ্চয়ই কিছু ছিল।

এরকম হঠাৎ-থামা, হঠাৎ-থাকা জায়গাগুলোর ভারী একটা আকর্ষণ আছে আমার কাছে। এরা যেন পাওয়ার হিসেবের মধ্যে ছিল না, এরা যেন ঝড়ের-আমের মতো ; পড়ে-পাওয়া। অথচ কত টুকরো টুকরো ভাললাগা এই সমস্ত হঠাৎ পাওয়ায় —ঝিনুকের মধ্যে নিটোল সুন্দর মুক্তোর মতো।

একটা হাওয়া ছেড়েছে বনের মধ্যে। শুকনো শালপাতা উড়িয়ে নিয়ে, গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে নালায়-টিলায় ; ঝোপে-ঝাড়ে। দূরের পাহাড়ে দাবানল লেগেছে। আলোর মালা জ্বলছে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে দেখা যায় পাহাড়ে পাহাড়ে মালা-বদল হচ্ছে। এমনি করে কী পাহাড়দের বিয়ে হয় ? কে জানে ?

হাওয়ায় হাওয়ায়, ঝরে-যাওয়া পাতায়, না-ঝরা পাতায় কত কী ফিসফিসানি উঠছে। চাঁদের আলোয় আর হাওয়ায়-কাঁপা ছায়ায় কত কী নাচ নাচছে এই রাত—সাদা-কালোয়, ছায়া-আলোয়। কত কী গাছ উঠছে। গাছেদের তো প্রাণ আছে, ওদের গানও আছে, কিন্তু ওদের ভাষা তো আমরা জানি না— কোনও স্কুলে তো ওদের ভাষা শেখায় না। কেন যে শেখায় না ! ভারী খারাপ লাগে ভাবলে !

ঋজুদা স্নান করছে তো করছেই। কতক্ষণ ধরে যে স্নান করে ঋজুদাটা ! যখন ঋজুদার স্নান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে— বাবুর্চিখানা থেকে অমৃতলালের

গুরুমুখী গানের নিচু গুনগুনানি ভেসে আসছে খিচুড়ি রান্নার শব্দ ও গন্ধের সঙ্গে, এমন সময় মশাল হাতে একদল লোককে আসতে দেখা গেল টুটিলাওয়ার দিক থেকে। লোকগুলো হাজারীবাগী—টাঁড়োয়া-গাড়োয়া ভাষায় উঁচু গলায় কী সব বলতে বলতে আসছিল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে, উৎকর্ণ হয়ে ঐ দিকে চেয়ে রইলাম।

লোকগুলো যখন বাংলোর সামনাসামনি এল, তখন ঋজুদা বারান্দায় এসে ওদের হিন্দীতে শুধোল, কী হয়েছে ভাই ?

ওরা সমস্বরে বলল, বড়কা বাঘোয়া।

ব্যাপারটা শোনা গেল।

বড় একটা বাঘ, গরু চরাতে-যাওয়া একটা পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেকে ঠিক সন্ধের আগে আগে একটা নালার মধ্যে ধরে নিয়ে গেছে।

গরুগুলো ভয়ে দৌড়ে গ্রামে ফিরতেই ওরা ব্যাপার বুঝতে পেরে ছেলেটার খোঁজে যায়। গাঁয়ের শিকারী তার গাদা বন্দুক নিয়ে জনাকুড়ি লোক সঙ্গে নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে রক্তের দাগ দেখে দেখে নালার কাছে যেতেই বাঘটা বিরাট গর্জন করে তেড়ে আসে নালার ভিতর থেকে। তাতে ঐ শিকারী গুলি করে। গুলি নাকি লাগেও বাঘের গায়ে—কিন্তু বাঘটা ঐ শিকারীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথাটা একেবারে তিলের নাড়ুর মতো চিবিয়ে, সকলের সামনে তাকে মেরে ফেলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার নালার অন্ধকারে ফিরে যায়।

ওরা বলল, ছেলেটাকে তো এতক্ষণে মেরে ফেলেছেই, খেয়েও ফেলেছে হয়তো। ওরা কী করবে ভেবে না পেয়ে এখানে ফরেস্টারবাবুকে খবর দিতে এসেছে।

ঋজুদা চুপ করে ওদের কথা শুনছিল। জনা-কয় লোক বাংলোর সামনে দাঁড়িয়েছিল, অন্যরা ফরেস্টারবাবুর বাংলোর দিকে চলে গেল।

আমার আর তর সইল না। আমি ঋজুদাকে দেখিয়ে ওদের বলে ফেললাম, কোই ডর নেহী—ঈ বাবু বহত্ জবরদস্ত শিকারী হ্যায়।

এ কথা বলতে-না-বলতেই ওদের মধ্যে কিছু লোক ফরেস্ট অফিসে দৌড়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ফরেস্টারবাবুকে সঙ্গে করে ফিরে এল সকলে। ওঁরা সকলে মিলে ঋজুদাকে বার বার অনুরোধ করলেন। ছেলেটা গ্রামের মাহাতোর ভাতিজা। মৃতদেহের কিছু অংশ না পেলে দাহ করা যাবে না এবং তাহলে ছেলেটার আত্মা চিরদিন নাকি জঙ্গলে-পাহাড়ে, টাঁড়ে-টাঁড়ে ঘুরে বেড়াবে, ভূত হয়ে যাবে।

আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। ঋজুদার সঙ্গে এ পর্যন্ত ওড়িশার জঙ্গলে অনেক ঘুরলেও কখনও এমন সদ্য মানুষমারা বাঘের সঙ্গে মোলাকাতের অভিজ্ঞতা হয়নি।

গোলমালটা হল ঋজুদাকে নিয়েই। ঋজুদা বলল, রুদ্র, তুমি যাবে না। তুমি আর অমৃতলাল দুজনেই থাকবে এখানে।

অমৃতলাল বলল, নেহী বাবু, ঈ ঠিক নেই হ্যায়। একেলা যানা নেই চাহিয়ে। দুস্‌রা বন্দুক রহনা জরুরী হ্যায়।

তখন ঋজুদা অধৈর্য গলায় অমৃতলালকে বলল, কিন্তু রুদ্র যে বড় ছেলেমানুষ— ওর কিছু হলে ওর বাবা-মাকে কী বলব আমি ?

আমি সকলের সামনেই ঋজুদার পা জড়িয়ে ধরে বললাম, ঋজুদা, আমাকে নিয়ে চলো, প্লিজ্। তুমি তো সঙ্গেই থাকবে। তোমার যা হবে আমারও তাই হবে।

ঋজুদা কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। বলল, তুই ভারী অবাধ্য হয়েছিস। তারপরই বলল, আচ্ছা চল।

জীপে যে-কজন লোক ধরে, তাদের নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, লাওয়ালঙের রাস্তায়। অমৃতলাল জীপ চালাচ্ছিল তখন। ঋজুদা ফোরফিফ্‌টি-ফোর হানড্রেড দোনলা রাইফেলটা নিয়েছিল। আমার হাতে দোনলা বারো বোরের বন্দুক। দুটো অ্যালফাম্যাকস্ এল-জি আর দুটো লেথাল্ বল নিয়েছি সঙ্গে।

গরমের দিন। জঙ্গল একেবারে পাতলা হয়ে গেছে পাতা ঝরে। বর্ষার শেষে বড় বড় গাছের নীচে নীচে যে-সব আগাছা, ঝোপ-ঝাড়, লতা-পাতা গজিয়ে ওঠে এবং শীতে যেগুলো ঘন হয়ে থাকে— যাদের ঋজুদা বলে 'আন্ডার গ্রোথ'— সে সব এখন একেবারেই নেই। জীপের আলোর দুপাশে প্রায় একশো-আশি ডিগ্রী চোখ চলে এখন।

একটা খরগোশ রাস্তা পেরুল ডানদিক থেকে বাঁদিকে। পর পর দুটো লুম্‌রির জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ দেখা গেল। একটু পরেই আমরা পথ ছেড়ে একটা ছোট পায়ে-চলা পথে ঢুকে গ্রামটাতে এসে পৌঁছলাম। জীপের আওয়াজ শুনেই লোকজন ঘরের বাইরে এল। জীপটা ওখানেই রেখে দেওয়া হল। তারপর গ্রামের যে মাহাতো, তাকে ঋজুদা বলল পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের।

যে শিকারীকে বাঘ মেরে ফেলেছে, তাকে খাটিয়ার উপর একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। মাটির দেওয়াল আর খাপরার চালের বাড়িগুলো থেকে মেয়ে ও বাচ্চাদের কান্না শোনা যাচ্ছিল। ঋজুদা সেই মৃতদেহের কাছে গিয়ে চাদর সরিয়ে লণ্ঠন দিয়ে কী যেন দেখল ভাল করে। তারপর ফিরে এসে বলল, চল্ রুদ্র।

গ্রামের লোকেদের যথাসম্ভব কম কথা বলতে ও আওয়াজ করতে অনুরোধ করে ঋজুদা আর আমি মাহাতোর সঙ্গে এগোলাম। উত্তেজনায় আমার গা দিয়ে তখনই দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছিল, হাতের তেলো ঘেমে যাচ্ছিল। বারবার

খাকি বুশ শার্টের গায়ে ঘাম মুছে নিচ্ছিলাম।

জঙ্গলের বেশির ভাগই শাল। মাঝে মাঝে আসন, কেঁদ, গনহার এসবও আছে। আমলকী গাছ আছে অনেক। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এক-এক ফালি চাষের জমি। হয়তো শীতে কিতারী, অড়হর, কুলথী বা গেঁহু লাগিয়েছিল। এখন কোনও চিহ্ন নেই তার। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে আছে।

আলো না-জ্বালিয়ে, আমরা নিঃশব্দে শুকনো পাতা না-মাড়িয়ে, পাথর এড়িয়ে হাঁটছি। বন্দুকে গুলি ভরে নিয়েছি। ঋজুদার কথামতো দু নলেই এল-জি পুরে নিয়েছি। খুব কাছাকাছি থেকে গুলি করতে হলে নাকি এল-জিই ভাল। ঋজুদাও রাইফেলের দু ব্যারেলে সফ্‌ট-নোজড্ বুলেট পুরে নিয়েছে। ঋজুদার রাইফেলের সঙ্গে একটা ক্ল্যাম্পে ছোট একটা টর্চ লাগানো আছে— ক্ল্যাম্পের সঙ্গে আটকানো একটা লোহার পাতে নিশানা নেবার সময় বাঁ-হাতের আঙুল ছোঁয়ালেই টর্চটা জ্বলে ওঠে। আমার বন্দুকে আলো নেই। এমন জ্যোৎস্নারাতে বন্দুক ছুঁড়তে আলো লাগে না। বন্দুক ছোঁড়া রাইফেল ছোঁড়ার চেয়ে অনেক সহজ।

কিছুদূর গিয়ে আমরা একটা উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে শান্ত উদোম উপত্যকা। দূরে পিউ-কাঁহা পিউ-কাঁহা করে রাতের বনে শিহর তুলে পাখি ডাকছে। কী চমৎকার সুন্দর পরিবেশ। ভাবাই যায় না যে, এই আলোর মধ্যের ছায়ার আড়ালে মৃত্যু লুকিয়ে আছে— অমন মর্মান্তিক মৃত্যু। দু'-দু'জন লোক আজ সন্ধে থেকে এখানে মারা গেছে, বলতে গেলে খুন হয়েছে, অথচ কী সুন্দর পাখি ডাকছে; হাওয়ায় মহুয়া আর করৌনজ্ ফুলের গন্ধ ভাসছে কী দারুণ।

মাহাতো আঙুল দিয়ে দূরে যে জায়গাটা থেকে বাঘ নালা ছেড়ে উঠে এসে শিকারীকে আক্রমণ করেছিল, সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিল। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, সামনে যে পিপুল গাছটা আছে, তাতে তুমি চড়ে বসে থাকো। আমরা ডানদিকে গিয়ে বাঘের যে-জায়গায় থাকার সম্ভাবনা, সে-জায়গা থেকে কম করে তিনশ গজ দূরে নালায় নামব।

তারপর আর কিছু না বলে ঋজুদা এগিয়ে চলল। পরক্ষণেই, দাঁড়িয়ে পড়ে, মাহাতোকে বলল, দিনের আলো ফোটার আগেও যদি আমরা না ফিরি, তাহলে অমৃতলালকে ও গাঁয়ের লোকদের নিয়ে আমাদের খুঁজতে এসো।

কথাটা শুনে মাহাতো খুব খুশি হল না, চাঁদের আলোয় তার মুখ দেখেই তা বোঝা গেল।

এরপর ঋজুদা আর আমি সেই চন্দ্রালোকিত উপত্যকায় দুটি ছায়ার মতো, নিঃশব্দে দূরের শুয়ে-থাকা ঘন-কালো ছায়ার মতো, নালাটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

ঋজুদা শুধু একবার ফিসফিস করে বলল, ভয় পেয়ে পিছন থেকে আমাকে

গুলি করিস না যেন। নালায় নেমে আমার পাশে পাশে হাঁটবি— পিছনে নয়। একটুও শব্দ না করে। প্রত্যেকটি পা ফেলার আগে কোথায় পা ফেলছিস, তা দেখে ফেলবি— এক পা এগোবার আগে সামনে ও চারপাশে ভাল করে দেখবি। কান খাড়া রাখবি, নালার মধ্যে চোখের চেয়ে কানের উপরই বেশি নির্ভর করতে হবে। নালার মধ্যে হয়তো অন্ধকার থাকবে। তোর বন্দুকে আলো থাকলে ভাল হত।

যাই হোক, তখন আর কিছু করার নেই। আশা করতে লাগলাম, পাতা-ঝরা গাছগুলোর ফাঁকফোঁক দিয়ে নালার মধ্যে কিছুটা আলো হয়তো চুঁইয়ে আসবে। গুলি খাক আর না-ই খাক, বাঘ যে নালার মধ্যেই থাকবে, এমন কোনও কথা নেই। যদি নালার মধ্যে থাকে, তাহলে নালার কোন্ জায়গায় থাকবে তারও স্থিরতা নেই। তা ঋজুদা ভাল করে জানে বলেই এত সাবধান হয়ে নালার প্রায় শেষ প্রান্তের দিকে আমরা এগোচ্ছি।

দেখতে দেখতে নালার মুখে চলে এলাম। শুকনো বালি, চাঁদের আলোয় ধবধব করছে। আমাকে হুঁশিয়ার থাকতে বলে ঋজুদা হাঁটু গেড়ে বসে নালার বালি পরীক্ষা করে দেখল। নালা থেকে যে বাঘ বেরিয়ে গেছে তেমন কোনও পায়ের চিহ্ন দেখা গেল না। খুব বড় একটা বাঘের পায়ের দাগ ছাড়াও শুয়োর, শজারু, কোট্‌রা হরিণ ইত্যাদির অনেক পায়ের দাগ দেখা গেল। বাঘ ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু এদিক দিয়ে বাইরে বেরোয়নি।

নালায় পৌঁছনোর আগে অবধি একটা টী-টী পাখি আমাদের মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে টিটির-টি—টি-টি-টি-টি করে ডাকতে ডাকতে সারা বনে আমাদের আগমন-বার্তা জানিয়ে দিল। আমার মন বলছিল, বাঘ একেবারে খবর পেয়ে তৈরি হয়েই থাকবে।

এবারে আমরা নালার মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

দুপাশে খাড়া পাড়। কোথাও বা খোয়াই, পিটিসের ঝোপ, আমলকীর পত্রশূন্য ডালে থোকা-থোকা আমলকী ধরে আছে। নালার মধ্যে মধ্যে একটা জলের ধারা বয়ে এসেছে ও-পাশ থেকে। কোথাও সে-জলে পায়ের পাতা ভেজে— কোথাও বা তাও নয়—শুধু বালি ভিজে রয়েছে।

কোনও সাড়াশব্দ নেই— শুধু একরকম কটকটে ঝিঁঝির একটানা ঝাঁ-ঝাঁ আওয়াজ ছাড়া।

একটা বাঁক নিলাম। ঋজুদা এক-এক গজ পথ যেতে পাঁচ মিনিট করে সময় নিচ্ছে।

যতই এগোতে লাগলাম, ততই জলের ধারাটা গভীর হতে লাগল। কোথাও কোথাও হাঁটু-সমান জল পাথরের গভীরে জমে আছে। তার মধ্যে ব্যাঙাচি, কালো কালো লম্বা গোঁফওয়ালা জলজ পোকা। আমাদের পায়ের শব্দের অনুরণনে একটা ছোট ব্যাঙ জলছড়া দিয়ে দৌড়ে গেল জলের মধ্যে।

যতই এগোচ্ছি, ততই নিস্তব্ধতা বাড়ছে। এত জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখলাম নালায় ঢোকার সময় বালিতে, কিন্তু কারও সঙ্গেই দেখা হল না এ পর্যন্ত। কোন্ মন্ত্রবলে তারা যেন সব উধাও হয়ে গেছে।

ঋজুদার কান চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। ঋজুদার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে বাঘ নালার মধ্যেই আছে। বন্দুকটা শুটিং-পজিশনে ধরে সেফ্‌টি-ক্যাচে বুড়ো আঙুল ছুঁইয়েই আছি আমি— যাতে প্রয়োজনে এক মুহূর্তের মধ্যে গুলি করতে পারি।

বোধহয় এক ঘণ্টা হয়ে গেছে আমরা নালাটার মধ্যে ঢুকেছি। এতক্ষণে বেশ অনেকখানি ভিতরে ঢুকে থাকব। নালার মধ্যেটাকে আলো-ছায়ার কাটাকুটি করা একটা ডোরাকাটা সতরঞ্জি বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ বুকের মধ্যে চমকে দিয়ে কাছ থেকে হুপ্-হুপ্-হুপ্-হুপ্ করে একসঙ্গে অনেকগুলো হনুমান ডেকে উঠল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে পঁচিশ গজ দূরের একটা বড় গাছের উপরের ডালে ডালে হনুমানদের নড়ে-চড়ে বসার আওয়াজ, ডালপালার আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদা আমার গায়ে হাত ছুঁইয়ে আমাকে নালার বাঁদিকের পাড়ের দিকে সরে আসতে ইশারা করল। আমি সরে আসতেই, আমার সামনে ছায়ার মধ্যে একটা বড় পাথরের উপর বসে, দু হাঁটুর উপরে রাইফেলটা রেখে সামনের দিকে চেয়ে রইল ঋজুদা তীক্ষ্ণ চোখে।

নালাটা সামনে একটা বাঁক নিয়েছে।

হনুমানদের হুপ্‌হাপ্ আওয়াজ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনে থেকে জল পড়ার আওয়াজ স্পষ্ট হল ; ঝরনার মতো। পাথরের উপর বোধহয় হাতখানেক উঁচু থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে, তারই শব্দ। শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু ঝরনাটা দেখা যাচ্ছিল না। ওটা বোধহয় বাঁকটার ও-পাশেই। এদিকে জলের স্রোতও বেশ জোর— প্রায় ছয় আঙুল মতো জল একটা হাত পাঁচেক চওড়া ধারায় বয়ে চলেছে।

এখানে ঋজুদা একেবারে স্থাণুর মতো বসে রইল সামনের দিকে চেয়ে। কী জানি, ঐ হনুমানদের হুপ্-হাপ্ শব্দের মধ্যে ঋজুদা কী শুনেছিল— কোন্ ভাষা। কিন্তু তার হাবভাব দেখে আমার মনে হল, বাঘটা ঐ নালার বাঁকেই যে কোনও মুহূর্তে দেখা দিতে পারে।

ঐভাবে কতক্ষণ কেটে গেল মনে নেই। আমার মনে হল, কয়েক ঘণ্টা, কিন্তু আসলে হয়তো পাঁচ মিনিটও নয়।

এখানে কেন বসে আছে, একথা আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছি, এমন সময় জলের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। এক মুহূর্ত কান খাড়া করে শুনেই, ভেজা বালিতে হামাগুড়ি দিয়ে নালার বাঁকের দিকে এগোতে লাগল ঋজুদা। শব্দটা আমিও শুনেছিলাম। কুকুরে জল খেলে যেমন চাক্-চাক্-চাক্

শব্দ হয় তেমনই শব্দ, কিন্তু অনেক জোর শব্দ।

শব্দটা তখনও হচ্ছিল। বাঘটা নিশ্চয়ই ঝরনার জল খাচ্ছিল।

বাঁকটা তখনও হাত-দশেক দূরে। ঋজুদা জোরে এগিয়ে চলেছে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে, রাইফেলটাকে হাতের উপর নিয়ে। আমার বুকের মধ্যে তখন একটা রেলগাড়ি চলতে শুরু করেছে— এত ধক্‌ধক্ করছে বুকটা, ঘামে সমস্ত শরীর, মাথার চুল সব ভিজে গেছে। আমার তখন খালি মনে হচ্ছিল, ঋজুদা দেখতে পাওয়ার আগে তার জল-খাওয়া শেষ করে চলে যাবে না তো বাঘটা ?

হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ, আমার বুকের স্পন্দন থেমে গেল।

আমার সামনে ঋজুদা বালিতে শুয়ে পড়েছে— প্রোন-পজিশনে দু হাতে রাইফেলটা ধরে নিশানা নিচ্ছে।

ততক্ষণে আমি ঋজুদার পাশে পৌঁছে গেছি। পৌঁছেই যে দৃশ্য দেখলাম তা সারা জীবন চোখে আঁকা থাকবে।

ঝরনাটার উপরে ডানদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বাঘটা জল খাচ্ছে। চাঁদের আলোয় তার মাথা, বুক সব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পেছনের দিকটা অন্ধকার। তার প্রকাণ্ড মাথাটা জলের উপর একটা বিরাট পাথর বলে মনে হচ্ছে। আমিও যেই শুয়ে পড়ে বন্দুকটা কাঁধে তুলতে যাব, ঠিক এমনি সময়ে বুক-পকেটে রাখা বুলেটটার সঙ্গে বন্দুকের কুঁদোর ঠোকা লাগতেই খুট করে একটু শব্দ হল। তাতেই বাঘ এক ঝটকায় মাথা তুলে এদিকে তাকাল। বাঘটা কানে-তালা-লাগানো গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাকে গুটিয়ে যেন একটা বলের মতো করে ফেলল এবং মুহূর্তের মধ্যে সোজা আমাদের দিকে লাফাল। লাফাল না বলে উড়ে এল, বলা ভাল। আমার কানের পাশে ঋজুদার ফোরফিফটি-ফোরহানড্রেড রাইফেলের আওয়াজে মনে হল বাজ পড়ল। বাঘের গর্জন, হনুমানদের চেঁচামেচি, দাপাদাপি, জঙলের গভীরে অদৃশ্য নানা পাখির চেঁচামেচিতে এবং রাইফেলের গুমগুমানিতে যেন আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দেখলাম, আলো-ছায়ায় মেশা একটা অন্ধকারের স্তূপ উড়ে আসছে আমাদের দিকে শূন্য থেকে, তার সামনে প্রসারিত করা— নখ সমেত প্রকাণ্ড থাবা দুটি। বোধহয় ঘোরের মধ্যেই আমি একই সঙ্গে দুটো ট্রিগার টেনে দিয়েছিলাম বন্দুকের। কিন্তু গুলি লাগল কি না-লাগল কিছু বোঝা গেল না— বাঘটা জলের মধ্যে ঝপাং করে পড়ল, প্রায় আমার নাকের সামনে। আমার মনে হল, থাবাটা একবার তুলে বাঘটা আমার মাথায় এক থাপ্পড় মারল বুঝি। আমি তখনও শুয়েই ছিলাম, দুহাতে বন্দুকটাকে সামনে ধরে।

যেন ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে, যেন অনেক দূর থেকে ঋজুদা আমাকে ডাকল, 'রুদ্র, এই রুদ্র !'

তাকিয়ে দেখলাম, আমার পাশে ঋজুদা বাঘটার ঘাড়ের দিকে রাইফেলের

নল ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটাও যেন একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, সারা শরীর নড়ে উঠল, জল ছপছপ করে উঠল, ডন দেবার মতো উঠে দাঁড়াতে গেল বাঘটা। ঋজুদা রাইফেলটা কোমরে ধরা অবস্থাতেই বাঁ-ব্যারেল থেকে আবার গুলি করল। বাঘটার মাথাটা ঝপাং করে জলে পড়ল।

একটাও কথা না বলে ঋজুদা ঝরনার কাছ দিয়ে নালা পেরিয়ে বাইরের উপত্যকায় এল। এসে ফাঁকা জায়গা দেখে একটা বড় পাথরের উপরে বসে পকেট থেকে পাইপটা বের করে ধরাল। বলল, গাঁয়ের শিকারীর নিশানা ফসকে গিয়েছিল। তার গুলি সত্যিই বাঘের পায়ে লেগে থাকলে ব্যাপারটা এত সহজে শেষ হত না। দূরে দেখা গেল— ঝাঁকড়া পিপুল গাছের দিক থেকে একটা লোক আমাদের দিকে জ্যোৎস্নায় ভেসে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে। মাহাতো।

হঠাৎ ঋজুদা যেন কেমন উদাস হয়ে গেল।

পিউ-কাঁহা পাখিটা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার ডাকতে লাগল দূর থেকে। বাঘ মরে গেছে— এ-খবরে আনন্দ কী দুঃখ প্রকাশ করল জানি না, কিন্তু চতুর্দিকের বন-পাহাড়ে আবার নানারকম পশুপাখির ডাক শোনা যেতে লাগল।

আমি শুধোলাম, ঋজুদা, ছেলেটা ?

ঋজুদা পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কিছু করার নেই। ওর বাবা-দাদারা আসবে— যাদের আপনজন, তারাই নিয়ে যাবে। কী-ই বা করার আছে আমাদের ?

আমি শুধোলাম, কোথায় আছে ?

ঋজুদা বলল, এমনভাবে বলল, যেন নিজে দেখেছে, ঐ ঝরনার ওপাশে, বেশ কিছুটা ও-পাশে, নালার মধ্যেই পড়ে আছে।

আমিও পাথরটার উপরে বসে পড়ে খুশি গলায় বললাম, যাক্, বাঘটাকে মেরেছ ভালই হয়েছে। বদমাইস বাঘ।

ঋজুদা শুকনো হাসি হাসল।

বলল, আহা, কী দারুণ বাঘটা ! বেচারা !

তারপরই বলল, উপায় ছিল না বলেই হয়তো ও ছেলেটাকে মেরেছিল। জন্তু-জানোয়ারদের ভালবাসিস, বুঝলি, রুদ্র। মানুষকে মানুষ তো ভালবাসেই। কিন্তু ওদের ভালবাসতে পারে, ভালবাসতে জানে, খুবই কম মানুষ।

ঋজুদার সঙ্গে সিমলিপালে

ভর-দুপুর। টাইগার প্রোজেক্টের ডিরেকটর সান্যাল সাহেব, যশীপুরের খৈরী-খ্যাত চৌধুরী সাহেব ও আরও একজন দক্ষিণ ভারতীয় একোলজিস্ট ওড়িশার ন্যাশনাল পার্ক সিমলিপালের পাহাড়ের মধ্যে বড়াকামড়ার ছোট বাংলোর বারান্দায় বসে লাঞ্চ খাচ্ছিলেন।

ঋজুদা তাঁদের টা-টা করে বেরিয়ে পড়লেন। জেনাবিলের দিকে। জীপের মুখটা ঘুরল, কিন্তু ট্রেলারটা ঘুরল না। ট্রেলারগুলো বড়ই বেয়াদব হয়। জীপ ডাইনে ঘুরলে বাঁয়ে ঘোরে, বাঁয়ে ঘুরলে ডাইনে। আমি আর বাচ্চু হ্যাট্ হ্যাট্ করে হালের বলদ তাড়াবার মতো করে, নেমে পড়ে হাত দিয়ে পা দিয়ে ট্রেলারকে বাধ্য করালাম জীপের কথা শুনতে।

তারপর বড়াকামড়ার বাংলোর গড়ের উপরের সাঁকো পেরিয়ে এসে জীপ মুখ ঘোরাল ডানদিকে।

এই সিমলিপালের জঙ্গলে ঋজুদা একা আসেননি। সঙ্গে ঋজুদার জঙ্গলতুতো দাদা কানুদা এবং তার জঙ্গল-পাগল স্ত্রী ও শালী, খুকুদি ও মণিদি। সঙ্গে দিদি ও জামাইবাবু-অন্তপ্রাণ বাচ্চু।

এত লোক সঙ্গে থাকায় আমি ঋজুদাকে মোটেই একা পাচ্ছি না। আমাকে এইসব নতুন লোকেরা মোটেই পাত্তাও দিচ্ছেন না। মন-মরা হয়ে ট্রেলারে মালপত্রের উপরে বসে আছি। "খিদ্‌মদ্‌গার" বাচ্চু এবং "ইউসলেস্" আমার জায়গা ডাঁই-করা মালপত্র-ভরা ট্রেলারের উপর।

পাহাড়ী রাস্তা। জীপ যখন উৎরাইয়ে নামে, তখন আমরা এ-ওর ঘাড়ের উপর পড়ে একেবারে ট্রেলারের সামনে এসে পড়ে জীপের চাকার তলায় যাই আর কী ! আবার জীপ যেই চড়াইয়ে ওঠে, তখন আবার সড়াৎ করে ট্রেলারের পেছনে চলে গিয়ে গড়িয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ো-পড়ো, পাথরে। অনেক পাপ করলে মানুষকে জীপের ট্রেলারে চড়তে হয়।

বড়াকামড়ার বাংলোর সামনেই শবরদের একটা বস্তি। সার সার খড়ের ঘর, নদীর ওপারে ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের গায়ে। বর্ষার বাঁক-নেওয়া ভরন্ত পাহাড়ী নদীর পাশে, নরম সবুজ প্রান্তরের উপর। দূর থেকে যেন পাণ্ডবদের বনবাসের পর্ণকুটির বলেই মনে হয়। এখন চৈত্রের শেষ। লক্ষ লক্ষ শালগাছে মঞ্জরী এসেছে। মেঘলা আকাশ। মেঘলা আকাশের পটভূমিতে পুষ্পভারাবনত শালগাছগুলিকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, তা বোঝাবার মতো ভাষা আমার নেই। কাল সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ ভোরে থেমে গেছে। বৃষ্টির পর লাল মাটির কাঁচা রাস্তা, পুষ্পশোভিত কচি কলাপাতা-রঙা শালবন, ওয়াশের কাজের মতো পাহাড়শ্রেণীর নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে ট্রেলারে চড়ে জঙ্গলে ঘোরার মারাত্মক ঝুঁকি ও শারীরিক কষ্টও যেন ভুলে গেলাম।

হঠাৎ মণিদি বললেন, হাতি, হাতি !

কানুদা বললেন, দিন-দুপুরে হাতি না ছাই। স্বপ্ন দেখছিস !

ওমা ! চেয়ে দেখি, সত্যিই হাতি। দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতি ঝাঁটি-জঙ্গলে ভরা ছোট টিলা পেরিয়ে ওপারের উঁচু টিলাতে যাচ্ছে হেলতে-হেলতে দুলতে-দুলতে আর তাদের পায়ে পায়ে একটা গাবলুগুবলু বাচ্চা। গোলগাল, গোবর-গণেশ, একহাত শুঁড়টাকে নাড়াতে নাড়াতে চলেছে।

বাচ্চু একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, আমরা সকলেই। হঠাৎ বাচ্চু বলল, রুদ্র, হাতির মাংস কখনও খেয়েছ ? বোধ হয় পাঁঠার চেয়েও নরম হবে। দৌড়ে গিয়ে ধরি ?

বলেই, কারও পারমিশানের অপেক্ষা না করে ট্রেলার থেকে এক লাফে নেমে হাতিদের দিকে দৌড় লাগাল ও।

জীপের মধ্যে সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, কী হল ? কী হল ?

কী হল, তা জানতে এতটুকু উৎসাহ না দেখিয়ে কানুদা উৎসারিত কণ্ঠে বললেন, আমার ক্যামেরা ! ক্যামেরা ! বলেই সামনের সীটে বসে পেছন দিকে জোরে গলফ্-খেলা তাগড়া হাত ছুঁড়লেন।

হাতটা এসে লাগল মণিদির নাকে।

মণিদি বললেন, উঁ বাঁবাঁ-রেঁ।

ঋজুদা চুপ করে ছিলেন, পাইপের ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ হচ্ছিল।

কানুদা শালীকে ধমকে বললেন, মণি, ক্যামেরা কোথায় ? শিগগির দাও। এখন ন্যাকামি করো না।

ন্যাঁকামি নাঁ। নেঁই। বলেই মণিদি নাকী সুরে কেঁদে উঠলেন।

ঠিক সেই সময় কানুদা বললেন, নেই মানে ? ইয়ার্কি পেয়েছ ?

আমি ঘোড়ার পিঠে বসার মতো করে ট্রেলারের দুদিকে দুপা ছড়িয়ে দিয়ে বসে বাচ্চুর কার্যকলাপ রিলে করছিলাম।

বললাম, এইবার সেরেছে ! সর্বনাশ।

সকলে চেয়ে দেখলেন, বড় হাতিটা বাচ্চুর দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাচ্চু নির্বিকার। ও হাতির বাচ্চার রোস্ট্ খাবেই।

কানুদা আবার বললেন, মণি, ক্যামেরা !

মণিদি বললেন, ডাঁলমুঁটের ঠোঁঙার মঁধ্যে রেঁখেছিলাম। ডাঁলমুটের ঠোঁঙাটা কাঁঠের বাঁক্সে। কাঁঠের বাঁক্সটা ট্রেঁলারে।

কানুদা একটা চাপা কিন্তু তীব্র ধমক দিলেন মণিদিকে। সংক্ষিপ্তসার— ইডিয়ট্।

মণিদি ভ্যাঁ-অ্যা করে কেঁদে দিলেন।

ওদিকে হাতি ডেকে উঠল, প্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা। ডেকেই, শুঁড় তুলে ডান পায়ে শূন্যে ফুটবলে লাথি মেরে এগিয়ে এল। শর্টস্পরা ও হাওয়াইয়ান

চপ্পল-পরা বাচ্চু দৌড়ে পালিয়ে আসতে গিয়ে একটা হোঁচট খেয়ে পড়ল ধবপাস্ করে। তারপর উঠে দৌড়ে এসেই দূর থেকে লং-জাম্প দিয়ে সোজা এসে ট্রেলারে পড়ল। প্রায় আমার ঘাড়ে। ও-ও ধ্বপ্ করে পড়ল, কানুদাও বললেন, গেল !

বাচ্চু লজ্জিত হয়ে পেছনে না তাকিয়েই বলল, কী গেল ? হাতি ? চলে গেল ?

তারপর সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার একপাটি চপ্পলও !

মণিদি বললেন, নাঁ-আঁ-আঁ। বোঁধ হঁয় ভেঙেঁ গেঁল। কাঁনুদার ক্যামেঁরা, উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ—।

কানুদা আবার বললেন, ইডিয়ট্।

ঋজুদা জীপটা জোরে চালিয়ে দিয়ে বলল, কে ? বাচ্চু, না মণিদি ?

দুজনেই। কানুদা রেগে বললেন।

এরপর জীপের আরোহীরা নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে মণিদির নাক টানার শব্দ।

কিন্তু রাস্তার দৃশ্যের তুলনা নেই। কানুদার মতো ঋজুদা ক্যামেরাতে বিশ্বাস করে না। চোখের টু-পয়েন্ট লেন্সে এইসব নিসর্গ-ছবি তুলে নিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যের অন্ধকার ল্যাবরেটরিতে লুকিয়ে রেখে দেয় অবচেতনের ভাঁড়ারে। যখন যেমন দরকার পড়ে, তখন তেমন সেই সব মুহূর্তের, দৃশ্যের, পরিবেশের শব্দ, গন্ধ, রূপের সামগ্রিক চেহারাটা তার কলমের মুখ থেকে সাদা পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মস্তিষ্ক যা পারে, যা ধরে রাখে, পৃথিবীর কোনও ক্যামেরা বা টেপ-রেকর্ডারই তা পারে না। মানুষ যেদিন গন্ধ-ধরা যন্ত্রও বের করবে— সেদিনও পারবে না।

পথের বাঁকে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে-আসা বুনো চাঁপার গন্ধ বা মেঘলা আকাশের মৃদু-মৃদু হাওয়ায় আলতো হয়ে ভাসতে-থাকা শালফুলের গন্ধকে কি কোনও যন্ত্র ধরতে পারে ?

আমরা ময়ূরভঞ্জের রাজার শিকারের বাংলো ভঞ্জবাসার পথ ছেড়ে এসেছি। পথটা বড়াকামড়া বাংলো থেকে নদী পেরিয়ে লাল মাটির মালিমা মেখে ছুটে গেছে সবুজ জঙ্গলের গভীরে। গতকাল আমরা রাজার বাড়ি চাহালাতে ছিলাম। চাহালা নামটার একটা ইতিহাস আছে। এখানে রাজা প্রত্যেকবার শিকারে আসতেন। একবার হাঁকা শিকারের সময় রাজা এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা অনেক জানোয়ার মারলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল শিলাবৃষ্টি। সে কী শিলাবৃষ্টি ! রাজার ক'জন বন্ধু মারা গেলেন, মারা গেল অনেক হাঁকাওয়ালা। রাজাও নাকি আহত হয়েছিলেন। লোকে বলতে লাগল যে, ভগবানের আসন টলে গেল। মরণোন্মুখ ও আহত পশুপাখির কান্নায় ও চিৎকারে ভগবানের আসন টলে গেছিল সেদিন। সেই থেকে নাম চাহালা। সেই দিন থেকে

চাহালাতে শিকার বন্ধ। এমনকী, গাছ পর্যন্ত কাটা হত না রাজার আমলে। এখনও অনেক বনবিভাগের অফিসার সেকথা মেনে চলেন। বাংলোর হাতায় একটা পিয়াশাল গাছ আছে কুয়োয় যাওয়ার পথে, তার চারদিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রেখেছেন রেঞ্জার মিশ্রবাবু। পাছে ভুল করে গাছটার কেউ ক্ষতি করে।

এখানে প্রকৃতির পুত্র-কন্যাদের উপর বিন্দুমাত্র অন্যায় হলে আবারও ভগবানের আসন টলতে পারে। সকলেই এই ভয় বুকে নিয়ে বাঁচেন ওখানে।

চাহালা বেশ উঁচু। গরমের দিনেও ঠাণ্ডা। অনেকগুলো ইউক্যালিপটাস গাছ আছে হাতার মধ্যে, বৃত্তাকারে লাগানো। বসন্ত-সকালের সোনার রোদ যখন ইউক্যালিপটাসের মসৃণ পাতায় চমকাতে থাকে, সুনীল আকাশের নীচে তখন নীলকণ্ঠ পাখি বুকের মধ্যে চমক তুলে ডেকে ডেকে ওড়ে। টিয়ার ঝাঁক শিহর তুলে একদল ছোট্ট সবুজ জেট-প্লেনের মতো ছুটে যায় নক্ষত্র জয়ের জন্য নীলোৎপল আকাশে।

একটা পথ বাংলোর ডাইনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে হলদিয়ার দিকে ; বারো কিলোমিটার। অন্য পথ, কাইরাকাচার দিকে। এই দুজায়গায়ই বনবিভাগের ছোট্ট মাটির ঘর আছে। খড়ে-ছাওয়া বাংলো। তার চারপাশে হাতি যাতে না আসতে পারে, সেজন্যে গভীর গড় কাটা। ছোট্ট নিকোনো মাটির উঠোন। ছোট্ট বারান্দা। স্বপ্নে দেখা ছবির মতো। পাশেই ঝরনা। বড় বড় গাছ ঝুঁকে পড়েছে চারধার থেকে। মাটির উঠোনে টুপটাপ্ পাতা পড়ে ঝরে ঝরে। নির্জন দুপুরে কাঁচাপোকা ওড়ে বুঁ—বুঁবুঁ—বুঁ-ই-ই-ই আওয়াজ করে। জংলী হাইবিস্কাস্-এর সরু ডালে বসে নানারঙা মৌটুসী পাখি শিস দেয়। দূর থেকে হাতির দলের বৃংহণ ভেসে আসে, কোটরা হরিণ ডেকে ওঠে ব্বাক্, ব্বাক্, ব্বাক্ করে। সেই উদাত্ত আওয়াজ অনুরণিত হয় পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে-বনে। উঁচু গাছের ডাল থেকে অর্কিড দোলে মহুর খেয়ালী হাওয়ায়। গন্ধ ওড়ে।

চাহালা থেকে আরও একটা রাস্তা গেছে ন-আনা হয়ে, বড়াই পানি জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে। যে প্রপাত থেকে বুড়াবালাম্ নদীর সৃষ্টি। তারপর পৌঁছেছে গিয়ে ধুধরুচম্পাতে। কী দারুণ নামটা, না ? ধুধরুচম্পা। এখানে আরও সব সুন্দর সুন্দর নামের জায়গা আছে। যেমন বাছুরিচরা। ধুধরুচম্পাতে পৌঁছলে মনে হয় খাসীয়া পাহাড়ের কোনও নিভৃত জায়গায় এসেছি, অথবা কুমায়ুনের চিড় আর চিড়। শুধু চিড়ের বন। ময়ূরভঞ্জের রাজা বহু বহু বছর আগে এই উঁচু মালভূমিতে পাইন গাছ এনে লাগিয়েছিলেন। ঘন গহন পাইন বন। লোক নেই, জন নেই, দোকান নেই, শুধু বন আর বন। হাওয়া ওঠে যখন পাইনের বনে, তখন এমন এক মর্মরধ্বনি ওঠে যে কী বলব ! পাইনের গন্ধ ভাসে হাওয়ায়। চিড়ের ফলগুলো ঝরা চিড়পাতার মখমল গালচের উপরে নিঃশব্দে গড়িয়ে যায়। গা শিরশির করে ভাল-লাগায়। তার সঙ্গে মিশে যায় কত না নাম-জানা এবং না জানা ফুলের গন্ধ।

প্রত্যেক জঙ্গলের গায়েরই একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। প্রত্যেক মানুষের গায়ের গন্ধের মতো। গন্ধ ঋতুতে ঋতুতে বদলায়। যেমন বদলায় শব্দ ; যেমন বদলায় রূপ। চৈত্রের হাওয়ায় বনের বুকে যে কথা জাগে, সে কথার সঙ্গে শ্রাবণের কথা বা মাঘের কথার কত তফাত ! সে রূপেরই বা কত তফাত ! যার চোখ আছে, সে দেখে ; যার কান আছে, সেই শোনে ; যার হৃদয় আছে, সেই শুধু হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করে।

অনেকেই জঙ্গলে যান, হৈ-হৈ করেন, পিকনিক করে চলে আসেন, কিন্তু জঙ্গল তাঁদের জন্যে নয়। পিকনিক করার অনেক জায়গা আছে। জঙ্গলে গেলে নিজেরা কথা না বলে জঙ্গলের কী বলার আছে তা শুনতে হয়।

ন-আনা জায়গটার নামটাও ভারী মজার, তাই না ? এর একটা ইতিহাস আছে। রাজার খাজনা ছিল এখানে ন-আনা। তাই জায়গাটার নাম ন-আনা।

ন-আনা জায়গাটাও ভারী সুন্দর। ধুধরুচম্পা বা জেনাবিলের মতো এখানকার বাংলো কাঠের দোতলা নয়। পাকা বাংলো। চাহালাতেও। বাংলোটা একটা টিলার মাথায়— বহুদূর চোখ যায়। অনেকখানি জায়গা জঙ্গল কেটে ফাঁকা করা আছে। পাহাড়ী নদী গেছে এঁকেবেঁকে। ধু-ধু উদোম টাঁড়— কিন্তু রুক্ষ নয়।

এই চৈত্রশেষের বৃষ্টিতেও চারিদিক সতেজ সবুজ দেখাচ্ছে। আমরা যখন ন-আনায় যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের সঙ্গে একজন গোন্দ্ দম্পতির দেখা হয়ে গেছিল। তীর-ধনুক হাতে নিয়ে চলেছিল কালো ছিপছিপে বাবরি চুলের ছেলেটি আর হলুদ রঙে ছোপানো শাড়ি পরা মেয়েটি। মেঘলা আকাশের নীচে।

কানুদাকে শুধোলেন ঋজুদা, রাতে কোথায় থাকা হবে ?

জেনাবিলে। কানুদা বললেন।

বাচ্চু বলল, এই সেরেছে !

আমি বললাম, কেন ? অসুবিধা কিসের ?

ও বলল, না। পরে বলব।

দেখতে দেখতে আমরা দেও নদীতে এসে পড়লাম। বড় বড় মাছ আছে নদীটাতে। একটা দহের মতো হয়েছে। বর্ষার লাল মাটি-ধোওয়া ঘোলা জল ভরে রয়েছে। কানায়-কানায়।

হঠাৎ বাচ্চু আমাকে বলল, কানায় কানায় ইংরিজী কী ? আমি অনেক ভাবলাম। তারপর বললাম, জানি না।

কানুদা বললেন, মণি, নাক কেমন ?

মণিদি বললেন, ভাঁল। একটু রঁক্ত বেঁরিয়েছে।

খুকুদি বললেন, তোর একটুতেই বাড়াবাড়ি।

মণিদি বললেন, হুঁ, তোঁর নিজেঁর বঁর কিঁনা, হুঁ··· !

ঋজুদা বললেন, ওঁ মণিপদ্মে হুম্।

কানুদা বললেন, বাঁদিকে নয় ; ডানদিকে।

ভুল করে ঋজুদা বাঁদিকে চলে যাচ্ছিল। কানুদা স্টীয়ারিং ডানদিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

দেও নদী পেরিয়ে আমরা দেবস্থলীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। জনমানব নেই, লোকালয় নেই— জঙ্গল আর জঙ্গল। মাইলের পর মাইল থমথমে নিস্তব্ধতা। দেবস্থলীতে একটা ছোট্ট খড়ের ঘর— চারধারে গড় কাটা, হাতির জন্যে। টাইগার প্রোজেক্টের বাংলো। কোনও ফরেস্ট গার্ড থাকেন বোধ হয়। এখন কাউকে দেখলাম না।

বাচ্চু বলল, রুদ্র, তুই কখনও বাঘের মাংস খেয়েছিস ?

আমি বললাম, না। তবে প্রায় সব জানোয়ারেরই খেয়েছি, এক গাধা ছাড়া।

বাচ্চু বলল, কাক কখনও কাকের মাংস খায় ?

আমি বললাম, কী বললি ?

বলতেই সামনে থেকে ওঁরা সকলে হেসে উঠলেন।

আমার কান লাল হয়ে উঠল। এই জন্যেই অল্প-চেনা লোকদের সঙ্গে আসতেই চাই না কোথাও। ঋজুদাটা আর মেশার লোক পেল না। ভাল লাগে না।

দূর থেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের সমান প্রান্তরে ছবির মতো জেনাবিল গ্রামটা চোখে পড়ল। একটা হাতির কঙ্কাল পড়ে আছে। দুটো হাতি নাকি লড়াই করেছিল এখানে, সিমলিপালের রিপোর্টার কানুদা বললেন।

মণিদি বললেন, নাঁ। লঁড়াই না। আঁদর।

বাচ্চু বলল, বাঁদর।

কানুদা বললেন, কোথায় ?

ঋজুদা বললেন, ট্রেলারে।

অনেকগুলো বাঁদর পথ পেরিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে গেল।

কানুদা বললেন, পারফেক্ট হেলথ্।

জেনাবিলের কাঠের বাংলোটা হাতিরা ধাক্কাধাক্কি করে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। বাংলোটা হেলে গেছে। বড় বড় কাঠের গুঁড়িগুলোকে সোজা করে বসাবার জন্যে এবং পাশে পাশে ঠেকনো দেওয়ার জন্যে বিরাট বিরাট গর্ত খোঁড়া হয়েছে। বাংলো পুরোপুরি সারাবার আগে বহু লোকের যে পা ভাঙবে, মাথা ফাটবে এই গর্তে পড়ে, তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলোটার সব ভাল। কিন্তু বাথরুম নেই। কোনও ফার্নিচারও নেই। একটা চেয়ার পর্যন্ত নয়। মাটিতে শোওয়া, মাটিতে বসা। নীচে গার্ডের ঘরে রান্না করা। বেশ দূরের ঝরনাতে চান, হাত-মুখ ধোওয়া। সিমলিপালের

বেশির ভাগ বাংলোতেই রান্নাবান্না সব নিজেদেরই করতে হয়। সেজন্যে অসুবিধা নেই। কিন্তু বাঘ-হাতির জঙ্গলে রাত-বিরেতে প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিতে জঙ্গলে যাওয়া একটু অসুবিধের !

বাংলোয় পৌঁছে খুকুদি বললেন, মণি, তাড়াতাড়ি স্টোভটা বের কর। চা বানাই। তারপর খিচুড়ির বন্দোবস্ত করে বেরিয়ে পড়র এক চক্কর। সন্ধের মুখে-মুখেই তো জানোয়ার বেরোয়।

তারপরই আবার বললেন, মুগের ডাল আছে ?

ঋজুদা এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এখন জীপ থেকে নেমে গার্ডের ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে পাইপে নতুন করে তামাক ভরতে ভরতে বলল, খুকুদি, তাড়াতাড়ি চা।

চা খেয়ে খেয়ে খুকুদি ডিসপেপ্টিক। ঋজুদার মতো চা-ভক্ত লোক পেয়ে খুশি।

মণিদি স্টোভ বের করলেন। খুকুদি বললেন, মুগের ডাল দিয়ে খিচুড়িটা ভাল করে রাঁধতে হবে রাতে। সকালবেলা ভাল হয়নি।

বাচ্চু আতঙ্কিত গলায় বলল, আবারও খিচুড়ি ?

খুকুদি বললেন, না তো কী ! এই জঙ্গলে তোমার জন্যে বিরিয়ানি পাব কোত্থেকে ?

বাচ্চু বলল, না, তা বলছি না। মানে, একটু অসুবিধা ছিল। তারপরই বলল, ওষুধের বাক্সে কি কিছু আছে ?

ও ! তোর বুঝি পেট খারাপ হয়েছে ? খুকুদি বললেন।

বাচ্চু বলল, দশদিন তো হল এবেলা খিচুড়ি, ওবেলা খিচুড়ি। তারপর চারধারের জঙ্গলে চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলল, আমি নেই। যা খেয়েছি সকালে, অনেক খেয়েছি। আর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে নেই।

আমি বললাম, ভয় কিসের ? যেদিকে তাকাবি, সেদিকেই তো উদার, উন্মুক্ত।

বাচ্চু রেগে বলল, তুই যা না, যতবার খুশি।

মণিদি বললেন, বাঁদর।

আমি ও বাচ্চু দুজনেই একসঙ্গে তাকালাম। তারপর বুঝলাম যে আমরা নই।

একটা বড় বাঁদর গার্ডের ঘরের পাশের গাছে বসে আছে। তাড়াতাড়ি করে চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একটা বড় চক্কর ঘুরে আসবার জন্যে— জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে জীপের ট্রেলার খুলে রেখে। জেনাবিল থেকে ধুধুরুচম্পা যাওয়ার এই স্বল্প ব্যবহৃত পথটাতে যে কত জীবজন্তু দেখেছিলাম আমরা আসার সময়, তা বলার নয় ; দিনের বেলা দলে দলে হাতি, ময়ূর, হিমালয়ান স্কুইরেল, বাঁদর, বার্কিং ডিয়ার।

প্রায় পাঁচ কিলোমিটার মতো গেছি, একদল বুনো কুকুর লাফাতে লাফাতে রাস্তা পেরুল। মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করছিল ওরা।

ঋজুদা বলল, বুনো কুকুর এসেছে যখন, তখন এখানে এখন কিছু দেখা যাবে না।

কানুদা বললেন, চলোই না একটু ভিতরে।

আসন্ন সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে ময়ূর ডাকছে, মুরগী ডাকছে, বাঁদর হুপ্-হুপ্-হুপ্-হুপ্ করে উঠছে গভীর জঙ্গল থেকে। হাতির দল দূর দিয়ে দিনের শেষে ঘুমের দেশে চলেছে সারি বেঁধে, গায়ে লাল মাটি মেখে। মনে হয় স্বপ্ন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না সত্যি বলে।

হঠাৎ ঋজুদা জীপটা হল্ট্ করিয়ে দিয়ে বলল, মামা!

বাচ্চু বলল, কার মামা?

খুকুদির লম্বা হাতটা জীপের পেছনের আধো-অন্ধকারে এসে বাচ্চুর কানে আঠা হয়ে সেঁটে গেল। খুকুদির হাতটা বাচ্চুর কানে পড়তেই বাচ্চুর ও আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

পথের ডানদিকে খাদ— বাঁদিকে পাহাড়। সূর্য ডুবে এসেছে। মামা আসছে গোঁফে তাড়া দিয়ে সোজা হেঁটে জীপের একেবারে মুখোমুখি।

সকলে স্ট্যাচু হয়ে গেছে জীপের মধ্যে। শুধু ঋজুদার পাইপের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

প্রকাণ্ড বড় চিতা। চমৎকার চিক্কণ চেহারা। গোঁফ দিয়ে জেল্লা বেরুচ্ছে। এ-জঙ্গলে মানুষ বোধহয় একেবারেই আসে না, নইলে চিতার এমন ব্যবহার আমি কখনও দেখিনি।

জীপের থেকে হাত কুড়ি দূরে চিতাটা সোজা বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। দিনের শেষ আলোর ফালি এসে পড়ল ওর গায়ে। সে এক দারুণ সৌন্দর্য ও স্তব্ধতার মুহূর্ত।

সেই নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে হঠাৎ কানুদা উত্তেজিত হয়ে বললেন, মণি, ক্যামেরা! বলেই সকালের মতো আবারও হাত ছুঁড়লেন।

'মা-গোঁ-ও' বলে মণিদি জীপের মধ্যেই বসে পড়লেন।

চিতাটা ভীষণ ভয় পেয়ে চমকে উঠে এক লাফে খাদের দিকে দৌড়ে গেল। তারপর কী করে নামল খাদ বেয়ে, তা সে চিতাই জানে। ডিগবাজি খেয়ে নিশ্চয়ই ওরও নাক ভাঙল।

খুকুদি বললেন, এটা বাড়াবাড়ি কানু, তোমার ক্যামেরা তুমি ঠিক করে রাখতে পারো না? মেয়েটার নাক দিয়ে এখনও রক্ত ঝরছে, তার ওপর আবার আঘাত?

কানুদা বললেন, ক্যামেরা কোথায়?

কাঁজুবাঁদামের টিনে। মণিদি কোঁকাতে কোঁকাতে বললেন।

কানুদা চিতাবাঘটা লাফানোর আগে যেন ধনুকের মতো বেঁকে গেছিল, তেমনি রাগে বেঁকে গিয়ে বললেন, দেয়ারস্ এ লিমিট। ডালমুটের ঠোঙা থেকে বের করে কাজুবাদামের টিনে—ক্যামেরা?

মণিদি জামাইবাবুকে খুব ভালবাসেন।

বললেন, তুঁমিই না বঁলেছিলে বৃষ্টিতে লেন্সে ফাঙ্গাঁস পঁড়ে যাবে? আমি তাঁই যত্ন কঁরে-এ-এ-এ। উঃ-হু-হু—।

ঋজুদা জীপ থেকে নেমে বললেন, এইরকম কোনও জায়গাতেই শূর্পণখার নাক কাটা গেছিল। এখানে প্রত্যেকের নাক সাবধান রাখা উচিত। বলে রুমাল বের করে নিজের নাক মুছল।

খুকুদি বললেন, বাচ্চু, মণির নাকে ওয়াটার বটল্ থেকে একটু দল দে তো।

কোথায় বাচ্চু?

তাকিয়ে দেখি বাচ্চু নেই। কখন যে হাওয়া হয়েছে, কেউই লক্ষ করিনি।

বাঘও ডানদিকে খাদে লাফিয়েছে, বাচ্চুও বাঘকে ডোন্টকেয়ার করে বাঁদিকে পাহাড়ে চড়েছে। ও বলেইছিল যে, ওর একটু অসুবিধা আছে। কিন্তু বাঘের চেয়েও যে বেশি ভয়াবহ কিছু আছে, এ-কথাটা সেবারেই প্রথম জানলাম। বাঘ তো বাঘই; কিন্তু খিচুড়ি—ঘোগ।

হলঙ

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যখন বোয়িং প্লেনটা নামল তখন ভর-দুপুর।

একজন কালো মতন ভদ্রলোক, চশমা-পরা, প্লাস্টার-করা ডান হাত স্লিংয়ে ঝোলানো, এগিয়ে এসে ঋজুদাকে নমস্কার করলেন।

ঋজুদা বলল, কী বিকাশ? কেমন আছ? যাচ্ছ তো হলঙে আমাদের সঙ্গে?

ভদ্রলোক বললেন, কী করে যাই? দেখতেই পাচ্ছেন। গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে ডান হাত ভেঙেছি। তাছাড়া কাল ভোরেই কলকাতা যাব, বিশেষ কাজ আছে।

তারপর বললেন, আপনি একা জীপ নিয়ে যেতে পারবেন তো? ড্রাইভার ছাড়া আমি যে অচল।

ঋজুদা বললেন, না, না, ঠিক আছে। একা যেতে পারব না কেন? তাছাড়া একা তো নই, সঙ্গে আমার চেলা, এই রুদ্রচন্দ্র আছে। কোনওই অসুবিধে নেই।

আমি জীপের পেছনে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ছ'টা মুরগি কঁক কঁক করছে। পাশে একটা বড় প্যাকিং বাক্স। তাতে চাল, ডাল, তরকারি, ফল, তেল ঘি— এই সব।

বিকাশবাবু বললেন, সবই দিয়ে দিয়েছি, আপনার কোনওই অসুবিধে হবে না। ওখানে তো পাওয়া যায় না কিছু। এবার দেরি না করে বেরিয়ে পড়ুন। অনেকখানি পথ।

ঋজুদা স্টীয়ারিং-এ বসল। আমি গিয়ে পাশে বসলাম।

তারপর বিকাশবাবুর সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলে জীপ স্টার্ট করল ঋজুদা।

'চলি, বলে ডান হাতটা বিকাশবাবুর দিকে তুলে জীপের অ্যাকসিলেটরে চাপ দিল। তারপর জীপ ছুটে চলল।

ঋজুদা বলল, দূর, এই জীপ ভাল না।

আমি শুধোলাম, কেন ?

এটা বড্ড ভাল। জীপের স্টীয়ারিং কমপক্ষে আড়াই-তিন পাক ফলস্ না হলে কি চালিয়ে আরাম ! বাঁই-বাঁই করে তিন পাক স্টীয়ারিং ঘুরে গেলে তবে চাকা একটু সরবে, সেই-ই তো মজা।

দেখতে দেখতে আমরা এয়ারপোর্টের এলাকা পেরিয়ে এসে ফাঁকায় পড়লাম। দার্জিলিং-এ যাওয়ার রাস্তা বাঁদিকে ফেলে বাইপাস দিয়ে এসে আমরা সেভক রোড ধরলাম।

বেশ ঠাণ্ডা এখন, এই দুপুরেও। হাওয়া লাগছে চোখে-মুখে। মাথার উপর ঝকঝকে নীল আকাশ— দুপাশে ঘন শালের জঙ্গল, সেগুনের প্ল্যানটেশান— মধ্যে দিয়ে আর্মির বানানো চওড়া কালো অ্যাসফল্টের রাস্তা সোজা চলে গেছে তিস্তা অবধি। তিস্তা পেরিয়ে সেভক ব্রীজ পেরিয়ে ডুয়ার্সে যাওয়ার পথ, আর সোজা গেলে, খরস্রোতা তিস্তার গায়ে গায়ে কালিম্পং যাওয়ার রাস্তা।

বেশ জোরেই জীপ চালাচ্ছিল ঋজুদা। জীপের এঞ্জিনটা মাঝে মাঝে স্পীড কমে গেলেই, সে যে তত ভাল ছেলে নয়, যতটা ঋজুদা ভেবেছিল, তা প্রমাণ করার জন্যে মাথা নাড়ছিল পাগলের মতো। সঙ্গে সঙ্গে জোরে একটা লাথি মারছিল ঋজুদা ক্লাচে। অমনি আবার সে ভাল ছেলে হয়ে যাচ্ছিল। সেভকে এসে বিখ্যাত করোনেশন ব্রীজ পেরোলাম আমরা। ব্রীজের পর বেশ কিছুটা পথ আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ, তারপর আবার সটান, সোজা, আদিগন্ত।

ওদলাবাড়ি ছাড়িয়ে এসে আমরা মালে পৌঁছে বাস-স্টপের পাশে একটা চায়ের দোকানেই খেয়ে নিলাম। দারুণ রসগোল্লা, কালোজাম আর সিঙাড়া। দোকানটাতে খুব ভিড়।

ঋজুদা বলল, ভাল করে খেয়ে নে রুদ্র। জীপ যেরকম মাথা নেড়ে মাঝে মাঝেই আপত্তি জানাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত উদোম পথে ঝামেলায় না ফেলে। সারা রাত থাকতে হলে ঠাণ্ডায় কুলপি মেরে যাব।

খেয়ে-দেয়ে আবার এগোলাম আমরা।

চালসাও পেরুনো হল। এখান থেকে ময়নাগুড়ির পথ বেরিয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ আগে থেকেই পথের দুপাশে চা-বাগান আরম্ভ হয়েছে।

বাগানের পর বাগান। কেসিয়া ভ্যারাইটির ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ, নীচে চায়ের সবুজ নিবিড় সমারোহ— পেছনে নগাধিরাজ হিমালয়ের শোভা।

গোঁ গোঁ করে জীপ চলেছে। মাঝে-মধ্যে কোনও চা-বাগানের জীপ বা ট্রাকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। চা-বাগানের কুলি-কামিন কাজ সেরে নিজেদের ঘরে ফিরছে গান গাইতে গাইতে। অনেক সাঁওতাল দেখলাম এখানে। কোথা থেকে কোথায় কাজ করতে আসে এরা, ভাবলে অবাক লাগে !

তারপর বানারহাট, বীরপাড়া হয়ে আমরা প্রায় সন্ধের সময় মাদারীহাটে এসে পৌঁছলাম। ডানদিকে কোচবিহারের পথ বেরিয়ে গেছে। সোজা গেলে হাসিমারা হয়ে ফুংসোলিন। ভুটানের সীমান্ত। এপথে একটু এগিয়েই আমরা ডানদিকে চেক-নাকা পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম হলঙে।

ঋজুদার কাছ থেকে রিজার্ভেশন স্লিপ দেখে তারপর আমাদের ঢুকতে দিল ফরেস্ট গার্ড। সাদা পাথুরে মাটি আর নুড়ি-ঢালা পথ সোজা চলে গেছে হলঙের দিকে। সাত কিলোমিটার।

একটু পরই সন্ধে হয়ে যাবে। পথের পাশে পাশে একটি নরম লাজুক ছিপছিপে নদী চলেছে গাছপালা লতাপাতার আড়ালে। পরে জেনেছিলাম যে, এই নদীর নামই হলঙ। নদীর নামে জায়গার নাম। এই সন্ধে হব-হব গভীর জঙ্গলে সেই নদীর মৃদু কুলকুল আওয়াজ ভারী সুন্দর লাগছে। পথের দুপাশে অনেকগুলো ময়ূর দেখলাম। আমাদের জীপের শব্দ শুনে ভারী শরীর নিয়ে কষ্ট করে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসছিল। রাত প্রায় নেমে এল। এমনিতেই তো ওদের এখন গাছে গিয়ে বসার কথা।

ঋজুদা জঙ্গলে ঢুকলেই কেমন যেন হয়ে যায়। চোখ-মুখ সব পালটে যায়। শহরের ঋজুদা আর জঙ্গলের ঋজুদা অনেক তফাত। স্টীয়ারিংয়ে হাত রেখে পথের দিকে চেয়ে আমাকে ফিসফিস করে ঋজুদা বলল, "চিতা বাঘ বড় শখ করে ময়ূর ধরে খায়, তা জানিস ? বড় বাঘও ময়ূর ভালবাসে।

আমি বললাম, ময়ূরের মাংস খেলে নাকি লোকে পাগল হয়ে যায় ?

ঋজুদা হেসে উঠল। বলল, যে এ-কথা বলে, সেও একটি পাগল। ময়ূরের মাংসের মতো মাংস হয় না, তা জানিস ? পৃথিবীতে এত ভাল হোয়াইট নেই-ই বলতে গেলে তবে এখন তো ময়ূর ন্যাশনাল বার্ড। ময়ূর মারার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি বললাম, চিতাবাঘে মেরে খায় যে !

ঋজুদা বলল, চিতাবাঘের কথা ছাড়। আইন-কানুন, সংবিধান কিছুই মানে না ওরা। ওরা যা খুশি তাই করে।

যখন হলঙ-এর দোতলা কাঠের বাংলোয় গিয়ে পৌঁছলাম আমরা, তখন সবে অন্ধকার নেমেছে। শ্রীবিবেক রায় এলেন আমাদের দেখাশোনা করতে। আমি যখন আড়ালে ডেকে তাঁকে ঋজুদার নাম বললাম, তখন তো তিনি খুব খুশি

এবং উত্তেজিত। ঋজুদাকে এসে বললেন, আপনাকে কীভাবে আপ্যায়ন করতে পারি, বলুন ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, কিছু করতে হবে না মশাই, আমার এই চেলাটিকে একটু বাঘ দেখান। পারবেন তো ?

বিবেকবাবু বললেন, বাঘ তো এখানে রাস্তার কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনার খাতিরে অবশ্য শুভদৃষ্টি হলেও হতে পারে।

আমি ঋজুদাকে মনে করিয়ে দিলাম, তুমি তেল ভরলে না ঋজুদা, যদি রাতে কোথাও যাও, আর কাল তো ফুংসোলিন যাব আমরা !

ঋজুদা বলল, ঠিক বলেছিস।

তারপর বিবেকবাবুকে বললেন, যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে মাদারীহাট ? তেল ভরতে যাব।

বিবেকবাবু বললেন, বরাতে থাকলে ঐটুকু যাওয়া-আসার পথেই বাঘ দেখতে পাবেন। তবে, আমার কাজ সেরে আসি। আরও যাঁরা এসেছেন তাঁদের খবরাখবর সুখ-সুবিধার খোঁজ নিয়ে আসি। ততক্ষণে আপনারা চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন।

ঋজুদা হেসে বলল, ফেয়ার এনাফ্।

বিবেকবাবু বললেন, বাঘ যদি সত্যিই সামনে পড়ে, তাহলে জীপ চালাবে কে ? ড্রাইভার ভীতু হলে কিন্তু বিপদ।

ঋজুদা বলল, আমিই চালাব, আমিই ড্রাইভার।

এ কথা শুনে বিবেকবাবু একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ বাঘ দেখার পর এক-একজন লোকের এক এক রকম অবস্থা হয়। ভগবান বা ভূত দেখার মতো। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না ঋজুদাকে। লজ্জা পেলেন।

আমার মজা লাগল। কারণ ঋজুদাকে আমি যেমন চিনি, উনি তো তেমন চেনেন না।

কোন চা-বাগানের প্রেস্টিজ ব্রাণ্ড তা জানি না, তবে বিকাশবাবু ফার্স্ট ক্লাস চা দিয়েছিলেন। ডানলোপিলো লাগানো বিছানায় পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বসে ঋজুদা চা খেতে খেতে একটা বড় বোলের পাইপ বের করে ধরাল। পাইপের মিষ্টি তামাকের গন্ধে ঘর ভরে গেল।

ঋজুদা বলল, কী হে বৎস, আর এক কাপ চা করে খাওয়াও, একটু গুরুসেবা করো, ড্রাইভারের গায়ে জোর করো, নইলে বাঘ দেখে ড্রাইভার অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে তো !

আমি হাসলাম ; বললাম, ড্রাইভারকে আমি তো চিনি।

তারপরই আধ চামচ চিনি দিয়ে যথারীতি দুধ কম দিয়ে ঋজুদাকে চা বানিয়ে দিলাম। একটু পরে কাজটাজ সেরে বিবেকবাবু আমাদের মেহগনি কাঠ দিয়ে

বানানো ঘরের দরজায় এসে টোকা দিলেন।

কোট-টোট চড়িয়ে, মাথায় টুপি পরে আমরা নীচে নামলাম। ঋজুদা জাপান থেকে একটা জার্কিন কিনে এনেছিল, সেটা পরলে ঋজুদাকে ভীষণ কিম্ভূতকিমাকার দেখায়। ঋজুদা স্টীয়ারিং-এ বসল, মধ্যে আমি ; বাঁ-দিকে বিবেকবাবু।

বাংলো থেকে বেরিয়ে হলঙ নদী পেরিয়ে বিবেকবাবুর কোয়ার্টার্স, মাহুত ও হাতিদের আস্তানা ছাড়িয়ে বড়জোর আধমাইলটাক গেছি আমরা, হঠাৎ বিবেকবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, বাঘ ! বাঘ !

দূরে রাস্তার উপরে এক জোড়া লাল চোখ দেখা গেল। ঋজুদা জোরে জীপ ছোটাল। হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল একটা বিরাট বড় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের জঙ্গলে নেমে যাচ্ছেন। আমরা পৌঁছতে পৌঁছতে জঙ্গলে ঢুকে গেলেন তিনি।

বিবেকবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, দেখলেন ?

ঋজুদা বলল, বড় লাজুক বাঘ। তারপর বলল, কী রে রুদ্র, দেখলি ?

হুঁ। আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, মনে হচ্ছে না দেখলেই খুশি হতিস।

আমি বিবেকবাবুর সামনে লজ্জা পেয়ে বললাম, যাঃ !

পাঁচ মিনিটও হয়নি, আবার বিবেকবাবু বললেন, বাঘ ! বাঘ !

ঋজুদা জোরে অ্যাসিলারেটরে চাপ দিল। দেখতে দেখতে বাঘের মুখোমুখি ! মাঝারি সাইজের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে।

ঋজুদা স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে হেডলাইটটা জ্বালিয়ে রাখল বাঘের উপর। দশ হাত দূর থেকে বাঘটা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। সন্দেহের চোখে। তারপর আস্তে আস্তে রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের খোলামতো জায়গায় নেমে গিয়ে একটা বড় সেগুন গাছের নীচে বসে পড়ল আমাদের দিকে মুখ করে।

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, বিবেকবাবু, মনে হচ্ছে আপনাকে পছন্দ হয়েছে।

বিবেকবাবুর বাঁ পাটা বাইরে ছিল। টক করে পাটা ভিতরে টেনে নিলেন উনি।

ঋজুদার কথায় ও বিবেকবাবুর পা সরানোর শব্দে বাঘের কান খাড়া হয়ে উঠল।

আমি বললাম, ঋজুদা, ব্যাক করে চলো। অ্যাটাক করবে।

ঋজুদা বলল, বলছিস তুই ? বলেই, একটু ব্যাক করল জীপটা স্টার্ট দিয়ে।

দেখলাম, জীপের পেছোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও মুখ ঘুরিয়ে যাচ্ছে আমাদের দিকে আস্তে আস্তে।

আবার স্টার্ট বন্ধ করে দিল ঋজুদা। জার্কিনের পকেট থেকে দেশলাই বের করে ফস্‌স্‌ করে পাইপ ধরাল।

বাঘটার কানটা আবার খাড়া হয়ে উঠল।

ঋজুদা বলল, ভাল করে দেখ নে রুদ্র, নইলে কলকাতায় গিয়ে বন্ধুদের গুল মারলে ওরা তোর সম্বন্ধে সন্দেহ করবে।

দুস্‌স্‌, আমি বললাম। বললাম বটে, কিন্তু আমার বুকের কাছটা ব্যথা-ব্যথা করছিল। ভীষণ গরম লাগছিল। গলা শুকিয়ে শুকনো হয়ে গেছিল। একটু জল হলে ভাল হত।

কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু জঙ্গলের গন্ধ। ডানদিকের হলঙ নদীর কুলকুল শব্দের সঙ্গে ভেজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। আর বাঘের গায়ের বোঁটকা গন্ধ। ঋজুদার পাইপে নিকোটিন আর জল জমে যাওয়ায় প্রত্যেক টানের সঙ্গে হুঁকোর মতো ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ বেরোচ্ছে।

এমন সময় বিবেকবাবু ফিসফিস করে বললেন, এমন খোলা জীপে বাঘের এত কাছে বসে থাকা কি ঠিক হবে?

ঋজুদা বলল, কথা বলবেন না মশায়!

বাঘটা একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে নট-নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু হয়ে বসে আছে তো আছেই। সেও আমাদের দেখছে, আমরাও তাকে দেখছি। শুভদৃষ্টি হল শেষ পর্যন্ত।

অনেকক্ষণ পরে ঋজুদা জীপ স্টার্ট করল।

জীপ স্টার্ট করতেই বাঘটা উঠে দাঁড়াল। জীপটাকে ফার্স্ট গীয়ারে দিয়ে একটু সামনে গড়িয়ে দিতেই বাঘটা উঠে দাঁড়িয়ে জীপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সমস্ত শরীরটা চার পায়ের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়ে।

হঠাৎ ঋজুদা খুব জোরে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। ইঞ্জিনের শব্দে ও হঠাৎ এগিয়ে যাওয়াতে বাঘটা একটু হকচকিয়ে গেল।

একটু দূরে গিয়ে ঋজুদা জীপটাকে থামাল।

আমরা পেছন ফিরে দেখলাম, বাঘটা রাস্তার মাঝখানে এসে আমাদের জীপের দিকে তাকিয়ে আছে। জীপটা থেমে যেতেই এক পা এক পা করে জীপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমার হঠাৎ মনে হল, কলকাতাটা কী সুন্দর জায়গা! এমন সন্ধেবেলায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের আলোজ্বলা মেলায় ঘুরে বেড়াতে পারতাম মজা করে, তা নয়, ঋজুদার সঙ্গে এসে কী বিপদেই পড়লাম!

হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল ঋজুদা। তারপর জীপটা স্টার্ট করে এগিয়ে চলল।

বাঘটাকে তখনও লক্ষ করছিলাম আমি ঘাড় ঘুরিয়ে। কিছুদূর হেঁটে এসে ও নাক তুলে আমাদের চলমান জীপের দিকে চেয়ে রইল।

বিবেকবাবু বললেন, হাসছেন কেন?

মজা দেখে, ঋজুদা বলল।

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, মজাটা কীসের?

ঋজুদা গীয়ার বদলে বলল, বাঘটা বাচ্চা। এসব হচ্ছে বাচ্চা বাঘের স্বভাব। ও যা করছিল, তা সবই ওর অদম্য কৌতূহলের ফল। ওর কাছ থেকে কোনওই ভয় ছিল না। কিন্তু বিপদ ছিল ওর মায়ের কাছ থেকে। অবশ্য যদি জীপ থেকে নামতিস। ওর মা ধারে-কাছেই ছিল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, অত বড় ধেড়ে বাঘ যদি বাচ্চা হয়, তাহলে তো আমিও বাচ্চা!

ঋজুদা বলল, তুই তো বাচ্চাই। তুই যে নিজেকে বড় বলে সব সময় জাহির করতে চাস, এইটেই প্রমাণ করে যে তুই বাচ্চা।

স্বল্প-পরিচিত বিবেকবাবুর সামনে ঋজুদার এমন কথাবার্তা আমার পছন্দ হল না। চুপ করে রইলাম।...

অন্ধকার থাকতে থাকতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে, টি-কোনিতে মোড়া টি-পটে করে গরম চা দিয়ে গেল বেয়ারা। হলঙের সমস্ত টুরিস্ট লজটা জেগে উঠেছে। বাথরুমে বাথরুমে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। ইলেকট্রিক আলো নেই। জেনারেটরের আলো সন্ধে থেকে রাত দশটা অবধি জ্বলে।

যখন আমরা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম, দেখি চারটে হাতি দাঁড়িয়ে আছে পিঠে গদি নিয়ে। বনবিভাগের হাতি। ঋজুদা আর আমি একটা হাতির পিঠে উঠে পড়লাম। অন্য হাতিগুলোতে অন্য ঘরের লোকেরা। তারপর হাতিগুলো চলতে লাগল একসারিতে।

তখনও ম্লান চাঁদ আছে। শীতের শেষরাতে কুয়াশা, শিশির আর চাঁদে কেমন মাখামাখি হয়ে গেছে। সারা আকাশের বনেজঙ্গলে কোনও জাপানী চিত্রকর যেন ওয়াশের কাজের কোনও ছবি এঁকেছেন।

রাস্তার দু পাশে কতগুলো উঁচু উঁচু সোজা মেরুদণ্ডের গাছ। গাছগুলোর গায়ের রঙ সাদা। গুঁড়িগুলো মজার। খোপ খোপ করা। ঋজুদাকে শুধোলাম, কী গাছ এগুলো?

ঋজুদা বলল, তোকে ধরে মারব আমি। বাঙালীর ছেলে শিমুল গাছ চিনিস না?

একটু পরই অন্ধকার হালকা হতে লাগল। হেঁয়ালির রাত শেষ হয়ে প্রাঞ্জল দিন ফুটতে লাগল ফুলের মতো। হাতিরা হলঙ নদী পেরুল। জল থেকে ঠাণ্ডার ধোঁয়া উঠছে। ময়ূর ডাকল এদিক ওদিক থেকে। দেখতে দেখতে রুপো গলে গিয়ে সোনা এল। বুলবুলি জাগল, ময়না জাগল, টিয়ার ঝাঁক কোথায় না কোথায় কথা রাখতে তীরের মতো উড়ে গেল ট্যাঁ-ট্যাঁ করতে

করতে।

আমরা শিমুল অ্যাভিন্যু ধরে চলতে লাগলাম।

মাহুত বলল, এ পথটা গেছে জলদাপাড়ায়। যেখানে আমাদের বনবিভাগের পুরনো বাংলো আছে।

দুধারে গভীর বন। শাল, সেগুন, রাই-সেগুন। বড় বড় পুড়ুণ্ডী ঘাস— পাতা তাদের চওড়া, সতেজ, সবুজ। শিশু গাছ সরু সরু। ডানদিকে পড়ে আছে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি— খেয়ালী তোর্সা নদীর ফেলে-যাওয়া পথে। গভীর জঙ্গলের ফাঁক-ফোঁক দিয়ে চোখে পড়ে। গণ্ডারের আস্তানা ওখানে।

এই হলঙ্-জলদাপাড়ার জঙ্গল ঘিরে আছে অনেক নদনদী। ভারী সুন্দর এদের নাম সব। হলঙ্, বুড়ি তোর্সা···, তোর্সা···, চূড়াখাওয়া, বেলাকোওয়া আর মালঙ্গী।

একটু দূর গিয়ে পথ ছেড়ে বাঁদিকের নুনীতে নামল হাতিগুলো। এখানে জঙ্গল ফাঁকা করে কিছুটা জায়গায় মাটির সঙ্গে নুন মিশিয়ে রাখে বনবিভাগের লোকেরা। জংলী জানোয়ারেরা নুনের নেশায় আসে এখানে। জানোয়ারেরা তো আর বিড়ি-সিগারেট, পান-টান খায় না— ওদের নেশা বলতে নুন খাওয়া। হরিণ সম্বর অবশ্য মহুয়ার দিনে মহুয়া খেয়ে নেশা করে— ভাল্লুকরাও। এই নুনী থেকে পায়ের দাগ দেখে সেই পায়ের দাগ অনুসরণ করে হাতি নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে মাহুতরা।

আমি ঋজুদাকে বললাম, কী থ্রিলিং! এসে ভালই করেছি, কী বলো?

ঋজুদা ইয়ার্কি করল আমার সঙ্গে, বলল, যা বলেন!

তারপর বলল, বুঝলি রুদ্র, ঘণ্টা কয়েকের জন্যে বেশ রাজারাজড়া কি মন্ত্রী-টন্ত্রী মনে হচ্ছে না নিজেদের? যতদূর দেখা যায়, গাছগাছড়া, মানুষ-কাঁকড়া সবকিছুর মালিক আমরা। হুজুর মা-বাপ। বলো, হাতির পিঠে কেমন যাচ্ছি?

আমি বললাম, তা ঠিক। কিন্তু কোমরে ব্যথা করছে।

ঋজুদা চাপা হাসি হাসল। বলল, ভাত আর আলু খাওয়া বন্ধ কর, আইসক্রীমও। এতটুকু ছেলে, পেটে চর্বি থাকবে কেন?

হঠাৎ মাহুতরা মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে হাতিগুলোকে এক এক করে নুনী থেকে বের করে আনল। পথে উঠতেই দেখলাম, দুটো গাঢ় খয়েরী রঙের বেশ বড় হরিণ ছুটে রাস্তা পেরিয়ে এদিকের জঙ্গল থেকে ওদিকের জঙ্গলে গেল।

হরিণ! হরিণ! করে চারটে হাতি থেকে জনা পনেরো লোক সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। আর সেখানে হরিণ থাকে? মাইল দুয়েক চলে যাবে বোধহয় এক দৌড়ে।

ঋজুদা গম্ভীর মুখে বলল, বনবিভাগকে সাজেস্ট করব যে, সকলের মুখ

ভোরবেলা স্টিকিং-প্লাস্টার দিয়ে সেঁটে দেবে।

আমি ফিসফিস করে বললাম, কী হরিণ ওগুলো? ওড়িশাতে তো দেখিনি? বিহারেও না!

ঋজুদা বলল, এগুলো হগ্-ডিয়ার। এগুলো এই রকম জঙ্গলেই দেখা যায়। আমাদের কাজিরাঙ্গায় গেলে দেখতে পাবি সোয়াম্প ডিয়ার। আরও বড় হয়। জলকাদা ঘাসবনে পাওয়া যায় ওগুলো।

এবারে মাহুতেরা হঠাৎ খুব সাবধানী হয়ে গেল। হাতিগুলোর সঙ্গে কী সব সাংকেতিক ভাষায় কথাবার্তা বলতে লাগল। মাঝে মাঝে ডাঙ্গসের বাড়ি মারতে লাগল মাথায়। একটা হাতির সঙ্গে একটা ছোট সুনটুনী-মুনটুনী বাচ্চা ছিল। সেটা মায়ের পায়ে পায়ে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে মা দাঁড়িয়ে পড়লেই চুকচুক করে একটু দুধ খেয়ে নিচ্ছিল। ঋজুদা ফটাফট তার ছবি তুলছিল।

হাতিগুলো ডানদিকের নলবনে খুব সাবধানে এগোতে লাগল। এত গভীর নলবন যে হাতি ডুবে যায়। নলের ফুলগুলো কী সুন্দর! যার চোখ আছে সে-ই দেখতে পায়। রুপোলি আর লালে মেশা কী নরম রেশমী ফুলগুলো। গালে চেপে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করে।

ঋজুদা ফিসফিস করে কী শুধোল যেন মাহুতকে।

মাহুত বলল, গেঁড়া। বলেই সতেজ সবুজ ঘাসের বনে ঢুকল।

সবুজ পাইপটা জার্কিনের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে, ক্যামেরাটা দুহাত দিয়ে ধরল ঋজুদা।

আমরা একটা জায়গায় এসে পড়লাম, সেখানে ঘাসের বন বিরাট জায়গা জুড়ে জমির সঙ্গে সমান হয়ে গেছে। গণ্ডার বা গেঁড়ারা রাতে এখানে শুয়েছিল। ভারী চমৎকার সবুজ, নরম নিত্য-নতুন বিছানা ওদের। মাথায় গাছের চাঁদোয়া— নীচে ঘাসের বিছানা, পাতার বালিশ। দিব্যি আছে।

এ জায়গায় পৌঁছে হাতি ও মাহুতেরা একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। হঠাৎ বড় হাতির মাহুত কী একটা আদেশ করল তার হাতিকে। হাতিগুলো একে একে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘাস জঙ্গল ভেঙে এগোতে লাগল। এদিকে বড় বড় পুড়ুণ্ডী ঘাস, চওড়া সতেজ সবুজ পাতা এদের। সোজা উঠেছে।

এখন গাছের চাঁদোয়া নেই। নীল আকাশে রোদ চকচক করছে। মাথার উপরে বাজপাখি উড়ছে চক্রাকারে। দারুণ এক সুগন্ধী প্রভাতী নিস্তব্ধতা চারিদিকে। শুধু হাতির পা ফেলার নরম শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই।

সামনে চোখ পড়তেই আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্কের মতো তিনটে একশিঙা গণ্ডার ও একটা বাচ্চা গণ্ডার দাঁড়িয়ে আছে সামনের ফাঁকা জায়গাটাতে। তাদের পেছনে আদিগন্ত নলবন। খেয়ালী তোর্সার ফেলে-যাওয়া পথে গজিয়ে-ওঠা নল। আরও দূরে মেঘ-মেঘ ভুটান পাহাড়। ওদের দুপাশে সবুজ সুস্পষ্ট পুড়ুণ্ডীর জঙ্গল। পায়ের নীচে মিষ্টি গন্ধের বাংলার

মাটি, নুড়ি, সাদা বালি। মাথার উপরে ঝকঝকে নীল আকাশ। ওদের নাকে স্বাধীনতার গন্ধ, চোখে সাহসের দ্যুতি।

কতক্ষণ যে তাকিয়েছিলাম মনে নেই তা।

হঠাৎ এক ভদ্রমহিলার হাত থেকে একটা চা-ভর্তি থার্মোফ্লাস্ক থপ করে নীচে পড়ল।

ব্যাস্। গণ্ডারগুলোর মধ্যে চঞ্চলতা দেখা গেল। ওরা পরাধীন হাতির পিঠে-বসা শিক্ষিত, জামা-কাপড় পরা ভীতু প্রাণীগুলোর থেকে দূরে, আরও দূরে সরে যেতে লাগল।

দিগন্ত ওদের সবসময় হাতছানি দেয়। খোলা আকাশ, খোলা বাতাস ওদের ডাকে। ওরা আমাদের পেছনে ফেলে ঘৃণায় পা ফেলে ফেলে, অবহেলায়, দ্রুত চলে যেতে লাগল।

ওদের যতক্ষণ দেখা গেল, চুপ করে চেয়ে রইলাম। চোখের দূরবীক্ষণেও যখন ওদের আর দেখা গেল না, ওরা মিলিয়ে গেল দিগন্তের নলবনে, তখন হুঁশ হল আমার।

ঋজুদা বলল, তাহলে এবার ইডেনে গো-হারান ডাংগুলি খেলা না দেখে ভালই করেছিস বল ?

আমি হেসে ফেললাম।

বললাম, যা বলেছ। টিকিট না পাওয়ার জন্যে আর দুঃখ নেই।

ঋজুদা বলল, কলকাতা ফিরে তোর সব বন্ধুদের বলবি, ক্রিকেট ছাড়াও উত্তেজনাকর আরও অনেক কিছু আছে। আমাদের বনবিভাগ এত সুন্দর সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে, তোরা ছেলেমানুষরা যদি এসব না দেখবি, প্রকৃতির মধ্যে এসে প্রকৃতিকে না উপলব্ধি করবি, না জানবি, তাহলে এত আয়োজন কাদের জন্যে ?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। ভাল-লাগায় আমার বুক ভরে উঠেছিল।

হাতিগুলো এবারে দুরের নলবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল।

এরাও কি দিগন্তের দিকে যাচ্ছে ? এই জড়বুদ্ধি পরাধীন জানোয়ারগুলোরও কি স্বাধীন হওয়ার শুভ ইচ্ছা জাগল মনে ? এদের নাকেও কি খোলা আকাশ, খোলা বাতাসের বাস লেগেছে ?

কে জানে !

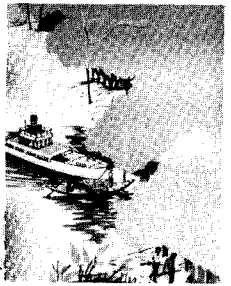

বনবিবির বনে

"Bobibir Bone" was previously uploaded in this blog (www.boiRboi.blogspot.com) as a seperate book.So,this time I exclude it from this collection.

টাঁড়বাঘোয়া

তোমরা কেউ বাড়কাকানা থেকে চৌপান্ যে রেল লাইনটি চলে গেছে পালামৌর গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সেই পথে গেছ কি না জানি না। না-গিয়ে থাকলে একবার যেও। দু'পাশে অমন সুন্দর দৃশ্যের রেলপথ খুব কমই আছে। শাল, মহুয়া, আসন, পন্নন, কেঁদ, পিয়াশাল, টোওয়া, পলাশ, শিমুল আরও কত কী নাম জানা এবং নাম না-জানা গাছ-গাছালি। ছিপছিপে, ছিমছাম ঝিরঝিরে নদী। মৌন মুনির মতো সব মন-ভরা পাহাড়। মাইলের পর মাইল ঢালে, উপত্যকায়, গড়িয়ে-যাওয়া সবুজ জামদানী শালের মতো জঙ্গল। এক এক ঋতুতে তাদের এক এক রূপ।

এই রেলপথে লাপ্‌রা বলে একটি ছোট্ট স্টেশান আছে। তার এক পাশে খিলাড়ি, অন্য পাশে মহুয়ামিলন। মহুয়ামিলনের পর টোরী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই লাপ্‌রা স্টেশানটির নাম ছিল আন্ডা-হল্ট। ব্রিটিশ টমি আর অ্যামেরিকান সৈন্য ভর্তি মিলিটারী ট্রেন এখানে থামতো রোজ ভোরে—প্রাতঃরাশ-এর জন্য।

যখনকার কথা বলছি, তখন তোমরা অনেকেই হয়তো জন্মাওনি। যে সময়কার এবং যে সব জায়গার কথা বলতে বসেছি, সেই সময় এবং সেই সব সুন্দর দিন ও পরিবেশ বিলীয়মান দিগন্তের মতোই দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে। তাই হয়তো মনে থাকতে থাকতে এসব তোমাদের বলে ফেলাই ভাল।

লাপ্‌রার কাছে চট্টি নদী বলে একটি নদী আছে। ভারী সুন্দর নদীটি। পিক্‌নিক করতে যেতেন অনেকে দল বেঁধে। সেই সময় লাপ্‌রাতে এ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা একটি কলোনী করেছিলেন। ফুটফুটে মেয়েরা গোলাপী গাউন পরে, মাথায় টুপী চড়িয়ে গরুর গাড়ি চালিয়ে যেত লাল ধুলোর পথ বেয়ে, ক্ষেতে চাষ করত, পাহাড়ী নদীতে বাঁধ বেঁধে সেচ করত সেই জমি। পালামৌর ঐসব রাঁচী অঞ্চলের এমনই মজা ছিল যে, গরমের সময়েও কখনও রুক্ষ হত না। প্রায় সব সময়ই সবুজ, ছায়াশীতল থাকত। এপ্রিল মাসের

মাঝামাঝিও রাতে পাতলা কম্বল দিতে হত গায়ে। সন্ধের পর বাইরে বসলে সোয়েটার বা শালের দরকার হত।

আমি তখন কলেজে পড়ি। ফারস্ট্ ইয়ার। কলেজের গরমের ছুটিতে মহুয়ামিলন আর লাপ্রার মাঝামাঝি একটি জায়গাতে গিয়ে উঠেছি। সঙ্গে আমার সাকরেদ টেড্। টেড-এর বাবা আমার বাবার সঙ্গে এক অফিসে কাজ করতেন। অস্ট্রিয়াতে টীরল বলে একটি বড় সুন্দর প্রদেশ আছে। সেখানেই তার পৈতৃক নিবাস। কিন্তু তার বাবার সঙ্গে ভারতবর্ষেই টেড ছিল অনেক বছর। জন্মেও ছিল সে এখানে। আমরা দুজনে অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলাম! বনে-জঙ্গলে টেড-এর সঙ্গে যে কত ঘুরেছি আর শিকার করেছি সেই সময়—সেসব কথা এখন মনে হয় স্বপ্ন।

এখন টেড আছে কানাডাতে। ছোটবেলায় ভারতবর্ষের জঙ্গলে ঘুরে তার জঙ্গলের নেশা ধরে গেছিল, তাই কানাডার জঙ্গলে বিরাট কাঠের কারবার ফেঁদেছে সে বড় হয়ে। তিন চার বছর অন্তর টেড আমাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে যায়। টিকিট কেটে পাঠায় ওখান থেকে। কানাডার বনে জঙ্গলে এখন আমিই ওর সাগরেদ হয়ে ঘুরে বেড়াই।

সেদিন বিকেলে, একটা ছোট্ট পাহাড় ছুলোয়া করিয়ে ময়ূর তিতির ও মুরগী উড়িয়েছিলাম আমরা। তবে, খানেওয়ালা মাত্র আমরা দুজন। সঙ্গে আছে টিরিদাদা। টিরি ওঁরাও। তিনি একাধারে আমাদের অনুচর, বাবুর্চি, গান-বেয়ারার বা বন্দুকবাহক এবং লোকাল গার্জেন। তাই অনেক পাখি উড়লেও তিনজনে দিন-দুই খাওয়ার মতো দুটো মোরগ আর দুটো তিতির শুধু মেরেছিলাম আমরা।

ময়ূর মারতাম না কখনও আমাদের কেউই। একবার শুধু, কেমন খেতে লাগে তা দেখবার জন্যে অনেকদিন আগে মেরেছিলাম একটা। তোমরা বোধহয় অনেকেই জানো না, ময়ূরের মাংস হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাদু ও নরম হোয়াইট মীট।

টিরিদাদা রান্না-টান্না করছে, আমরা বাংলোর বাইরে বেতের চেয়ারে বসে গল্প করছি। কাল-পরশু সবে অমাবস্যা গেছে। তখনও চাঁদ ওঠেনি, ফুরফুর করে হাওয়া দিয়েছে। মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধ ভেসে আসছে সেই হাওয়াতে। অন্ধকার বন থেকে ডিউ-ড্যু-ডু-ইট্ পাখি ডাকছে। কোনও জানোয়ার দেখে থাকবে হয়তো ওরা।

এমন সময় দেখি মশাল জ্বালিয়ে আট দশজন লোক দূরের পাকদণ্ডী পথ বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জোরে জোরে কথা বলতে বলতে আমাদের বাংলোর দিকেই আসছে।

সন্ধের পর এই জঙ্গুলে জায়গায় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউই বড় একটা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোয় না। এত লোক এক সঙ্গে কোথা থেকে আসছে সেই

কথা ভাবতে ভাবতে আমরা চেয়ে রইলাম নাচতে-থাকা মশালের আলোগুলোর দিকে।

বিকেলে মুরগী মারার সময় যারা ছুলোয়া করেছিল, তারা মহুয়ামিলনের আশেপাশের বস্তীরই সব ছোট ছেলে। তাদের আমরা এক আনা করে পয়সা দিতাম, তিন-চার ঘন্টা ছুলোয়ার জন্যে। তখনকার এক আনা অবশ্য এখনকার পাঁচ টাকার সমান। তাই ভীড় করে আসত ওরা ছুলোয়া করার জন্যে। সেদিনই টেডের বন্দুকের ছররাগুলি ঝরঝর করে একটা কেলাউন্দা ঝোপের গায়ে গিয়ে লাগে, তার পাশেই ছিল একটি ছেলে। এমন বোকার মতো বেজায়গায় এসে পড়েছিল ছেলেটা যে, একটু হলে তার গায়েই গুলি লেগে যেত। তার গায়ের পাশে গুলি লাগতে সে অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে মাটিতে বসে ছিল। টিরিদাদা গিয়ে তাকে তুলে ধরে, টিকি নাড়িয়ে তার যে কিছুই হয়নি একথা বুঝিয়ে তার ঠোঁটের ফাঁকে একটু খৈনী দিয়ে দিয়েছিল। অতটুকু ছেলে খৈনী খায় দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছিলাম।

এই লোকগুলো আসছে কেন কে জানে। ছেলেটার গায়ে সত্যি সত্যিই কি গুলি লেগেছিল? শিকারে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন এমন সব ঘটনা ঘটে যে, তখন মনে হয় বন্দুক রাইফেলে আর জীবনে হাত দেব না। আমার ছোট ভাই-এর একটা ফুসফুস তো কেটে বাদই দিতে হল! এক বে-আক্কেল সঙ্গীর বে-নজীর বন্দুকের পাখি-মারা-ছররা তার একটা ফুসফুসকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

সবই জানা আছে। মানাও। তবুও কিছুদিন যেতে না যেতেই জঙ্গল আবার হাতছানি দেয়। কানে ফিস্‌ফিস্ করে জঙ্গলের কানাকানি, পাখির ডাক, শম্বরের গভীর রাতের দূরাগত ঢাংক ঢাংক আওয়াজ, চিতাবাঘের গোঙানী। আর নাকে ভেসে আসে জঙ্গলের মিশ্র গন্ধ। ফোটা-কার্তুজের বারুদের গন্ধের সঙ্গে মিশে ঘুমের মধ্যে, ভিড়ের মধ্যে, পড়াশুনার মধ্যে অশরীরী হাওয়ার মতো জঙ্গল যেন হাত বোলায় গায়ে মাথায়। তাই আবারও বেরিয়ে পড়তে হয়। নানারকম বিপদ আছে বলেই হয়তো জঙ্গল এত ভাল লাগে।

লোকগুলো গেট পেরিয়ে বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়ে একেবারে কাছে এসে আমাদের সামনে মাটিতে বসে পড়ল। বুঝলাম, অনেক পথ হেঁটে এসেছে ওরা। ওদের মধ্যে যে সর্দার গোছের, সেই শুধু দাঁড়িয়েছিল। সে বলল যে, তারা পলাশবনা বলে একটা গ্রাম থেকে আসছে অনেকখানি হেঁটে। তাদের বস্তীতে একটা মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। গ্রামকে ওরা বলে বস্তী। পনেরো দিন আগে কাঠ কুড়োতে যাওয়া একটি মেয়েকে সেই বাঘে ধরেছিল। ওরা ভেবেছিল যে, বাচ্চা মেয়েটা বুঝি হঠাৎ ভুল করেই গিয়ে পড়েছিল ভীষণ গরমে ক্লান্ত হয়ে-যাওয়া ছায়ায় বিশ্রাম-নেওয়া বাঘের সামনে। কিন্তু আজই বিকেলে গ্রামের মধ্যে ঢুকে অনেকের চোখের সামনেই কুয়োতলা

থেকে আবার একজন বুড়িকে তুলে নিয়ে গেছে বাঘটা। তাই বাঘটা যে মানুষখেকোই সে বিষয়ে তাদের কোনও সন্দেহ নেই আর !

কথাবার্তা শুনে টিরিদাদা এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের পেছনে।

আমি বললাম, দাঁড়িয়ে কী দেখছ টিরিদাদা ? এতদূর থেকে এসেছে ওরা, ওদের প্যাঁড়া দাও, জল দাও, জল খাওয়াও। ওদের জন্যে খাওয়ারও একটু বন্দোবস্ত করো। তুমি তো একা এত লোকের খাবার বানাতে পারবে না ! ওদের জল-টল খাওয়া হলে ডেকে নাও ওদের, তারপর সকলে মিলেই হাতে হাতে রুটি বানিয়ে ফেল। নইলে ভাত করো। ঝামেলা কম হবে। মাংস তো আছেই। যা আছে তাতে হয়ে যাবে।

টিরি বলল, নিজের খাওয়া আর সকলের খাওয়া-খাওয়া করেই তুমি মরলে।

টেড হিন্দী বোঝে। বলতেও পারে। টিরিকে বলল, তুম বহত বক্‌বকাতা হ্যায়।

আমি সর্দারকে শুধোলাম, বুড়ির মৃতদেহ কি তোমরা উদ্ধার করতে পেরেছ ?

না বাবু, ও বলল।

কেন ? সকলে মিলে আলো-টালো নিয়ে গেলে না কেন ? গ্রামে কি একটাও বন্দুক নেই ?

আছে। টিকায়েতের আছে। তার বিলিতি বন্দুক আছে একনলা। তার কাছে গেছিলামও আমরা। কিন্তু সে বলল, একটা মরা বুড়ির জন্য রাতবিরেতে নিজের প্রাণ খোয়াতে রাজি নয় সে। কাল দিনেরবেলা আমাদের গিয়ে দেখে আসতে বলেছে। বুড়ির সবটুকু যদি বাঘ খেয়ে না ফেলে থাকে, তাহলে সেইখানে ভাল বড় গাছ দেখে মাচা বাঁধতে বলেছে আমাদের। সেই মাচায় বসবে বিকেলে গিয়ে। এবং বলেছে বাঘটাকে মারবে।

টেড বলল, তাহলে তো বন্দোবস্ত হয়েই গেছে। তোমরা আমাদের কাছে এই এতখানি পথ ঠেঙ্গিয়ে আসতে গেলে কেন ?

সর্দার বলল, এই টিকায়েতই তো গতবছরে নতুন বন্দুক কেনার পর বাঘ মারবে বলে গরমের সময়ে জলের পাশে বসে ছিল। বাঘ যখন জল খেতে এসেছিল, তখন তাকে গুলিও করে বিকেল বেলায়। ঐ তো যত ঝামেলার ঝাড়।

আমি বললাম, খারাপটা সে কি করল তোমাদের ?

সর্দার বলল, বাঘটা মারতে পারলে তো হতই। বাঘ হুঙ্কার ছেড়েই পালিয়ে গেছিল গায়ের গুলি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে।

সর্দার একটু চুপ করে থেকে বলল, কী আর বলব, আজ প্রায় সাত-আট বছর হল বাঘটা এই অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করত, কারও কোনও ক্ষতি করত না কখনও, এমন কি গ্রামের গরু-মোষও মারেনি। শুধু টিকায়েতের বেতো-ঘোড়া মেরেছিল একটা।

ওদের মধ্যে একজন সর্দারকে শুধরে দিয়ে বলল, একবার শুধু একটা গাধা মেরেছিল বস্তীর ধোপার।

সঙ্গে সঙ্গে সর্দার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমাদের মনে হয় টিকায়েতের ঐ গুলিতে আহত হয়েই, বাঘটার শরীরে জোর কমে গেছে। তাই তো বোধহয় ও আর জঙ্গলের জানোয়ার ধরতে পারে না। সেইজন্যেই এখন মানুষ ধরা আরম্ভ করেছে। ওকে বস্তীর সকলেই চেনে, কারণ পলাশবনার ছোট বড় প্রায় সকলেই কখনও না কখনও দেখেছে ওকে।

একটু থেমে বুড়ো সর্দার বলল, আমরা আগে ওকে আদর করে ডাকতাম টাঁড়বাঘোয়া বলে। অনেকে পিলাবাবাও বলত। আমাদের বস্তীর আর জঙ্গলের মধ্যের খোলা টাঁড়ের মধ্যে দিয়ে প্রায়ই সকালে অথবা সন্ধেয় ওকে ধীর সুস্থে যেতে দেখা যেত।

বুড়োর কথা শুনে টেড আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। বিহারের হাজারীবাগ পালামৌ জেলাতে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠকে বলে টাঁড়। টাঁড়ের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করত বলেই ওরা টাঁড়বাঘোয়া বলে ডাকত বাঘটাকে। মানে টাঁড়ের বাঘ। বাঘ সাধারণতঃ ফাঁকা জায়গায় বেরোয় না দিনের বেলা। কিন্তু এ বাঘটা সকাল সন্ধের আলোতে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করত বলেই ওরকম নাম হয়েছিল বোধহয়।

টেড বলল, কত বড় বাঘটা ?

সর্দার বলল, দিখ্‌কে আপকো দিমাগ্ খারাপ হো জায়গা হজৌর। ইত্‌না বড়কা। বলে, নিজের বুকের কাছে হাত তুলে দেখিয়ে বলল।

আমি বললাম, বাঘটাকে পিলাবাবা বলে ডাকত কেন কেউ কেউ, তা বললে না তো ?

বুড়ো বলল, হলুদ রঙের ছিল বাঘটা, ইয়া ইয়া দাড়ি গোঁফওয়ালা, তাই অনেকে বলত পিলাবাবা। হিন্দীতে পিলা মানে হলুদ। বিহারের বাঘের গায়ের রঙ সচরাচর পাটকিলে হয়। টাঁড়বাঘোয়ার রঙ হলুদ বলেই তার অমন নাম।

টেড জিগগেস করল, তোমাদের গ্রাম কত মাইল হবে এখান থেকে।

ওরা এবার একসঙ্গে সকলে কথা বলে উঠল।

বলল, জঙ্গলে জঙ্গলে গেলে লাতেহারের দিকে দশ মাইল। পি-ডাব্লু-ডির রাস্তায় গেলে কুড়ি মাইল—তাও রাস্তা ছেড়ে আবার পাঁচ-ছ' মাইল হাঁটতে হবে।

আমি বললাম, তোমাদের গ্রামে আমাদের থাকতে দিতে পারবে তো ? কোনও খালি ঘর-টর আছে ?

বুড়ির ঘরই তো আছে, ওরা বলল।

তারপর বলল, বুড়ির কেউই ছিল না। এক নাতি ছিল, গত বছরে এমনই এক গরমের দিনে একটা বিরাট কালো গহ্‌মন্ সাপ তাকে কামড়ে দেয়। ওঝা

কিছুই করতে পারল না। মরে গেল সে।

তারপর বলল, আপনারা গেলে আমরা আমাদের নিজেদের ঘরও ছেড়ে দেব। আপনাদের কোনও কষ্ট দেব না। দয়া করে চলুন আপনারা মালিক।

কলেজে-পড়া সবে-গোঁফ-ওঠা আমাদের, এমন বার বার মালিক মালিক বলাতে আমাদের খুবই ভাল লাগতে লাগল। বেশ বড় বড় হাব-ভাব দেখাতে লাগলাম। আবার একটু লজ্জাও করতে লাগল। এখনও নিজেদের মালিকই হতে পারলাম না, তো এতজন লোকের মালিক! টিরিদাদাকে ডেকে, ওদের সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে বললাম।

ওরা যখন চলে গেল তখন আমি আর টেড পরামর্শ করতে বসলাম।

এর আগে আমাদের দুজনের কেউই কোনও মানুষখেকো বাঘ মারিনি। আমি তো বড় বাঘও মারিনি। টেড অবশ্য মেরেছিল একটা, ওড়িশার চাঁদকার জঙ্গলে, যখন ও ক্লাস টেন-এ পড়ে। দিনের বেলা, মাচা থেকে।

টেড অনেকবার আমাকে বলেছে আগে, বাঘটা এমন বিনা ঝামেলায় মরে গেল যে, একটুও মনে হল না যে বাঘ মারা কঠিন। থ্রি-সেভেনটি-ফাইভ ম্যাগনাম্ রাইফেলের গুলি ঘাড়ে লেগেছিল সাত হাত দূর থেকে। বাঘটা মুখ থুবড়ে পড়েই ভীষণ কাঁপতে লাগল। মনে হল, ম্যালেরিয়া হয়েছে, গায়ে কম্বল চাপা দিলেই জ্বর ছেড়ে যাবে। তা নয়, ঘাড়ের ফুটো দিয়ে প্রথমে কালচে, তারপর লাল রক্ত বেরোতে লাগল আর বাঘটা হাত পা টানটান করে ঘুমিয়ে পড়ল। যেন রাত জেগে পরীক্ষার পড়া পড়ে খুবই ঘুম জমেছিল ওর চোখে। যেন সাধ মিটিয়ে ঘুমোবে এবারে।

টেডের প্রথম বাঘ অমন লক্ষ্মী ছেলের মতো মরলেও টেড ও আমি খুব ভালই জানতাম যে বাঘ কী জিনিস! বড় বাঘের সঙ্গে মোলকাৎ আমাদের বহুবার হয়েছে—জঙ্গলে, পায়ে হেঁটে। যেই না চোখের দিকে তাকিয়েছে বাঘ, অমনি মনে হয়েছে যে, এ্যাডিশনাল ম্যাথমেটিকস্-এর পরীক্ষা যে ভীষণই খারাপ দিয়েছি অথচ কাউকে বাড়িতে সে.খবরটা এ পর্যন্ত জানাইনি তাও যেন বাঘটা একমুহূর্তে জেনে গেল। বাঘ চোখের দিকে চাইলেই মনে হয় যে, বুকের ভিতরটা পর্যন্ত দেখে ফেলল।

একে বাঘ। তায় আবার মানুষখেকো।

টেড বলল, বাড়িতে টেলিগ্রাম করে বাবার পারমিশান চাইব? তুইও চা। আফটার অল ম্যানইটার বাঘ বলে কথা।

আমি বললাম, তোর যেমন বুদ্ধি! পারমিশান চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম আসবে, কাম ব্যাক্ ইমিডিয়েটলি।

টেড বলল, সেকথা ঠিকই বলেছিস। বাবা-মার পারমিশান নিয়ে কে আর কবে এরকম মহৎ কর্ম করেছে বল।

আমি বললাম, কোনও খারাপ কর্মও কখনও করেনি কেউ, কী বল?

ও বলল, তাও যা বলেছিস।

তারপর বলল, থাকতেন আমার মা বেঁচে! মা দেখতিস রিটার্ন-টেলিগ্রাম করতেন, বাঘের চামড়া না-নিয়ে ফিরলে, তোমারই পিঠের চামড়া তুলব। বাবাও অবশ্য আগে সেরকমই ছিলেন। তবে জানিস তো, মা চলে গেলেন এত অল্প বয়সে, আমার তো আর ভাই-বোন নেই, আমিই একা; বাবা এখন বড় নরম হয়ে গেছেন আমার ব্যাপারে। নইলে বাবা ঠিকই উৎসাহ দিতেন।

আমি বললাম, তোর বাবা-মা তো আর বাঙালী নন। তুই তো রবীন্দ্রনাথ পড়িসনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করোনি।

টেড বলল, আমরা ভীষণ বাজে কথা বলছি। এবার কাজের কথা বল।

বলেই বলল, টস্ করবি?

আমি বললাম, দুস্‌স্‌স্। টস্ করা মানেই একজন জিতবে অন্যজন হারবে। হারাহারির মধ্যে আমি নেই। তুইও থাকিস না। আমরা হারতে আসিনি। কখনও হারব না আমরা। জিতবই। আমরা যাচ্ছি। ডিসাইডেড।

টেড কিছুক্ষণ বাইরের অন্ধকার রাতে তাকিয়ে থেকে আমার দিকে ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল।

ওর টেনিস-খেলা শক্ত হাতের মধ্যে আমার হাতটা নিয়ে বলল, সো, দ্য পুওর ম্যানইটার ইজ ওলরেডী ডেড।

বলেই হাসল।

আমি ওর হাতটা আমার হাতে ধরে হাসলাম।

বললাম, ইয়েস্। হি ইজ। অ্যাজ ডেড অ্যাজ হ্যাম।

টেড বলল, অ্যাই! হি বললি কেন? বাঘ কী বাঘিনী আমরা তো জানি না এখনও! গিয়েই জানব।

আমি বললাম, ঠিক।

টিরিদাদা এসে বলল, ওদের প্যাঁড়া আর জল খাইয়েছি। রুটি বানানো শুরু হয়ে গেছে। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হবে। ভাত-ফাত খেতে ভালবাসে না ওরা। পনেরো মিনিটের মধ্যেই পেট খালি-খালি লাগে নাকি ভাত খেলে।

টিরিদাদাকে উদ্দেশ্য করে টেড বলল, বাঁধা-ছাঁদা করে আমরাও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব। আজ রাতারাতিই ওদের গ্রামে পৌঁছুতে হবে। বুড়িকে খাওয়ার পরও যে পলাশবনা গ্রামেই মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসে থাকবে বাঘ তার তো কোনও গ্যারান্টি নেই।

টিরিদাদা আপত্তির গলায় বলল, এই রাতে! সাপখোপ্ আছে।

আমি বললাম, ভূত প্রেতও আছে টিরিদাদা!

টিরিদাদা বলল, ব্যসস্, ব্যসস্। রাতের বেলা আবার ওদের নাম করা

কেন ? বড় বেয়াদব হয়েছ।

টেড হাসল। বলল, শোনো টিরি ; ওদের সঙ্গে তুমিও খেয়ে নেবে ভাল করে, আর আমাদের খাবারটা এখানেই দিয়ে যেও সকলের খাওয়া হয়ে গেলে।

টিরিদাদা বলল, মোরগ আর তিতিরগুলো সবই কেটে ফেললাম। তারপর এক বালটি পানি আর একগাদা লংকা ফেলে এমন ঝোল বানাচ্ছি যে, যারা তোমাদের প্রাণে মারার জন্যে নিতে এসেছে তাদের প্রাণ আজ আমার হাতেই যাবে। ওদের কারোরই বাঘের মুখ অবধি পৌঁছতে হবে না হয়তো আর এই ঝোল খাবার পর।

টেড হাসল।

তারপর বলল, তুমি আজকাল কথা বড় বেশি বকছ, কাজ কম করছ টিরি। যাও, পালাও এখান থেকে।

টিরিদাদা সত্যি সত্যিই চটে গেছে মনে হল এবার।

বলল, তোমাদের দুজনের কারও যদি কিছু হয় তাহলে আমি তোমাদের বাবাদের কাছে কোন্ জবাবদিহিটা করব, সে কথা একবারও ভেবেছ ? সবে কলেজে উঠেছ, এখন ভাল করে গোঁফ পর্যন্ত ওঠেনি, সব একেবারে লায়েক হয়ে গেছ দেখি তোমরা ! লায়েক ! কেন যে মরতে আমি এখানে ফেঁসেছিলাম ! সঙ্গে এসেছিলাম !

আমি বললাম, আমরা বন্ড লিখে সই করে দিয়ে যাব যে, আমাদের মৃত্যুর জন্যে টাঁড়বাঘোয়াই দায়ী, টিরিদাদা দায়ী নয়।

টাঁড়বাঘোয়া ? সেটা আবার কী ?

টিরিদাদা কাঁচা পাকা ভুরু তুলে শুধোল।

টেড বলল, বাঘটার নাম গো, বাঘটার নাম। এত বড় বাঘ যে, দেখলে দিমাগই খারাপ হয়ে যাবে।

টিরিদাদা বলল, আমার দিমাগ বাঘ না দেখেই খারাপ হচ্ছে। ভাল লাগছে না একটুও। আমার মন একেবারেই সায় দিচ্ছে না। কী বিপদেই যে পড়লাম !

॥ ২ ॥

পলাশবনা গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই আমাদের ঘন্টা আড়াই লেগে গেল। ইচ্ছে করেই মহুয়ামিলনে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম নিয়ে আমরা রাত দেড়টা নাগাদ ওখান থেকে বেরিয়েছিলাম যাতে ভোর ভোর এসে পলাশবনাতে পৌঁছতে পারি।

পথের এক জায়গায় একটা বেশ উঁচু এবং গভীর জঙ্গলে ভরা পাহাড় আছে। তার গায়ে ন্যাড়া চ্যাটালো কালো পাথরের চাঙড়। অনেকগুলো বড় বড় গুহা। সবে ওঠা একটু চাঁদের আলোয় গরমের শেষ রাতের হাওয়ায় দোলাদুলি করা ডাল-পালার ছায়ায় পাহাড়টাকে ভুতুড়ে ভুতুড়ে লাগছিল।

টিরিদাদা এখানে এসেই আমাদের একেবারে গায়ে গায়ে সেঁটে চলতে লাগল।

টেড বলল, কি হল টিরিদাদা ? ভয় পেও না। আমারও মন বলছে, এখানে ভূত নিশ্চয়ই আছে।

টিরিদাদা প্রচণ্ড রেগে উঠল। এবং সঙ্গের দু-একজন ওর সঙ্গে তাল মেলাল।

বলল, রাতের বেলায় বনপাহাড়ে ওসব দেবতাদের নিয়ে রসিকতা একেবারেই করতে নেই। ওরা ঐসব দেবতাদের ভাল করেই জানে, তাই ভয় পায়। বন্দুক দিয়ে তো আর ওঁদের মারা যাবে না।

টেড চুপ করে গেল।

হঠাৎ আমাদের সামনের অল্প চাঁদের আলোয় মাখামাখি ভুতুড়ে পাহাড়তলী থেকে একটা আওয়াজ উঠল উঁ-আঁউ। পাহাড়ের আনাচ-কানাচ, উপত্যকা সব সেই আওয়াজে গম্‌গম্ করে উঠল।

লোকগুলো সব ঘন হয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল আমাদের পেছনে।

বুড়ো সর্দার ফিস্‌ফিস্ করে বলল, টাঁড়বাঘোয়া।

সে বাঘের গলার আওয়াজ এত জোরালো এবং এমন গম্ভীর এবং যার আওয়াজ শুনেই তলপেটের কাছে ব্যথা ব্যথা লাগছিল, তাই তার চেহারাটা ঠিক কীরকম হবে তা অনুমান করে আমি মোটেই খুশি হলাম না।

টেড কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে যেদিক থেকে শব্দটা এসেছিল সেই দিকে চেয়ে থেকে বিড় বিড় করে কী যেন বলল।

বাঘটা আরেকবার ডাকল।

একটু পরেই একটা কোটরা হরিণ আর একদল মেয়ে শম্বর জঙ্গলের ডানদিকে দৌড়তে দৌড়তে ডাকতে ডাকতে চলে গেল। তাতে বুঝলাম, বাঘটা আমাদের পথ থেকে অনেক ডানদিকে সরে যাচ্ছে।

মশালগুলো জোর করে নিয়ে ওরা আবার এগোলো। আমি আর টেড রাইফেলের ম্যাগাজিনে গুলি লোড করে নিলাম। উঁচু-নিচু পথে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে চেম্বারে গুলি থাকলে, তাই চেম্বার ফাঁকাই রাখলাম। ভাবলাম, বাঘ কী অত সহজে দেখা দেবে আমাদের।

যখন আমরা পলাশবনা গ্রামের সীমানায় কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়া অনেক ক্ষেত-খামার আর জটাজুট-সম্বলিত বড় অশ্বত্থগাছের নীচের বনদেবতার থান পেরিয়ে গ্রামের দিকে এগোতে লাগলাম তখন একজনের বাড়ির উঠোনের কাঠের বেড়ায় বসে, গলা-ফুলিয়ে একটা সাদা বড়কা মোরগ কঁকর-কঁ-অ করে ডেকে উঠে রাত পোহানোর খবর পৌঁছে দিল দিকে দিকে।

পলাশবনাতে পৌঁছতেই খবর পাওয়া গেল যে, টিকায়েত খুবই চটে গেছে, গাঁয়ের লোকদের উপরে। সে বাঘ মেরে দেবে বলা সত্ত্বেও তাকে না-বলে-কয়ে তারা যে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তার সম্মানে লেগেছিল। টিকায়েত খবর দিয়ে রেখেছিল যে, তার সঙ্গে দেখা না করে যেন আমরা জঙ্গলে না-ঢুকি। কারণ, এই গ্রামের মালিক সেইই।

এই টিকায়েতেরও অন্য সব টিকায়েতেরই মতো অনেক জমিজমা, গাই-বলদ, মোষ, প্রজা, লেঠেল ইত্যাদি ছিল। সাধারণ গরীব মানুষদের উপর এদের প্রতিপত্তি ও অত্যাচার যাঁরা নিজের চোখে না দেখেছেন তাঁরা বিশ্বাসও করতে পারবেন না।

যাইই হোক, টেড আমার দিকে তাকাল, আমি টেডের দিকে। আগে টিকায়েতকেই মারব, না বাঘ মারব ঠিক করে উঠতে পারলাম না আমরা। টিকায়েত একজন লেঠেল পাঠিয়েছিল। সাড়ে ছ'ফিট লম্বা সেই পালোয়ান সাত ফিট লম্বা লাঠি হাতে যখন শুনল যে, আমাদের এখন টিকায়েতের সঙ্গে দেখা করার একেবারেই সময় নেই ; আমরা আগে বুড়ির মৃতদেহের খোঁজেই যাচ্ছি ; তখন খুবই অবাক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল সে, টিকায়েতকে আমাদের দুঃসাহসের খবরটা দিতে।

টিরিদাদার উপর মালপত্রের জিম্মা দিয়ে, বুড়ির ঘর কিংবা অন্য যে কোনও খোলামেলা একটা ঘর গ্রামের এক প্রান্তে যাতে পাওয়া যায় তার খোঁজ করতে বলে দুজন স্থানীয় যুবকের সঙ্গে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথমেই এলাম কুয়োতলায়। বুড়ির মাটির কলসীটা ভেঙে পড়ে ছিল তখনও। যুবক দুটি বুড়িকে মাটিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ দেখে দেখে এগোতে লাগল। প্রথমে অবশ্য একটুও দাগ ছিল না টেনে নেওয়ার। বুড়ির ঘাড় আর কাঁধ কামড়ে ধরে প্রকাণ্ড বাঘটা প্রায় তাকে শূন্যে তুলেই নিয়ে গেছে অনেকখানি।

বাঘটা যে কত বড় তা তার পায়ের দাগ দেখেই বোঝা গেল। দশ ফিটের মতো হবে বলে মনে হল আমার ও টেডের। বেশিও হতে পারে। অবশ্য, ওভার দ্য কার্ভস্ মাপলে। বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখে আমারও রীতিমত ভয়ই করতে লাগল। টেড-এরও নিশ্চয়ই করছিল। কিন্তু কে যে বেশি ভয় পেয়েছে তা তক্ষুনি বোঝা গেল না। পরে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে।

শাল জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর নিয়ে গিয়েই বুড়ির সাদা থানটাকে খুলে ফেলেছে বাঘ। রক্তমাখা, তখন সপ্‌সপে কাপড়টা ওরা তুলে নিল। দেখা গেল, বাঘটা বুড়িকে কতগুলো পুটুস্ আর আনারসের মতো দেখতে মোরব্বার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে। সেই জায়গাটা পেরিয়ে এক টুকরো হরজাই জঙ্গলে ঢুকে, সেই জঙ্গলও পেরিয়ে একটা কালো পাথরের বড় টিলার পাশে, কতগুলো ঢোওটা, ঢোটর আর পলাশ গাছের মধ্যে ঢুকে নীচের

পুটুস্ আর শালের চারার মধ্যে মৃতদেহটাকে লুকিয়ে রেখেছে।

প্রায় সবটাই খেয়ে গেছে। আছে শুধু একটা পা আর মাথার খুলি। চুলগুলো ছিঁড়ে ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। দেখেই আমাদের গা-গোলাতে লাগল। সেইই প্রথম মানুষখেকো বাঘে-খাওয়া মানুষের মড়ি দেখলাম আমি আর টেড।

চারদিক দেখে-টেখে মনে হল, বাঘ এখন কাছাকাছি নেই। নেই যে তা বোঝা গেল পাখিদের এবং নানা জানোয়ারের ব্যবহারে। কাছাকাছি মাচা বাঁধার মতো কোন গাছও দেখলাম না ভাল। পলাশ গাছগুলো ছোট ছোট ছিল, তাছাড়া ঐ গাছগুলোর নীচের দিকটা ন্যাড়া হয়। গরমের সময় তো পাতাও থাকে না মোটে। শুধুই ফুল। লালে লাল হয়ে আছে চারিদিক। ঢোওটা ও ঢোটরগুলোও তথৈবচ। তার চেয়ে ঐ বড় কালো টিলাটাতে বসলে কেমন হয় সে কথা আমি আর টেড সেই দিকে চেয়ে চুপ করে ভাবছি, ঠিক সেই সময়ই একটা শম্বর ভীষণ ভয় পেয়ে ডাকতে ডাকতে টিলাটার পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে আমাদের একেবারে পাশ দিয়ে জোরে দৌড়ে চলে গেল খুরে খুরে পাথরের ঠকাঠক্ শব্দ করে।

ব্যাপারটা কী যখন তা বোঝার চেষ্টা করছি তখনই গোটা দশেক জংলী কুকুর টিলাটার পাশ থেকে দৌড়ে বেরিয়েই শম্বরটাকে লাফাতে লাফাতে ধাওয়া করে নিয়ে চলে গেল।

'রাজকোঁয়া, রাজকোঁয়া !' বলে চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গের যুবক দুটি।

টেড ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে চুপ করতে বলল ওদের।

তারপর ওদের গাছে উঠে, বসে থাকতে বলে, আমি আর টেড দুজনে দুদিকে চলে গেলাম, টিলাটাকে ভাল করে দেখার জন্যে। রাতে কোথায় বসা যায়, এবং আদৌ বসা যায় কি-না তা খুব সাবধানে খতিয়ে দেখতে হবে আমাদের। সন্ধের পর এই কালো পাথরের টিলার চারপাশে কালো কালো ছায়া পাথরের মতোই চেপে বসবে। কোনওদিকেই কিছু দেখা যাবে না। এবং বাঘ যদি আসে তবে শুধু শব্দ শুনেই তার গতিবিধি ঠিক করতে হবে। জায়গাটা এমন যে, চাঁদ উঠলেও ছায়ারা দলে আরও ভারী হবে।

আমরা দুজনে টিলার দুদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সাবধানে। রাইফেলের সেফটি-ক্যাচে আঙুল রেখে। এখন আর একে অন্যকে দেখা যাচ্ছে না। কতগুলো ছাতার পাখি ডাকছে। উড়ছে। বসছে। বুড়ির দুর্গন্ধ শরীরেও একরাশ পোকা উড়ছে বসছে। একঝাঁক টিয়া হঠাৎ ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে ডাকতে ডাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল গ্রীষ্ম-সকালের শান্ত সমাহিত ভাবটা একেবারে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে।

আমি আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম টিলাটার উপরে। টেডকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। ও নিশ্চয়ই অন্য দিক দিয়ে উঠেছে। টিলাটার উপরে একটা

গুহা। এবং সেই গুহার ঠিক সামনে পাথরের উপর বাঘের ময়লা পড়ে আছে দেখতে পেলাম। খুব বেশি পুরনো নয়। তিন চার দিনের হতে পারে, বেশি হলে।

তবে কি টাঁড়বাঘোয়া এখন এই গুহার মধ্যেই বিশ্রাম নিচ্ছে?

গুহার মুখে একটুও ধুলো বালি নেই যে, বাঘের পায়ের দাগ পড়েছে কি না তা দেখব! রাইফেলটা লক্ করে সেফটি-ক্যাচটা তুলে রাখলাম। প্রয়োজন হলে মুহূর্তের মধ্যে যাতে সেফটি-ক্যাচকে ঠেলে সরানো যেতে পারে।

গুহার মুখের একপাশে দাঁড়িয়ে ভাবছি, গুহার মধ্যে ঢোকা ঠিক হবে কি হবে না; হঠাৎ এমন সময় মনে হল আমার পিছন থেকে কে যেন আমাকে এক-দৃষ্টিতে দেখছে। প্রত্যেক শিকারীই জানেন যে, বনে-জঙ্গলে এরকম মনে হয়। একেই হয়তো বলে শিকারীদের সিক্সথ্-সেন্স্। মনে হতেই, ঘুরে দাঁড়ালাম আমি রাইফেলসুদ্ধ

ঘুরে দাঁড়ালাম বটে কিন্তু দেরী হয়ে গেল।

হয়তো আমাদের দুজনেরই। একটা প্রকাণ্ড হলুদ-রঙা বাঘের দাড়ি-গোঁফওয়ালা মুখ মুহূর্তের জন্যে গোল কালো পাথরের উপর দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি পাথর টপ্‌কিয়ে টপ্‌কিয়ে ঐদিকে এগোতে লাগলাম টিলাটাকে ঘুরে ঘুরে। বাঘটা যেখানে ছিল সেখান থেকে একলাফেই আমার ঘাড়ে পড়তে পারত। কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে বাঘের কাছে পৌঁছতে হলে অনেকখানি ঘুরেই যেতে হবে অনেকগুলো পাথর ডিঙ্গিয়ে ও গহ্বর এড়িয়ে।

হঠাৎই আমার টেড-এর কথা মনে হল।

আমি শিকারের আইন ভেঙ্গে চেঁচিয়ে বললাম, টেড, ওয়াচ-আউট। দ্য ম্যানইটার ইজ এ্যারাউন্ড।

টেড সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল দূর থেকে, আই নো।

যখন বাঘটার জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছি রাইফেল বাগিয়ে, তখন টিলার পশ্চিমদিকের ঝাঁটি জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে একটা ভারী জানোয়ারের দ্রুত চলে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল ঝরে-পড়া শুকনো পাতা মচ্‌মচিয়ে।

সেইদিকে চেয়ে আওয়াজটা লক্ষ্য করতে লাগলাম। দূরে যেতে যেতে আওয়াজটা একটা ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ী নালার মধ্যে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

আমি নেমে এলাম সাবধানে টিলা থেকে। গাছে-বসা একটা লোককে জিগগেস করলাম, টিলার উপর থেকে গুহার মুখটি সে দেখতে পাচ্ছে কি না?

সে বলল, পাচ্ছে।

আমি বললাম, গুহার ঐ মুখটার দিকে নজর রাখতে। কিছু দেখলেই যেন চেঁচিয়ে আমাকে বলে।

ও বলল, আচ্ছা।

নেমে দেখি, টেড খুব মনোযোগ দিয়ে মাটিতে কী যেন দেখছে।

আমি যেতেই, আমাকে দেখাল। টিলার নীচে, মাটিতে এক জোড়া বাঘের পায়ের দাগ। টাঁড়বাঘোয়ার দাগ এবং একটি বাঘিনীর পায়ের দাগ। বাঘিনী টাঁড়বাঘোয়ার চেয়ে ছোট।

এরপর আমরা দুজনে সাবধানে টিলাটার চারদিকে একবার ঘুরলাম আরও দাগ আছে কি না দেখার জন্যে। টিলার পশ্চিম দিকে, যেদিকে আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে শুনেছিলাম একটু আগে, সেই দিকে মাটিতে অনেক পায়ের দাগ দেখলাম বাঘ ও বাঘিনীর। তিন-চারদিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল, নরম মাটিতে দাগগুলো স্পষ্ট।

আমরা মহা সমস্যায় পড়লাম।

ফিরে এলাম আবার বুড়ির দেহ যেখানে পড়েছিল সেখানে। যে-লোকটা গুহার মুখে পাহারা দিচ্ছিল তাকে বসিয়ে রেখে, গাছের অন্য লোকটাকে নেমে আসতে বলল টেড।

সে নামলে, তাকে দ্বিতীয় বাঘের কথা জিজ্ঞেস করল ও।

ওরা তো আকাশ থেকে পড়ল। গ্রামের যত লোক নানান কাজে প্রত্যেকদিন জঙ্গলে আসছে তাদের মধ্যে কেউই এক টাঁড়বাঘোয়া ছাড়া অন্য কোনও বাঘকে দেখেনি। পায়ের দাগও দেখেনি। এই গ্রামে আশে-পাশে কখনও কোনও চিতাবাঘও দেখেনি ওরা। হয়তো তার কারণ টাঁড়বাঘোয়াই। তার মতো পাহারাদার থাকতে কোনও চিতাবাঘেরই এখানে এসে ওস্তাদী করতে সাহস হয়নি।

ইতিমধ্যে চারজন লোক হৈ হৈ করতে করতে দড়ি আর একটা চৌপাই মাথায় করে এসে হাজির। তারা বলল যে, তারা টিকায়েতের লোক। টিকায়েত রাতে এখানে মাচা করে বসবে, তাই মাচা বাঁধতে পাঠিয়েছে।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলল, আপনারা কিন্তু বাঘের গায়ে গুলি-টুলি করবেন না। করমচারীয়া আপনাদের খুঁজছে। আপনাদের খুবই বিপদ হবে টিকায়েতের কথা না শুনলে।

করমচারীয়া, জানা কথা, টিকায়েতেরই লোক। কিন্তু সে আমাদের খুঁজলেই তো আমরা যাব না তার কাছে।

টেড বলল, টিকায়েতের পোষা বাঁদর নই আমরা।

আমাদের সঙ্গের যুবক দুটি টেড-এর কথাতে হেসে উঠল।

তাতে টিকায়েতের লোকগুলো আরও চটে গেল।

গাছের উপর থেকে অন্য লোকটিও নীচে নেমে এলে আমি টিকায়েতের লোকদের বললাম, মাচা কোথায় বাঁধবে?

ওরা বলল, যে গাছে সুবিধে মতো বাঁধা যায়।

কিন্তু টিকায়েতকে গিয়ে বলো যে, এখানে দু দুটো বাঘ আছে। একনলা

শট্‌গান নিয়ে তার পক্ষে এই দু' দুটি বাঘের মোকাবিলা করা কি সম্ভব হবে ? তার প্রাণের ভয় নেই ?

টেড বলল, টিকায়েতকে গিয়ে বলো, আমরা সকলে মিলেই একসঙ্গে বাঘ দুটি মারার চেষ্টা করি।

ওরা ভাবল, ঠাট্টা করছি।

তখন টেড তাদের নিয়ে গিয়ে পায়ের দাগ দেখাল ভাল করে, বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা কী !

দুটো বাঘের পায়ের দাগ দেখে লোকগুলো ফ্যাসাদে পড়ল। তারপর রাইফেল-হাতে আমরা ঐ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি দেখে ওরাও বোধহয় খালি হাতে ঐ অকুস্থলে থাকা নিরাপদ নয় ভাবল।

আমরা একটু এগোতেই দেখি উপুড়-করা খাটিয়া মাথার উপর নিয়ে পেছন পেছন আসছে পুরো দল বড় বড় পা-ফেলে।

টেড বলল, চল্ আমরা ফিরে যাই। এখানে দেখছি টিকায়েতকেই আগে মারতে হবে, তারপর বাঘ মারার বন্দোবস্ত। এতরকম কমপ্লিকেশান, এত জনের এত মতো নিয়ে মানুষখেকো বাঘ মারা যায় না।

আমি বললাম, যা বলেছিস্ !

গ্রাম থেকে আমরা প্রায় মাইলখানেক এসেছিলাম। বুড়ির ঘরে নয়। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে আমাদের জন্যে দুটি ঘর ছেড়ে দিয়েছে ওরা ! গোবর দিয়ে উঠোন লেপে দিয়েছে। ঘরের ভিতরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু গরমের মধ্যে জানলাহীন ঐ ঘরে কী করে শোব রাতে তাইই ভাবছিলাম।

টিরিদাদা চা করে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ফেলল, আমাদের দেখেই।

মুড়ি ভাজা। তার মধ্যে কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা কেটে মুড়ির সঙ্গেই ভেজেছে। তারপর তার মধ্যে ওমলেট কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়ে দিয়েছে। গ্রামের গাছের ল্যাংড়া আম। আর কফি।

ঘর দুটোর পাশে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ ছিল। তার তলায় চৌপাই বিছিয়ে আমি লম্বা হয়ে শুলাম। আর সাহেব মানুষ টেড, ঘটিতে জল নিয়ে ফর্সা-ফর্সা ঠ্যাং বের করে লাল গামছা পরে জঙ্গলে গেল। যারা জঙ্গলে যাওয়া-আসা করে প্রত্যেকেরই অভ্যেস থাকে।

তেঁতুলতলার ফুরফুরে হাওয়াতে আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ শোরগোল শুনে তাকিয়ে দেখি ভাগলপুরী সিল্কের পাঞ্জাবী আর লোম-ওয়ালা গোবদা গোবদা পা-দেখানো মিলের ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা, সোনার হাত-ঘড়ি হাতে, চকচকে কালো নাগরা পায়ে একজন মস্ত লম্বা-চওড়া লোক একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে এদিকে আসছে আর তার পিছনে কুড়ি-পঁচিশজন লাঠিধারী ষণ্ডা-মার্কা লোক।

আমি আরামের ঘুম ছেড়ে তাড়াতাড়ি চৌপাইতে উঠে বসলাম।

ঠিক আমার সামনে এসে লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ে ধমক দিয়ে শুধোল, আপ্‌কী শুভ্ নাম ?

আমি নাম বললাম। সবিনয়ে।

টিকায়েত বলল, তাঁর এলাকাতে এসব তিনি সহ্য করবেন না। এই পলাশবনা গ্রামে সব কিছু তাঁর ইচ্ছামতোই হয়েছে এযাবৎ এবং হবে চিরদিন।

ভাবছিলাম, এতবড় একটা বিপদ ! কোনদিন বাঘ কাকে নেয় তার ঠিক নেই। তারপর আজ দেখা গেল জোড়া বাঘ। গ্রামের গরীব লোকগুলো এতদূর থেকে আমাদের ডেকে নিয়ে এল আর যে গ্রামের মালিক, মাথা, তারই কি না এই ব্যবহার ?

লোকটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে আমি বসেছিলাম। এমন লোককে কিছুই বলার নেই।

এমন সময় টেডকে আসতে দেখা গেল।

টিকায়েতের মুখ দেখে মনে হল, এমন সাহেব টিকায়েত বাপের জন্মেও দেখেনি। টকটকে গায়ের রঙ, মাথাভরা বাদামী চুল, খালি গা, পায়ে চটি, লাল গামছা পরে সাহেব ঘটি হাতে টাঁড় থেকে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে আসছে।

টেড এসেই বলল, এখানে ভিড় কিসের ?

তখনও তো দেশ স্বাধীন হয়নি। সাদা চামড়া দেখলেই লোকে বেশ সমীহ করত। কিন্তু এই রকম গামছা-পরা সাহেবকে সমীহ করা ঠিক হবে কি না, একটু ভাবল টিকায়েত। তারপর নিজের লোকদের সামনে ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে বলল, আপনাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।

টেড বলল, সে কথা ভেবে দেখব। কিন্তু এখুনি আপনার একজন লোক দিন আমাকে ! আমি এস-ডি-ও সাহেবের কাছে চিঠি পাঠাব, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে এই বাঘকে 'ম্যান-ইটার' ডিক্লেয়ার করার জন্যে এবং চার পাশের সব গ্রামের মানুষদের ঢেঁড়া পিটিয়ে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে।

টিকায়েত, টেড-এর হর্তাকর্তার মতো কথা শুনে হকচকিয়ে গেল বলে মনে হল।

আমি বললাম, ঘোড়া থেকে নামা হোক। আপনার রাজত্বে এলাম, আপনাদেরই উপকার করার জন্যে, তা আপনিই শত্রুর মতো ব্যবহার করছেন !

তারপর বললাম, দয়া করে নামুন, বাঘটার খবরাখবর দিন আমাদের। বাঘও তো আপনার প্রজা। আপনি তার খোঁজ না রাখলে, আর কে রাখবে ?

টিকায়েত ঘোড়া থেকে নামল।

আমি বললাম, আপনার বন্দুকটা কোথায় ? শুনেছি দারুণ দামি বিলিতি বন্দুক। আমাদের একবার দেখান। নেড়ে-চেড়ে দেখি অন্তত একটু।

টেড আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর ইংরেজীতে বলল, কী ব্যাপার ? অত গ্যাস দিচ্ছিস কেন ?

আমিও ইংরেজীতে বললাম, মিষ্টি কথা বলতে তো পয়সা লাগে না। দ্যাখ-না, ওঁকে বন্ধু করে ফেলেছি।

টেড বলল, যেমন তুই। তোর বন্ধুও তো তেমনই হবে!

টেড জামাকাপড় পরে আসতে গেল।

টিকায়েত এসে চৌপাইতে বসল।

লোকটার বয়স আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। চল্লিশ-টল্লিশ হবে। শুনলাম, তার এগারোটা ছেলেমেয়ে, পাঁচশ বিঘা জমি, দেড়শো গরু-মোষ। জঙ্গলের মধ্যে ভাণ্ডার। বিহারের গ্রামে-জঙ্গলে ক্ষেত-খামার দেখাশোনার জন্যে মাটির বাড়ি করে এরা, তার মধ্যে গুদামটুদামও থাকে। ওরা বলে ভাণ্ডার।

টিকায়েত একটা লোককে ডেকে কী বলল। সে আরও দুজনকে সঙ্গে করে দৌড়ে চলে গেল।

আমি টিরিদাদাকে বললাম, চা করে খাওয়াও টিকায়েত সাহেবকে।

ইতিমধ্যে টেড জামা-কাপড় পরে এল। এবার ওকে পুরোদস্তুর সাহেব-সাহেব দেখাতে লাগল। টিকায়েতের ভক্তিও পুরো হল। হাব-ভাবও একটু নরম হল।

বলল, আপনারা এই ঘরে কি থাকবেন? আমার বাড়ি চলুন নয়তো ভাণ্ডারে বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। খাঁটি গাওয়া ঘি-এর পরোটা, হরিণের মাংসের আচার, ক্ষেতের ছোলার ডাল, আর তার সঙ্গে খরগোশের এবং শম্বরের মাংস খাওয়াব।

তারপর বলল, নীলগাই এখানে এত যে, ক্ষেত-খামারই করা যায় না। আমরা যে হিন্দু, তাই নীলগাই আমরা মারি না। গো-হত্যা হবে।

ওদের বুঝিয়ে লাভ নেই যে, নীল গাই-এর নামই নীল গাই, কিন্তু তারা মোটেই গরু নয়। একরকমের এন্টেলোপ। এবং এরাই এবং বাঁদর-হনুমানই সবচেয়ে ক্ষতি করে ফসলের। কিন্তু গ্রামের লোকের কুসংস্কারের জন্যে নীলগাই আর বাঁদর হনুমান মারে না আমাদের দেশে। নীলগাইকে খুব একটা মজার নামে ডাকে এরা। বলে, ঘোড়ফরাস্। নামটা শুনলেই আমার বুক ধড়ফরাস্।

টিরিদাদা চা আর হান্টলি-পামারের বিস্কিট এনে দিল টিকায়েতকে। টিকায়েত যখন প্রীত হয়ে চা খাচ্ছে, তখন যে লোকগুলো চলে গেছিল তারা এক গাদা মাঠরী আর প্যাঁড়া নিয়ে এল। নিশ্চয়ই টিকায়েতের বাড়ি থেকে।

টিকায়েত বলল, খেয়ে দেখুন। সব বাড়ির তৈরি। অসুখ হওয়ার ভয় নেই। মাঠরী খাঁটি ঘি-এ এবং বাড়ির জাঁতায়-পেষা ময়দা দিয়ে তৈরি।

টিকায়েতের ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতেই পারছিলাম যে, ঘি সত্যিই খুব খাঁটি। চা খেতে খেতে টিকায়েতকে বললাম, তাহলে বাঘটাকে কী করা যাবে?

টিকায়েত বলল, চলুন না আমরা তিনজনেই বসি আজ। শুনলাম যে, টিলা

আছে ওখানে একটা। ঐ টিলাতেই তিনজনে তিন জায়গায় বসে থাকব।

টেড আমাকে ইংরেজীতে বলল, তুই যাত্রাপার্টিতে কবে নাম লেখালি? ম্যান-ইটার মারতে তাহলে সঙ্গে তবলচী, সারেঙ্গীওয়ালাকেও নিয়ে যা!

আমি টিকায়েতকে বললাম, ঐ টিলাতে বসা খুবই বিপজ্জনক। চাঁদ নেই এখন। আর বাঘ তো অমনি বাঘ নয়; মানুষখেকো। কখন যে নিঃশব্দে এসে ক্যাঁক্ করে ঘাড় কামড়ে নিয়ে যাবে বোঝার আগেই, তারও ঠিক নেই। তাতে আবার দুটি।

টিকায়েতের মুখে এক তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। বলল, আপনারা তাহলে খুব বাঘ মারবেন! বাঘ মারতে সাহস লাগে।

বলেই, তাচ্ছিল্যের চোখে তাকিয়ে আবার বলল, ইয়ে বাচ্চোঁকা কাম নেহী।

আমি বললাম, তা লাগে। কিন্তু গোঁয়ার্তুমি আর সাহস এক কথা নয়। মানুষখেকো বাঘ মারতে বোকা-বোকা সাহসের চেয়ে বুদ্ধি আর ধৈর্য অনেক বেশি লাগে।

টিকায়েত বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, যা বোঝার তা বুঝেছি। আপনাদের মতো বাচ্চা ছেলেদের কর্ম নয় এই বাঘ মারা।

তারপরই বলল, বাজীই লাগান একটা তাহলে।

আমার খুব রাগ হল আমাদের বাচ্চা বলাতে।

টেড বলল, বাজী কিসের?

বাঘ কে মারবে? বাঘ মারার বাজী।

আমি বললাম, বাঘ মরলেই হল। কে মারে সেটা অবান্তর।

টিকায়েত আবার বলল, বুঝেছি। ভয় পেয়ে পেছিয়ে যাচ্ছেন।

তারপর আবার বলল, বলুন কী বাজী? সাহস আছে? কী হল? বাজী ধরবারও সাহস নেই?

টেড হঠাৎ বলল, বাজী একটা রাখা যাক। কিন্তু অন্য বাজী। বাঘ আগে আপনাকে খাবে, না আমাদের খাবে? আমাদের তো এখানে কেউই নেই। আমার বন্ধুকে খেলে তাকে ভালভাবে সৎকার করবেন। আর আমাকে খেলে, জঙ্গলের মধ্যে একটা সুন্দর ফুল গাছের নীচে ছায়াওয়ালা জায়গায় কবর দেবেন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে লোকজনদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, আর আপনি মরলে, আমরা দাঁড়িয়ে থেকে আপনাকে দাহ করার বন্দোবস্ত করব। নদীর পারে।

টিকায়েত বেজায় চটল। বলল, বুঝেছি।

টেড আবার বলল, কী হল? বাজীর?

টিকায়েত বলল, আপনাদের বাজীর মধ্যে আমি নেই। আমি একাই বসব আজ বাঘের জন্যে।

আমি বললাম, বসেনই যদি, তাহলে টিলায় বসবেন না, আমার অনুরোধ।

ভেবে দেখব।

টেড বলল, একজন লোক দিন, যাতে দিনে দিনে এস-ডি-ওর কাছে যেতে পারে। এস-ডি-ও আবার ডি-এমকে জানাবেন তবে তো ম্যান-ইটার ডিক্লেয়ার করতে পারবেন।

লোকের কি অভাব ? লোক দিয়ে দিচ্ছি দেড়-বোঝা। আপনি চিঠি লিখে দিন।

টিকায়েত বলল।

টেড টিরিদাদাকে কাগজ আনতে বলল।

টিরিদাদা কাগজ আনলে চিঠি লিখে সই করল, আমাকেও সই করতে বলল। টিকায়েতকে বলল সই করতে গ্রামের লোকেদের হয়ে।

টিকায়েত লেখাপড়া জানে না। ডানহাতের ইয়া মোটকা বুড়ো আঙুলে কালি লাগিয়ে টিপসই দিল সে।

তারপরেই উঠে পড়ে বলল, আমি যাই। মাচা বাঁধার বন্দোবস্ত করি গিয়ে।

টেড বলল, তা যান। আমরা আজ খুব ঘুমোব। কাল আপনাকে দাহ করতে অনেক মেহনত হবে তো ! যা ঘি আছে আপনার শরীরে ! পুড়তে অনেক সময় লাগবে।

টিকায়েত হাসি হাসি মুখে বলল, চলি।

বলেই, ঘোড়ার দিকে এগোতে গেল।

টেড বলল, একটু দাঁড়ান। আপনিই তো গত বছরে বাঘটাকে গুলি করেছিলেন। কোথায় লেগেছিল গুলি ? আপনি কি জানতেন না যে, গরমে যখন পিপাসার্ত জানোয়ারেরা জল খেতে আসে তখন তাদের ঐভাবে মারা বে-আইনী ?

টিকায়েত হেসে বলল, জঙ্গলে আবার আইন কী ? আমার এখানে আইন আমি বানাই। আমি যা করি, তাইই আইন। আমরাই আইন, আমি ইচ্ছেমতোই ভাঙতে পারি। তার জন্যে কারও কাছে জবাবদিহি করতে রাজী নই। সে রকম বাপের ব্যাটা নই আমি। জান্‌ভি যায়গা তব্‌ভি নেহী ! কড়্‌ভি নেহী।

তা ভাল। টেড বলল, কিন্তু বাঘটাকে আহত করে আপনিই তো বুড়ি আর মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে দায়ী হলেন। আপনাকে আপনার প্রজারা খুনের দায়ে দায়ী করতে পারে। করছেও হয়তো মনে মনে।

টিকায়েত কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, দেখুন, আপনাদের সঙ্গে ফাল্‌তু কথা বলার সময় আমার নেই। আমার রাজত্বে আপনারা অতিথি, তাই ভাল ব্যবহার করছি। আমি দিগা টিকায়েতের বেটা। আমার বাবা ডাকাত ছিল। তার ভয়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। আমাকে আপনারা ভয় দেখাবেন না। আমার রক্ত ভয় কাকে বলে তা জানে

না। এই জঙ্গলের আমিই রাজা। আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না আমার কথা, কী আমি বলতে চাচ্ছি। কিন্তু শুধু এই কারণেই বাঘটাকে আমারই মারতে হবে। নইলে আমার ইজ্জৎ থাকবে না।

একটু চুপ করে থেকে টিকায়েত আবার বলল, এই টাঁড়বাঘোয়া যতদিন প্রজার মতো আমার রাজত্বে ছিল, ওকে কিছুই বলিনি। গত বছরে আমার একটা ঘোড়া খেয়েছিল, তাইই ভেবেছিলাম শাস্তি দেওয়া দরকার। এবার আমার দুজন প্রজাকে ও মেরেছে !

একটু চুপ করে থেকে বলল, সমঝা না, এক জঙ্গলে দুজন রাজা থাকতে পারে না। হয় আমি থাকব ; নয় টাঁড়বাঘোয়া থাকবে। আপনাদের সঙ্গে আমার কোনও ঝগড়া নেই। দয়া করে আমার কথাটা বুঝুন। এটা আমার সম্মানের ব্যাপার। আমাকে আগে চেষ্টা করতে দিন। আমি না পারলে বা আপনাদের অনুমতি দিলে তখনই আপনারা মারবেন।

টেড বলল, তা হয় না। আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। প্রথমত একনলা বন্দুক দিয়ে অতবড় বাঘকে আপনার মারতে যাওয়াটাই বোকামি। দ্বিতীয়ত গ্রামের লোকরা আমাদের ডেকে এনেছে—তাদের এতবড় বিপদের মধ্যে ফেলে আমরা চলে তো আর যেতে পারি না।

টিকায়েত বলল, বাঘ কি কেউ শুধুই বন্দুক দিয়ে মারে ? আমার বন্দুকের গুলির সঙ্গে আমার টিকায়েতের রক্ত, আমার রাগ, আমার ঘেন্না, সব কিছুই তো গিয়ে লাগবে টাঁড়বাঘোয়ার গায়ে। সে যত বড় বাঘই হোক না, আমার চোখে চোখ রাখতে পারবে ? পারে কোনও প্রজা রাজার চোখে চোখ রাখতে ? আমার কাছে এলেই ও ভয়েই মারা যাবে। সামনাসামনি এলে হয় একবার।

আমরা টিকায়েতের কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। অদ্ভুত মানুষ। এরকম মানুষ আমরা কেউই দেখিনি আগে। পড়িওনি কোনও বইয়ে।

টেড বলল, তাইই যদি হবে, তাহলে গত বছর আপনার গুলি খেয়ে ও বেঁচে গেল কী করে ? এমন গুলিখোর বাঘকে প্রজা বানালেনই বা কেন ?

টিকায়েত মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, ও আমাকে দেখতে পায়নি। আমিও ওকে দেখতে পাইনি। সেদিন আমার ছোটছেলের জন্মদিন ছিল। বাড়ির লোককে কোটরা হরিণের মাংস খাওয়াব কথা দিয়ে জলের কাছে গিয়ে বসেছিলাম। বেলা পড়ে এসেছিল। প্রচণ্ড গরমে, ক্লান্তিতে, ঘুম ঘুম এসে গেছিল। হঠাৎ দেখি, জলের পাশের পুটুস ঝোপের আড়ালে কোটরা হরিণের মতো লালচে কী একটা জানোয়ার এসে দাঁড়িয়েছে। কখন যে এল জানোয়ারটা তা বুঝতেই পারিনি। হরিণই হবে ভেবে গুলি করে দিয়েছিলাম বন্দুক তুলেই। গুলি করতেই বিকট চিৎকার করে এক বিরাট লাফ দিয়ে যখন সে চলে গেল, তখন দেখি টাঁড়বাঘোয়া।

কোথায় গুলি লেগেছিল ?

জানি না। বোধহয় পায়ের থাবা-টাবাতে।

কি গুলি দিয়ে মেরেছিলেন ?

তখন আমার বিলিতি বন্দুক ছিল না। মুঙ্গেরি গাদা বন্দুকে তিন-আঙুল বারুদ কষে গেদে সামনে সীসার গুলি পুরে ঠুকে দিয়েছিলাম।

আমি বললাম, আপনি একটু আগেই বললেন যে, টাঁড়বাঘোয়াকে আপনার ঘোড়া খাওয়ার জন্য শাস্তি দিতে গেছিলেন।

আমার ঘোড়া এবং বস্তীর ধোপার গাধা। ওরা সকলেই আমার প্রজা। তাই আমারই হল। শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাঘ ভেবে তো আর গুলি করিনি। কোট্‌রা ভেবেই করেছিলাম। অত কাছ থেকে গুলি লাগলে কোট্‌রা চিৎপাত হয়ে পড়ে যেতই। বাঘ জানলে, ভাল করে নিশানা নিয়ে মোক্ষম জায়গাতেই মারতাম। তাহলে ওখানেই তাকে শুয়ে থাকতে হত। তখন আমার রাশিচক্রের একটু গোলমাল চলছিল। এখন তা কেটে গেছে।

বলেই বলল, এই দেখুন, একটা মাদুলী ধারণ করেছি, বলেই, পাঞ্জাবীর ভিতর থেকে সোনার হারে বাঁধা পেল্লায় একটা মাদুলী দেখাল।

টেড বলল, আমাদের শুভ কামনা রইল। কিন্তু আপনি তাহলে তিনদিন সময় নিন। তিনদিনের মধ্যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ শেষ না হলে আমরা এই উলুখাগড়ারাও কিন্তু নেমে পড়ব যুদ্ধে। আপনার কথাটা আমরা বুঝেছি, বোঝবার চেষ্টা করছি বলেই, এই কথা বলছি। এবং আগে আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি। আপনার বাঘ আপনিই মারুন।

টিকায়েত এতক্ষণে হাসল।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, বজরঙ্গবলী আপনাদের ভাল করুন। আমি জানতাম, আমার কথা আপনারা বুঝবেন। আপনাদের বহত্ মেহেরবানী। জয় বজরঙ্গবলীকা জয় !

এই বলে তো ঘোড়ায় গিয়ে উঠল টিকায়েত। বিরাট সাদা ঘোড়াটার ঘাড়ের কেশর ফুলে উঠেছিল। সেই ঘোড়ার উপর এই পলাশবনা গ্রামের টিকায়েতকে রোদে সত্যি সত্যিই একজন রাজার মতোই দেখাচ্ছিল।

ঘোড়ার লাগাম টেনে টিকায়েত বলল, আপনারা কিন্তু আমার অতিথি। খাওয়া-দাওয়া, সব আমারই দায়িত্ব। এখানে আপনারা রান্না করে খেলে আমি খুবই দুঃখ পাব। রান্না যদি একান্তই করেনই, তবু রসদ কিন্তু সব আমিই পাঠিয়ে দেব। এইটুকু নিশ্চয় করতে দেবেন আমাকে।

জবাবে আমাদের কিছু বলার সুযোগ না-দিয়েই টিকায়েত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সেই টিলার দিকে, যেখানে বুড়ি পড়ে রয়েছে।

আমি বললাম, রাজা-রাজড়ার ব্যাপারই বটে। ঘোড়ায় চড়ে, শোভাযাত্রা করে কেউ মানুষখেকো বাঘ মারতে যায় শুনেছিস কখনও টেড ?

রোদের মধ্যে লাল ধুলো উড়িয়ে দুল্‌কি-চালে-চলা সাদা ঘোড়ার পিঠে বসা টিকায়েত জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টেড সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে হঠাৎ বলল, খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু মানুষটা।

আমি বললাম, ভীষণ দাম্ভিক। এত গর্ব ভাল নয়।

টেড বলল, আমি তোর সঙ্গে একমত নই। গর্ব না থাকলে কী নিয়ে মানুষ বাঁচে। গর্বর মধ্যে দোষ নেই। কিন্তু টিকায়েতের গর্বর কারণটার মধ্যে কোনও গুণও নেই। এই গর্ব ভাল কারণে, ভাল কাজের জন্যে হলে আরও ভাল হত।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, জানিস, আমার মনে হয়, গর্ব ব্যাপারটার নিজেরই আলাদা একটা গুণ আছে। একটা বেগও আছে। যার গর্ব আছে, তার দায়িত্ব অনেক, সেই গর্বকে বাঁচিয়ে রাখার। আর এই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে করতেই এ সব মানুষ অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। তাই না ? দেখিস, মানুষটার এমন জেদ, ঠিক বাঘটা মেরেই দেবে। আমাদের কপালে আর মানুষখেকো মারা হল না। মিছিমিছিই এলাম এতদূর তল্পি-তল্পা নিয়ে।

টিরিদাদা চায়ের কাপ তুলে নিতে এসেছিল, হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলল, বাঘে খাবে ওকে। বাঘে খাবে।

টেড ধমক দিল, কেন বাজে কথা বলছ টিরিদাদা ?

টিরিদাদা বলল, বাজে কথা নয়। ও যখন কথা বলছিল, আমি তখন যমদূতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি ওর একেবারে পিছনে। ওর আয়ু শেষ।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, যত্ত সব বাজে কুসংস্কার তোমার টিরিদাদা।

টিরিদাদা অভিমানের গলায় বলল, আরে ! আমি দেখলাম যে নিজের চোখে।

তারপর গলা নামিয়ে বলল, টিকায়েত হচ্ছে দিগা টিকায়েতের বেটা আর আমি হচ্ছি মিরি-পাহানের বেটা। আমিও সব দেখতে পাই। সত্যিই দেখেছি যমদূতকে ! বিশ্বাস করো।

টিরিদাদার কথা যেন শোনেইনি এমনভাবে অন্যমনস্ক গলায় টেড দূরে তাকিয়ে হঠাৎই বলল, তোদের দেশে এইরকম গর্বিত, উদ্ধত সব মানুষ থাকতেও ব্রিটিশরা তোদেরে পরাধীন করে রাখল যে কী করে এতবছর তা ভাবলেও অবাক লাগে।

॥ ৩ ॥

টিকায়েত একটা শিশু গাছে মাচা বেঁধে বুড়ির মৃতদেহের কাছে বসেছিল গিয়ে। তবে, গাছটা থেকে মড়িটা বেশ দূরে।

যে-লোকরা টিকায়েতকে মাচায় চড়িয়ে ফিরে এসেছিল বিকেল বিকেল

তাদের মুখেই শুনলাম যে, টিকায়েত মড়ির উপরে বাঘকে মারবার আশা রাখে না। মড়িতে যাওয়া অথবা ফেরার পথেই বাঘকে মারবে এমন আশা করছে সে। একনলা গ্রীনার বন্দুকের নলের সঙ্গে তিন ব্যাটারীর টর্চ লাগিয়ে নিয়েছে ক্ল্যাম্পে। গ্রীনার নাম-করা বন্দুক। ডাবলিউ, ডাবলিউ, গ্রীনার। ইংরেজদের কোম্পানী। টিকায়েতের বন্দুকের বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা ব্যারেল। রেঞ্জও ভাল। বাঘ যদি কাছাকাছি আসে তবে লেথাল্ বল্-এর গুলি বাঘের ভাইটাল জায়গায় লাগলে বাঘ যে মরবে না, এমন কথা বলা যায় না।

আস্তে আস্তে পলাশবনার পশ্চিম দিগন্তে লালটুলিয়া পাহাড়ের আড়ালে সূর্য বিদায় নিল। আমি সারাদিন ঘুমিয়েছি। রাতে আমিই পাহারা দেব। টেড ঘুমোবে ঘরের বাইরে চৌপাইতে। তেঁতুলতলাতে ছায়া জমবে ঘন হয়ে কৃষ্ণপক্ষের রাতে। একটু চাঁদও উঠবে শেষ রাতে। তাই সেখানে ঘুমোলে ঘুম চিরঘুমও হতে পারে। ঘরের মধ্যে টিরিদাদা ঘুমোবে।

কিন্তু টিরিদাদা কি ঘুমোতে পারবে? টিকায়েতের পাঠানো যবের ছাতু ঘি, কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে যে লিট্টি বানিয়েছিল, তা খেয়ে এই গরমে আমাদের তো প্রাণ আঁই-ঢাঁই। আমার তাও দেশী পেট—মামাবাড়ি গিরিডিতে লিট্টি-ফিট্টি খাওয়া অভ্যেস আছে। কিন্তু বেচারী টেড-এর অস্ট্রিয়ান পেটে এই লিট্টি যে কোন্ আলোড়ন তুলছে তা টেডই হাড়ে হাড়ে বুঝছে। দেখি সে পেটে ভিজে গামছা জড়িয়ে চৌপাইতে বসে হাঁসফাঁস করছে আর টিরিদাদাকে দোষারোপ করছে।

রাত আটটা বাজতে না বাজতেই গ্রামের সমস্ত শব্দ মরে গেল। ভাঁটা পড়লে, সুন্দরবনের ট্যাঁকে যে এক গভীর, বিষণ্ণ অথচ যে-কোনও সাংঘাতিক ঘটনার জন্যে তৈরি এক নিভৃত নীরবতা নেমে আসে তার সঙ্গে এই মানুষখেকো বাঘের রাজত্বের স্তব্ধ নীরবতার তুলনা চলে। গ্রামের কুকুরগুলোও যেন কেমন ভয়ার্ত গলায় ডাকছে। একটা বড় হুতোম প্যাঁচা উড়ে গেল দুরগুম্ দুরগুম্ দুরগুম্ করে ডাকতে ডাকতে তেঁতুলতলার অন্ধকার ছেড়ে। দূরে, দুটি ছোট পেঁচার ঝগড়া বাধল যেন কী নিয়ে। কিঁচি কিঁচি কিঁচর্ কিঁচি কিঁচি কিঁচর্ আওয়াজ করতে করতে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল ওরা। কিন্তু মনে হল, ওদের মামলা সেই রাতে নিষ্পত্তি হওয়ার নয়।

টিরিদাদা ঘর থেকে হাই তুলে বলল, হাঁয় রাম! হায় রাম!

তারপরই সুর করে গুন্‌গুনিয়ে তুলসীদাস আবৃত্তি করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর টিরিদাদা এবং টেড দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘরের বাইরে দেওয়ালের কাছে আমার চৌপাইটা টেনে এনে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকলাম আমি, আমার দু উরুর উপরে আমার প্রিয় রাইফেলটা আড়াআড়ি করে রেখে। এই রাইফেলটা টেড-এর দেশে তৈরি। ম্যানলিকার শুনার। ক্যালিবার পয়েন্ট থ্রি-সিক্স। এই দিয়ে

আমি ছায়াকেও মারতে পারি, অন্ধকারে দৌড়ে যাওয়া জংলি ইঁদুরকেও, এমনই বোঝা-পড়া হয়ে গেছিল আমার রাইফেলটার সঙ্গে বারো বছর বয়স থেকে। এই রাইফেলটা যদি কথা বলতে পারত তাহলে তোমাদের অনেক অনেক গল্প বলতে পারত। গল্প নয়; সত্যি কথা সব।

দূরের মহুয়া গাছগুলোর নীচে শম্বরের দল মহুয়া কুড়িয়ে খাচ্ছে। হাওয়াতে মহুয়ার গন্ধ আর করৌঞ্জের গন্ধ ভাসছে। হঠাৎ মহুয়াতলাতে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বোধহয় ভাল্লুকদের সঙ্গে মহুয়ার ভাগ নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে শম্বরদের।

তোমরা কি কখনও ভাল্লুকদের গাছে চড়তে দেখেছ? দেখলে হেসে কূল পাবে না। ওরা পেছন দিক দিয়ে গাছে ওঠে। কেন যে অমন করে ওঠে তা জিগগেস করার ইচ্ছে আছে অনেকদিনের কিন্তু একটাও বাংলা বা ইংরিজী জানা ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা-না-হওয়ায় জিগগেস করা হয়ে ওঠেনি। ওদের নিজেদের ভাষায় শব্দ বড় কম এবং আমাদের অভিধানে তাদের মানেও লেখা নেই।

টিকায়েত কী করছে এখন কে জানে। এমন অন্ধকার চারদিকে যে, মনে হয় অন্ধকার মুখে-চোখে থাপ্পড় মারছে। দু'হাত দিয়ে অন্ধকারের চাদর সরিয়ে দেখতে চাইলেও কিছুই দেখা যায় না।

গরমের দিনে জঙ্গলে হাওয়া বয় একটা। শুকনো লাল হলুদ পাতা ঝরিয়ে পাথরে আর রুখু মাটিতে গড়িয়ে সেই হাওয়া ঝর্ ঝর্ সড় সড় শব্দ তুলে বেগে বয়ে যায় দমকে দমকে। তখন টিরিদাদার ভাষায়: যত সব কাটনেওয়ালা জানোয়ারদের চলাফেরার ভারী সুবিধা। শব্দের মধ্যে, মর্মরধ্বনির মধ্যে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায় না কি না অন্য অহিংস্র জানোয়ারেরা!

নিস্তব্ধ বনে জঙ্গলে যখন হাওয়া থাকে না, নিথর হয়ে থাকে যখন আবহাওয়া, তখন একটা ঝরা-পাতা মাটিতে পড়ার আওয়াজকেও বোমা পড়ার আওয়াজ বলে মনে হয়। জংলী ইঁদুর বা গিরগিটি মরা ঘাস পাতার উপর দিয়ে দৌড়ে গেল বুঝি। যখন চোখ কোনও কাজে লাগে না তখন কান দিয়েই দেখতে হয়।

এই অন্ধকার, তারা-ফোটা হালকা নীল সিল্ক্ শাড়ির মতো উদ্বেল আকাশ যেন উড়তে থাকে মাথার উপরে আদিগন্ত চাঁদোয়ার মতো। হাওয়াতে তারারা কাঁপে, মনে হয় মিটমিট্ করে। দারুণ লাগে তখন তাকিয়ে থাকতে। অন্ধকারের এক দারুণ পুরুষালী মৌনী রূপ আছে। তোমরা যদি মনের সব জানলাগুলো খুলে দিয়ে, ইন্দ্রিয়ের আন্তরিকতা দিয়ে সেই রূপকে অনুভব করার চেষ্টা করো, তাহলে নিশ্চয় তা অনুভব করতে পারবে। এমন সব অন্ধকার রাতেই তো আলোর তাৎপর্য, আলোর আসল চেহারাটা বোঝা যায়। অন্ধকার নইলে, আলো আলোকিত করত কাকে?

দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে এসব ভাবছি। টেড রীতিমত নাক ডেকে

ঘুমোচ্ছে। ওর নাক ডাকলে অদ্ভুত একটা ফিচিক্ ফিচিক্ করে আওয়াজ হয়। সাহেবদের ব্যাপারই আলাদা। আর ঘরের মধ্যে টিরিদাদা! ঐ রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা হলে কী হয়, ওর নাক-ডাকা শুনলে মনে হয় ধাঙ্গড়পাড়ার কোনও কোঁৎকা শুয়োরকে বুঝি কেউ জলে ডুবিয়ে মারছে।

টাঁড়বাঘোয়া যদি কাছাকাছি এসে পড়ে তবে নির্ঘাত টিরিদাদার জন্যেই আসবে এবং তাহলে টিরিদাদার কারণেই বাঘকে গুলি করার সুযোগ পাব।

কিন্তু বাঘ যদি সত্যিই এসে পড়ে তাহলেও কি গুলি করা মানা! টিকায়েতকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। কথা ছিল, আমরা বাঘ মারতে যাব না তিনদিন। কিন্তু বাঘ যদি আমাদের মারতে আসে তাহলে কী করব সে কথা আমাদের "জেন্টলমেনস্ এগ্রিমেন্টে" লিখতে ভুল হয়ে গেছে। মহা চিন্তার কথা হল।

জঙ্গলের মধ্যে ডিউ-উ্য-ডু-ইট্ পাখি ডাকছে উড়ে উড়ে। ঐ পাখিগুলো যখন আকাশে উড়ে বেড়ায় তখন ওদের লম্বা পা দুটি শূন্যে আলতো হয়ে ঝোলে লট্‌পট্ করে, ভারী মজার লাগে দেখতে। এদের চোখ এড়িয়ে রাতের জঙ্গলে কোনও কাট্‌নেওয়ালা জানোয়ার অথবা মানুষের চলাফেরা করা ভারী মুশকিল। কী দেখল পাখিগুলো কে জানে?

এখন ঐ টিলার কাছে অন্ধকার কেমন ঘন হয়েছে তাই ভাবছিলাম। টিকায়েত মাচাতে একাই বসেছে। তবে, দুপাশের দুটি গাছে তীর-ধনুক নিয়ে তার দুই অনুচর বসেছে। টিকায়েতের মাচাটাই নাকি সবচেয়ে নিচু। নিচু না হলে গুলি করতে অসুবিধা হয়। তবে বেশি নিচু হলে বিপদও থাকে। বিশেষ করে, মানুষখেকো বাঘের বেলাতে। সেই রঙ্গমঞ্চে এখন কী প্রতীক্ষা আর তিতিক্ষার সঙ্গে বসে আছে পলাশবনা গ্রামের রাজা আমাদের টিকায়েত, কে জানে!

বসে বসে এই সব ভাবছি। আর ঘুমিয়ে যাতে না পড়ি সে কথা নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, ঠিক এমন সময় আমাদের সোজা সামনে প্রায় মাইল খানেক ভিতরে গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে বাঘের ডাক শোনা গেল। উম্—আঁও—

গভীর রাতের সমস্ত শব্দমঞ্জরী, পিউ-কাঁহা পাখির ক্রমাগত ডাক, পেঁচাদের চেঁচানি সব মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল। এই জন্যেই বাঘকে বলে, বনের রাজা। সে কথা বললে বনের সব প্রাণী চুপ করে থাকে সম্ভ্রমে : সম্মানে।

বাঘ যেদিক থেকে ডাকল সেই দিকে তাকিয়ে আছি, ঠিক সেদিক থেকে অন্য একটা বাঘের ডাক ভেসে এল। এই ডাকটা অনেক বেশি গম্ভীর, ভারী এবং জোর। মনে মনে ভাবলাম, ঐ দ্বিতীয় বাঘটাই টাঁড়বাঘোয়া।

হঠাৎ দেখি টেড উঠে বসেছে চৌপাইয়ে।

আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ কচলে বলল, বাঘেরা কি মিছিল করে বেরুল নাকি?

আমি বললাম, শ্—শ্—শ্—

এমন সময় প্রথম বাঘটা আবার ডাকল এবং ডেকে দ্বিতীয় বাঘটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। একদল হনুমান হুপ্—হুপ্—হুপ্ ডাক ছেড়ে পাতা-ঝরা গাছেদের ডালে ডালে ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিল।

টেড বলল, দুজনে মিলে বুড়ি আর টিকায়েত যেদিকে আছে সেদিকে যাচ্ছে। বুঝলি।

আমি বললাম, তাই-ই তো মনে হচ্ছে।

টেড বলল, টিকায়েত দুটো বাঘকে সামলাবে কী করে একা? তারপর মাচাও তো শুনলাম বেশি উঁচু করেনি।

আমি বললাম, সে সেই-ই বুঝবে। তুই চুপ করে শুয়ে পড় না।

কেন? চল্ না আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়ি। বাঘেদের আওয়াজ যখন শোনা গেল তখন চল্ স্টক করি।

আমি বললাম, এই অন্ধকারে? মানুষখেকো বাঘের পেছনে পায়ে হেঁটে! দিনে হলে তাও কথা ছিল।

তারপরই বললাম, আমার একটাই জীবন। জীবনটাকে আমি খুবই ভালবাসি। আত্মহত্যার মধ্যে আমি নেই।

টেড বলল, তুই ভীতু।

তবে তাই।

টেড আবার শুয়ে পড়ল।

ডানদিক থেকে একটা কোট্‌রা হরিণ ক্রমাগত ডাকতে লাগল ভয় পেয়ে। তার ব্বাক্—ব্বাক্—ব্বাক্ ডাক জঙ্গলে-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে লাগল আমার মাথার মধ্যে। ডিউ-উ্য-ডু-ইট্ পাখিগুলো ডিউ-উ্য-ডু-ইট্, ডিউ-উ্য-ডু-ইট্ করে ডাকতে ডাকতে ডানদিকে উড়ে উড়ে সরে যেতে লাগল।

চোখ কান সজাগ রেখে আমি বসে রইলাম। একটু পরই আবার টেডের ফিচিক্ ফিচিক্ করে নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলাম। টিরিদাদার নাক ডাকা এখন বন্ধ। কী হল কে জানে।

ডিউ-উ্য-ডু-ইট পাখিগুলোর ডাক ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। ওরা অনেক ডানদিকে চলে গেছিল ততক্ষণে। কে জানে, বাঘ দুটো এখন কোথায়? টিকায়েতই বা কী করছে? অত নিচুতে মাচাটা বাঁধা ঠিক হয়নি। দু দুটো বড় বাঘ। তায় মানুষখেকো।

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম, রাত তিনটে বেজে গেছে। আমার বসে থেকে থেকে খুবই ঘুম পেয়ে গেছিল। শেষ রাতের ফুরফুরে হাওয়া, মহুয়া আর করৌঞ্জের মিষ্টি গন্ধ; ঘুমের দোষ নেই। পাছে ঘুমিয়ে পড়ি, তাই উঠে পায়চারী করতে লাগলাম রাইফেল হাতে। একবার পেছন ফিরতেই মনে হল একটা ছায়া যেন সরে গেল তেঁতুলতলার পাশ থেকে। টর্চ ফেলে দেখলাম,

শেয়াল। একজোড়া। আলো পড়তেই ওদের দু-জোড়া চোখ জ্বলে উঠল লাল হয়ে। পরক্ষণেই ওরা চলে গেল।

আস্তে আস্তে পুবের আকাশের অন্ধকারের ভার হাল্কা হতে লাগল। অন্ধকারেরও যে কতরকম রঙ, কতরকম ঘনতা, তা ভাল করে নজর করে দেখলে দেখা যায়। অন্ধকারের গায়ের কালো, ফিকে হতে হতে জোলো দুধের মতো সাদাটে হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, তারপর মিহি সিঁদুরের হালকা গুঁড়োর মতো রঙ লাগবে আকাশের পুবের সিঁথিতে। আরও পরে, আসামের পাকা কমলালেবুর রঙের মতো লাল হবে। তারপর রোদ উঠলে আলোর রঙকে আর আলাদা করে চেনা যাবে না। সূর্যের সাত রঙ মাখামাখি হয়ে উজ্জ্বল দিনের শরীরে বিশ্বচরাচরকে আলোকিত করে তুলবে। রাতের পাখিরা, রাতের প্রাণীরা ঘুমুবে; দিনের পাখি, প্রজাপতি, নানান প্রাণী জেগে উঠবে। ভোরের মিষ্টি ঠাণ্ডায় আর দিনের আলোর অভয়-আশ্বাসে কচি পাতা ছিঁড়ে খাবে চিতল হরিণের দল। শম্বরেরা গাঢ় জঙ্গলের ভিতরে কোনও নালার ছায়াতে গিয়ে ঢুকবে। শুয়োরেরা নেমে যাবে পাহাড়তলীর খাদে। রাতভর পেটভরে খাওয়ার পর চিৎ-পটাং হয়ে পড়ে থাকবে এ ওর ঘাড়ে ঠ্যাং তুলে দিয়ে।

ভোর হয়ে আসছে, এমন সময় পরপর দু-দুটো গুলির আওয়াজ কানে এল। প্রথম গুলিটা থেকে পরের আওয়াজটা দু মিনিট মতো ব্যবধানে হল।

তারপর সব চুপচাপ।

টেড গুলির শব্দে লাফিয়ে উঠল। টিরিও বাইরে এল। কথা না বলে, কাঠের উনুনে চায়ের জল চাপাল। তারপর বালতিতে করে জল আর হাতে করে ঘটি নিয়ে এল আমাদের জন্যে।

টেড বলল, দেখলি, তোকে বলেছিলাম, মিছিমিছিই এলাম আমরা। টিকায়েতই মেরে দিল দু-দুটো বাঘ। তার কথা রাখল। এবার চল্, টিকায়েতের মাঠরী আর চা খেয়ে মহুয়ামিলনে ফিরি আমরা। আর এখানে থেকে কী করব?

আমি বললাম, গাঁয়ের লোকেরা একটা শম্বর মেরে দিতে বলেছিল যে, ওদের। বলেছিল্লা, বহুদিন ভাল করে মাংস খায় না ওরা! কথা দিয়েছিলাম, একটা শম্বর মেরে দেব ওদের খাওয়ার জন্য। মাংস ওদের দিয়ে, আমরা চামড়াটা নিয়ে চলে যাব।

টেড বলল, বুঝলি, এবার একটা স্যুটকেশ বানাব আমি, তুই শম্বর মারলে।

তারপর বলল, কিন্তু এই এমনভাবে বলছিস যে, মনে হচ্ছে গাঁয়ের লোকে তোর জন্যে যেন শম্বর গাছতলাতে বেঁধে রেখেছে?

আমি বললাম, বেঁধে রাখবে কেন? বাঘ মরে গেছে তো আর ওদের জঙ্গলে যেতে ভয় নেই কোনও। ওরা জঙ্গলের সব খবরই রাখে। জানোয়ারদের বাহান্ সাহান্-এরও। ওরা হাঁকোয়া করবে আর জায়গামতো আমরা রাইফেল

নিয়ে দাঁড়ালেই মারা পড়বে শম্বর।

তা হতে পারে।

বলেই, টেড বলল, আমি তাহলে একটু ঘুরে আসছি।

তারপর বলল, টিরিদাদা এক ঘটি জল দাও জঙ্গলে ঘুরে আসি।

আমি বললাম, খালি হাতে যাস না, রাইফেলটা নিয়ে যা।

টেড বলল, রাইফেল আর কী হবে? বাঘ তো মরেই গেছে।

টেড আর টিরিদাদা ঘুম থেকে উঠে পড়ার পর আমার দু চোখে ঘুম যেন ভেঙ্গে এল।

চৌপাইটা টেনে নিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম।

টিরিদাদা চা আর মাঠরী এনে ডাকল আমাকে।

চোখ মেলে দেখলাম, টেড ফিরে আসছে জঙ্গল থেকে।

হঠাৎ টিরিদাদা দূরে চেয়ে বলল, ও কী? কারা অমন দৌড়ে আসছে?

টেড ও আমি তাকালাম ওদিকে। ততক্ষণে গ্রামের অনেক লোক আমাদের কাছে চলে এসেছে। আমাদের যখন সকাল, গ্রামের লোকের তখন অনেক বেলা। দুটো লোক ডানদিক থেকে দৌড়ে আসছে আর টিকায়েতের সাদা ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে কে যেন নিয়ে চলেছে ঐ লোকগুলোর দিকেই। টিকায়েতের সহিস হবে।

ছুটে-আসা লোক দুটোর সঙ্গে যখন ঘোড়া আর সহিসের দেখা হল তখন ওরা সকলে মিলে একসঙ্গে আমাদেরই দিকে জোরে ফিরে আসতে লাগল। সহিস, যে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ঐদিকে এতক্ষণ, সে-ও ঘোড়ার পিঠে উঠে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের আগে আগেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছে গেল।

ঘোড়া থেকে নেমেই সহিস বলল, খাত্‌রা বন্ গীয়া সাহাব। খাত্‌রা বন্ গীয়া। ভারী খাত্‌রা।

গ্রামের লোকেরা উঁচু নিচু নানা স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, খাত্‌রা বন্ গীয়া হো ও-ও-ও-ও, খাত্‌রা বন্ গীয়া।

আর সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে পিল্ পিল্ করে ছেলে বুড়ো মেয়ে সবাই দৌড়ে এল এদিকে।

সহিস, আমাদের দুঃসংবাদটা দিয়েই জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল টিকায়েতের বাড়িতে খবরটা দিতে। ততক্ষণে সেই ছুটে আসা লোক দুটোও আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে।

ওরা এসেই ধ্বপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল। ওরা যা বলল, তার সারমর্ম হল এই—

বাঘ দুটো সারারাত টিলার অন্য পাশে ছিল। ওদের সামনে দিয়ে একবারও যায়নি। ওদের অনেক পেছন দিয়ে ঘুরে গিয়ে টিলার পেছনে পৌঁছেছিল, তাই

টিকায়েতের গুলি করার সুযোগ আসেনি। টাঁড়বাঘোয়া নয়, অন্য বাঘটা বোধহয় কোনও হরিণ-টরিণ মেরে থাকবে। সেটাকে ওরা দুজনে মিলে টেনে নিয়ে গেছিল টিলার পেছনে। কোনও কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছিল ওরা। টিলার কাছাকাছি অন্ধকার এত ঘন ছিল যে, চোখে নিজেদের হাত-পা-ই ওরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছিল না অন্ধকারে। দূরের কিছু দেখার কথাই ওঠে না। সারারাত বাঘ দুটো জানোয়ারটার মাংস ছেঁড়াছেঁড়ি করে হাড় কড়মড়িয়ে খেয়েছে আর মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ করেছে। বুড়ির মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল সেখানে কিন্তু একবারও আসেনি একটা বাঘও, সারা রাতে।

যখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, তখন টাঁড়বাঘোয়া আস্তে আস্তে, হয়তো মুখ বদলাবার জন্যেই বুড়ির পা আর মাথা যেখানে পড়েছিল সেইদিকে এগিয়ে এসে বুড়িকে খেতে শুরু করল। বিরাট বাঘটাকে তখন আবছা আলোতেও দেখা যাচ্ছিল। আবছা-আলোতে খুব ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে নিশানা নিয়ে টিকায়েত গুলি করে। গুলি লেগেছিল টাঁড়বাঘোয়ার গায়ে। ঠিক কোন্ জায়গায় তা ওরা বলতে পারবে না।

গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটা একটা সোজা লাফ দিয়ে উপরে উঠল প্রায় পনেরো ফিট। তার পরে ধপ্লাস্ করে পড়ল নীচে, ডিগবাজী খেয়ে। পড়েই, আর এক লাফে টিলার আড়ালে চলে গেল একটুও শব্দ না করে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনী বেরিয়ে এসে যেখানে টাঁড়বাঘোয়ার গায়ে গুলি লেগেছিল, ঠিক সেখানেই এসে দাঁড়াল। টিকায়েত ততক্ষণ ফোটা গুলিটা বদলে নিয়েছিল। বাঘিনী এসে দাঁড়াতেই টিকায়েত আবার গুলি করল। চমৎকার গুলি। গুলিটা পাশ ফিরে দাঁড়ানো বাঘিনীর বুকে লাগল। বুকে লাগতেই একবার যেন পড়ে যাচ্ছে বলে মনে হল বাঘিনীটা কিন্তু তারপরেই টিকায়েতের মাচা দেখতে পেয়ে জোরে কিছুটা নিচু হয়ে দৌড়ে এসেই সোজা লাফ মারল মাচার দিকে। গুলি পাল্টাবার সময়টুকুও পেল না আর টিকায়েত। দোনলা বন্দুক থাকলে মেরে দিত নিশ্চয়ই আরেকটা গুলি। কিন্তু এক লাফে সোজা এসে পড়ল মাচাতে তারপর টিকায়েতের গলা কামড়ে মাচা ভেঙে দুজনে নীচে পড়ল। নীচে পড়তেই, টিলার আড়াল থেকে টাঁড়বাঘোয়া জোরে দৌড়ে এসে টিকায়েতকে কামড়ে ধরল তারপর দুজনে টানাটানি করে তাদের চোখের সামনেই টিকায়েতের হাত-পা সব আলাদা করে ফেলল।

টেড বলল, বেঁচে ছিল টিকায়েত তখনও। বেঁচে আছে?

ওরা বলল, টিকায়েতের ঘাড় কামড়ে ধরতেই সে মরে গেছিল।

টেড আবার বলল, তোমরা তীর ধনুক নিয়ে কী করছিলে? মারতে পারলে না তীর? মজা দেখতে গেছিলে নাকি তোমরা?

প্রথম লোকটা বলল, যতক্ষণ বুঝিনি যে, টিকায়েত মরে গেছে ততক্ষণ মারিনি। যেই বুঝলাম যে, সে আর বেঁচে নেই তক্ষুনি আমরা দুজনেই সমানে

তীর মারতে লাগলাম। যদিও তখন চোখের সামনে ঐ দৃশ্য দেখে আমাদের বেহুঁশ অবস্থা। তবুও তিন-চারটে করে তীর লেগে থাকবে এক একটা বাঘের গায়ে।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, তারপর কী হল?

তারপর? বলেই, লোকটা চুপ করে থাকল।

দুটো লোকেরই চোখ মুখ দেখে মনে হল যে ওরা বোধহয় পাগল হয়ে গেছে, বা হয়ে যাবে এক্ষুনি।

একজন বলতে গেল, তারপর...

বলেই, থেমে গিয়ে দু হাত দিয়ে উঠোনের ধুলো মুঠিতে ভরে আবার ফেলতে লাগল।

অন্যজন থম্‌থমে নিচু গলায় বলল, তারপর টিকায়েতের একটা হাত শুধু ফেলে রেখে, টিকায়েতকে দু টুকরো করে দু জনে মুখে করে নিয়ে টিলার আড়ালে চলে গেল।

এইটুকু বলেই, লোকটা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ভয়ে আতঙ্কে ওরা দুজনেই তখন কাঁপছিল।

আমরাও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কী বলব, কেমন করে বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

টেড বলল, এখনও কি বাঘ দুটো ওখানেই আছে?

অন্য লোকটা বলল, তা কি করে বলব?

সেই সময় টিকায়েতের এগারো সন্তানের মধ্যে পাঁচজন হাজির হল এসে আমাদের সামনে। পাঁচটিই ছেলে, বড় ছেলেটির বয়স হবে চোদ্দ-পনেরো। সে কেঁদে হাতজোড় করে টেডকে বলল, সাহাব, মেরা বাবুজী কী খুন্‌কা বদ্‌লা লিজিয়ে আপলোগোঁনে। ইয়ে গাঁওকে যিত্‌না আদমি হ্যায়, যিত্‌না ধন-দৌলত হ্যায় সব আপলোগোঁকা দে দুংগা। বদ্‌লা লিজিয়ে সাহাব।

বলেই, ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল।

টিরিদাদা তখনও চা আর রেকাবীতে মাঠরী নিয়ে দাঁড়িয়েছিল স্ট্যাচুর মতো আমাদের পাশে।

টেড তাড়াতাড়ি গামছা ছেড়ে শর্টস আর খাকী বুশ কোট পরে নিল। নিয়ে ওর ফোর-ফিফ্‌টি-ফোর হান্ড্রেড ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা নিয়ে, বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বুক পকেটের খোপে খোপে ছটি গুলি ভরে নিল। দু ব্যারেলে দুটি ভরল। আমি তো তৈরিই ছিলাম। সারা রাত জেগে ছিলাম, এককাপ চা খেয়ে গেলে ভালই হত। কিন্তু তখন চা খাওয়ার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

কিন্তু টিরিদাদা ও গাঁয়ের লোকেরাও আমাদের জোর করল। বলল, কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই। ফিরতে ফিরতে রাতও হতে পারে।

ফিরতে যে না-ও পারি, সে কথা আর মুখে কেউই বলল না।

বলল, চা-এর সঙ্গে ভাল করে নাস্তাও করে যান।

নাস্তা-ফাস্তা করার মতো অবস্থা তখন একেবারেই ছিল না আমাদের। শুধু মাঠরী দিয়ে চা খেলাম। টিকায়েতেরই পাঠানো মাঠরী। এতক্ষণে আমরা যেভাবে মাঠরী খাচ্ছি সেইভাবে টাঁড়বাঘোয়া আর তার সঙ্গিনী টিকায়েতের শরীরটাকে খাচ্ছে হয়তো। ঈস্‌স্‌! ভাবা যায় না, জলজ্যান্ত লোকটা!

দুজনের কাঁধে দুটো জলের বোতল দিয়ে দিল টিরিদাদা। আমরা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এগোলাম।

কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের লোক দৌড়ে এসে আমাদের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সকলে বলল, ওর বৌকেই নিয়ে গেছিল টাঁড়বাঘোয়া প্রথম দিন।

লোকটার হাতে একটা মস্ত চকচকে টাঙ্গী। কাঁধে তীর ধনুক। ও বলল, আমাকে সঙ্গে নিন আপনারা। আমি টাঁড়বাঘোয়ার মাথায় নিজে হাতে টাঙ্গী মারব। টাঙ্গী মেরে আমার বাসমতীর মৃত্যুর বদলা নেব।

আমরা চলতে চলতেই ওকে অনেক বুঝিয়ে, তারপর ফেরৎ পাঠালাম।

টিরিদাদা গ্রামের শেষ পর্যন্ত এল। আমরা দুজনেই ওর মুখের দিকে চাইলাম।

বললাম, চলি টিরিদাদা।

টিরিদাদার মুখটাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল।

কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না। বোধহয় ও আমাদের যেতে মানা করবে ভেবেছিল। তারপর গ্রামের এতগুলো লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে, টিকায়েতের ছেলের কান্না-ভেজা মুখের দিকে চেয়ে বলল, এসো, এসো। যাওয়া নেই, এসো।

তারপর জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তোমাদের জন্যে ফাস্টক্লাস ভাত আর মুরগীর ঝোল রেঁধে রাখব। এসেই, চান করে খেতে বসে যাবে। যাও, দেরী কোরো না ফিরতে। আমি কিন্তু না খেয়ে বসে থাকব তোমাদের জন্যে।

গ্রামের লোকের কাছে শুনলাম যে, টিকায়েতের মা এখনও বেঁচে আছেন। উনি এবং টিকায়েতের স্ত্রীও হয়তো কাল বিকেলে এমনি করেই টিকায়েতকে বিদায় দিয়েছিলেন।

আমি খুবই উত্তেজনা বোধ করছিলাম। মানুষখেকো বাঘের অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও হয়নি। তারপর আবার একসঙ্গে দু-দুটো আহত বাঘ-বাঘিনী। টাঁড়বাঘোয়ার পায়ের দাগ দেখে এবং বর্ণনা শুনেই তো তার চেহারা সম্বন্ধে অনুমান করে নিয়েছিলাম। বাঘিনী টাঁড়বাঘোয়ার চেয়ে ছোট, কিন্তু সেই-ই তো মাচায় উঠে ধরেছে টিকায়েতকে। এখন দুজনেই গুলি খেয়ে যে কী সাংঘাতিক হয়ে আছে কে জানে?

টেড নিচু স্বরে বলল, টিকায়েত কিন্তু খুবই ভাল শিকারী। ভোরের আবছা-আলোতে দু দুটো বাঘকেই উনি গুলি করেছিলেন ভাইটাল জায়গাতে। কিন্তু, এই জন্যেই আমি সব সময় বলি তোকে যে, হেভী রাইফেল ছাড়া বন্দুক নিয়ে বাঘ মারতে আসা বড় বিপদের। তোর রাইফেলটাও এবার কলকাতায় ফিরে বদলে নে তুই। পায়ে হেঁটে বাঘের মোকাবিলা করতে সব সময়েই হেভী রাইফেল নিয়ে যাওয়া উচিত। ঐ গুলি দুটি যদি রাইফেলের হত তবে বাঘ বাবাজীরা ঐখানেই শুয়ে থাকত। তবে টিকায়েত বাঘিনী মাচায় উঠতেই দ্বিতীয় গুলি হয়তো করে ফেলতে পারত। এই সব কারণেই ওঁকে মানা করেছিলাম একনলা বন্দুক না-নিয়ে যেতে। শুনলে না। কী আর করব আমরা?

তারপর বলল, তাছাড়া, আমার দৃঢ় বিশ্বাস গুলিগুলো খুবই পুরনো ছিল। কে জানে কোথা থেকে কিনেছিল। গুলি ভাল থাকলে সত্যি সত্যিই দু দুটো বাঘই বেচারী মারতে পারত। নিজেও মরত না।

আমি বললাম, দুজনে একসঙ্গে থাকলে কিন্তু হবে না টেড। টিলাটার কাছে গিয়ে আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হবে। তুই কার পিছনে যাবি? টাঁড়বাঘোয়া? না বাঘিনী?

টেড বলল, আমরা মারতে পারলেও, দুটো বাঘের একটাও তো আমাদের কারোরই হবে না, কারণ প্রথম রক্ত তো টিকায়েতের গুলিতেই বেরিয়েছে।

আমি বললাম, তা ঠিক।

তোমরা হয়তো জানো না যে, শিকারের অলিখিত আইনে বলে, যার গুলিতে প্রথম রক্তপাত ঘটবে, শিকার তারই। যদি কোনও শিকারীর গুলি বাঘের লেজে লেগেও রক্ত বেরোয় এবং বাঘ সাক্ষাৎ যম হয়ে থাকে, তবুও যে শিকারী নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেই বাঘকে অনুসরণ করে গিয়ে মারবেন বাঘ সেই শিকারীর হবে না। যিনি লেজে গুলি করে রক্ত বের করেছিলেন, তাঁরই হবে। সকলেই মেনে নেবেন যে, বাঘ প্রথম জনই মেরেছেন।

চারদিকে চোখ রেখে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, এ তো আর বাহাদুরী বা হাততালির ব্যাপার নয়। বাঘ কার হল, তারও ব্যাপার নয়। পাহাড় জঙ্গলের গভীরে একটি ছোট্ট গ্রামের সব কটি মানুষ তাদের বাঁচা-মরা, তাদের আশা-ভরসা, তাদের সব বিশ্বাস আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে আন্তরিকভাবে, চোখের জলে। আমাদের বয়স এবং অভিজ্ঞতা কম হলেও, আমরা যাতে তাদের বিশ্বাসের যোগ্য হতে পারি, তাদের চিরদিনের কৃতজ্ঞতাভাজন হতে পারি তারই চেষ্টা করতে হবে।

আমরা কি পারব এই কঠিন কাজের যোগ্য হতে?

আমরা দুজনেই নিজের নিজের মনে সে কথা ভাবছিলাম। মুখে কথা ছিল না কারোরই। যদি বিপদমুক্ত করতে পারি ওদের তবেই না আমাদের মান

থাকবে আর যদি না পারি ?

নাঃ, সে সব ভাবনা এখন থাক।

টেড বলল, এখন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কাল সকালে টিকায়েতকে অমন করে না বললেও পারতাম। আমি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম যে এত তাড়াতাড়ি আমার রসিকতা সত্যি হবে ?

কি বলেছিলি তুই ?

বলিনি ? যে, কালই আপনাকে দাহ করতে হবে আমাদের ?

কুয়োতলাটা পেরিয়ে গিয়েই হঠাৎ টেড ঘুরে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে বলল, এক সেকেন্ড দাঁড়া। টস্ করছি। যে জিতবে, সেই টাঁড়বাঘোয়ার দায়িত্ব পাবে যে হারবে সে বাঘিনীর। ওক্কে ?

আমি বললাম, ওক্কে।

আসলে আমাদের দুজনেরই ইচ্ছা ছিল যে টাঁড়বাঘোয়ার পিছনেই যাই। সে-ই যে নাটের গুরু।

টেড বলল, তোর কী।

আমি বললাম, টেল !

টেড অনেক উঁচুতে ছুঁড়ে দিল আধুলিটা। মাটিতে পড়েই কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে লাল ধুলোর মধ্যে একটা শালের চারার গোড়াতে আটকে গেল সেটা। আটকে যেতেই উল্টে গেল !

আমরা দুজনেই সেখানে পৌঁছে দেখলাম, টেল রয়েছে উপরে। হেড নীচে।

টেড আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল।

আমরা দুজনেই জানতাম যে বে-জায়গায় গুলি-লাগা বাঘ সাক্ষাৎ যম হয়ে ওঠে। তার কারণ, যতক্ষণ বাঘের চারটি পা এবং মুখ এবং মস্তিষ্ক ঠিক থাকে ততক্ষণ বাঘ পুরোপুরি সমর্থ। তার উপর পেটে গুলি লাগলে প্রচুর যন্ত্রণার কারণে তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকে। সেই দিক দিয়ে দেখলে টাঁড়বাঘোয়া এখন বাঘিনীর চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ—তার চেহারার বিরাটত্ব বাদ দিয়েও ! বাঘিনীর গুলি লেগেছে বুকে—অবশ্য লোক দুটো ভুলও বুঝতে পারে—ভুল বোঝা একটুও অস্বাভাবিক নয়—। কিন্তু যদি ঠিক বুঝে থাকে, তাহলে বাঘিনীর লাংস কিংবা হার্টে গুলি লাগা অসম্ভব নয়। হার্টে লাগলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মরে যাওয়ার কথা। লাংসে লাগলে কিছুক্ষণ বাঁচে। লাংসে গুলি লাগলে বাঘের গায়ের থেকে যে রক্ত বেরোয়, তাতে ফেনা দেখা যায় অনেক সময়। ওখানে গেলেই বোঝা যাবে। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, দুটি বাঘই খুব সম্ভব মানুষখেকো এবং সদ্য আহত।

অতএব...

সাবধানে, চারদিকে চোখ রেখে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর এসে গেছি

আমরা !

এবার টিলাটার কাছাকাছি এসে পড়েছি। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে টিলাটা। সকালের রোদ মাথা উঁচু করে আছে। আর একটু এগোতেই মাচাটার ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। চৌপাইয়ের চারটে পায়া ঠিক আছে। দড়ি ছিঁড়ে এবং পাশের এক দিকের কাঠ ভেঙে মাচাটা গাছটা থেকে তখনও নীচে ঝুলছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। ভোরের ফিস্‌ফিসে হাওয়া আর ছাতারেদের ডাক ছাড়া।

আর একটু এগিয়ে যেতেই আমি আর টেড দুজনেই চমকে উঠলাম।

একটু দূরেই বুড়ির একটি পা পড়ে আছে। নীলরঙা বড়বড় মাছি ভন্ ভন্ করছে তাতে। এত দুর্গন্ধ যে, কাছে যাওয়া যায় না।

আর মাচার থেকে একটু দূরে, সোজা, কি যেন একটা জিনিস পড়ে আছে। টেডকে ইঙ্গিতে চারপাশে নজর রাখতে বলে আমি এগিয়ে গিয়ে দেখতে গেলাম জিনিসটা কী ?

কিন্তু না গেলেই বোধহয় ভাল হত। সিল্কের পাঞ্জাবীসুদ্ধ টিকায়েতের বাঁ হাতটি কনুই থেকে পরিষ্কার করে কাটা। পুরুষ্টু বাঁ হাতে হাতঘড়িটা বাঁধা আছে তখনও। সোনার সাইমা ঘড়ি একটা, কড়ে আঙুলে পলার আংটি। আঙুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। হাতটা এমন করে দাঁত দিয়ে কেটেছে যে দেখলে মনে হয় কোনও মেশিনে কাটা হয়েছে বুঝি।

টেড একটু এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। তারপর আমাকে ইশারা করে নিজেও এগিয়ে গেল। টাঁড়বাঘোয়া এবং বাঘিনীর পায়ের দাগ দেখে দেখে আমরা খুব সাবধানে টিলার উল্টোদিকে এলাম, রাইফেলের সেফটি-ক্যাচে আঙুল রেখে।

এখানে পৌঁছেই আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। আলাদা হওয়ার আগে ঘড়িতে দেখলাম সকাল সাতটা বেজেছে। টেড ফিস্‌ফিস্ করে বলল, সন্ধ্যে হবে সাতটাতে। আমাদের হাতে বারো ঘন্টা করে সময়। আমরা একা একাই খুঁজব বাঘদের। যদি দেখা না হয়, সাতটার সময় কুয়োতলায় পৌঁছব আমরা। কুয়োতলাই রাঁদেভু-পয়েন্ট আমাদের।

তারপর বলল, গুড লাক্। গুড হান্টিং।

আমি হাত তুলে ওকে শুভেচ্ছা জানালাম।

তারপর আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম।

টেড গেল পুবে। আমি পশ্চিমে।

একটু এগোতেই একটা গেম-ট্র্যাকের দেখা পেলাম। জঙ্গলে জানোয়ার-চলা সুঁড়ি পথ। নানান জানোয়ারের পায়ের দাগ আছে সেখানে। পথটা বেরিয়েছে একটা ফাঁকা টাঁড়মতো জায়গা থেকে। পথটার গোড়াতেই কতগুলো কুঁচফলের ঝোপের গায়ে দেখলাম রক্ত লেগে আছে। তখনও শুকিয়ে যায়নি রক্ত। ঝোপের এমন জায়গাতে লেগে আছে রক্ত যে মনে হয় বাঘের বুক বা পেট

সেই ঝোপে ঘষা খেয়েছে। বুক হলে বাঘিনীর বুক, পেট হলে টাঁড়বাঘোয়ার পেট। কারণ রক্ত বেশ উঁচুতেই লেগে আছে।

প্রথমটা কিছুক্ষণ রাইফেল সামনে করে আমি হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগোলাম। যাতে নীচে ভাল করে নজর করতে পারি। নাঃ, কোথাও কিছু নেই। তবে পথে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে রয়েছে।

পথটা এঁকেবেঁকে গেছে। কাছেই, সামনে একটা ঝরনা আছে। তার ঝরঝর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। খুবই সাবধানে এগোচ্ছি। ঐ অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘামে গা এবং হাতের পাতা ভিজে গেছে আমার। হয়তো ভয়েও।

মিনিট পনেরো ঐভাবে চলার পর ঝরনাটার কাছে এসে গেলাম। তখন আরও সাবধান হলাম।

এক হাত যাচ্ছি আমি পাঁচ মিনিটে, প্রায় শুয়ে শুয়েই, যেন একটা শুকনো পাতাও না মাড়ানোর শব্দ হয়, পথের পাশের ঝোপঝাড়ে যেন একটুও কাঁপন না লাগে। পা ও হাত ফেলার আওয়াজ যেন নিজের কানেও না শোনা যায়।

একটা বাঁক আছে সামনে। বাঁকটার কাছে পৌঁছে আমি চুপ করে শুয়ে পড়লাম। কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম, কিছু শুনতে পাই কি না।

নাঃ, কোনও শব্দই নেই। ঝরনার ঝরঝর শব্দ ছাড়া। ঝরনার ঐ পারে একটা নীল আর লালে মেশা ছোট্ট মাছরাঙা পাখি নদীর শুকনো বুকে একটা ভেসে আসা কাঠের উপর বসে জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কী যেন দেখছিল আর মাঝে মাঝে আশ্চর্য দুঃখ দুঃখ গলায় ডাকছিল। হঠাৎ পাখিটা যেন ভীষণ ভয় পেয়ে সোজা উপরে উড়ে গেল জোরে ডাকতে ডাকতে।

আমাকে কি ও দেখতে পেল ? নাঃ। আমাকে দেখতে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তবে ? কেন ও ভয় পেয়ে উড়ল ? এই কথা ভাবছি, ঠিক এমন সময় জলের মধ্যে ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনতে পেলাম। কোনও জানোয়ার জল মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে ! কী জানোয়ার জানি না, কিন্তু জানোয়ারটা বাঁ দিক থেকে ডানদিকে হেঁটে আসছে। যেভাবে শব্দটা এগিয়ে আসছে আর থামছে, তাতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মাছরাঙা পাখিটা যেখানে বসেছিল তার সামনে এসে পৌঁছবে জানোয়ারটা। কী জানোয়ার ? হরিণ ? শম্বর ? শুয়োর ? বাঘ ?

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললাম।

রাইফেলটাকে এগিয়ে দিয়ে কাঁধে তুলে নিলাম। কাঁধে তুলে নিয়ে মাছরাঙাটা যে ভেসে-আসা কাঠে বসেছিল, সেই কাঠে নিশানা নিলাম। যে জানোয়ারই হোক সে ঐ কাঠের সামনে এলেই আমি তাকে গুলি করতে পারব। কিন্তু সেফটি-ক্যাচ অন্ করিনি। ঝরনাটা এত কাছে, আমার থেকে দশ হাত দূরেও নয় ; এখানে সেফটি-ক্যাচ অন্ করলেই শব্দ হবে। তাই এখন আর উপায় নেই।

খুব শক্ত করে ধরে রাখলাম রাইফেলটাকে, আর ডান হাতের বুড়ো আঙুল

রাখলাম সেফটি-ক্যাচের উপরে, যাতে গুলি করতে হলে সেফটি-ক্যাচ ঠেলে সঙ্গে সঙ্গে নিশানা না-সরিয়েও গুলি করতে পারি।

আওয়াজটা আরও একবার হল। জানোয়ারটা আরও কিছুটা এসে থমকে দাঁড়াল। তারপরই জলে চাক্ চাক্ চাক্ চাক্ শব্দ শুনতে পেলাম।

আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে এল। বাঘ !

এমন জোর শব্দ করে বাঘ ছাড়া আর কোনও জানোয়ার জল খায় না। রাইফেলের ব্যারেলের রিয়ার-সাইট আর ফ্রন্ট-সাইটের মধ্যে দিয়ে চেয়ে, স্মল্ অফ দ্য বাটের সঙ্গে গাল ছুঁইয়ে দু চোখ খুলে আমি সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম।

জল-খাওয়া সেরে জানোয়ারটা আবার চলতে শুরু করল। এসে গেছে ; এসে গেল।

তার পরমুহূর্তেই দেখলাম একটা বিরাট বাঘ। তার বুকে একটা প্রকাণ্ড রক্তাক্ত ক্ষত, সেখান থেকে তখনও রক্ত বেরিয়ে আসছে, বড় বড় হলদে সাদা লোমের সঙ্গে রক্ত আর জল মাখামাখি হয়ে গেছে।

বাঘটার মাথাটা যেই কাঠটার কাছে এল, আমি সেফটি-ক্যাচ অন্ করেই ট্রিগারে হাত দিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দে বাঘটা আমার দিকে মুখ ফেরাল। আর এক সেকেন্ডও দেরি না করে আমি ট্রিগারে চাপ দিলাম। গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঝপাং করে জল ছিটিয়ে বাঘটা জলে পড়ে গেল। তাড়তাড়ি বোল্ট খুলে চেম্বারে নতুন গুলি এনে আমি সেই দিকে তাকালাম। দেখলাম, বাঘটা মাছরাঙা পাখিটা যেই কাঠে বসে ছিল, সেই কাঠেই হেলান দিয়ে যেন বসে পড়েছে। আর তার কান আর মাথার মাঝামাঝি জায়গা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

বাঘটার বসার ধরন দেখেই বুঝলাম যে ও আর উঠবে না। কিন্তু তবুও, যেহেতু আমি শুয়ে ছিলাম এবং যদি বাঘ চার্জ করে তবে হঠাৎ ঐ শোয়া অবস্থা থেকে ওঠা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে, তাই কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে আমি বাঘের বুক লক্ষ্য করে আরেকটি গুলি করলাম।

বাঘটা যেন একটু দুলে উঠেই ঝুলে গেল। যেন আর একটু আরাম করে কাঠটাতে হেলান দিল। ঠিক সেই সময় ঝরনার বাঁ দিক থেকে অন্য একটি বাঘ প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল। গর্জনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে উপরের ডালপালা ভেঙে তাকে খুব জোরে উল্টোদিকে দৌড়ে যেতে শুনলাম।

আমার আর টেড-এর একটি সাংকেতিক ডাক ছিল জঙ্গলের। বৌ-কথা-কও পাখির ডাক। বাঘটা মরে গেছে জেনে এবং অন্য বাঘটা কাছাকাছি আছে জেনে আমি উঠে সুঁড়িপথ দিয়ে জঙ্গলের বাইরে এলাম। এসে ফাঁকা টাঁড়ে দাঁড়ালাম।

এই জায়গাটা ফাঁকা। যেদিক দিয়েই আক্রমণ আসুক না কেন, দেখা

যাবে। তাই বাঁ হাতে রাইফেলটা ধরে ডানহাত মুখের কাছে নিয়ে আমি বার বার বৌ-কথা-কও পাখির ডাক ডাকতে লাগলাম।

আমি জানতাম যে, এত অল্প সময়ে টেড খুব বেশি দূরে যায়নি। তাছাড়া সে আমার রাইফেলের পরপর দুটি গুলির আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনেছে। তাই টেড অল্পক্ষণেরই মধ্যেই সাড়া দেবে।

অনেকবার ডেকেও আমি যখন টেডের সাড়া পেলাম না তখন চিন্তাতে পড়লাম। বাঘটা এদিকেই আছে। টেড মিছিমিছি পুবে ঘুরে মরবে। টেড এলে আমরা দুজনে একসঙ্গে ঝরনার ওপারে চলে-যাওয়া বাঘটাকে খুঁজলে তাড়াতাড়ি তার দেখা পেতে পারি।

মিনিট দশেক ওখানে দাঁড়িয়েও যখন টেডের সাড়া পেলাম না তখন মনে হল যে, টেড নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে গেছে।

একাই যাব ভেবে যখন ঐদিকে ফিরে চলে যাচ্ছি। ঠিক সেই সময় জঙ্গলের মধ্যে খুব জোরে কিছু একটা দৌড়ে আসছে শুনতে পেলাম। তারপরই আমার প্রায় কানের কাছেই গুড়ুম করে টেডের ভারী রাইফেলের আওয়াজ শুনলাম। এবং আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে টেড ডানদিকের জঙ্গল থেকে এক লাফে ছিটকে বেরিয়েই দৌড়ে এল আমার দিকে। ওর চোখে মুখে ভয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী হল ?

টেড জবাব দেওয়ার আগেই দেখি টেড যেখান থেকে জঙ্গল ফুঁড়ে বেরোল, সেইখান দিয়ে একটা প্রকাণ্ড শঙ্খচূড় সাপ জঙ্গল লণ্ডভণ্ড করে ফণা আর লেজ দিয়ে ঝোপঝাড় ভাঙতে ভাঙতে আছড়াতে আছড়াতে টাঁড়ে বেরিয়ে এল।

আমি আমার রাইফেলটা টেড-এর হাতে দিয়ে একটা লম্বা শুকনো কাঠ তুলে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে পরপর কয়েকটা বাড়ি মেরে তাকে ঠাণ্ডা করলাম।

রাইফেল দিয়ে সাপ মারার অসুবিধে অনেক। সাপ মারতে শটগান সবচেয়ে ভাল।

টেড মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছিল।

আমি ফিরে এসে বললাম, এত বড় শঙ্খচূড় কেউই বোধহয় দেখেনি কখনও।

টেড বলল, তোর গুলির শব্দ শুনেই আমি এদিকে দৌড়ে আসছিলাম। তারপর তুই যখন বৌ-কথা-কও পাখির ডাক দিলি, তখন দাঁড়িয়ে পড়ে সেই ডাকের উত্তর দেব এমন সময় পেছনে শব্দ শুনে দেখি ঐ সাপটা ঝাঁটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আমার পেছনে দৌড়ে আসছে।

তক্ষুনি গুলি করতে পারতাম। কিন্তু আমরা মানুষখেকো বাঘের পেছনে এসেছি, তাই গুলির আওয়াজে পাছে তারা সরে যায়, তাইই ভাবলাম, গুলি না করে দৌড়ে তোর কাছে এসে পৌঁছে যাই।

উরে ব্বাস্ ! একটু হলেই আজ খতম হয়ে গেছিলাম। শেষকালে যখন প্রায়

আমাকে জঙ্গলের কিনারে এসে ধরে ফেলল এবং লেজের উপর সমস্ত শরীরটাকে তুলে আমার মাথা সমান লম্বা হয়ে উঠে একেবারে মাথায় ছোবল দেওয়ার উপক্রম করল তখন রাইফেলের ব্যারেলটা প্রায় তার ফণাতেই ছুঁইয়ে, গুলি করেই লাফিয়ে টাঁড়ে এসে পড়লাম। গুলিটা ফণাতে না লাগলে এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছিলাম আমি।

তারপর দম নিয়ে টেড বলল, তুই গুলি করেছিলি কেন ? ডাকলিই বা কেন আমাকে ? কিসে গুলি করলি ?

আমি বললাম, টাঁড়বাঘোয়া এবং তার সঙ্গিনী দুজনেই এদিকেই আছে। তোকে উল্টোদিক থেকে ডেকে আনবার জন্য শীষ দিয়েছিলাম।

ও বলল, তা তো বুঝলাম। কিন্তু গুলি করলি কী দেখে ?

বললাম, বাঘ দেখে !

টেড লাফিয়ে উঠল। বাঘ ? কোথায় ?

মিস্ করেছি। পালিয়ে গেছে। এবারে চল, ওদিকেই যাই।

মিস্ করলি ? ঈস্স্।

তারপর বলল, চল্, এগোই। ঘড়িতে তখন আটটা বেজেছে। তখনও সময় আছে হাতে অনেক।

টেডকে সঙ্গে নিয়ে সুঁড়িপথ ধরে যখন আমি ঝরনাটার পাশে এসে দাঁড়ালাম তখন বাঘটাকে দেখেই টেড রাইফেল তুলল।

আমি হাত দিয়ে ওর রাইফেলের ব্যারেল নামিয়ে দিয়ে বললাম, বেচারা অনেকক্ষণ হল মরে গেছে।

বাঘটার থাবার দিকে তাকিয়ে টেড চিৎকার করে উঠল, টাঁড়বাঘোয়া, টাঁড়বাঘোয়া বলে।

তারপর আমার কান ধরে খুব করে মলে দিয়ে বলল, মিথ্যেবাদী, লায়ার, ইডিয়ট।

বলেই, আমাকে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে।

আমি ওকে শান্ত করে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, অন্য বাঘটা সামনেই গেছে। চুপ করে যা। চল্ এখন এগোই।

ঝরনার পাশ দিয়েই আমরা উজানে চললাম। কিছুটা গিয়েই, যেখান থেকে বাঘিনীর আওয়াজ শুনেছিলাম সেখানে পৌঁছেই আমরা থম্‌কে দাঁড়ালাম।

ঝরনার পারে, বালির মধ্যে একটা বড় কালো পাথরের উপর থেকে টিকায়েত আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। টিকায়েত মানে, টিকায়েতের মুণ্ডটা।

কেউ যেন দা দিয়ে কেটে পাথরে বসিয়ে রেখেছে সেটাকে। চোখ দুটো খোলা—ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে।

আমি ভয়ে টেডকে জড়িয়ে ধরলাম।

টেড বমি করার মতো একটা শব্দ করল।

তারপর আমাকে হাত ধরে নিয়ে এগোল সামনে। একটু সামনেই নদীর পারে টিকায়েতের শরীরের দুটি অংশ দুদিকে পড়ে আছে। রক্ত, আর বালি আর সাদা লাল হাড়ের টুকরোতে, কাল বিকেলের ঘোড়ায় চড়া লম্বা-চওড়া লোকটার কথা ভেবেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল আমাদের।

ঝরনাটা থেকে আমরা এখন প্রায় মাইলখানেক চলে এসেছি। এখানে জঙ্গল খুবই ঘন। এই সকালেও মনে হচ্ছে গভীর রাত। এমনই অন্ধকার ভিতরটা।

পুরো পথই আমরা ভিজে জায়গায় বাঘের পায়ের দাগ দেখে এসেছি। কিন্তু রক্ত কোথাও দেখিনি। আশ্চর্য! এখন নীচে এত ঝোপঝাড় এবং ঘন ঘাস যে পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা একটা দোলা মতো। একটা বড় পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে ছায়ায় ছায়ায়। তাই এত গাছ পাতা ঘাস এই গরমের সময়েও। নদীতে জলও রয়েছে এক হাঁটু মতো। স্রোত আছে।

টেড ফিসফিস করে বলল, একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। বুদ্ধিও ভাঁজতে হবে,—এই বলে একটা বড় পাথরের উপর বসল টেড। আমিও বসলাম। কিন্তু উল্টো দিকে মুখ করে।

টেড বলল, এখন সাড়ে দশটা বাজে। এখানে আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসি। ভাল করে শোন্ কোনও আওয়াজ শোনা যায় কি না। মিছিমিছি হেঁটে লাভ কী?

ওয়াটার বটল থেকে একটু জল খেলাম আমরা।

টেড পকেট থেকে একটা চকোলেট বের করে আমার পেছনদিকে হাত ঘুরিয়ে আধখানা এগিয়ে দিল।

ঐ জায়গাটার একদিকে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বেশির ভাগই খড়হি বাঁশ। দমকে দমকে হাওয়া উঠছে বনের মধ্যে আর বাঁশবনে কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে। কটকট্ করে আওয়াজ হচ্ছে বাঁশবন থেকে।

মিনিট দশেক ওখানে বসে থাকার পর হঠাৎ আমার ডানদিক থেকে ও টেডের বাঁদিকের ঘন জঙ্গল থেকে হুপ-হাপ করে হনুমানের ডাক শোনা গেল। মনে হল, কিছু একটা দেখে ওরা খুব উত্তেজিত হয়েছে। হনুমানগুলো আমরা যেখানে বসেছিলাম, তার থেকে বড় জোর দুশো গজ দূরে ছিল।

আমরা কান খাড়া করে সেই দিকে চেয়ে রইলাম। দেখলাম, হনুমানগুলো ডালে ডালে ঝাঁপাঝাঁপি করতে করতে ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে ঘন-সবুজ পাতার চাঁদোয়ার মধ্যে মধ্যে।

আমি আর টেড তাড়াতাড়ি কিন্তু নিঃশব্দে বড় পাথরটা থেকে নেমে দুটো পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসলাম। একটু পরই কোনও জানোয়ারকে ঝোপঝাড়ের ভিতরে আসতে শোনা গেল। এই জায়গাটা ভিজে থাকায়,

শুকনো পাতা মাড়ানোর খচ্‌মচ্ আওয়াজ হচ্ছিল না।

একটু পরই সেই আওয়াজটা থেমে গেল। তারপর আবার আড়ালে আড়ালে আওয়াজটা ফিরে গেল। হনুমানগুলোও এতক্ষণ টিকিট-না-কেটে র‍্যাম্পার্টে চড়ে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখার আনন্দে মশগুল সাপোর্টারদের মতো চেঁচামেচি লাফালাফি করছিল। গাছের মাথায় মাথায় ঐ আওয়াজটা থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও চুপচাপ হয়ে গেল।

টেড বলল বাঘ কিংবা চিতা।

আমি বললাম, এ অঞ্চলে চিতা একটিও ছিল না, বলছিল বস্তীর লোকেরা।

তাহলে তাই হবে।

বাঘ হলে টাঁড়বাঘোয়ার সঙ্গিনী।

টেড বলল, সঙ্গিনী কিন্তু আহত হয়নি। তুই লক্ষ করেছিলি যে এতখানি পথের সব জায়গায় পায়ের চিহ্ন থাকলেও রক্ত কোথাওই আমরা দেখিনি।

তা ঠিক।

টিকায়েতের সঙ্গের লোকদুটো ভুলও দেখে থাকতে পারে, আমি বললাম।

টেড বলল, যদি এই বাঘিনী মানুষখেকো না হয় তবে তাকে কি আমাদের এখুনি মারা উচিত? মাচায় উঠে টিকায়েতকে মেরেছিল—তা স্বাভাবিক বাঘেও মারে। ওটা রাগের মার। যে গুলি করেছে বা ভয় দেখিয়েছে; তাকে শাস্তি দেওয়া আর মানুষখেকো হয়ে যাওয়া এক জিনিস নয়।

আমি বললাম, তা ঠিক। কিন্তু পরে যদি দেখা যায় যে এই বাঘিনীও মানুষখেকো?

তাহলে আমরা আবার ফিরে আসব। মহুয়ামিলনে পলাশবনার লোকেরা ইচ্ছে করলেই যেতে পারে। তাছাড়া কলকাতার ঠিকানাও ওদের দিয়ে রাখব। ওরা খবর দিলেই আসব। কিন্তু আন্দাজে মানুষখেকো ভেবে বাঘিনীকে মারা আমার মনঃপুত নয়।

তারপর টেড আবার বলল, একটা কাজ কর। তুই জোরে গলা ছেড়ে গান গা। আমি জোরে জোরে কথা বলব। যদি মানুষখেকো হয় তবে তাকে আমরা জানান দিয়ে এখান থেকে ফিরে চলি চল্। মানুষখেকো হলে, সে হয়তো আমাদের পিছু নেবে।

আমি বললাম, পেট তো ভর্তি। পিছু নাও নিতে পারে। তাছাড়া, গুলির শব্দ শোনার পরও দিনের বেলায় আমাদের পিছু পিছু যাবেই যে, এমন কি কথা আছে?

টেড বলল, সেটাও ঠিক। তবুও আমার মন সায় দিচ্ছে না। চল্ আমরা ফিরে যাই আজ। তাছাড়া, টিকায়েতের শরীরের অংশ আর মাথাটা নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে করে। দাহ করার জন্যে।

আমি বললাম, তা ঠিক! কিন্তু কী করে নেব? আমার যে ভাবতেই ভয়

করছে।

টেড বলল, ওর ছেলেটার কথা ভাব। শরীরের কোনও অংশ না নিয়ে গেলে তো তোদের হিন্দুমতে মৃতের সৎকারই হবে না।

তা ঠিক।

টেড বলল, কী হল ? গান গা।

আমি জোরে গাইতে লাগলাম :

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে যে দেশ, সকল দেশের সেরা।
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

টেড সঙ্গে শীষ দিতে লাগল। আমরা কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে নজর রাখতে রাখতে আস্তে আস্তে ফিরতে লাগলাম।

আধ মাইল যাওয়ার পরও কোনও কিছু যে আমাদের পিছু নিয়েছে এমন বোঝা গেল না।

আরও আধ মাইল চলার পরও না।

টেড বলল, দ্যাখ্ আমার মন বলছে বাঘটা ভাল। দেখিস। ও রাগের মাথায় একটা খুন করে ফেললেও আর কখনও মানুষ খাবে না।

আমরা যখন টাঁড়বাঘোয়ার কাছে এসে পৌঁছলাম তখন দেখে আশ্চর্য হলাম যে তার গায়ে একটি তীরও যে লেগেছে এমন দাগ নেই। টেড আর আমি আমাদের জামা খুলে তার মধ্যে করে টিকায়েতের মাথা আর পেটের কিছুটা অংশ মুড়ে নিলাম। এবারেও টিকায়েতের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, যেন টিকায়েত নীরব চোখে বলছে, বাজীতে হার হয়েছে আমার। ছেলেমানুষ তোমরাই জিতে গেলে !

টেড বলল, যদি তীর লাগার কথাটা মিথ্যা হয়, তাহলে বাঘিনী যে টিকায়েতের মাংস খেয়েছে, আধখানা মুখে করে নিয়ে গেছে এও মিথ্যা হতে পারে। চল্ ফিরে চল্। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করি। যদি আর কোনও অত্যাচার হয় গ্রামে তখন তো আমরা আছিই।

বেচারা টাঁড়বাঘোয়া !

তার কোনও দোষ ছিল না। সে এ গ্রামের প্রহরী ছিল। যদি না টিকায়েত তার থাবাটাকেই ভেঙে দিত তাহলে সে বেচারার মানুষের ক্ষতি করার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

এখন দুপুর দেড়টা বাজে। খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। গ্রামে ফিরে টাঁড়বাঘোয়াকে নিয়ে আসার, চামড়া ছাড়াবার বন্দোবস্ত করতে হবে, টিকায়েতের সৎকারের সময় সামনে থাকতে হবে ; এখন অনেক কাজ আমাদের।

আমি বললাম, চল্ টেড, যাওয়া যাক এবার।

টেড বলল, যাবি যাবি। মানুষখেকো বাঘ মারলি তুই। এই জায়গাটাতে

একটু বসে থাকি। মিনিট দশেক জিরিয়ে নিই।

তারপর বলল, কী করে মারলি বল তো শুনি।

আমি বললাম, মানুষখেকো যদি টিকায়েতকে না মারত তাহলে আজ সত্যিই আনন্দের দিন ছিল। মনটা এত খারাপ হয়ে গেছে যে, কিছুই আর ভাল লাগছে না।

টেড বলল, যা ঘটে গেছে এবং যে-সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র করণীয় নেই ; সেই আলোচনা করে লাভ কী ? বল্ তো তুই, কী করে মারলি, কোথায় দেখলি ওকে ? গুলি খেয়ে কী করল টাঁড়বাঘোয়া ?

টেড টাঁড়বাঘোয়ার দিকে মুখ করে নদীর বালিতে বসেছিল। আর আমি টাঁড়বাঘোয়ার পাশে একটা পাথরে।

টেড-এর কথার উত্তরে আমি কথা বলব, ঠিক এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল টেড-এর চোখে। টেড-এর চোখ দুটো সজাগ হয়ে উঠেছে, কান উৎকর্ণ, টেড আমার পেছনের জঙ্গলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন কী দেখছে !

আমি ওর দিকে আবার তাকাতেই ও ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল আমাকে।

আমি লক্ষ করলাম যে, আমার রাইফেলটা আমার হাতে নেই। টেড-এর পাশে একটা পাথরে রেখে এসেছিলাম রাইফেলটা।

টেড-এর হাতে রাইফেল তার শক্ত মুঠিতে ধরা। ও আমার পায়ের দিকে মুখ করে আছে, আমাকেই দেখছে যেন, এমন ভাব করছে আসলে তাকিয়ে আছে আমার পেছনে।

হঠাৎ ঝরঝর করে মাটি আর নুড়ি পাথর খসে পড়ার আওয়াজ হল আমার ঠিক পেছনে।

আমি বুঝলাম কোনও জানোয়ার আমার ঘাড়ে লাফাবার মতলব করছিল, কোনও কারণে সে পা পিছলে অথবা ইচ্ছে করে সরে গেছে।

টেড স্বাভাবিক গলায় বলল, আর চুপ করে থাকার দরকার নেই। ভাব দেখা যেন কিছুই হয়নি। সেই গানটা গা-না, যেটা গাইছিলি একটু আগে।

আমার পেছনে নিশ্চয়ই বাঘিনী। হাতে রাইফেলও নেই। আর টেড গান গাইতে বলছে ! কিন্তু নিরুপায় আমি। নিশ্চয়ই গান গাওয়াটাও এখন দরকার। তাই জোরে আবার গান ধরলাম আমি, 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা... ।'

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে ডানদিকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েই টেড আমার গায়ে যাতে গুলি না লাগে এমনভাবে রাইফেলটা কাঁধে তুলেই গুলি করল। গুলি করতেই, প্রচণ্ড হুংকার শুনলাম আমার পেছনের জঙ্গলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি ওখান থেকে লাফিয়ে সামনে পড়ে আমার রাইফেলটা হাতে তুলে নিলাম।

টেড দৌড়ে উল্টোদিকের পাড়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। আমিও দৌড়ে ওর ডানদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে রইলাম সেদিকে, যেদিক থেকে গর্জন করেছিল বাঘিনী। কিন্তু আমাদের আর খুঁজতে হল না তাকে। গাছপালা ঝোপঝাড় কামড়ে-আঁচড়ে ভেঙে-চুরে মাটি পাথর সব উপড়ে ফেলে বাঘিনী যে কী প্রলয় উপস্থিত করল তার বর্ণনা লিখতেও আজ এত বছর পরেও হাত ঘেমে উঠছে আমার।

টেড-এর গুলি বাঘিনীর পিঠ আর পেটের মধ্যে মেরুদণ্ডে লেগেছিল। তবে তার গর্জন এবং যন্ত্রণা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। টেড-এর হেভী রাইফেলের আর একটি গুলি ততক্ষণে তার কাঁধ দিয়ে ঢুকে বুকের ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছিল। আমার রাইফেলের একটি গুলি লেগেছিল তার মাথার পেছনে।

আমি যে জায়গাতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম সেখান থেকে মাথার পেছনটাই দেখা যাচ্ছিল শুধু।

বাঘিনী শান্ত হল অনেকক্ষণ থর্ থর্ করে কেঁপে।

যাঁরাই নিজেরা গুলি করে কখনও কোনও জানোয়ার মেরেছেন, সে মানুষখেকো বাঘই হোক, আর যাইই হোক, তাঁরাই জানেন যে, সেই জানোয়ার যখন মারা যায় তখন বড় কষ্ট হয়। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আসে। কিন্তু এবারে আমাদের টাঁড়বাঘোয়া আর তার সঙ্গিনীকে না মেরে উপায় ছিল না।

টেড থেই থেই করে লাফাতে লাগল, 'ঢানা ঢান্যে ফুস্কে বারা আমাডের বশুন্ডরা' বলে গান গাইতে গাইতে।

আমি বললাম, কী সাংঘাতিক চালাক দেখেছিস বাঘিনী। একটু হলে তো আমাকে খেয়েই ফেলত!

টেড বলল, চালাকেরও বাবা থাকে। বাঘিনী আমাদের কোথা থেকে ফলো করেছিল বল তো?

কোথা থেকে?

সেই যেখানে হনুমানরা ফিরে গেল, আমরা ভাবলাম, জানোয়ারটাও ফিরে গেল, সেইখান থেকে। ওটা ওর একটা কায়দা। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তোকে কিছু বলিনি। ভেবেছিলাম, সময় মতো বলব। কিন্তু যে বাঘিনী অতগুলো গুলির শব্দ শোনার পরও ভর দুপুরে দু দুজন শিকারীকে এতখানি ফলো করে আসে সে নতুন নয়। এখন আমার মনে হচ্ছে কী জানিস? মনে হচ্ছে টাঁড়বাঘোয়া একটি মানুষও খায়নি। সবই এই বাঘিনীর কাজ। তা না হলে দ্যাখ্ টিকায়েতের গুলি তো খেয়েছিল সে গত বছর গরমের সময়। এই গত একবছরে একজনকেও সে ধরল না কেন?

ভাববার মতো কথা, আমি বললাম।

তারপর বললাম, আমরা দুজনেই তো সমান অথরিটি। তার চেয়ে চল্,

কলকাতায় ফিরে ঋজুদাকে ভাল করে সব বলে ব্যাপারটা আসলে কী তা জিজ্ঞেস করব।

টেড বলল, নট্ আ ব্যাড আইডিয়া।

তারপর বলল, আর এখানে নয়। এবার তাড়তাড়ি ফেরা যাক। অনেক কাজ বাকি আমাদের; গ্রামের লোকদের।

আমি বললাম, টিকায়েতের সঙ্গী দুজনকে ধরে ঠ্যাঙাব কিন্তু আমি। মিথ্যুক পাজী লোকগুলো।

টেড বলল, ওদের ঠ্যাঙানোই উচিত।

যে জায়গাটা দিয়ে আমরা তখন যাচ্ছিলাম, সেই জায়গাটা খুব উঁচু।

ওখানে দাঁড়িয়ে দারুণ দেখাচ্ছিল নীচের পলাশে পলাশে লাল-হয়ে-যাওয়া পলাশবনা বস্তী, তার আশেপাশের জঙ্গল আর টাঁড়কে; দুপুরের আলোতে।

আধি উঠছে। ধুলোর মেঘের আস্তরণে ছেয়ে গেছে চারদিক। রুখু হাওয়ায় নাক চোখ জ্বালা জ্বালা করে। অথচ ভালও লাগে। দমক্ দমক্ হাওয়ায় মহুয়া করৌঞ্জ আর নানা ফুলের মিশ্র গন্ধ ভেসে ভেসে আসছে ছুটোছুটি করে, মনে হচ্ছে যেন কোনও খেলায় মেতেছে ওরা; কে কার আগে এসে পৌঁছবে।

গরু চরছে বস্তীর মাঠে, প্রান্তরে, মুরগী ছাগল ডাকছে। আটার কলে গম পেষাই হচ্ছে, তার পুপ্ পুপ্ পুপ্ পুপ্ আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসছে হাওয়াতে। লালরঙা হনুমান ঝাণ্ডা উড়ছে অশ্বত্থ গাছের মগডাল থেকে। রুক্ষ উদাস প্রকৃতি, বড় গরীব কিন্তু বড় ভাল মানুষজন; কী শান্তি চারদিকে!

চলতে চলতে নীচে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম, বন-পাহাড় ঘেরা এই শান্তির বস্তী পলাশবনাতে দুজন রাজা ছিল। একজন টিকায়েত। আর অন্যজন টাঁড়বাঘোয়া। যদিও একেবারেই আলাদা ছিল তাদের রাজত্বের রকম, তাদের প্রজাদের চেহারা। তাদের চরিত্র। কিন্তু এই দুই রাজার মধ্যে সত্যিকারের কোনও ঝগড়া ছিল না। দুজনেই দুজনকে চিরদিন সমীহ করে চলত। ভুল বোঝাবুঝির জন্যেই এই দুপুরে তারা দুজনেই এক মর্মান্তিক ঝগড়ার পরিণতির শিকার হয়ে জঙ্গলের মধ্যের এক অনামা নদীর ঝরনার পাশে শুয়ে রয়েছে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে, বালিতে, পাথরে, জলে মাটিতে, রোদে ছায়ায়।

একই সঙ্গে।

টেড আমার আগে আগে চলছিল।

আমি টেডকে বললাম, আমার কী মনে হয় জানিস? মনে হয়, সমস্ত ঝগড়া, যতরকম ঝগড়া হয়, হয়েছে আজ পর্যন্ত এবং হবে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে এবং একদিন হয়তো এক গ্রহের সঙ্গে অন্য গ্রহের, সেই সমস্ত ঝগড়ার পেছনেই একটিই মাত্র কারণ থাকে; ভুল বোঝাবুঝি।

ভারী দুঃখের। তাই না?

টেড এখন কোনও কথাই শুনতে রাজি নয়। ও ওর রাইফেলটা বাঁ কাঁধে

ফেলে মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বড় বড় পা ফেলে গান গাইতে গাইতে এগোচ্ছিল—'ঢন ঢান্নে ফুক্ষে বারা আমাডের বশুন্ডরা।...'

বাঘের মাংস

"আউ কেত্তে বাট্ট হব্ব দণ্ডধর টুল্লকা বাংলো ?" দণ্ডধরকে প্রশ্ন করলাম চলতে চলেতে।

আমার দিকে মুখ না ফিরিয়েই, ডোন্ট কেয়ার উত্তর দিল দণ্ড, "হব্ব, দ্বি কোশখণ্ডে। আউ কঁড় ?"

"বাপ্পালো বাপ্পা ! দ্বি কোশ ? মু আউ চালি পারিবনি।" হতাশ গলায় বললাম আমি।

"চালি পারিবুনি ? ইঃ, আউ কঁড় করিবি ? এই ভীষণ গহন জঙ্গলরে রহিবি কি মরিবা পাঁই ? চঞ্চল করিকি চালুন্ত ঋজুবাবু। এইঠি বহত্ব গল্প আছি। বড্ড বড্ড গল্প।"

প্রায় কেঁদে ফেলে একটা পাথরে বসে পড়ে দণ্ডকে বললাম, "না ম'। মোর গোড়্টা কেম্বতি ফুলি গল্লা দেখিলু ! মু আউ জমারু চালি পারিবুনি।"

"কাম্ব সারিলা !" বলেই, প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে আমি যে পাথরে বসে পড়েছিলাম, তারই পাশেরই একটা পাথরে বসল সে। নিজে বসার লোক দণ্ডধর আদৌ নয় ; যদিও অন্যকে যখন-তখন পথে বসানোই তার কাজ।

আমাদের জিপটা খারাপ হয়ে গেছিল পুরুনাকোট্ থেকে টুল্লকাতে আসার পথে। এ পথে এমন জঙ্গল পাহাড় যে, দিনমানে চলতেই বুক দুরুদুরু করে। আর এখন তো রাত বারোটা। তাও আবার কৃষ্ণপক্ষের রাত। চাঁদ উঠবে শেষ রাতে। কেন যে জিপেই শুয়ে থাকলাম না। তাই ভাবছিলাম। এই দণ্ডটার পাল্লায় পড়ে আজ যে কত দণ্ড দিতে হবে তা ভগবানই জানেন। জীবনটাই যাবে হয়তো। পাঁচটা নয়, দশটা নয়, মাত্র একটাই জীবন।

দণ্ড জলের বোতলটা এগিয়ে দিল কথা না বলে। রেগে গেলে ও কথাবার্তা বলে না। মাঝে-মাঝে গলা দিয়ে পিলে-চম্‌কানো একটা আওয়াজ করে, আর পিচিক পিচিক করে তিনহাত দূরে থুথু ফেলে। মিস্টার ডাকুয়ার এই ব্যাপারটা ঠিক কাসিও নয় হাঁচিও নয়, গলা-খাঁকারিও নয়। এক কথায় তাকে 'কাহাঁখাঁ' বলা চলে। ওর ওই কাঁহাঁখাঁ' হঠাৎ শুনে আমি কোন্ ছার অনেক বড় বড়

হিম্মতদার লোককে পর্যন্ত ঘাবড়ে যেতে দেখেছি।

ডিসেম্বরের রাতেও আমার জার্কিন ঘামে ভিজে গেছে। বসে, বন্দুকটা দু' হাঁটুর মধ্যে রেখে একটু জিরিয়ে নেওয়ার পর পাইপের পোড়া তামাক খুঁচিয়ে ফেলে আবার নতুন করে টোব্যাকো ঠাসতে লাগলাম। দণ্ডকে খুশি করার জন্যে পাইপের টোব্যাকো এগিয়ে দিয়ে বললাম, "টিক্কে তামাকু ?"

মুখে শব্দ না করে ও দুদিকে মাথা নাড়ল দক্ষিণ ভারতীয়দের মতো। তারপর নেড়েই চলল।

বুঝলাম প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছে আমার উপর। ও যখন তামাক নিলই না অগত্যা তখন দেশলাই ঠুকে পাইপটা ধরালাম। ঠিক সেই সময়েই মহানদীর দিক থেকে একটা বড় বাঘ জঙ্গলের গভীরে ডেকে উঠল। অবশ্য বেশ দূরে। তার এবং আমাদের পথের মধ্যে একটা বড় টিলাও ছিল। ডাক শোনামাত্রই দণ্ড তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। অন্ধকারে তার চোখ দুটো বাঘের চোখের মতোই জ্বলে উঠল। বলল, "ই সে বাঘুটা হব্ব নিশ্চয়ই।"

আমি ইচ্ছে করেই টিপ্পনী কেটে বসলাম, "হুঃ। তাংকু বদনরে টিক্কিট্ লাগিছি। তু ত সব্ব জানিচি !"

ভীষণ রেগে গিয়ে দণ্ড বলল, "মু জানিচি না কঁড় তম্বমানংকু সান্যাল ডি. এফ. ও. জানিচি ?"

সান্যাল ডি. এফ. ও.-এর উপর দণ্ডর ভীষণ রাগ। আমারও রাগ কম নয়। কিন্তু সে-গল্প এখানে নয়। এই "সব্ব জানিচি" কথাটা প্রায়ই দণ্ড দর্পভরে বলত বটে কিন্তু সেই দর্প বা দম্ভ মিথ্যা আস্ফালন একেবারেই ছিল না। সব কৃতী মানুষেরই বোধহয় একটু দম্ভ থাকে। বিশেষ করে সেই কৃতিত্ব যদি চালাকি বা চুরি করে না অর্জিত হয়। দণ্ড সেইসব সত্যিকারের কৃতীরই একজন। আসলে, একে দম্ভ না বলে বোধহয় আত্মসম্মান বলাই ভাল। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায় যা হচ্ছে 'দ্য বেটার হাফ অফ প্রাইড।' যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে এই অঞ্চলের বনজঙ্গল দণ্ডর মতো ভাল করে কেউ জানত বলে আমার মনে পড়ে না। তবে বাঘেদের ঠিকানায় তো আর পিন্‌কোডের ছাপ মারা থাকে না। কখনও কখনও এক রাতে তারা পঞ্চাশ মাইলও টহল মেরে ফেলে। এইটাই বাঘুমুণ্ডার বাঘ, এ-কথাটা আন্দাজে ঢিল।

আমার পাইপ-খাওয়া আর সহ্য হল না। ধমকে বলল, "চালুন্ত, চালুন্ত, আউ কেত্তে ভুশভুশ করিবে ?"

উঠলাম অগত্যা।

জিপটা পথের বাঁ পাশে ঠেলে পার্ক করে রেখে এসেছি আমরা। ভয় হচ্ছে, রাতে হাতিতে ফুটবল না খেলে তা দিয়ে। অংগুল থেকে ফার্স্টক্লাস 'পোড়-পিঠা' কিনেছিলাম। সেগুলো সঙ্গে নিয়ে এলে অথবা পেটে ভরে নিয়ে এলেও মন্দ হত না। জিপ খারাপ হয়েছিল পুরুনাকোটের গেট পেরুনোর

মাইলখানেক পরেই। পুরুনাকোটে গেলেই ভাল হত। অনেক কাছেও হত। কিন্তু কে কার কথা শোনে ! টুল্বকা বাংলোতে দণ্ডর দুই চেলা ভীম আর দুর্যোধন গুরান্টির 'নলা-পোড়া' বানিয়ে রাখবে যত্ন করে। রাতে ফিরে নলা-পোড়ার সঙ্গে খিচুড়ি না খেতে পারলে 'এ ছার জীবন রাখারই আর কোনও মানে হয় না' বলে জেদ ধরল দণ্ড। নলা-পোড়া খেতে অবশ্য চমৎকার। গুরান্টি অর্থাৎ মাউস্-ডিয়ারের মাংস ডুমো ডুমো করে কেটে নুন না-ছুঁইয়ে কাবারের মশলা মাখিয়ে নলা-বাঁশের একমুখ ফুটো করে তার ভেতরে পুরে কাদা দিয়ে সেই মুখ সেঁটে বন্ধ করে ক্যাম্প ফায়ারের আগুনের মধ্যে ফেলে দিতে হয়। তারপর বাঁশের মধ্যে কাবাব তৈরি হয়ে গেলে ফটাং শব্দ সহকারে নলাবাঁশ ফেটে যায়। তখন আগুন থেকে বের করে প্লেটে জম্পেশ করে নুন মাখিয়ে, কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়ে খেতে এক্কেবারে ফাস্‌টোকেলাস। হাজারিবাগের হান্নানের দোকানের কাবাবও হেরে যাবে নলাপোড়ার কাছে। এসব দণ্ডধরের পক্ষেই সম্ভব। নইলে, ভীম আর দুর্যোধনের মধ্যে এমন গলাগলি ভাবই বা কী করে যে হয় তাও আমার মোটা বুদ্ধির বাইরে। এমন অহি-নকুলের ভালবাসা একমাত্র গ্রেট দণ্ডধর ডাকুয়াই ঘটাতে পারে।

জিপ থেকে নেমে মাইলখানেক আসার পরেই আমার ডানপায়ের জুতোটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার সোল্‌টিকে মুক্তি দিয়েছিল। একটি ধারালো পাথরের মুখে পড়ে তার কিছু আগে হিল্‌টিও হাপিস্ হয়ে যায়। তাই ডান পায়ে আমার জুতোর উপরের খোলসটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঐ ঠাণ্ডা আইসক্রিমের মতো ধুলো, বরফের ছুরির মতো পাথর আর আলপিনের মতো কাঁটায় পা আমার ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল।

রাত আড়াইটে নাগাদ টুল্বকায় পৌঁছে মুগের ডাল খিচুড়ি এবং গুরান্টির নলা-পোড়া খেয়ে পায়ের সব কষ্টই যেন লাঘব হয়ে গেল। পথে ঘটনা তেমন আর বিশেষ ঘটেনি। একটা ভাল্লুকের সঙ্গে কুস্তি লড়তে হত, যদি না দণ্ড তার রোলেক্স গামছা মাথার উপর ধরে 'ওরে মোরো সজনী, ছাড়ি গল্লা গুণমনি, কা কর ধরিবি' গেয়ে গেয়ে তাকে নাচ না দেখাত। রুপোলি জরি-বসানো ঘোরতর লাল রঙের রোলেক্স গামছাটি দণ্ডর সব সময়ের সঙ্গী। এমন মালটিপারপাস্ গামছা বড় একটা দেখিনি। সর্বসময়ই কাঁধে শোভা পায়।

বেলা এগারোটা নাগাদ অবধি ঘুমিয়ে উঠেছি। খুব ভোরে উঠেই চলে গেছিল দণ্ড রফিককে সঙ্গে করে নিয়ে। ট্রাকে, কুলিদেরও নিয়ে গেছিল। সুরবাবুকে বলে। আমার ঘুম ভাঙার পর ও জিপ নিয়ে হৈ-হল্লা করতে করতে ফিরে এল। সঙ্গে একটা কুট্‌রা হরিণ। হরিণটাকে দেখিয়ে বলল, "তোমাদের কালীঘাটের পাঁঠার মতো ঝোল রাঁধব আজকে। সিম্পিল্ রান্না। মাংসের ঝোল আর ভাত।"

খেয়ে খেয়েই দণ্ড মরবে একদিন, যদিও ওর যা কার্যকলাপ, তাতে বাঘের কামড় খেয়ে মরাটাই অনেক বেশি স্বাভাবিক বা বাঞ্ছনীয় ছিল। দণ্ড বোধহয় কামড় খেয়ে মরার চেয়ে সুস্বাদু সব খাবার জিনিস কামড়ে খেয়ে মরাটা অনেক ভাল বলে সাব্যস্ত করেছে।

ঘর থেকে চেয়ার বের করে রোদে এনে দিল দণ্ড। আমি বসলাম। এখন গরম জামা-কাপড় খুলে ফেলেছি। আস্তে আস্তে শরীর গরম হয়ে উঠছে। রাত-শিশিরের ওসে-ভেজা ভারী ধুলো রোদের ওমে গরম হয়ে, পাতা-ঝরানো রুখুশুখু হাওয়ায় সবে উড়তে আরম্ভ করেছে। বাংলোর হাতার উল্টোদিকের জঙ্গল থেকে বড়কি ধনেশ ডাকছে কুচিলাগাছ থেকে। হ্যাঁক্-হ্যাঁক্, হ্যাঁক্-হ্যাঁক্ করে। গ্রেটার্ ইন্ডিয়ান হর্নবিল্‌কে এখানে বড়কি ধনেশ বলে। আর লেসার ইন্ডিয়ান হর্নবিলকে বলে, ছোট্‌কি ধনেশ। হোমিওপ্যাথিতে বিখ্যাত ওষুধ আছে নাক্সভমিকা। এই নাক্সভমিকা ওষুধ তৈরি হয় কুচিলা থেকেই। এই গাছগুলোর পাতার মাঝখানটিতে একটু সাদাটে রঙ থাকে। হাল্‌কা সাদা। অনেক সময় বড়কি ধনেশরা যখন মগডালে বসে থাকে, তখন তাদের বুকের সাদা আর পাতার সাদায় এমনভাবে মিশে যায় যে পাখিরই বুক না পাতারই মুখ, তা ঠাহর করতে অসুবিধে হয় ; বিশেষ করে অন্ধকার পাহাড়তলি অথবা গভীর ছায়াচ্ছন্ন জঙ্গলে।

এই বড়কি ধনেশরা বড্ড আওয়াজ করে। তা তারা যেখানেই থাক না কেন ! তাই এদের শিকার করা বেশ সোজা। এদের তেল দিয়ে কবিরাজমশাই এবং হাকিমসাহেবরা বাতের ওষুধ বানান।

ছোট্‌কি ধনেশদের বেশি দেখা যায় ভালিয়া গাছে বসে ফল খেতে। কুচিলার মতো ভালিয়াও একরকমের বন্য গাছ। ওদের ভালিয়া গাছে বসে থাকতেও দেখা যায় বলে ছোট্‌কি ধনেশদের নাম এখানে 'ভালিয়া-খাঁই'। প্রকাণ্ড বড় বড় বাদামি কাঠবিড়ালিগুলো চিঙ্ক্-চিঙ্ক্-চিঙ্ক্ আওয়াজ করতে করতে বড় বড় গাছের এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাল-ঝাঁকিয়ে শীতের রোদ-পিছলানো চিকন উজল পাতার পথে পথে ঝরনার মতো শব্দ করে ঘুর্ণা হাওয়ায় রোদকণা উড়িয়ে ছড়িয়ে সমস্ত জঙ্গলকে মুখর প্রাণবন্ত করে তুলেছে। অদৃশ্য, কোনও দারুণ-জুয়ারির গায়ক যেন সমস্ত প্রকৃতিকে অসংখ্য বাজনার মতো ভরপুর সুরে বেঁধে নিয়ে গাইছেন :

"প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে,
অলস রে, ওরে, জাগো জাগো ॥
শোনো রে চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে—
অলস রে, ওরে জাগো, জাগো ॥

চুপ করে সেই শীতের পাহাড়-জঙ্গলে ফ্যাকাসে মাটির ধূলি-ধূসর সড়কে হাওয়ার অলিগলিতে ঝরাপাতার নাচের দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়ে বসে

আছি। দণ্ড, ভীম, দুর্যোধন এবং আরও অনেকের চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই আমার কানে আসছে না। কুচিলা-খাঁইদের ডাক, বাদামি কাঠবিড়ালিদের চিকন চিঙ্ক্-চিঙ্ক্, ঝরা-পাতার মচ্‌মচানি, সবুজ টুঁই, মসৃণ মৌটুসিদের শিস্ আর হাওয়ার ফিস্‌ফিস্ সব মিলেমিশে এমন এক ভিডিও-স্টিরিওর এফেক্ট হচ্ছে আমার অবচেতনে যে তা বুঝিয়ে বলতে পারি এমন কলমের জোর আমার নেই। কোনওকালে হবেও না। জঙ্গলের মধ্যে এলে এই সবই উপরি পাওনা। বোনাস্। যদি কখনও বিনা আন্দোলনে এই বোনাস্ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জঙ্গলে এসে, তাহলে জানবে যে, তোমরা ভাগ্যবান।

বড় চমৎকার এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎই কানের কাছে দণ্ডধরের ডাকে সেই ঘোর কেটে গেল।

বলল, "সে কুটরা দেইকি আউ কঁড় রাঁধিবু ? ঝোল্ ত হউচি। টিকে কষা মাংস ভি হেল্লে মন্দ হইথান্তি না। কহন্তু আঁইজ্ঞা। কঁড় করিবু ?"

বিহ্বল ছিলাম অন্য এক দেবদুর্লভ জগতে। চলে এলাম মাংসের ঝোল আর কষা-মাংসের রাজ্যে। দণ্ডধর ডাকুয়াও একরকমের বিহ্বলতা আমার।

যদিও একেবারেই অন্যরকমের।

একটা বড় বাঘ, বাইসনের বাচ্চা ধরেছিল কাল রাতে। ধরে অনেকদূর টেনে নিয়ে গেছে বাইসনদের দলের চোখ এড়াতে, বাইসন-চরুয়া মাঠ পেরিয়ে। খাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে রেখেছিল। আমি রোদে বসে থাকতে থাকতেই দণ্ডর ইনফরমাররা খবর নিয়ে এল। দণ্ড বলল, "নিশ্চয়ই কাল রাতের বাঘটার কাজ।"

বললাম, "আমার পায়ের যে হাল, তাতে খাড়া পাহাড়ে চড়ার অবস্থা একেবারেই নেই। অন্য কোনও কিল্ করুক তখনই মাচায় বসা যাবে। নইলে, পরে হাঁকা করার বন্দোবস্ত কোরো।"

ও বলল, "তা হলে সন্ধেবেলা কী করবে ? সন্ধেবেলাও কি বাংলোয় বসে আগুনের পাশে বই পড়বে ? বই-ই পড়বে তো কলকাতাতেই পড়তে পারতে ! বই পড়ার জন্যে এত কষ্ট করে এতদূর ঠেঙিয়ে আসার দরকারটা কী ছিল ?"

"পায়ের অবস্থাটা দেখলে না ?"

"দেখেছি। শিকারে এলে এমন কত কী হয় ! যাবে কি না বলো।"

"তুমি তো মহা অবুঝ !"

"আমি অবুঝ ? না তুমি ? কাল কী খাবে ? আজ না হয় কুটরা হল !"

"খাওয়াই কি সব দণ্ড ?"

দণ্ডধর হতাশ হয়ে দুহাত দুদিকে কাঁধসমান তুলে ঢেউ খেলিয়ে বলল, "আল্লো। মু আউ কঁড় কহিবি ! কিচ্ছি কহিবাকু নাই।"

অনেক তর্কাতর্কির পর শেষ রফা হল যে, বন্দুকটা নিয়ে এক চক্কর হেঁটে

আসব সন্ধের পর। সঙ্গে ফোর-সেভেন্টি ডাবল্-ব্যারেল রাইফেলটাও নেব। যদি কোনও অভদ্র অসভ্য বড় জানোয়ার ঘাড়ে এসে পড়ে তবে তার গায়ে ঠেকিয়েই দেগে দেব। কালকে ক্যাম্পে সকলের খাওয়ার জন্যে কিছু পট্-হান্টিং-এর জন্যেই যাওয়া। ও বলল, "যিব্বি আর আসিবি। টিক্কে বুলি-বুলিকি পলাই আসিবি চঞ্চল।"

বিকেল হল। জঙ্গলে শীতকালে দ্রুতগতি চিতার মতো বিকেল আসে হরিণীর মতো দুপুরকে তাড়া করে। ক্রমশই তাদের ব্যবধান কমে আসতে থাকে। তারপর হঠাৎই সন্ধে এসে মস্ত হলুদ দিগন্তজোড়া বাঘেরই মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে কালো থাবা চালায় তাদের দুজনেরই উপর। রাত নামে। সব কালো হয়ে আসে।

আমাদের দণ্ডধরের শীতকালীন শিকারের পোশাকের একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার। পায়ে একটি ডাকব্যাকের গামবুট। নিম্নাঙ্গে কাছা-কোঁচা গোঁজা। এই-মারি কি সেই-মারি ভঙ্গিতে পরা খাটো ধুতি। ঊর্ধ্বাঙ্গে হলুদরঙা হাফশার্ট। তারও উপরে ঘোরতর মারদাঙ্গা লালরঙের একটি আলোয়ান। ওর নুয়াগড়ের বাড়ি ছেড়ে যতদিন জঙ্গলে এসে থাকে দণ্ডধর ততদিন দাড়ি কামায় না। কাঁচা-পাকা, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি মুখময়। এবং মিটি-মিটি হাসি। হাসির ফাঁকফোকর দিয়ে গুণ্ডি-পানের গন্ধ। এই সন্ধেয় বাঁ-কাঁধে লাঠির মতো করে শোয়ানো ফোর-সেভেন্টি ডাবল্-ব্যারেল রাইফেলটি। ডান হাতে পাঁচ-ব্যাটারির টর্চ।

রেডি হয়ে এসেই ও বললে, "চালুন্ত আইজ্ঞা। চঞ্চল যিবি, চঞ্চল আসিবি। গুলি বাজ্জিবে কী প্রাণ যিব্বে।"

কিছুটা গিয়ে ভীমধারার ঝরনা পেরিয়ে বাঁ-দিকে ঢুকে গেলাম আমরা। তখন সবে অন্ধকার হয়েছে। আলো না-জ্বেলে দণ্ড আগে আগে চলেছে। আমার লোকাল-গার্জেন, ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফিলসফার। জঙ্গলে কৃষ্ণপক্ষ রাতেও তারাদের আলো থাকে। তবে সে-আলোর সুবিধা পাওয়া যায় শুধু জলের ধারে বা ফাঁকা জায়গাতেই। কৃষ্ণপক্ষের রাতে জঙ্গলের গভীরে একবার ঢুকে পড়লে, তারা তেমন কোনও কাজে আসে না। তবু জানোয়ার-চলা সুঁড়িপথটা দেখা যাচ্ছিল একটু একটু, আবছা। অন্ধকারে, মায়ের খুব কাছে শুয়ে আলোনিবনো ঘরে মায়ের মাথার সিঁথি যেমন দেখতে পাও তোমরা, তেমন।

মিস্টার ডাকুয়া চলেছে তো চলেছেই। আমি ভেবেছিলাম, জলের পাশে কচি ঘাসে বুঝি চিতল হরিণের খোঁজে চলেছে সে। অথবা টুল্কা গাঁয়ের শেষ সীমানাতে বিবি-ডালের খেতে শম্বরের দলের খোঁজে। দণ্ডধরের পূর্ব-চিহ্নিত কোনও বিশেষ শুয়োরেরও খোঁজেও হয়তো হতে পারে। কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে সেরকম আদৌ মনে হচ্ছে না। অথচ শিকার যাত্রায় বেরিয়ে পড়ার পর দণ্ডধরের গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করি এমন দুঃসাহস আমার আদৌ ছিল

না। অধমের পায়ের অবস্থার কথাও ও বিলক্ষণই জানে। মনের অবস্থা জানে না এমনও নয়। সব জেনেশুনেই ও এমন হেনস্থা করছে আমার। অ্যালগারনন্ ব্ল্যাকউডের একটা দারুণ বই দিয়েছিল দেবু। সেই বইটা অর্ধেক পড়ে রেখে এসেছি। মনটা আমার এখন সেই মূজ-শিকারির বুকপকেটে গোঁজা আছে। মনে হচ্ছে মিস্টার ডাকুয়ার হাতে পড়ার চেয়ে ডাকাতের হাতে পড়াও অনেক ভাল ছিল।

এখনও টর্চটা একবারও জ্বালায়নি ও। উদ্দেশ্য, গভীর সন্দেহজনক। আমার ডান-পা'টা যাতে চিরদিনের মতোই যায়, তারই বন্দোবস্ত পাকা করতে চায় বোধহয়।

হঠাৎই দেখলাম সামনে জঙ্গলটা ফাঁকা হয়ে এল। যেন ভোজবাজিতে। সামনে অনেকখানি সমান ফাঁকা জায়গা। কোনওকালে ক্লিয়ার-ফেলিং হয়েছিল সেগুনের। তারপর জংলি ঘাস জবরদখল নিয়েছে। ফাঁকা জায়গাটার কাছে পৌঁছে দণ্ড মুখে দু' আঙুল পুরে শিস্ দিল একবার। ফাঁকা জায়গাটার ওপাশের জঙ্গল থেকে অন্য কেউ শিস দিয়ে উত্তর দিল। তারার আলোয় দেখলাম ও-পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি প্রায়-উলঙ্গ ছায়ামূর্তি টলতে টলতে আমাদের দিকে আসছে। লোকটা যখন কাছে এল তখন দেখলাম তার পরনে একটি ছেঁড়া গামছা। গায়েও একখানি গামছা। দণ্ড কথা না বলে, তার আলোয়ানের নীচ থেকে একটি থলি বের করে লোকটিকে দিল। বলল, "ভাল করে খাস্। পেট ভরে।"

লোকটা বলল, "হুঁ।"

"কষা মাংস আর রুটি আছে।"

"হুঁ।" লোকটা আবার বলল।

তারপর দণ্ড আমাকে কিছুটা পাইপের তামাক দিতে বলল লোকটাকে। দিলাম। খৈনির মতো হাতে ডলে ঠোঁটের নীচে দিয়ে দিল লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে।

অন্ধকারেও ওর পাঁজরের হাড় গোনা যাচ্ছিল। দণ্ডধর ওকে জিজ্ঞেস করল ঘড়িংয়ের পায়ের দাগ সে দেখেছে কি না! লোকটা বলল, "একটু এগিয়েই একটা 'নুনি' আছে। সেখানে শম্বর, ঘড়িং, গল্ব, সব নিয়মিত আসে। বাঘও আসে তাদের পেছন-পেছন। নুনির পাশে একটা ঝাঁকড়া শিশুগাছ আছে। তার নীচে বড় বড় পাথর, আর ঝোপঝাড়। তার আড়াল নিয়ে বোসো গিয়ে নির্ঘাত শিকার। কিন্তু সাবধান! বেশি রাত অবধি থেকো না ওখানে ভুল করেও।"

"কেন? দণ্ডধর শুধোল, কোমরের বটুয়া থেকে আরেকটা গুণ্ডিপান মুখে ফেলে।"

"ঠাকুরানি আছেন ওখানে।"

দণ্ডধর গালাগালি দিয়ে বলল, "আফিং খেয়ে খেয়ে আফিংখোর তোর মগজটা একেবারেই গেছে রে, শিব্ব।"

"না রে, দণ্ড। আমার কথা শুনিস্। নইলে বিপদ হবে।" লোকটা ভয়-পাওয়া গলায় বলল।

"দণ্ডধর ডাকুয়াকে বিপদের ভয় দেখাস না। তুই এখন বউয়ের সঙ্গে কুট্‌রার কষা-মাংস আর রুটি খা গিয়ে যা পেট ভরে। সঙ্গে সেগুন-পাতায় পোড়া আমলকীর আচারও আছে।

শিব্ব নামক লোকটি ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "খাবে নাকি?"

দণ্ড যেন খুব অনিচ্ছার সঙ্গেই বলল, "দে।"

"বাড়ি চল তাহলে।"

শিব্বর সঙ্গে একটু হেঁটে হেঁটে ওর কুঁড়ের কাছে গেলাম আমরা। এক ঘটি জল এনে ও দণ্ডকে কী যেন খেতে দিল। নাড়ুর মতো দেখতে। কিন্তু কালো। দণ্ড আমাকেও দিল দুটো। বলল, "খেয়ে নাও কথা না বলে।"

"কী? জিনিসটা কী?"

"প্রসাদ। ঠাকুরানির কাছে যাচ্ছ, শিব্বর কথা শোনো। ভাল ছাড়া খারাপ হবে না কোনও।"

নাড়ুদুটো জল দিয়ে বাধ্য ছেলের মতো খেয়ে ফেললাম।

শিব্ব আমাদের এগিয়ে দিল একটু। তারপর ছায়ামূর্তিরই মতো মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। অন্ধকারে দণ্ড আর আমি জঙ্গলের গভীরে ফিরে জানোয়ার-চলা পথটি ধরলাম।

ফিসফিস করে দণ্ডকে শুধোলাম, "ওই ভুতুড়ে লোকটি কে হে?"

"ওর নাম শিব্ব। শুনলে তো!"

"তোমার কে হয়?"

"আমার ভাই।"

"ভাই? কখনও দেখিনি তো। কীরকম ভাই?"

"দেশের ভাই। মাটির ভাই। সবচেয়ে কাছের ভাই।"

"ওঃ।" আমি বললাম।

"আজকে একটা খুব বড় গল্প মেরে দাও তো, ঋজুবাবু।" কথা ঘুরিয়ে ও বলল।

"বড় গল্প তো গত সপ্তাহেই মেরেছি। খামোকা বাইসনের মতো অতবড় জানোয়ার মেরে কী হবে দণ্ড? অমাদের খেতে তো অত মাংস লাগবে না। তাছাড়া বাইসনের বা নীলগাইয়ের মাংস আমি তো খাই না। এ তো অন্যায়।"

"কিসের অন্যায়?" দণ্ডধর ডাকুয়ার চোখ অন্ধকারে আবার বাঘের মতো দপ্ করে জ্বলে উঠল। ও বলল, "জানো ঋজুবাবু এই শিব্ব মাংস খেয়েছিল গত

বছরের আগের বছর যখন আমরা এখানে শিকারে এসে একটা বড় শম্বর মারি। তারপরে আর কোনওরকম মাংসই ও খায়নি। গত সপ্তাহে তোমার মারা গন্ধর মাংস অবশ্য খেয়েছিল পেট পুরে। মাছ খেয়েছিল গত দু বছরে মাত্র তিন-চারদিন। ভীমধারার দহে কখনও-সখনও কুঁচো মাছ জমে। তাও দাবিদার অনেক। টিকরপাড়ার কনট্রাক্টর। খাইয়েছিলেন এখানকার গ্রামের সব্বাইকেই গত বছরে তাঁর জঙ্গলে খুব ভাল কাঠ বেরিয়েছিল বলে।"

হেসে বললাম, "মাছ-মাংস তো কত লোকেই খায় না।"

দণ্ডধর দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "তা খায় না বটে, কিন্তু তারা তো অন্য অনেক কিছু খায়। দুধ খায়, মাখন খায়, ঘি খায়, তরি-তরকারি, ফলমূল, ডাল-ভাত কত কী খায়!"

"শিব্ব কী খায়। শিব্বও তো এ-সব খায়। ঘি-মাখন না হয় নাই খেল!"

"শিব্ব?" তাচ্ছিল্যের গলায় দণ্ড বলল। "দিনে একবেলা, একহাঁড়ি খুদের মধ্যে জল আর আফিঙের একটু গুঁড়ো মিশিয়ে সেদ্ধ করে খেয়ে থাকে ও আর ওর বৌ। পেটের পিলেটা দেখলে না, পাঁচ-নম্বরি ফুটবলের মতো। আর বছরের জামা-কাপড়? একটা পাঁচ টাকা দামের গামছা দু' ভাগ করে কেটে গায়ে দেয় ও পরে শিব্ব। সারা বছর। একটা বারো টাকা দামের শাড়ি পরেই ওর বউ বারোটা মাস কাটিয়ে দেয়। করবে কী? ওদের সঙ্গে তুমি কাদের তুলনা করছ ঋজুবাবু?"

আমি চুপ করে ছিলাম।

দণ্ড বলল, "একটা গন্ধ মারলে কতগুলো গ্রামের লোক মাংস খেতে পারে তার ধারণা তো তোমার আছে। নিজের চোখে দেখোনি? কত পাহাড়-নদী পেরিয়ে মেয়ে-পুরুষরা গত সপ্তাহে-মারা বাইসনটার মাংস নিতে এসেছিল? কত ঘন্টা তারা ধৈর্য ধরে বসেছিল।"

"কিন্তু আমার পারমিটে যে মোটে একটাই বাইসন ছিল। গত সপ্তাহে তা তো মেরেইছি দণ্ডধর। অন্যায় হবে না বনবিভাগের পারমিটের বাইরে শিকার করলে?"

দণ্ডধর দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ আমার দু'চোখের উপর পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা ফোকাস্ করল। যেন আমিই কোনও সাংঘাতিক শ্বাপদ। আলোর তোড়ে আমার চোখদুটো বুজে এল। তারপর ওর মুখটা আমার বাঁ কানের কাছে এনে ফিসফিস করে দণ্ড বলল, "একটা বড় ন্যায়ের জন্যে পাঁচটা ছোট অন্যায় করার মধ্যে কোনওই পাপ নেই। এ-গ্রামের এবং অন্য অনেক গ্রামের লোককে সমানভাবে মাংস ভাগ করে দেব আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। তুমি দেখো। কত মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে তুমি! সে কি আনন্দের নয়? পুণ্যের নয়? সব পুণ্য বুঝি কেতাবি আইন মানারই মধ্যে?"

এই অবধি বলেই, আমাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই রাইফেলটা

ধপ্পাস্ করে আমার কাঁধে ফেলে দিয়ে বলল, "চলো। আজ নুনিতে বসে বড্ড গল্প মারব আমরা।"

জঙ্গলের গভীরে বসে দন্ডধর ডাকুয়ার কথা অমান্য করার সাহস তখন কেন, কোনওসময়ই আমার ছিল না। তা ছাড়া, কতই বা বয়স তখন আমার। বড়জোর বাইশ-তেইশই হবে। কলেজ থেকেই পাইপ ধরেছিলাম। অন্য কিছুর জন্যে নয়, পয়সা খরচ প্রায় একেবারেই নেই বলে। দণ্ডধর জেঠুমণিকে পর্যন্ত ডোন্টকেয়ার করত আর আমি তো কোন্ ছার্।

ফোর-সেভেন্টি রাইফেলটা কাঁধে ঠিক করে তুলে নিলাম। কেন, বুঝলাম বাংলোতে থ্রি-সিক্সটি-সিক্স ম্যানকিলার শুনার রাইফেলটা (আমার প্রিয় রাইফেল) থাকতেও ও ইচ্ছে করেই ফোর-সেভেন্টি ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা নিয়ে এসেছিল। এটি অনেক বেশি শক্তিশালী রাইফেল। জেফ্রি নাম্বার টু। মোক্ষম মার। বড় জানোয়ার মারতে এতেই সুবিধা।

আর কোনও কথা না বলে নুনিতে এসে পৌঁছলাম আমরা। আমাদের দেশের এবং অন্য অনেক দেশের জঙ্গলের গভীরেই এরকম কিছু জায়গা থাকে যেখানে মাটিতে নুন থাকে। জংলি তৃণভোজী জানোয়ারেরা সেই নুন চাটতে আসে। ছোট্ট হরিণ থেকে গণ্ডার সবাইই চাটে। ইংরিজিতে একেই বলে 'সল্ট-লিক্'। অনেক জায়গায় বনবিভাগ বস্তা বস্তা নুন ফেলেও কৃত্রিম 'নুনি' বানান অথবা স্বাভাবিক নুনির এলাকা বাড়ান।

শিব্বর কথামতো নুনিতে পৌঁছে আমরা ঐ ঝাঁকড়া শিশুগাছের নীচেই আড়াল নিয়ে বসলাম ঝোপঝাড়ের পেছনে। নুনির উপরের আকাশ ফাঁকা। মাঝের ঘাস, শিশিরে ভিজে গেছে। কোনও বড় জানোয়ার জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে নুনিতে এসে দাঁড়ালে তাকে মারা কঠিন হবে না, আলো ছাড়াই। কিন্তু দণ্ড বলল, "কোনওই চিন্তা নেই। আমি আলো দেব তোমার ডান কাঁধের উপর দিয়ে রাইফেলের ব্যারেলের উপরে, যাতে ব্যাক্সাইট ফ্রন্টসাইট দুইই দেখতে পাও। মারবে আর পড়ে যাবে। গুলি বাজ্জিবে কী প্রাণ যিব্বে। তারপর তোমাকে আর পায়ের ব্যথা নিয়ে হেঁটে যেতে হবে না। আমিই কাঁধে করে বাংলোতে নিয়ে যাব।"

"তুমি নিজেই কেন মারছ না দণ্ডধর? তুমি তো আমার চেয়ে হাজারগুণ ভাল শিকারি?"

দণ্ড হাসল। বলল, "তুমি ঋজুবাবু কত ক্ষমতাবান লোক; বড়লোক। জেঠুমণির ভাইপো। আইন-কানুন সব তোমাদের হাতে ভাঙলেই মানায় ভাল। তোমাকে কেউই কিছু বলবে না। কিন্তু যদি আকাশের তারারাও দেখে ফেলে যে এইসব গ্রামের লোকদের একদিনের জন্যে মাংস খাওয়াবার জন্যে, ইংরিজিতে তোমরা পোচিন্ কী বলো যেন; তাই করে নিজে হাতে একটি ঘড়িং বা গল্প মেরেছি আমি; নুয়াগড়ের ভিখারি ডাকুয়ার ছেলে এই সমান্য মানুষ

দণ্ডধর ডাকুয়া, তাহলেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের খাতায় আমার নাম উঠে যাবে। আমাকে, আমার ছেলেকে, এমনকী আমার নাতিকে পর্যন্ত অপরাধী থাকতে হবে তাদের কাছে। যুগযুগান্ত ধরে কান মুলতে হবে। নাকে খত দিতে হবে। তুমি আর আমি কি এক হলাম ঋজুবাবু? আইন তোমাদের কাছে তামাশা, আর আমাদের কাছে তা ফাঁসি।"

"তোমার বক্তৃতার চোটে তো কোনও জানোয়ার এদিকে আর আসবে বলে একটুও মনে হচ্ছে না দণ্ডধর।"

"এইই চুপ করলাম।" ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে দণ্ডধর বলল। একটু পরই আবার রাতের জঙ্গলকে চমকে দিয়ে বলল, "আসবে না তো যাবে কোথায়? আমি কি গুণ্ডিপান না-খেয়ে থাকতে পারি? গুড়াখু দিয়ে দাঁত না মেজে পারি? না, তুমি পারো পাইপ না খেয়ে? নেশা বলে ব্যাপার। জানোয়ার নুনিতে আসতে বাধ্য। খুব বড্ড সাইজের একটা দেখেশুনে একেবারে মোক্ষম মার মারবে কিন্তু। অনেক মণ মাংস হয় যাতে। ফস্কিয়ে যায় না যেন!"

বসে আছি তো বসেই আছি। শিব্বর সেই কেলে নাড়ুতে কী ছিল কে জানে। কেমন ঘুম-ঘুম পাচ্ছে! হাত-পা অবশ-অবশ লাগছে। মনে হচ্ছে, আমার হাতদুটো বেহাত হয়ে গেছে।

ফিস্ফিস্ করে দণ্ডকে সে-কথা জিজ্ঞেস করলাম।

ও মাথা নেড়ে বলল, "রাইফেলের গুলির চেয়েও মারাত্মক! আস্তে-আস্তে দেখবে এর ফল। সফ্ট-নোজড্ বুলেটের মতোই ক্রিয়া। হুঁ!"

ক্রিয়ার কথা শুনে পুলকিত হলাম। কিন্তু তারপর কর্মটা যে কী হবে, সেইটেই দেখার।

একদল চিতল হরিণ এল। নুন চাটল খস্খসে জিভ দিয়ে খচ্র-খচ্র করে। চলে গেল। আমাদের পেছনে খানিকটা দূরে হাতির একটি ছোট দল চরে খাচ্ছিল। ডালপালা ভাঙার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। হাতিদের পেটে সবসময়েই যজ্ঞিবাড়ির উনুনের মতো কত কী সব রান্না হয়। নিস্তব্ধ জঙ্গলে অনেকদূর থেকেই সেই ফোঁস-ফোঁস, ভুটুর-ভাটুর আওয়াজ শোনা যায়। ওরা বাঁশ ভাঙছে মটাস-মটাস করে। হাতিরা আছে। কিন্তু নীলগাই অথবা বাইসন কারও দলেরই দেখা নেই। নীলগাইকে ওরা বলে ঘড়িং। আর বাইসন বা ইন্ডিয়ান গাউরকে বলে গল্প। একদল শুয়োর, ধাড়ি-বাচ্চা, মদ্দা-মাদিতে ভরপুর, জোরে দৌড়ে পার হয়ে গেল নুনিটা। কিসের এত তাড়া ওদের কে জানে! ঘন্টা-দেড়েক বসে থাকার পর কেবলই মনে হতে লাগল অনেক জানোয়ারই যেন জঙ্গলের কিনারা অবধি আসছে কিন্তু নুনিতে নামছে না। বিভিন্ন জানোয়ারের পায়ের শব্দ পাচ্ছি স্পষ্ট পাথুরে জমিতে। তারপরই আওয়াজগুলো আশ্চর্যজনকভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে। নুনির কিনারা অবধি আসার

আওয়াজ পাচ্ছি। কিন্তু ফিরে যাওয়ার কোনও আওয়াজই কানে আসছে না। আশ্চর্য ব্যাপার! দণ্ডধরকে ফিস্‌ফিস্ করে শুধোলাম, "এখানে তুমি আগে এসেছ কখনও?"

"নাঃ।" সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ও।

আমার মনে, 'কু-ডাক' দিচ্ছিল। মনে হচ্ছে, জায়গাটায় আশ্চর্য সব ব্যাপার-স্যাপার ঘটে। তবে, ভয় করছিল না; কৌতূহল হচ্ছিল খুব। মাথাটাও খুব ভার-ভার মনে হচ্ছিল। এরকম কখনও আগে বোধ করিনি। অন্ধকারে চোখের সামনে ময়ূরের পালকের মতো রঙ দেখছিলাম ঝলক্-ঝলক্। হঠাৎ খুব বড় একটা একলা-শিঙাল শম্বর ঘ্যাক্-ঘ্যাক্ করে ডাকতে ডাকতে প্রচণ্ড জোরে পুবদিক থেকে পশ্চিমে দৌড়ে নুনিটা পার হয়ে গেল। মুখ উঁচু করে ডালপালাওয়ালা প্রকাণ্ড শিংটাকে পিঠের উপর শুইয়ে পাথরের উপর পায়ের খুরে খট্‌খটানি আওয়াজ তুলে। এবং তার সামান্য পরেই একটা বড় বাঘ নিঃশব্দে জঙ্গলের গভীর থেকে লাফ মারল। নুনিটার মাঝখানে লাফিয়ে পড়েই ঘাপ্‌টি মেরে বসে যেন ঝোপঝাড় ভেঙে শম্বরটার চলে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে লাগল দু-কান খাড়া করে। বাঘ কিন্তু সচরাচর এমন ফাঁকায় আসে না। সবসময়ই আড়ালে-আবডালে চলে ছায়ার মতো। জাত-শিকারি সে। আমাদের দিকে ব্রড-সাইড ছিল বাঘটির। আমার পারমিটের বাঘ এখনও মারা হয়নি। দণ্ডধরের সঙ্গে আমার যেন মনে-মনে কথা হল টেলিপ্যাথিতে। দণ্ডধর মুখে কথা না বলে আমার পিঠে খোঁচা দিল। মুহূর্তের মধ্যে রাইফেল তুললাম আমি। কিন্তু চোখ ঝাপসা। মগজ ফাঁকা। পায়ে দলদলি। হাত বেহাত।

আমার মাথার মধ্যে কে যেন বলল, এ একেবারেই ঠাকুরানির দান। এই বাঘ। দণ্ডধর আলো ফেলল সঙ্গে-সঙ্গে। দু' চোখ খুলে বাঘের বুকে নিশানা নিয়ে গুলি করলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল। নুনির চতুর্দিক থেকে পাগলাঘন্টির মতো কিন্তু গৃহস্থ বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর সময় যেমন নিচুগ্রামে ঘন্টা বাজে তেমন, অনেক ঘণ্টা একসঙ্গে বেজে উঠল। অসংখ্য লোক হাত নেড়ে-নেড়ে যেন সেই ঘণ্টা বাজাচ্ছিল। সেই ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে রাইফেলের গুলির আওয়াজ এবং বাঘের চাপা গর্জনের আওয়াজ মিশে গেল। কিছু বোঝার আগেই দেখলাম একলাফে বাঘ উধাও। তারপর যাকে সে একটু আগে শিকার করবে বলে তাড়া করেছে বলে মনে হয়েছিল সেই শম্বরের মতো সে-ও জঙ্গল ঝোপঝাড় লণ্ডভণ্ড করতে করতে উধাও হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনিও থেমে গেল। হঠাৎ গুলির শব্দে রাতের বনে যে-সব বাঁদর ও নানারকম পাখি চেঁচামেচি করে উঠেছিল, তারাও হঠাৎ থেমে গেল। অথচ, এমন হঠাৎ তারা থামে না কখনও।

দণ্ডধর আমার পিঠে আঙুল দিয়ে আবার খোঁচা মেরে উঠতে বলল।

ঠিক দশটার সময় বাঘটাকে গুলি করেছিলাম। দণ্ডধরকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। খণ্ডিয়া মানে জখম বাঘ যেদিকে গেছে তার বিপরীত দিকে ভীমধারার উঁচু মালভূমির দিকে আমরা এগোতে লাগলাম।

বেশ কিছুদূর এসে দণ্ডধর বলল, "ঠিক দশটার সময় তুমি বাঘটাকে গুলি করেছিলে, তাই না?"

"হবে। ঘড়ি তো দেখিনি! কিন্তু ঘন্টাগুলো কী ব্যাপার?"

দণ্ডধর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "কথা বোলো না। চুপ"

আরও কিছুটা গিয়ে ও বলল, "শিব্বকে কান ধরে পিটব আমি। এখানের ঠাকুরানি যে এমন জাগ্রত এ-কথা সে বলে তো দেবে! আমাদের প্রাণ চলে যেত একটু হলে। জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে চুল পাকালাম এমন আজব ব্যাপার কখনও দেখিনি বা শুনিনি। এখন দ্যাখো। এ যদি সত্যি বাঘ হয়, মায়ার বাঘ না হয় তবে কাল এই খণ্ডিয়া বাঘ আমাদের অশেষ কষ্ট দেবে। একে খুঁজে বের করে মারতে হবে। এভাবে তো আর ছেড়ে রেখে চলে যাওয়া যাবে না।"

চলতে চলতে বললাম, "মায়ার বাঘ মানে?"

"বাঃ! রামায়ণে মায়ামৃগের কথা পড়োনি! ঠাকুরানি পঞ্চাশ হাতে ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন আর মায়া-বাঘ হাজির করতে পারেন না? আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল। আচ্ছা, নানা জানোয়ারের নুনিতে আসার শব্দ পেয়েছিলে তুমি?"

বললাম, "হ্যাঁ। কিন্তু ফেরার কোনও আওয়াজ পাচ্ছিলাম না। আশ্চর্য!"

"ঠিক! তখনই আমাদের ঐ নুনি ছেড়ে চলে আসা উচিত ছিল। আমি ভাবলাম, তোমাকে কোনওমতে রাজি করিয়েছি একটা বড্ড গল্প মারতে, চলে গেলে, যদি কাল আবার তুমি মত পাল্টে ফেলো? আমার লোভেই এমন হল। এখন কাল কী আছে কপালে, তা ঠাকুরানিই জানেন।"

ভীমধারার মালভূমিতে এদিক দিয়ে উঠতে হলে অত্যন্ত চড়াই বেয়ে উঠতে হয়। ঐ শীতেও আমরা ঘেমে গেলাম। উত্তেজনায় শরীরে ও মস্তিষ্কেও সাড় ফিরে এসেছিল। কিন্তু নিচ দিয়ে যাওয়ার সাহস ছিল না। গুলি-লাগা খণ্ডিয়া বাঘ কোথায় ওৎ পেতে বসে থাকবে কৃষ্ণপক্ষের রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তা কে জানে! ওদিকে জঙ্গল অত্যন্ত ঘনও। এবং এখন গভীর রাত। তার উপরে দণ্ডধর বলেছে: ঠাকুরানির বাঘ!

ভীমধারার মালভূমির উপরে পৌঁছে একটু দম নিলাম আমরা। কুলকুল করে বয়ে চলেছে পরিষ্কার জল চ্যাটালো পাথরের বুক বেয়ে অনেক ধারায় ভাগ হয়ে সমান্তরাল রেখায়। কিছুটা গিয়েই আমাদের বাঁদিকে প্রপাত হয়ে পড়েছে। তারার আলোতে পরিষ্কার মালভূমিটিকে স্বর্গীয় বলে মনে হচ্ছে। আমরা জলের কাছে এসে রাইফেল, বন্দুক, টর্চ সব পাথরের উপর শুইয়ে রেখে আঁজলা ভরে জল খেলাম। দণ্ডধর আলোয়ানটাকেও নামিয়ে রাখল পাথরের

উপরে। জল খেয়ে, মুখে, চোখে, ঘাড়ে, ঠাণ্ডা জল দিয়ে আমরা যখন উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক রাইফেল তুলে নেওয়ার জন্যে পেছনে ফিরেছি, দেখি আমাদের সম্পত্তিগুলো আর আমাদের মধ্যে আড়াল করে কালো পাহাড়ের মতো একটি একরা বাইসন দাঁড়িয়ে আছে। নিথর হয়ে। তার চোখ আমাদের দিকে।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি দুজনেই। খালি হাত। এত বড় বাইসন এ-অঞ্চলেও কখনও দেখিনি। পুরুনাকোট-টুম্বকার বাইসনদের নাম আছে সারা ভারতবর্ষে। কিন্তু তবু এ-অঞ্চলেও এত প্রাচীন বাইসন কখনও দেখিনি। তার গায়ের কালো রঙ বয়সের দরুণ যেন পেকে বাদামি হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে সাদা জায়গাটা, হাঁটু ও পায়ের কাছের সাদা জায়গাগুলো পরিষ্কার দেখাচ্ছে। নীলাভ দ্যুতি ছড়ানো তারাভরা কালো আকাশের পটভূমিতে নিথর হয়ে মহাকালের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে। যেন, পাথরে গড়া মূর্তি।

হঠাৎই দণ্ডধর হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বিড়বিড় করে কী সব বলতে লাগল অস্ফুটে। আর আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। অত বড় বাইসনটা পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে এলে যে শব্দ হত তা বহুদূর থেকেই শোনা যেত। এইখানে অত বড় তৃণভোজী জানোয়ারের লুকিয়ে থাকার মতো কোনও আড়ালও ছিল না। মাংসাশী জানোয়ারেরা লুকোবার অনেক কায়দা জানে। কিন্তু এরা তা জানে না। এও কি ঠাকুরানিরই কারসাজি! এ এখানে কখনওই ছিল না আমরা যখন জল খেতে নামি ঝরনাতে। আমরা জল খেতে নামার পরেও আসা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

দণ্ডধর কী সব বলেই চলল। আবারও হঠাৎ সববেত ঘন্টাধ্বনি হল জোরে জোরে। এ যেন কৃষ্ণপক্ষের ঘোরা রাত নয়, যেন কোজাগরী পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোয় ঘরে ঘরে কমলাসনার পুজো হচ্ছে। পরক্ষণে হঠাৎই ঘণ্টা থেমে গেল। এবং এত বড় বাইসনটিও উধাও হয়ে গেল। চোখের নিমেষে।

দণ্ডধর মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ল। ট্যাঁকের বটুয়া থেকে বের করে একমুঠো গুণ্ডি ঢেলে পান সাজল একটা। পানটা মুখে পুরল। আমিও ওর পাশে বসে পাইপে ঠেসে তামাক পুরে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে মাথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে লাগলাম। পাগল-টাগল হয়ে যাব না তো? কী কুক্ষণে এবার এখানে এসেছিলাম! তাইই ভাবছিলাম।

বাংলোয় ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম। কাল সকালের কথা ভাবতেই গায়ে জ্বর আসছিল। আহত বাঘকে অনুসরণ করে এর আগে অনেকবারই মেরেছি। এই সব মুহূর্তেই শিকারির স্নায়ু, সাহস, ধৈর্য আর অভিজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। তাতে, সত্যিকারের শিকারির উত্তেজনাই বাড়ে। একরকমের আনন্দও হয়। যে আনন্দের কথা শুধু শিকারিরাই জানেন। কিন্তু ভয় করে না। শিকারের সমস্ত আনন্দ তার বিপদেরই মধ্যে। কিন্তু খণ্ডিয়া বাঘকে নিয়ে ঠাকুরানি যে কী খেলা খেলবেন তা তিনিই জানেন।

শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম, দণ্ডধর, ভীম, দুর্যোধন, ওরা সকলে মিলে ফিসফিস করে ঠাকুরানির নানারকম অলৌকিক কীর্তিকলাপের কথা আলোচনা করছে। তারপরই দুর্যোধন খালি গলায় রাতের জঙ্গল মথিত করে উদাত্ত স্বরে আবেগভরে গান ধরল :

"দয়া করো দীনবন্ধু, শুনে যাউ আজদিন
করজোড়ে তুম পাদে করুছি মু নিবেদন
সত্য শান্তি প্রদায়ক, দুষ্ট দণ্ড বিধায়ক
রুক্মিনী প্রাণনায়েক প্রভু পতিতপাবন।

অনাদি অনন্ত হরি নৃসিংহ মুরতি ধরি
হিরণ্য দৈত্যকু মারি বুক কৈল বিদারণ ॥

দোয়াপর যুগরে হরি গুপ্তে বরি গুপপুরী
দুষ্ট কংসকু নিবারি রজা কল উগ্রসেন
ভারতভূমি মধ্যরে সুদর্শন ধরি করে
পাণ্ডবংক ছলে হরি, কৌরবে কল দহন
কলি যুগে জগরনাথ্ বিজে চক্রহস্ত
সাধিয়ে পউঠি অন্ন আপে করুছ ভবন
তুমে এ সংসারে সার, আভি সব মায়া ঘর
কুতাংত ডর উঠ্‌রো কহে দীন জনহীন ॥

দুর্যোধনের গলার সুন্দর ভক্তিকম্পিত জগন্নাথ-বন্দনার গান শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল চেঁচামেচিতে। বাইরে এসে দেখি অনেক মেয়ে-পুরুষ জমা হয়েছে বাংলোর সামনে। তারা সমস্বরে অনুযোগ করছে, "তম্বে এট্টা কঁড় করিলু বাবু? সে বড্ড বাঘ্‌ঘটাকু খণ্ডিয়া করিকি ছাড়ি দেলু? আম্মোমানে ঝাড়া দেইবাকু যাউ পারি নান্তি। কঁড় হব্ব এব্বে?"

মানে, তুমি এটা কী করলে বাবু? বড় বাঘটাকে আহত করে ছেড়ে রাখলে? আমরা জঙ্গলে প্রাতঃকৃত্য পর্যন্ত করতে যেতে পারছি না। কী হবে এবারে?

দেখলাম, দণ্ডধর তাদের শান্ত করে বলল, "এক্ষুনি হাঁকা করব আমরা। খণ্ডিয়া বাঘকে মেরে তবেই মুখে জলদানা দেব। বাঘটা কোথায় আছে যারা দেখেছে তারা চলো আমাদের সঙ্গে। মেয়েরা আর ছোটরা বাদে।"

এমন সময় দেখা গেল, গামছা-পরা একটা হাড়সার লোক আসছে গেট পেরিয়ে। দণ্ডধর ভাল করে দেখে বলল, "আরে, শিব্ব না?"

কাল রাতের অন্ধকারেই তাকে দেখেছিলাম। দিনের আলোয় আমার চেনার

কথা নয়। তার পেছনে পেছনে কঙ্কালসার একটি নারীমূর্তিকেও আসতে দেখলাম।

শিব্ব কাছে এলে, তাকে পাশে ডেকে দণ্ডধর কী সব জিজ্ঞেস করল। দণ্ডধরকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

শিব্ব বলল, সেও যাবে হাঁকা করতে। খণ্ডিয়া বাঘ যদি মারা পড়ে, তাহলে গব্বর মাংসর বদলে বাঘের মাংসই খাবে। বাঘের মাংস তো কী, তাই-ই সই! মাংস তো!

ভাবছিলাম, বাঘের মাংস চিবোনোই যায় না। রবারে কামড় দিলে দাঁত যেমন লাফিয়ে ওঠে তেমন করেই লাফিয়ে ওঠে দাঁতের পাটিও। বাঘের তলপেটের কাছে যতটুকু চর্বি থাকে তা তো লোকে বাঘের চামড়া ছাড়ানো হলে কাড়াকাড়ি করেই নিয়ে নেয় ওষুধ বানাবার জন্যে। শিব্ব তার এই জিরজিরে চোয়াল আর আফিংয়ে গুঁড়ো আর কন্দসেদ্ধ খাওয়া পেট নিয়েও বাঘ খাবার আশা রাখে দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

আধঘণ্টার মধ্যেই কেরোসিনের টিন, শিঙে, ঢোল, করতাল এবং টাঙ্গি ও তীর-ধনুক নিয়ে প্রায় জনা-পঞ্চাশেক লোক জমে গেল। কিন্তু অধিক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট হওয়ার ভয়। এ-কথা দণ্ডধরকে বলতেই সে বেছে-বেছে জনাকুড়ি লোককে সঙ্গে নিল। বাকি যারা, তারা তাদের বউ শালিদের সামনে রিজেকটেড হওয়াতে প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করল মনে হল।

দণ্ডধরকে শট্‌গানটা দিয়েছি। ডান ব্যারেলে লেথাল্ বল্ এবং বাঁ-ব্যারেলে স্ফেরিক্যাল বল্ পুরে। আরও চারটে গুলি নিয়েছে সে শার্টের পকেটে। আমি নিয়েছি ফোর-সেভেন্টি-ফাইভ ডাবল-ব্যারেল। সফ্‌ট-নোজ্‌ড গুলি নিয়েছি চারটি সঙ্গে।

এখন কথাবার্তা কম। প্রায় নিঃশব্দে সিঙ্গল ফরমেশানে এগিয়ে গিয়ে ভীমধারার নদী পেরিয়ে নদীটা যেখানে অন্য একটা নালা হয়ে সরে গেছে গ্রামের দিকে, সেখানে এসে দণ্ডধর অবস্থাটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল। বাঘের পায়ের দাগ এবং নদীর পাশের সুঁড়িপথের কোনও-কোনও জায়গায় শুকিয়ে-যাওয়া রক্তের দাগও পাওয়া গেল। তারপর ওদের সঙ্গে ফিসফিস করে পরামর্শ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দণ্ডধর। বুঝলাম, বিঁটাররা নালার মধ্যে নামবে দু'পাশের পাড়ের জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়ে। তারপর পেছন থেকে হাঁকা করবে যাতে বাঘটা তাড়া খেয়ে এদিকে আসে।

বসার মতো তেমন ভাল জায়গা নেই এদিকে। দণ্ডধর আমাকে একটা জায়গায় আড়াল করা কালো বড় পাথর দেখিয়ে নিজে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে একটা পিয়াশাল গাছে উঠে গেল তর্‌তর্ করে কাঠবিড়ালির মতো। ততক্ষণে বিঁটাররা আমাদের ফেলে দু' ভাগে ভাগ হয়ে চলে গেছে নালার ওদিকের পাড়ে-পাড়ে হেঁটে।

সময় এতই অল্প যে ব্যাপারটা যে কী দাঁড়াবে বুঝতে পারছিলাম না। কথা ছিল, ভীম প্রথমে শিঙা বাজিয়ে সকলকে হাঁকা শুরু করার সঙ্কেত দেবে। ভীম আছে বাঁ-দিকের পাড়ে-পাড়ে যে-দলটি গেছে তাদেরই সঙ্গে। পাথরে বসে সামনে থেকে আগাছার বেড়া হাত দিয়ে ফাঁক করে দেখে নিলাম নালা দিয়ে বাঘ যদি দৌড়ে যায় তাহলে তাকে মারা যাবে কি না? মনে হল, যাবে। তবে বাঘের সঙ্গে আমার তফাত থাকবে মাত্র হাত পাঁচেকের। উপায় নেই। তা ছাড়া দিনের বেলায় হাতে এই মাত্র রাইফেলের দু' ব্যারেলে দুটি সফ্‌ট-নোজ্‌ড গুলি থাকলে এবং ঠাকুরানির ঘণ্টা আবারও না বাজলে, খণ্ডিয়া বাবাজিকে খণ্ডিত হতেই হবে।

যাতে নালার মধ্যেটা আর একটু ভাল করে দেখতে পারি, তার জন্য পাথরটার আরও একটু পেছনে উঠে এলাম। পেছনেই একটা গুহমতো। তার মধ্যে থেকে বাদুড়দের গায়ের বোঁটকা গন্ধ আসছে। শীতের সকাল, তখনও গাছ-পাতা বালি-পাহাড়ে শিশিরে ভেজা। তুলোর মতো শিশির-পড়া মাকড়সার জালে আর বুনো নাম-না-জানা ফুলের উপর সকালের রোদ পড়াতে হাজার হাজার হিরে ঝলমলিয়ে উঠছে। যে একবার এই হিরের খনির খোঁজ পেয়েছে সে আর কলকাতার সাতরাম্‌দাস ধালামল্, পি সি চন্দ্র বা বম্বের জাভরি ব্রাদার্সের হিরে ছুঁয়েও দেখবে না।

টুই পাখি ডাকছে পেছন থেকে। দূর থেকে বড়কি ধনেশের ডাক আসছে অস্পষ্ট। এক ঝাঁক টিয়া সকালের রোদ-ঠিক্‌রানো জঙ্গলের সবুজকে টুকরো করে লাল ঠোঁটে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঝকঝকে নীল-নির্জন আকাশে।

বড় শান্তি এখন এইখানে।

হঠাৎ ভীমের শিঙা বেজে উঠল। আরম্ভ হল হাঁকাওয়ালাদের চিৎকার। কেরোসিন-টিন পেটানোর আওয়াজ। হাততালি। অদৃশ্য এবং বাস্তব ও কল্পিত সমস্ত শত্রুদের প্রতিই সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য সবরকম গালাগালি। আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। গাছে-গাছে টাঙ্গির মাথা দিয়ে বাড়ি মেরেও ওরা আওয়াজ করছে।

এমন সব সময়েই রক্ত শিরায় শিরায় একটু জোরেই ছোটাছুটি করতে থাকে। হাতের পাতা ঘামতে থাকে। ছেলেবেলায় এই উত্তেজনা আরও অনেক বেশি হত। যত দিন যাচ্ছে, ততই একে কিছুটা কায়দা করতে পারছি বলে মনে হচ্ছে। বিঁটাররা যে-গতিতে এগোচ্ছে, সেই গতিতে এগিয়ে এলে এবং হাঁকা পূর্ব-পরিকল্পনামতো হলে বড়জোর দশমিনিটের মধ্যেই আমার সামনের নালা দিয়ে বাঘের যাওয়া উচিত। কাল রাতের গুলিটা খুবসম্ভব ডান পায়ে লেগেছে। এবং পায়ের নীচের দিকে, মানে হাঁটুর আর থাবার মধ্যে। শিব্ব যে নাড়ু খাইয়েছিল তা সাধারণ নাড়ু নিশ্চয়ই নয়। অসাধারণও নয়। সে-নাড়ুর নাম দেওয়া উচিত জ্ঞানহরণ। কালো দেখতে এবং মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ।

খাওয়ার পর থেকেই খুব পিপাসা পাচ্ছিল আমার। দণ্ড বলেছিল যে বাংলোতে ফিরে দুধ খেতে হবে আমাদের। ওকে মনে করিয়ে দিতে। কী ব্যাপার তখন বুঝিনি। কিন্তু বাঘটার উপর যখন দণ্ড রাতে টর্চের আলো ফেলেছিল, তখন একটা বাঘ নয়, অনেকগুলো বাঘ দেখেছিলাম আমি। নুনিময়ই বাঘ। ছোট বাঘ, বড় বাঘ, মেজো বাঘ, সেজো বাঘ, বাঘে বাঘে বাঘারি! গুলি যে কোন্ বাঘকে করেছিলাম এবং কোন্ বাঘে লেগেছিল তা বুঝিনি।

আজ সকালে ঘুম ভাঙতে চাইছিল না। রাতে নানারকম স্বপ্নও দেখেছিলাম। দেখি একজন তাঁতি শান্তিপুরের সেই কাঁচা রাস্তাটার পাশে বসে লাল-নীল সবুজ সুতো দিয়ে কোনও সুন্দরীর জন্য যেন দারুণ আঁচলের আর পাড়ের এক শাড়ি বুনছে। এখনও ঘুম লেগে আছে আমার চোখে। টুকটুকে বউয়ের জন্যে যেন দারুণ আঁচলের আর পাড়ের এক শাড়ি বুনছে। এখনও ঘুম লেগে আছে আমার চোখে। হাঁকা শেষ হলে আজকে দণ্ডধর আর শিব্বকে এ নিয়ে ভাল করে জেরা করতে হবে। কেন এবং কী জিনিস খাইয়েছিল ওরা আমাকে। একটু হলে আমার প্রাণ নিয়েই টানাটানি হত। বাঘের সঙ্গে ইয়ার্কি!

এমন সময় হঠাৎই বাঘের গর্জন শোনা গেল। সর্বনাশ। বাঘ বিটারদের লাইন ভেঙে ফিরে যাচ্ছে বলে মনে হল সকলের ভয়ার্ত চিৎকারে। ওদের সঙ্গে ভীম আর দুর্যোধন আছে। ভীমের হাতে আমার শট্‌গানটাও আছে; বদলে 'থ্রি-সিক্সটি-সিক্স' রাইফেলটা নিয়েছে দণ্ড। দুর্যোধনের হাতেও আছে একটি সিঙ্গল ব্যারেল লাইসেন্সবিহীন মাজল-লোডার।

কয়েক সেকেন্ড পরেই শটগানের একটি গুলির পরেই আওয়াজ হল। বাঘের ঘন ঘন গর্জনে এবারে গাছপালা সব পড়ে যাবে মনে হল পাহাড় থেকে খসে। সঙ্গে-সঙ্গে হাঁকাওয়ালাদেরও সমবেত ভয়ার্ত চিৎকার, "দণ্ড রে! এ দণ্ডধর! ডাকুয়াবাবু! ঋজুবাবু! কাম্ব সারিলা! সে খণ্ডিয়াটা তাংকু মারি দেলে! শিব্বকু! সে কি আউ বাঁচিছি? গল্লা রে, গল্লা!"

আমি নালা ধরে দৌড়তে লাগলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে। দণ্ডও তরতরিয়ে পিয়াশাল গাছ থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে দৌড়ল। ঘটনার জায়গাতে পৌঁছে দেখি, নালার বালি আর পায়ের পাতা-ভেজা জলে শিব্ব পড়ে আছে। টাটকা রক্তের ঝিরঝিরে স্রোতে ভিজে যাচ্ছে বালি আর জল। ওর ঘাড় আর মাথাটাকে বাঘটা ডাঁশাপেয়ারার মতোই চিবিয়ে দিয়ে চলে গেছে। শিব্বর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল দণ্ড। দেখেই, ছেড়ে দিল।

আমার এত অপরাধী লাগল নিজেকে! কাল যদি বাঘটার বে-জায়গায় গুলি করে তাকে খণ্ডিয়া না করতাম তবে তো এমন হত না। এই মৃত্যুর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমারই একার। মানুষ খুন করারই মতো অপরাধ এ। আমি আর কোনও কথা না বলে হাঁকাওয়ালারা বাঘ যেদিকে লাফিয়ে চলে গেছে বলল,

সেইদিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম।

দেখলাম, নালার পাড়টা দু'লাফে পেরিয়ে গেছে বাঘটা। রক্ত বেশি পড়েছে এখানে। প্রথম থেকেই বালিতে পায়ের দাগ দেখে এবং ঘাসপাতায় রক্ত যেখানে যেখানে লেগেছে সেই সব জায়গার উচ্চতা দেখে গুলির চোটটা কোথায় হতে পারে তা অনুমান করেছিলাম। পায়ের থাবার দাগ অবিকৃতই ছিল, কিন্তু ডানপায়ের সামনের থাবার দাগটা অন্য পায়ের থাবার তুলনায় ছিল অস্পষ্ট। এটা বাঘ নয়, সব ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা। তাছাড়া শিব্বকে যখন ধরে বাঘটা তখন বিটারের মধ্যে অনেকে এবং একজন গাছে-বসা স্টপারও বাঘটাকে চোখে দেখেছিল। তারা সকলেই বলছিল যে ডান পায়ের হাঁটু একদম ভেঙে গেছে। ফুলেও গেছে পা-টা।

নালাটা খুব সাবধানে পেরোলাম। এখানে হরজাই জঙ্গল। কুচিলা, বেল, অর্জুন, করম, পালধুয়া, হাড়কঙ্কালি, পুটকাসিয়ার লতা। না-নউরিয়া এবং আরও নানারকম ঝোপ-ঝাড়। একটা পাথরের স্তূপের পাশ দিয়ে বাঘটা জঙ্গলে ঢুকে গেছে রাইফেলের ব্রিচ খুলে গুলি দুটোকে আর একবার দেখে নিলাম। পাপটা আমার। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তও একা আমাকেই করতে হবে।

আহত বাঘকে অনুসরণ করে মারার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা এবং উত্তেজনা থাকে তাই-ই শিকারিদের গর্বিত করে তোলে। যে-সব প্রাণী-দরদী সমস্ত শিকারকেই একধরনের নীচ স্পোর্টস বলে মনে করেন, তাঁদের বোধহয় ঠিক ধারণা নেই যে শিকার ব্যাপারটা সকলের জন্যে নয়। এবং শিকারিও নানারকমের হয়ে থাকেন। আইন মেনে বিপজ্জনক জানোয়ার শিকার করার মধ্যে কোনও লজ্জা আছে বলে কখনও মনে হয়নি। বরং শিকার, একজন শিকারিকে হয়তো মানুষ হিসেবেও অনেক বড় করে। দেশকে চেনায়, দেশের সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে জানবার সুযোগ দেয়, তাদের প্রতি দরদী করে তোলে, যা খুব কমসংখ্যক শহুরে লোকের পক্ষেই সম্ভব। যে-সময়ের কথা বলছি সে সময়ে শিকার করার মধ্যে কোনও অন্যায়বোধও ছিল না। জানোয়ার প্রচুর ছিল এবং চুরি করে শিকার করতাম না আমরা।

অনেকেরই ধারণা যে মাচায় বসে বা হাঁকোয়াতে একটি বাঘ মেরে দেওয়া বোধহয় খুবই সোজা। কিন্তু যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন যে, "There are many a slips between the cup and the lips." এবং এই কথাটা শিকারের বেলা কতখানি প্রযোজ্য। একজন শিকারি যেভাবে 'ব্যর্থতাই হল সাফল্যের সিঁড়ি' এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করেন এবং নিজের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন তা বোধহয় অন্য ধরনের খুব কম খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব।

আজকে কিন্তু মনটা খুবই দুর্বল লাগছে। ভয়ও লাগছে ভীষণ। বাঘ যে কত ক্ষমতাবান, তার গলার স্বরে যে পৃথিবী সত্যিই কাঁপে, তার সামনের দুটি পায়ে যে সে কতখানি বল রাখে, তা যারা জানে, বাঘকে ভয় না করে তাদের

কোনও উপায়ই নেই। শিব্বর রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন ঘাড়, মুখ আর মাথাটা মনে পড়ছিল, আর আমার নিজের মাথা তখনও ঘুরছিল। কিন্তু এখন মাথা ঠিক না রাখতে পারলে আমার মাথার অবস্থাও শিব্বর মতোই হবে।

পাথরের স্তূপটার আড়ালে বাঘটার পক্ষে লুকিয়ে থাকা খুবই সম্ভব। তাই, যেদিক দিয়ে বাঘটা সেদিকে গেছে, সে-দিক দিয়ে না এগিয়ে, অনেক ঘুরে বাঁ-দিক দিয়ে এগোলাম এক-পা এক-পা করে। নিঃশব্দে। সেই মুহূর্তে ডান পায়ের অবস্থার কথা একেবারেই ভুলে গেলাম। যা-পরে রাতে শুয়েছিলাম তাই পরেই চলে এসেছিলাম আমরা। পায়ে রবারের হাওয়াই চটি। নিঃশব্দে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল না। তবে, গোড়ালি আর পায়ের পাতায় কাঁটা ও ঘাসের খোঁচা লাগছিল। আস্তে-আস্তে বড় গাছের আড়াল নিয়ে নিয়ে অনেকখানি এগিয়ে এলাম বাঁদিকে।

জমিটা ওখানে পৌঁছে নরম চড়াই হয়ে একটি টিলার দিকে উঠে গেছে। আরও একটু এগিয়ে গেলাম টিলার দিকে। যাতে সেখানে পৌঁছে ঐ কালো পাথরের স্তূপের পেছনটা পরিষ্কার দেখতে পাই। বাঁ-দিকে একটি ময়ূর ও চারটি ময়ূরী চরছিল। ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। তবু, খুবই ঘাবড়ে গেলাম। ময়ূররা যেমন বাঘ দেখলে কেঁয়া কেঁয়া করে ডেকে ভয় পেয়ে উড়ে গাছে গিয়ে বসে, জঙ্গলের গভীরে কাছাকাছি মানুষ দেখলে তাই-ই করে। ওরা আমাকে দেখতে পেলেই ওদের আওয়াজে বাঘ বুঝতে পারবে। বনের রাজার কাছে বনের কোনও খবরই গোপন থাকে না।

ভাগ্য ভাল। ময়ূরগুলো আমাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত লক্ষই করল না। করল না, কারণ এদিকে তারা মুখই ফেরাল না। যারা সাপ ধরে খায়, তাদের চোখ ভীষণই তীক্ষ্ণ। এদিকে মুখ ফেরালেই ওরা দেখতে পেত আমাকে। কিন্তু না-ফিরিয়ে পেখম ছড়িয়ে চরতে-চরতেই ওরা নালার দিকে নেমে গেল। নালা তখন শান্ত। আমাদের দলের অন্য সকলেই ততক্ষণে হতভাগা শিব্বর প্রাণহীন শরীরটি নিয়ে টুম্বকা গ্রামের দিকে চলে গেছে। বোধহয় দণ্ডধরেরই নির্দেশে। দণ্ডও হয়তো গেছে ওদের সঙ্গে।

একটি সুবিধামতো জায়গাতে পৌঁছে বড় একটি অর্জুন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিলাম। ফোর-সেভেন্টি ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটির ব্যালান্স্ চমৎকার। বইতে একটুও কষ্ট হয় না। তবুও ভীত এবং উত্তেজিত অবস্থায় তাকেও খুব ভারী বলে মনে হচ্ছিল।

জখম ডান-পায়ের তলাটাও দপ্‌দপ্ করছিল দাঁড়িয়ে পড়লেই। আমারই এই হচ্ছে, তাহলে না-জানি খণ্ডিয়া বাঘটার কতই কষ্ট হচ্ছে রাইফেলের গুলিতে ভাঙা পায়ের জন্য। যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত হয় ততই ভাল।

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে এদিক্-ওদিকে খুব আস্তে-আস্তে মাথা ঘোরাতে লাগলাম। নাঃ, কোথাও কোনও চিহ্ন নেই বাঘের। খুব সম্ভব সে কোনও

নিভৃত জায়গার খোঁজে গেছে। কিন্তু যেখানেই যাক তার মৃত্যু নিশ্চিত! ফোর-সেভেন্টি রাইফেলের গুলিতে পা ভেঙে গেলে বাঘের পক্ষে বাঁচা মুশকিল। মরার আগে আরও অনেক মানুষ মেরে এবং বড় যন্ত্রণার মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে তিল তিল করে তাকে মরতে হবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। তা ছাড়া কোনও জন্তুকেই এমন কষ্ট দেওয়ার অধিকার কোনও শিকারির নেই।

শিব্বর উপর খুবই রাগ হচ্ছিল আমার। দণ্ডর উপরেও। কী যে নাড়ু খাওয়াল কাল রাতে! ঐ নাড়ু না-খেলে এমনভাবে গুলিও করতাম না এবং গুলি হয়তো অমন বে-জায়গাতেও লাগত না। শিব্বকে হয়তো মরতে হত না এমন করে। বাঘটার আঘাত এমন মারাত্মক মোটেই হয়নি যে, সে একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। ভাবলাম, এখানে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে বরং জঙ্গলের কী বলার আছে তা শোনা যাক। জঙ্গলের পাখি আর জানোয়াররাই বলে বাঘের গতিবিধির কথা। কিন্তু যেহেতু তার চলচ্ছক্তি পুরোপুরিই আছে তাই অল্প সময়ের মধ্যে সে অনেক দূরেও চলে যেতে পারে। অবশ্য, নাও যেতে পারে। কারণ, দণ্ডধর বলছিল এই জঙ্গলেই ওই বাঘের বাড়ি। তাই নুনিতে গুলি খেয়ে সে এখানেই ফিরে এসেছে।

বাঘটা গুলি খেয়ে অন্য জঙ্গলে গেলেও আমাদের তাকে খুঁজে বের করতেই হত। সে যদি বাংলোর কাছের জঙ্গলে না আসত তবে নুনিতে ফিরে গিয়ে আজ সকালে তার খোঁজ শুরু করতেই হত। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের কষ্ট কমই হচ্ছে। সবই হত যদি না শিব্ব...

শিব্বর রক্তাক্ত শরীরটার ছবি বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। গা গুলিয়ে উঠছিল আমার। মাঝে-মাঝে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল দৌড়ে বন-বাংলোর নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাই। বাঘটাঘ মারা আমার কর্ম নয়। এই খণ্ডিয়া বাঘ নিশ্চয়ই যমের দূত। পুরো ব্যাপারটাই কাল রাত থেকে একটা দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে আছে মনে। শরীরও আদৌ সুস্থ নেই।

দণ্ডধরই বা গেল কোথায়? আমার চেয়ে ওর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। সাহসও বেশি। এই সময়ে, এই জঙ্গলে, ও আমার পাশে থাকলে অনেক বেশি জোর পেতাম।

অর্জুন গাছটার নীচে বসে পড়লাম আমি। পাইপটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করলাম। লাইটারটা বাংলোর ঘরের টেব্‌লেই পড়ে আছে। তাড়াতাড়িতে আনা হয়নি। একজন হাঁকাওয়ালার দেশলাই চেয়ে নিয়েছিলাম।

গভীর জঙ্গলে একটি দেশলাইকাঠি জ্বাললেও অঅঅনেকেই শব্দ হয়। এবং সবচেয়ে বড় কথা সেই শব্দ বনের স্বাভাবিক শব্দ নয়। হালকা-বেগুনি খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা পরে ছিলাম। আসা উচিত হয়নি এমন

করে। এই পোশাকে ক্যামোফ্লেজ করা যায় না, তা ছাড়া সারাদিনই হয়তো এই বাঘের পেছনেই ঘুরতে হবে আমাকে আজ। কে জানে!

রাইফেলটা আড়াআড়ি করে দু'পায়ের উপরে রেখে পাইপটা ধরালাম, দেশলাই জ্বেলে। বাঘ যেখানেই থাকুক সে আমার খুব কাছে নেই। শব্দ শুনে সে যদি তেড়ে আসে তাহলে তো ভালই। গুলি করার সুযোগ পাব। সে আসতে আসতে রাইফেল তুলে নিতে যে পারব, সে-বিশ্বাস আমার ছিল। চোখ সামনে সজাগ রেখে, দেশলাইটা জ্বেলে পাইপ ধরালাম। নাঃ। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

একজোড়া বেনেবউ বসে ছিল ঐ পাথরের স্তূপের ওপাশের একটি বুনো জামগাছের ডালে। তারা দুজনে হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে ডানা ফরফর করে উড়ে গেল উল্টোদিকে। চমকে উঠে জ্বলন্ত পাইপ পকেটে পুরে ফেলে রাইফেলের স্মল্ অব্ দ্য বাট্-এ হাত ছোঁয়ালাম।

আবার সব চুপচাপ। আমার পেছনের ছায়াচ্ছন্ন গভীর জঙ্গল থেকে সমানে একটি কপারস্মিথ্ পাখি ডেকে যাচ্ছি। আর তার সঙ্গী সাড়া দিচ্ছিল অনেক দূর থেকে। দিনের বেলায় এদের ডাক জঙ্গলের নানারকম শব্দের মধ্যে অন্যরকম শোনায়। আশ্চর্য এক গা-ছমছমে ভাব আছে এই পাখির ডাকে।

এবার একঝাঁক টিয়া উড়ে এসে বসল ঐ পাথরের স্তূপেরই কাছের একটি গাছে। কিন্তু বসেই সঙ্গে সঙ্গে আবার ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ করে উড়ে গেল।

এবারে আমার সন্দেহ হল। উঠে দাঁড়ালাম। এবং খুব সাবধানে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম এক গাছের আড়াল থেকে অন্য গাছের আড়াল নিয়ে। স্তূপটার কাছাকাছি এসে রাইফেল রেডি পজিশনে ধরে খুব সাবধানে এগিয়ে যেতেই দেখলাম বাঘটার পেছনের একটি পায়ের সামান্য অংশ আর লেজ মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে ঝাঁটি-জঙ্গলের মধ্যে।

দেরি হয়ে গেছিল। ভালভাবে নিশানা না নিয়ে আহত বাঘকে আবারও বে-জায়গায় গুলি করার কোনও ইচ্ছাই ছিল না আমার।

বাঘটা নালাতেই নেমে গেল আবার। নালার দিকে সরে এসে দাঁড়াব কি-না ভাবছি এমন সময় আমার ঠিক পেছনে শুকনো পাতা-মাড়ানো আওয়াজে চমকে উঠে পিছন ফিরলাম। দেখি, দণ্ড। নীল লুঙ্গি দু'ভাঁজ করে কোমরে গোটানো। গায়ে সেই হলুদ শার্ট। খালি পা। হাতে থ্রি সিক্সটি-সিক্স রাইফেলটি। নীল লুঙ্গির গায়ে ছোপ-ছোপ লাল রক্ত লেগে আছে। শিব্বর রক্ত।

দণ্ড আমার দিকে চেয়ে চোখ দিয়ে শুধোল, কোন্‌দিকে?

কথা না বলে আঙুল দিয়ে ওকে দেখালাম। ইশারায় বোঝালাম যে বাঘ আবার নালায় নেমে যাচ্ছে ঝাঁটি-জঙ্গলের আড়াল নিয়ে। মতলবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দণ্ড ইশারাতে বলল যে এবার বাঘের পেছন পেছন যাব আমরা। দুজন আছি। বাঘকে এবার আমাদের দিকে চার্জ করে আসতে প্ররোচনা দেওয়াই ভাল হবে। তার চেহারা দেখামাত্র দুজনে একসঙ্গে গুলি করব। এখন আর ব্যাপারটা স্পোর্টসের পর্যায়ে নেই। তার যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া যেমন দরকার শিব্বর মৃত্যুর বদলা নেওয়াও তেমনই দরকার। যদিও সে খণ্ডিয়া না হলে শিব্বকে আদৌ মারত না। দোষটা পুরোপুরিই আমার।

অন্যায় আমরা অনেকেই করি। জীবনে সবসময় ন্যায়ই করছেন এমন ভাব দেখান যাঁরা তাঁরা ঘোরতর ভণ্ড। মানুষ মাত্রই দোষগুণে ভরা। অন্যায় সকলেই করে। কেউ জেনে কেউ না-জেনে। যে ভাবেই করুন না কেন, অন্যায় যে আমরা করেছি, সেটা স্বীকার যদি করি, তাহলে বোধহয় দোষের অনেকখানিই লাঘব হয়ে যায়।

আমিই আগে আগে চললাম। কারণ আমার হাতেই হেভি রাইফেল। কিন্তু দণ্ডর অভিজ্ঞতা, সাহস ও বাঘ সম্বন্ধে জ্ঞান আমার চেয়ে অনেক বেশি। ঝাঁটি-জঙ্গলে একটু গিয়েই বাঘ নালায় নেমেছে এক লাফে। বোধহয় অসমান পাথুরে জঙ্গলের চেয়ে নালার সমান নরম বালিতে ভাঙা-পা নিয়ে হাঁটতে তার সুবিধে হবে ভেবেই সে নালায় নেমেছিল।

গত সপ্তাহে এ-দিকেই শুয়োর মারতে এসেছিলাম। নালার এই অংশটা অজানা ছিল না। আরও একটু আগে গিয়ে নালার মধ্যে একটু দহর মতো আছে। জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন। দু' পাশ দিয়ে ঘন জঙ্গলে ঝুঁকে পড়ে চাঁদোয়ার মতো সৃষ্টি হয়েছে নালার উপরে সেখানে। দহতে জল আছে সামান্য।

নালায় নামতেই রক্তের দাগের সঙ্গে বাঘের পায়ের দাগও আবার পেলাম। লাফিয়ে নামতে বেচারার কষ্ট যেমন হয়েছে তেমনি রক্তও পড়েছে অনেকখানি। ওকে হাঁটাচলা করতে না হলে রক্ত-পড়াটা অন্তত এতক্ষণে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বনের এই জানোয়ারদের জীবনীশক্তি এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতে সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষমতা অবিশ্বাস্য।

কিছুটা গিয়েই নালাটা হঠাৎ একটা বাঁক নিয়েছে বাঁ-দিকে। এবং সেখানে নালার বুকে অনেক বড় বড় পাথর জড়ো হয়ে আছে। গত বর্ষায় কী তারও আগের বর্ষায় বানের তোড়ে ভেসে এসেছিল হয়তো। আহত বাঘের পক্ষে ঐ সব পাথরের যে-কোনও একটার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আদৌ অসম্ভব নয়। নালার বাঁকটার মুখ থেকে যাতে বেঁকে-যাওয়া নালাটা পুরোপুরি দেখতে পাই, সেইজন্যে একেবারে ডান প্রান্তে চলে গেলাম। গিয়ে, সাবধানে আস্তে আস্তে মাথা দু'পাশে ঘুরিয়ে সমস্ত জায়গাটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখলাম, নিশ্চল পায়ে দাঁড়িয়ে।

ঐখানে দাঁড়িয়েই হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, নালার বালিতে ঐ বাঁকের পরে বাঘের থাবার আর কোনও দাগ নেই। বাঘটা বাঁকের মুখে এসেই নালার

ডানপাড়ে উঠে গেছে আবার এক লাফে। বোধহয় আমরা যে তাকে অনুসরণ করছি, তা বুঝতে পেরেছে। অথবা এমনিতেই ও গভীর জঙ্গলে নিরুপদ্রব কোনও আশ্রয়ের খোঁজে গেছে।

কী করব ভাবছি। দু'তিন সেকেন্ড সময়ও কাটেনি, হঠাৎই পেছন থেকে দণ্ডর ভয়ার্ত চিৎকার শুনলাম : "বাঘ্ব : ডান পাখ্খেরে।"

সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকে মুখ ঘুরিয়েই দেখি বাজ পড়ে পুড়ে-যাওয়া একটা শিমুল গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে বাঘটা আমার উপর লাফিয়ে পড়ার জন্যে জমির সঙ্গে লেপ্টে শুয়ে থাকার মতো করে বসে আছে। লেজটা পেছনে লাঠির মতো সোজা সমান্তরাল হয়ে আছে। আমার চোখের সঙ্গে তার চোখের দৃষ্টি যখন মিলল তখন অনেকেই দেরি হয়ে গেছে। সেফ্‌টি ক্যাচ্‌টি ঠেলারও সময় পেলাম না। সে ততক্ষণে লাফ দিয়েছে। কিন্তু বাঘটা লাফাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে দণ্ডর হাতের রাইফেল গুড়ুম্ করে গর্জে উঠল। হলুদ-কালোয় ডোরাকাটা একটি সাইক্লোনের মতোই বাঘটা কানে তালা-লাগানো বুক-কাঁপানো গর্জন করে উড়ে এল আমার উপর। রাইফেল কাঁধে তুলে আমি একলাফে এগিয়ে গেলাম কিছুটা, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম বাঘের ছোঁয়া এড়াবার চেষ্টাতে। বাঘটা চার হাত পা এবং লেজসমেত যখন আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখনই রাইফেল সুইং করে ট্রিগার টেনে দিলাম প্রায় তার বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে।

এত সব ঘটনা ঘটতে কিন্তু লাগল মাত্র কয়েক মুহূর্ত।

হেভি রাইফেলের রিপোর্টে সমস্ত বন-পাহাড় গমগম করে উঠল। বাঘটা আছড়ে পড়ল জলের মধ্যে ঝপাং করে। জল ছিটকে উঠল চারদিকে। নালার দহের পাড়ে একটা ছোট্ট নীল মাছরাঙা মরা গাছের ডালে বসে ছিল। গুলির আওয়াজে ও বাঘের গর্জনে অন্য অনেক পাখির সঙ্গে সেও গলা মিলিয়ে ভয়ার্ত গলায় ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

বাঘটা জলে পড়েই এক মোচড়ে শরীরটাকে বিদ্যুতের মতো ঘুরিয়ে আবারও আমাকে ধরার জন্যে তেড়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে আমার ও দণ্ডর আর-এক রাউণ্ড গুলি গিয়ে তার বুকে ও মাথায় লেগেছে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

খালি-রাইফেল হাতে আমি বাঘটার দিকে চেয়ে রইলাম। সেও চেয়ে রইল আমার দিকে। তার কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে এল। তার দু'চোখ লাল হয়ে ধীরে ধীরে বুজে এল। সমস্ত শরীর থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। মনে হল আমারই মতো ওরও খুব ঘুম পেয়েছে।

মনটা ভীষণই খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। রাইফেলের ব্যারেলটা একটা পাথরের উপরে রেখে বাট্‌টা বালিতে পুঁতে বালিরই মধ্যে বসে পড়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে পাইপটা আবার বের করে ধরালাম। দণ্ড পাশে এসে বসল।

আজ দণ্ড না থাকলে আমার অবস্থাও এতক্ষণে শিব্বর মতোই হত। কথাটা

মনে পড়ে যাওয়ায় ভয়ে আমার গায়ে কাঁপুনি এল।

দণ্ড হাত পাতল। বলল, "টিক্কে তামাকু।"

তামাক দিয়ে বললাম, "আজ তোমার জন্যেই আমার প্রাণটা বাঁচল দণ্ড।"

নিচু গলায় দণ্ড বলল, "আমি প্রাণ বাঁচাবার কে ? সবই ঠাকুরানির দয়া !"

ততক্ষণে অতগুলো গুলির শব্দ আর বাঘের গর্জন শুনে গ্রাম থেকে অনেকে দৌড়ে এসেছিল। সবচেয়ে আগে দেখা গেল দুর্যোধনকে। তার হাতে আমার দোনলা শট্‌গানটি। সে সাবধানে আমাদের খোঁজে অন্যদের চেয়ে আগে-আগে এগিয়ে এসেছিল। আমাদের বসে থাকতে দেখেই হাত দিয়ে পেছনে ইশারা করল। এবং পরক্ষণেই চিৎকার করে বলল, "মরিচি ! বাপ্পালো বাপ্পা ! কেত্তে বড্ড বাঘটা মঃ।"

দৌড়ে এল ওরা সকলেই। হুড়োহুড়ি করে। পুরুষদের পেছনে পেছনে মেয়ে ও বাচ্চারাও। দণ্ড, পাইপের টোব্যাকোটা হাতে খৈনির মতো মেখে, মুখে ফেলার আগেই হাতে-হাতে বাঘের গোঁফ সব উধাও হয়ে গেল। দুর্যোধন চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

বাঘকে বয়ে বাংলোর হাতায় নিয়ে আসার ভার দুর্যোধনের উপরে দিয়ে আমি আর দণ্ড বাংলোর দিকে হেঁটে চললাম। বাঘ মরেছে। এবারে শিব্বর মৃত্যুটা আমার মনে ফিরে এল। গভীর গ্লানি আর পাপবোধ ভারী করে তুলল আমার মাথা।

চলতে চলতেই দণ্ড বলল, "শিব্ব ! বাঘ্ব খাইবাপাঁই হাঁকা করিবাকু এইঠি আসিথেল্লে। আউ বাঘুটা, তাংকু খাই নেল্লে। তার বড্ড ক্ষুধা থিল্লা।"

কার ? শিব্বর আবার কার ? অন্য মাংস না পেয়ে বাঘের মাংসই খাবে বলে হাঁকা করবার জন্যে লাফিয়ে লাফিয়ে এল আর তাকেই খেল বাঘে ! বড়ই খিদে ছিল শিব্বর। মাংসর উপর দারুণ লোভ ছিল ওর ! পরের জন্মে ঠাকুরানির দয়ায় ও হয়তো বাঘ হয়েই জন্মাবে। আশ মিটিয়ে মাংস খাবে তখন। কে জানে, সবই ঠাকুরানির ইচ্ছা।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে বললাম, "আচ্ছা দণ্ড, সেদিন কিসের নাড়ু খাইয়েছিল বলো তো শিব্ব আমাদের ? ওই নাড়ু না-খেলে বাঘের পায়ে গুলি করে তাকে খণ্ডিয়াও করতাম না আর না-করলে শিব্ব তার হাতে মারা যেত না। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যময়। রাতের নুনিতে এবং ভীমধারার মধ্যে ঐ আশ্চর্য ঘন্টা বাজা। সবই কি স্বপ্ন ? মনের ভুল ? ঐ মাটি ফুঁড়ে-ওঠা পেল্লায় বাইসন ! কাল রাতের সব কিছুই !"

দণ্ড দাঁড়িয়ে পড়ে লাল চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, "কী বলতে চাইছ তুমি ?"

"কিছুই বলতে চাইছি না। জানতে চাইছি শুধু।"

"ঐ নাড়ু সিদ্ধির নাড়ু। আর যা-কিছুই রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার কাল ঘটেছে তার কিছুই স্বপ্ন নয়। সব সত্যি। ও সব ঐ ঠাকুরানির লীলাখেলা। শিব্ব জেনেশুনেও আমাদের ঠাকুরানির ঠাঁইয়ে গন্ধ মারবার জন্যে পাঠিয়েছিল বলেই হয়তো ঠাকুরানিই বাঘের রূপ ধরে এসে তোমাকে দিয়ে বে-জায়গায় গুলি করিয়ে নিজে খন্ডিয়া হয়ে শিব্বকে মেরে গেলেন। ঠাকুরানিকে নিয়ে জঙ্গলের যে-সব লোক তামাশা করে, তাদের শেষ এই-ই হয়। কে জানে? পেট পুরে যাতে মাংস খেতে পারে তার জন্যে এই মরা বাঘের আত্মাটা ঠাকুরানি শিব্বকেই দিয়ে দেবেন হয়তো। শিব্ব বাঘ হয়ে যাবে। তাঁর লীলা, তিনিই জানেন।

ঠাকুরানির বাঘ আর নুনির রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার, সব কিছুরই মূলে তাহলে ওই সিদ্ধির নাড়ু! ছি, ছি!

দণ্ডর কথা আমি কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু ওদের অনেক কথাই আমি এবং আমরা বোধহয় বুঝি না। এই শিব্ব এবং দণ্ড, ভীম, দুর্যোধন, টুল্লকা বন-বাংলোর চৌকিদার, বেঁটেখাটো ছোট্ট বলিরেখাময় গোল মুখের খুকি, এরা এক অন্য জগতের মানুষ। এদের আমরা কখনও বুঝিনি, বুঝি না এবং বুঝবও না। এরাও বোঝে না আমাদের। আমাদের এই দুই জগতের মাঝে একটা সাঁকো থাকলে বোধহয় ভাল হত।

দণ্ড বলল, "শিব্বর বউয়ের জন্য আমাদের তো কিছু করা উচিত? কী বলো?"

"নিশ্চয়ই।" আমি বললাম। "কিন্তু তোমার কী মনে হয়? কী করা উচিত?"

"ওকে গ্রামে কিছু জমি কিনে দাও। ওদের তো ছেলেমেয়ে নেই। বউটার বয়সও বেশি নয়। ওর আবার বিয়ে দিতে বলব গ্রামের লোকদের শিব্বর শোক মরে গেলে। তুমি দুশো টাকা দেবে? জেঠুমণির কাছ থেকে চেয়ে? তাইই যথেষ্ট। দুশো টাকা কী কম টাকা! ওরা কেউই একসঙ্গে কখনও দুটো টাকা চোখে দেখেনি।"

দুশো টাকা? একজন মানুষের জীবনের দাম মাত্র এইটুকু?

বললাম, "হাজার টাকা দেব জেঠুমণিকে বলে। যেন একজন মানুষের জীবনের দাম হাজার টাকা! আবার বললাম, "আর সুরবাবুদের বলে দেব যে, শিব্বর বউকে এবং ও যদি আবার বিয়ে করে তো তবে তাকেও যেন একটা চাকরি করে দেন ওঁরা ওদের ক্যাম্পে।"

আমি আর দণ্ড যখন টুল্লকা বাংলোর হাতাতে ঢুকলাম তখন দেখলাম বাংলোর সামনেই ডানদিকে যে বড় উঁচু সাদাটে পাথরটা আছে সেই পাথরের উপর শিব্বর বউ বসে রোদ পেয়াচ্ছে পা ছড়িয়ে। কী সান্ত্বনা দেব ওকে জানি না। কী করে সামনে গিয়ে দাঁড়াব আমি?

"শিব্ব?" ওর কাছে পৌঁছে দণ্ড জিজ্ঞেস করল। মানে, মৃতদেহের কথা।

নিরুত্তাপ গলায় বউ বলল, "তাংকু নেই গল্লে..."

স্বামীকে ওরা সকলে নিয়ে গেল অথচ তার গলাতে একটুও দুঃখের আভাস পেলাম না। অবাক হলাম।

পরক্ষণেই শিব্বর বউ বলল, "বাবু, তুমি কি কখনও বাঘের মাংস খেয়েছ? শিব্বর তো খাওয়া হল না কিন্তু আমি খাব বলে বসে আছি। বাঘ কখন কাটা হবে? চামড়া ছাড়ানোর পর?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। উত্তর না-দিয়ে ঘরে গেলাম। মেয়েটার বোধহয় মাথাই খারাপ হয়ে গেছে।

বাঘের মাংস আমি জেঠুমণির সঙ্গে একবারই খেয়েছিলাম। নাগাল্যাণ্ডের মোকক্‌চঙের কাছের এক গ্রামে। চিবোনো যায় না। দাঁতের পাটি লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের এই বনজঙ্গলের বড় গরিব, ক্ষুধাতুর, সরল, সাধারণ মানুষগুলোর জীবনযাত্রা ও চাওয়া-পাওয়ার আসল রকমটি দেখে ও জেনে আমার মনে হল বাঘের মাংস হজম করার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন ওদের আসল দুরবস্থার সত্যটি হজম করা।

রাইফেলটা ঘরে রেখে বারান্দার চেয়ারে এসে বসলাম। চৌকিদার খুকি, চা নিয়ে এল। শিব্বর বউকেও একটু চা দিতে বললাম ওকে।

খুকি আপত্তি জানিয়ে বলল, "শিব্বর বউ তো পুরো আধ-হাঁড়ি খিচুড়ি খেয়েছে। কালকের খিচুড়ি বেঁচেছিল অনেক।"

"কখন খেল?" অবাক হয়ে শুধোলাম ওকে।

"শিব্বকে অংগুলে নিয়ে গেল যখন ওরা ট্রাকে করে তারপরেই নিরিবিলিতেই খেয়েছে। বিরক্ত করার কেউই ছিল না। পেট পুরে খেল।"

চায়ের গ্লাসটা হাতে নিয়ে অবিশ্বাসী চোখে খুকির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

জঙ্গল থেকে বাংলোর দিকে ফেরার পথে একটু আগেই দণ্ড বলছিল যে আমাদের কাছে ভাগ্যিস জিপ এবং ট্রাক আছে তাই আজই শিব্বর পোস্ট-মর্টেম হবে হয়তো। না, তবু আজ হবে না। আজ যে রবিবার। কাল হবে। কিন্তু যখন মোষের গাড়িতে চাটাই-মুড়ে মৃতদেহ নিয়ে যেতে হয়, কেউ গাছ-চাপা পড়লে বা বাঘ, হাতি বা বাইসনের হাতে মরলে তখন অংগুলে পৌঁছে পোস্টমর্টেম হতে হতে অনেকসময় সাতদিনও লেগে যায়। বাঘের হাতে মরেও নিস্তার নেই। তারপর পড়তে হয় পুলিশের হাতে। বাঘের চেয়েও বিপজ্জনক তারা।

খুকিকে বললাম, "তোমাদের আপনজন মরলে তোমরা শোক করো না? দুঃখ লাগে না তোমাদের?"

খুকি আমার কথা শুনে খুব জোরে হেসে উঠল। বলিরেখাভরা কপাল

কুঁচকে উঠল। ফোকলা দাঁতের মধ্য দিয়ে হাসির টুকরো-টাকরা লাফিয়ে আসতে চাইছিল বাইরে। কিন্তু সামলে নিয়ে তার চোখ আমার চোখে রেখে বলল, "ঋজুবাবু শোকটোক দুঃখ-টুঃখ সব তোমাদের মতো বড় মানুষদেরই জন্যে। আমাদের ওসব বিলাসের সময় কোথায়? প্রতিটি দিনই আসে বড় দাপটে। এক-একটা ঝড়ের মতো। ডানাভাঙা পাখির মতো গুড়িয়ে দিয়ে যায়, আমাদের দিন গুজরান্ করতেই প্রাণান্ত। আমরা তাইই তো গাই : দয়া করো দীনবন্ধু শুভে যাউ আজ দিন, করজোড়ে তুমপাদে করুছি এ নিবেদন। এই এমনি করেই কেটে যাচ্ছে দিন। তোমরা যে-কদিন আছ, ভাল খাচ্ছি-দাচ্ছি, তোফা আছি। চলে গেলেই আবার যে কে সেই।"

বলেই খুকি রান্নাঘরে চলে গেল।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বসে সামনে তাকিয়ে ছিলাম। শীতের হাওয়ায় পাতা ঝরে যাচ্ছে গাছ থেকে। হাওয়ার সওয়ার হয়ে ব্যালেরিনার মতো ঘুরতে ঘুরতে উড়তে-উড়তে মাটিতে নামছে তারা। ঝরঝর করে ঝরনার মতো শব্দে পাথরের উপর দিয়ে সেই পাতার পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাখাল হাওয়াটা।

পাতার মতো দিনও ঝরে। ঝরাপাতার মতো দিন। আমার দেশবাসীর দিন। আমার ভাইবোনের দিন। ঠাকুরানির জঙ্গলের বাঘে-চিবোনো এই সাধারণ শিব্ব, তার বউ, ভীম, দুর্যোধন, এবং অসংখ্য অজানা অচেনা মানুষদের প্রত্যেকেরই দিন।

বাঘের মাংসের মতো দিন!

অন্য শিকার

TDR

এদিকের জঙ্গলে কখনও আসিনি ঋজুদার সঙ্গে। ঋজুদাও যে এর আগে খুব বেশি এসেছে মধ্যপ্রদেশে, এমনও নয়। তবে, বার দশেক এসেছে। ঋজুদার ভালবাসার জায়গা ছিল হাজারিবাগ, পালামৌ, রাঁচি এবং ওড়িশার মহানদীর অববাহিকা। সুন্দরবন এবং আফ্রিকার কথা বাদ দিয়েই বলছি। এখন তাকে মধ্যপ্রদেশে পেয়েছে। দারুণ লাগে ! ঋজুদা বলে।

মিস্টার ভট্‌কাইয়ের মেজকাকা বহুদিন হল মধ্যপ্রদেশে আছেন। ঋজুদা অ্যান্ড কোম্পানিকে বহুবার দাওয়াতও দিয়েছেন। তিনি জবলপুরের পাচপেড়িতে থাকেন, সিভিল লাইন্সে। আর্মিতে ফুল-কর্নেল ছিলেন। রিটায়ার করে নর্মদায় মাছ ধরছেন আর বড় নাতিকে বাংলা পড়াচ্ছেন। এই তাঁর হোলটাইম অকুপেশান। পার্টটাইম অকুপেশান কাকিমার সঙ্গে ঝগড়া করা। কাকিমা ভাল গান গাইতেন একসময়। এখন মোটে রিয়াজ করেন না। তাই মেজোকাকা ব্যাপারটাকে ঝগড়া না বলে কণ্ঠ-চর্চা বলেন, স্ত্রীকে প্র্যাকটিস দেন, যাতে গলাটা থাকে। কাকার গলা 'তারা'য় বলে।

ঋজুদাকে তিনি একাধিক চিঠি দিয়েছিলেন আসার আগে নিমন্ত্রণ জানিয়ে। তাই আমাদের এই আগমন। কাকার ভাষায়, "ধন্য হলাম আমরা।" কাকা ধন্য হলেন অথবা ঋজুদা ধন্য করলেন, তা জানি না। আমি আর ভট্‌কাই রিয়্যালি হ্যাপি।

যতই ঘুরছি, ততই দেখছি ভারী সুন্দর রাজ্য এই মধ্যপ্রদেশ। অনেক জায়গাই দেখা হয়ে গেল এর মধ্যে। মার্বল রক, কান্‌হা, কিস্‌লি, মুক্কি, সুফ্‌কর, পাঁচমারি, ইন্দোর, উজ্জয়িন্‌, ভোপাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিতির আসেনি, তাই ঋজুদা একটু গিলটি ফিল করছে। কিন্তু ভটকাই প্রথম থেকেই তার মতামতে দৃঢ়। সে বলেছে, "তোমরা যখন গুগুনোগুম্বারের দেশে এবং রুআহাতে গেলে আফ্রিকায়, তখন তিতিরকেই নিয়ে গেলে। আমার মতো এমন এক কোয়ালিফায়েড জাঙ্গল এক্সপার্ট এবং ক্রাইম-বাস্টারকে রেখে গেলে। আমাকে বললেও না পর্যন্ত একবার। এবার আমারই বন্দোবস্ত। নো

মেয়ে-ফেয়ে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বই পড়িসনি? কী রে রুদ্র? মেন উইদাউট উইমেন। মেয়েদের নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করা যায়? ছোঃ। পথি নারী বিবর্জিতা।"

ঋজুদা বান্ধবগড়ের রাজাদের পুরনো শুটিং লজের বারান্দায় বসে সামনের একটি তেপায়াতে পা তুলে জম্পেশ করে পাইপটা ধরিয়ে একটু হেসে বলল, "একেই বলে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। 'ফর হুম দ্য বেল টোলস্' বুঝি পড়িসনি ভটকাই? অথবা 'স্লোজ অব কিলিমানজোরো? সেগুলো বুঝি হেমিংওয়ে নয়?"

"তা পড়েছি। তাতে মেয়েরা আছে। কিন্তু 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি'? তাতে? তাতে তো শুধু একটা বুড়ো, একটা ছোট্ট ছেলে আর একটা মস্ত মাছ। সমুদ্র। সমুদ্রই তো আসল।"

"তাইই বুঝি?" ঋজুদা বলল। তারপর বলল, "সমুদ্র মোটেই আসল নয়। কী যে আসল, তা তোকে নিজেকেই বের করতে হবে বারবার পড়ে। বিভিন্ন সময়ে পড়ে। সাহিত্য তো ব্যাকরণ নয় রে ভটকাই! সাহিত্য টেম্পারা বা ওয়াশের কাজের ছবির মতন। অথবা অয়েল পেন্টিংয়েরই মতো কোনও ছবি। সময়ের সঙ্গে এর তাৎপর্য ফুটতে থাকে, পরতে-পরতে খুলতে থাকে, সাহিত্য যদি সত্যিকারের সাহিত্য হয়। একই বই, বিভিন্ন বয়সে পড়ে বিভিন্ন মানে আবিষ্কার করবি। আফ্রিকার গোরোংগোরোর বা মাণ্ডুর প্রাগৈতিহাসিক বাওবাব গাছগুলির মতনই যে-কোনও মহৎ সাহিত্যের মধ্যেই বোধহয় প্রাগৈতিহাসিকতার সঙ্গে মিশে গেছে ভবিষ্যৎ। একসময়ে, একবার পড়ে, কোনও মহৎ সাহিত্যই বোঝা যায় না। হিরেরই মতো চমকে দেয় তা, বিভিন্ন কোণ থেকে চাইলে।" একটু থেমে ঋজুদা বলল, "কী রে? বুঝলি কিছু ভট্‌কাই?"

"বেশি জ্ঞান হয়ে গেল। বুঝলে না ঋজুদাদা, আমাদের জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের এই জ্ঞান-ফ্যানে ভীষণ অ্যালার্জি। তাও স্মল ডোজে দিলে হয়, টু মিলিগ্রাম মতো। এ যে স্যালাইন ইনজেকশনের সিরিঞ্জে জ্ঞান। বাপ্‌স্।"

কাকার রাজ্যে বেড়াতে-আসা ভটকাইয়ের জ্যাঠামো দেখে আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

ঋজুদাও। বলল, "থাক, তাহলে তোরা অজ্ঞানই থাক। মন থেকে যে জ্ঞান নিতে না চায়, তাকে জ্ঞান কি কেউ দিতে পারে?"

"সবে ব্রেকফাস্ট করেছি ঋজুদা। স্টম্যাক ফুল। চারটে ডিমের স্ক্র্যাম্বল্ খেয়েছি। এখন, দেয়ারস্ নো রুম ফর এনি জ্ঞান। প্লিজ। সাম আদার টাইম। পেট যখন খালি থাকবে।"

আমি বললাম, "ব্রেকফাস্ট তো হয়েই গেল। এবার চলো না ঋজুদা, আমরা বান্ধবগড় ফোর্টে যাই। সেখানেই তো বাঘেদের আড্ডা।" আসলে আমি কথা

ঘোরাতে চাইলাম।

ভট্‌কাই তো ঋজুদাকে অত ভাল চেনে না। বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। ফট করে যদি ঋজুদা রেগে যায় তো পালিয়ে বাঁচবে না। ঋজুদার মেজাজ বাঘের মতো। এমনিতে কুলফি, রাগলে উরিব্বাবা!

"ওঁদের নিয়মকানুন আছে না সব?" ঋজুদা বলল।

"আরে! পাওয়ারসাহেব, দত্তসাহেব; এখানকার সবাইকে বলে দিয়েছেন। মিস্টার ঋজু বোস বলে কতা। আমাদের বেলা কানুনফানুন খাটবে না," ভটকাই বলল, "আমরা হলাম গিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অনার্ড গেস্ট।"

আমি বললাম, "গিয়ে কী হবে? বাঘের গুহায় ঢুকে বাঘ দেখবি? বাঘেদের আড্ডায়? আগে চিড়িয়াখানায় দেখে দেখে অভ্যস্ত হ। কটা এনেছিস?"

"কী? কটা?"

"আন্ডারওয়্যার।"

"শাট আপ য়্যু ব্র্যাগিং ব্র্যাট," বলে ভট্‌কাই বলল, "না। তার চেয়ে বাঘেদের আড্ডাখানায় বসে আমরা একটু আড্ডা মেরে আসি।" কথা ঘুরিয়ে তারপর বলল, ঋজুদার দিকে চেয়ে, "কী করব স্যার, সুন্দরীমোহন অ্যাভিন্যুর রকবাজ লাইফ মেম্বার, একটু আড্ডা-ফাড্ডা না হলে পেট যে ফুলে উঠছে। তোমার জ্ঞান বন্ধ করো এখন, প্লিজ।"

ঋজুদা হেসে ফেলল, "ও. কে.। নো জ্ঞান। মানে অজ্ঞানই।"

"দেখলাম, আজ ফার্স্ট ক্লাস মুডে আছে ঋজুদা।

ওঠা হল সকলের। বান্ধবগড় দুর্গের পেছনে খাড়া উঠতে সময়ও লাগল কিছুটা। উপরে উঠে চোখ জুড়িয়ে গেল। শিকার করার জন্যে দুর্গের নীচের এই লজ বানিয়েছিলেন রাজারা। সামনে একটি ঝিল। পদ্ম, কুমুদিনী সব ফুটে আছে। শীতের হাওয়ায় পাতারা মাথা নাড়াচ্ছে, হেলছে, দুলছে; জলে বিলি কেটে সেই উত্তুরে বুখু-হাওয়া-হিহি-জলে চিতসাঁতার দিয়েই বসন্তের হাওয়া হয়ে এসে এপারে উঠছে। কখনও বা ডুবসাঁতারে। আর গভীর ব্যঞ্জনাময় অস্ফুট সব স্বগতোক্তি করছে নানা জাতের পরিযায়ী হাঁসেরা। ম্যালার্ড, পোচার্ড, নানা ধরনের টিল্‌স্, রাশিয়ান এবং সাইবেরিয়ান রাজহাঁস। সব বছর নাকি আসে না এরা। এদের এই স্বগতোক্তিতে ঘুম পেয়ে যায়। সোপোরিফিক এফেক্ট বয়ে আনে এই পরিবেশ। স্নায়ুগুলো শীতের সাপের মতো নেতিয়ে পড়ে। চোখ বুজে আসে আবেশে।

একটা মস্ত শালগাছের নীচের বড় পাথরে শুকনো পাতা-টাতা সরিয়ে আরাম করে বসলাম আমরা। গাছে পিঁপড়ে বা ফোকর আছে কি নেই দেখে নিয়ে, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল ঋজুদা, পায়জামা-পাঞ্জাবির উপর শাল জড়িয়ে নিয়ে; যেন বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছে। শীতটাও বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। উপর থেকে চারধারের গভীর জঙ্গল-পাহাড়ের গায়ের

শীত-শীত গন্ধের সঙ্গে মেশা চামচিকের ও বাঘের চিমসে গন্ধ মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে ঝলক ঝলক হাওয়ায়। রোদ এসে পড়েছে ঘাড়ে। কী এক গভীর সুখের নিবিড় সুগন্ধি আমেজে দু' চোখ সত্যিই বন্ধ হয়ে আসছে। ঘুমিয়েই পড়তে ইচ্ছে করছে একেবারে।

হঠাৎ ভটকাই শান্তি ভঙ্গ করে বলে উঠল, "একটা গল্প বলো না ঋজুদা। জঙ্গলের।"

এমনই ভাব, ও যেন পাঁচ বছরের খোকা। ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনতে চাইছে। এদিকে গত বছর কলেজের স্পোর্টসের দিন সিগারেট খেতে দেখেছে রাজীব ওকে। ন্যাকা! এই জন্যেই চটকাতে ইচ্ছে করে ভটকাইকে।

"কী গল্প?" ঋজুদা পাইপ ভরতে ভরতে নীচের ঝিলের দিকে চেয়ে বলল।

ওখানে পাখিরা উড়ছে আর বসছে। মাথার উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাজ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে। কোনও অশক্ত, বৃদ্ধ বা শিশুপাখি দেখলে আর রক্ষে নেই।

আমি বললাম, "সেই যে অনেক বছর থেকে তুমি বলছ, তোমার মাথার মধ্যে একটা গল্প খালি ঘোরে। বারবারই ঘুরেফিরে আসে। সেই যে, একজন বুড়ো সাদা-দাড়ি পাইপমুখো শিকারি আর একটি অল্পবয়সী আদিবাসী ছেলে, আর এক বুড়ো বাঘের গল্প। যে-বাঘ সাংঘাতিক। অনেক বাঘা-বাঘা শিকারি যার হাতে ঘায়েল হয়েছিল, অথচ বাঘাকে ঘায়েল করতে পারেনি তারা কেউই। এবং আশ্চর্য, সেই বাঘটি মানুষখেকো ছিল না। মানুষের বা তার গৃহপালিত কোনও পশুরই কোনও ক্ষতি কখনও সে করত না। সেই ভুতুড়ে গল্প। বলবে?"

ভটকাই বলল, "তাহলে তো দারুণ হয়। জমে যাবে। ফিরে গিয়ে সুন্দরীমোহন অ্যাভিন্যুর রকে যা ছাড়ব না! ইক্কেরে রক্ শেল্টার হয়ে যাবে।"

"থামা তো আর ইকির-মিকির ভাষা ভটকাই।" আমি বললাম।

তারপর বললাম, "তা হলে বলো ঋজুদা। তিতির থাকলে খুশি হত খুব। ওরই বেশি ইচ্ছে ছিল শোনার।"

"গল্পটা কোনওদিন কাগজে-কলমে লেখার ইচ্ছে আছে। মাথার মধ্যে এখনও জমাট বাঁধেনি। বলছি তোদের, শোন। যতক্ষণ এই গল্প বলব, তোরা কেউ কোনও প্রশ্ন করবি না আমাকে। প্রশ্ন করলেই গল্প ছিঁড়ে যাবে। এ-মালা এখনও গাঁথা হয়নি। খড় করেছি শুধু, এরপর মাটি লাগবে, চোখ মুখ থুতনি ভুরু—সব গড়তে হবে। তারও পর রঙ।"

ভটকাই বলল, "প্রমিস। কথা বলব না একটাও। শুরু করো তুমি, ঋজুদা।"

তুরু বলল, "বাপ্পা, কোন দিকে এবার?"

সাদা দাড়ির বুড়ো শিকারি বলল, মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে, "সোজা।"

"সোজাই তো এলাম এত মাইল।"

"আরও সোজা...যেতে হবে।"

"তোমার কথার মানে বুঝি না আমি। পাহাড়টা তো উঁচু ভীষণ সোজা যাব কী করে?"

"কারও কথার মানেই কেউ বোঝে না। দাঁড়িয়ে পড়ে বোঝার চেষ্টা করিস না। চলতে-চলতেই বোঝার চেষ্টা কর তুরু। মানে বুঝবি।"

"তোমার কথার মানে সত্যিই বুঝি না আমি।"

"যা বলি, তাইই কর। সব কথার মানে খুঁজিস না।"

"কী খুঁজছ তুমি এই জঙ্গলে বাপ্পা?"

"নিজেকে খুঁজছি।"

"তুমি বড় হেঁয়ালি করো। ইতিয়া বাইগা বলছিল যে, তুমি সোনার খনির খোঁজ পেয়েছ বুড়হা বুডাং পাহাড়ের কোলে।"

"কে বলছিল, বললি? কানে শুনি না আজকাল ভাল আমি।" সাদাদাড়ি বুড়ো শিকারি বলল।

"ইতিয়া বাইগা। বললামই তো!"

"বলল বুঝি?"

"হ্যাঁ। বলল, তুমি সোনা খুঁজে পেলে ধরতির সবচেয়ে বড়লোক হয়ে যাবে।"

"তাও বলল?"

"হ্যাঁ। আরও বলল..."

"কী বলল রে আরও?"

"বলল, সোনা খুঁজে পেলেই তুমি আমাকে মেরে ফেলবে, যদি আমি দেখে ফেলি। তারপর সেই সোনার গুহায় পুঁতে ফেলবে। যক করে দেবে আমাকে। অনন্তকাল ধরে আমি তোমার ধনরত্ন পাহারা দেব। যা হতে পারত তোমার, তা আমার হয়ে যাবে। যকের ধন।"

বুড়ো শিকারি হেসে ফেলল। বলল, "তুই একটা গাধা। যে-ধনকে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়, সে-ধন ধনই নয়। সোনা আমি খুঁজছি ঠিকই। তবে সে-সোনার রঙ সোনালি নয়।"

"আবারও হেঁয়ালি? তোমার কথা বুঝি না আমি।"

"বোঝার দরকার নেই রে তুরু। পথ দেখে পা ফেল। এক পা এক পা করে। দেখবি, একসময় বুড়হা বুডাং পাহাড়ের চুড়োতেই পৌঁছে গেছিস না-জেনেই। সোনাও পেয়েছিস।"

তুরু দাঁড়িয়ে পড়ল একটা খয়েরগাছের চিকন ছায়ায়। দু'হাতের পাতা শালপাতার দোনার মতো করে মুড়ে পাহাড়ের চুড়োর দিকে চাইল।

বলল, "ইরেঃ। ই কম্ম আমার দ্বারা হবে না গো। এটা কি যে-সে পাহাড় ? কম কি উঁচু ? আমার দ্বারা বুড়হা বুডাং-এ চড়হা হবেই না। তায় আবার কাঁধে এই ভারী রাইফেল।"

বুড়ো শিকারি আবারও হাসল। বলল, "চুড়োটা দেখলি বুঝি ? যারা চুড়োয় পৌঁছতে চায়, তারা কখনও চুড়োর দিকে চেয়ে দেখে না।"

"কী যে বলো না ? চুড়োর দিকে না-দেখলে চুড়োয় পৌঁছবে কী করে ?"

"যারা এক লাফে চুড়োয় চড়তে চায় এবং কখনও তা পারে না, তারাই নীচে দাঁড়িয়ে চুড়োর দিকে চেয়ে থাকে। তুই তোর ডান পা'টা এর পরে কোন্ পাথরে বা খাঁজে ফেলবি, সেইদিকে শুধু চেয়ে দ্যাখ। পায়ের পর পা ফেলে যা। একসময় দেখবি, পাহাড়চুড়ো তোর তামারঙা পায়ের নীচে লুটোচ্ছে।

"জানি না কী হবে। তবে শুনলাম কথা, তোমার। কিন্তু মুক্কির লোকেরা বলল যে, তুমি বুড়ো বাঘাকে মারতে এসেছ। এদিকে বানজার বাম্নি বস্তির লোকেরা বলছে যে, তুমি সোনার খনি খুঁজতে এসেছ। তুমি এদিকে ওই দুইয়ের কিছুই না করে জঙ্গল তোড়পাড় করে বেড়াচ্ছ আর বলছ, তুমি নিজেকে খুঁজতে এসেছ ! এটা হেঁয়ালি নয় ? তুমিই বলো ?"

"বেঁচে থাকাটা, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি হেঁটে যাওয়াটাই একটা হেঁয়ালি তুরু। যখন বড় হবি, তখন বুঝবি। এখন এসব কথা থাক।"

"বড় হব ? আর কত বড় হব ? তিন হাত লম্বা হলাম, বাঘ মারলাম, ভালুক মারলাম, তামাক আর ধান বুনলাম, তুললাম গোলা ভরে, বছরের পর বছর। বিয়ে করব আজ বাদে কাল। আরও বড় ? কত বড় ? তুমি পাগল হয়েছ বুড়ো শিকারি ? বাপ্পা !"

"না রে, হইনি। তুই যা হয়েছিস, তাতে তোর ঘর ভরেছে, পেট ভরেছে, খেত ভরেছে ধান-তামাকে, তুই লম্বা হয়েছিস, ফুলে উঠেছিস, কিন্তু বড় হোসনি।"

"সে কী কথা বাপ্পা ! এ আবার কোন্ নতুন হেঁয়ালি ?"

"হেঁয়ালি নয় তুরু। এইটেই কথা। তুই যখন বড় হবি, তখন বুঝবি। সত্যিই বুঝবি রে।"

"বুঝে কাজ নেই আমার। এখনও দাঁড়াও দেখি একটু। ওয়াটার-বটল থেকে জল খেয়ে নিই। এতখানি কি চড়া যায় একটানা ?"

তুরু দাঁড়িয়ে পড়ল প্রথমে। তারপর বসল একটা পাথরে। তার কোমরে বাঁধা গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। বলল, "দেখেছ, এই শীতেও কী ঘাম !"

"শীতের ঘাম গরমের ঘামের চেয়ে অনেক দামি। আরামেরও রে।"

"কী জানি ! তুমি জল খাবে তো এই নাও।"

"নাঃ। আমি খাব না।" বলে, বুড়ো শিকারি দূরবীন দিয়ে পাহাড়ের চুড়োর দিকে দেখতেই লাগল।

পাহাড়ের উপরটা মনে হয় মালভূমির মতো। বড় বড় পাকা সোনারঙা রেশমি-নরম ঘাসের উধাও মাঠ আর আফ্রিকান টিউলিপগাছে ছাওয়া। ভাল বোঝা যায় না, চুড়োয় কী আছে। আদৌ কিছু আছে কি নেই। গুহা যে আছে অনেকগুলো, তা বোঝা যায়। একেবারে চুড়োয় একটা মস্ত শিঙাল শম্বর ছবির মতো শিংয়ের ডালপালা বিছিয়ে নীল আকাশের পটভূমিতে কালোরঙা পুতুল-শম্বরের মতো একটা চ্যাটালো পাথরের উপর দাড়িয়ে আছে। তুরুর মনে হল, পৃথিবী বোধহয় ঠিক ওইখানেই গিয়ে শেষ হয়েছে। দেবতারা সব যে ওইখান থেকেই মেঘের গাড়িতে চড়ে দেবলোকের দিকে উড়ে যান, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তুরু শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকল ওইদিকে। অনেকক্ষণ। তারপর মুখ ঘুরিয়ে একবার বুড়োর মুখে তাকাল।

বুড়ো একদৃষ্টে তাকিয়েই ছিল পাহাড়চুড়োর দিকে। তার সাদা দাড়ি উড়ছে উত্তুরে হাওয়ায় কাপাসতুলোর মতো। তার ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক হাসি। সে-হাসির কোনও ব্যাখ্যা হয় না।

তুরু বলল, "এতক্ষণ ধরে অত দেখছ কী ? শম্বরটা রাইফেলের রেঞ্জের অনেক বাইরে আছে। তা ছাড়া ওকে মারলে তো ধ্বপ্‌ধপিয়ে পড়বে নীচের খাদেই। শেয়াল হায়নাতে বা চিতাতে খেয়ে যাবে। আমার বা বস্তির লোকদের কাজে লাগবে, না ঘন্টা। বলো তো আমি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ধড়ুকে দিই। কড়াক পিং। এমন করে, যাতে গুলি খেয়ে নীচে না পড়ে। ওখানেই থাকে।"

বুড়ো তবু কথা বলল না। দূরবীন চোখে লাগিয়ে এদিক থেকে ওদিক—একশো আশি ডিগ্রি দেখল। একবার নয়। বারবার।

তুরু মনে মনে ভাবল, সত্যিই পাগল। পাগলই হয়ে গেছে। আসলে বুড়ো হলে সব মানুষই একটু শিশু-শিশু, খ্যাপাটে, পাগলাটে হয়। সাদাদাড়ি শিকারি বুঝি বদ্ধ পাগলই হয়ে গেছে। কী কুক্ষণে যে এবারে এল পাগলের সঙ্গে ! না এলেই ছিল ভাল।

এবার অধৈর্য গলায় তুরু বলল, "দেখছ কী বাপ্পা ? পেলে, সোনার খনি ? এগোবে তো এগোও।"

বুড়ো অস্ফুটে বলল, "হল্লা করিসনি ছোঁওড়া। দেখছি।"

"আরে, দেখছ যে, সে তো আমি নিজেও দেখছি। দেখছটা কী তা তো বলবে।"

"জঙ্গল।"

"সেও তো আমিও দেখছি। অত করে দেখার কী আছে ? জঙ্গল তো জন্মাবার পর থেকেই দেখছি। দেখে দেখে তো পচে গেল চোখ।"

"আছে রে তুরু, আছে। পরতের পর পরত। কত সব পাথর, পাথরের

বুকে-বুকে মাটি, কিচুলরাজার কত যত্ন করে বয়ে-আনা মাটি, কত নাম-না-জানা পাখিদের ঠোঁটে করে বয়ে-আনা কত-রঙা বীজ তাতে পড়েছিল যুগ-যুগ ধরে। তাই তো ঘাস জন্মাল। তারপর ঝোপঝাড়। ফুলদাওয়াই, পুটুস, কেলাউন্দা, গিলিরি, না-নউরিয়া, পোকামাকড়, লাল সবুজ নীল। প্রজাপতি, রামধনুরঙা পাখি, চিকন পালকের, মেঠো ইঁদুর—নতুন চালের গন্ধে-ভরা যাদের সাদা শরীর, বর্ণালি সাপ, যারা ধীর স্বপ্নের মতো চারিয়ে যায় বনের গভীরে, কোটরে ; ফাঁকে-ফোকরে। হরিণ, চিতা, চিল। তারও পর বড়-বড় সব মহীরুহ এল। সময় লাগল কত। তোর বড় হয়ে ওঠার চেয়েও কত্ত কত্ত বেশি সময় বল ? জঙ্গল কী অত সহজে হয়েছিল রে তুরু যে, এত সহজেই দেখা ফুরিয়ে যাবে ?"

"কোনও জানোয়ার দেখেছ কি বাপ্পা তুমি ওই জঙ্গলে ? শম্বরটা ছাড়া ? বুড়হা-বাঘা কি ? দেখলে বোলো। তোমার বকবকানি বুঝি না আমি। বুড়হা-বাঘার সঙ্গে মোলাকাত হলে ঝামেলা মেটে।"

"নাঃ। সে দেখা দেয়নি। দেবে না সহজে। সেও তো আমারই মতো।"

"কী রকম ?"

"সেও তো হেঁয়ালিই। গুমোর-ভরা বুড়ো এক আমারই মতো। দুজনে দুজনকেই খুঁজছি। দেখা হয়ে গেলে তো মিটেই গেল। তবে, তাকে খুঁজতে হবে না। কোনও সন্ধের মুখে সে আপনিই এসে দাঁড়াবে মুখোমুখি। তখন..."

"তখন কী ?"

"বোঝাপড়া।"

"কী ?"

"শোধবোধ।"

"তবে ? এত কী খুঁজছ তুমি বাপ্পা ? যদি জানোই যে, শুভদৃষ্টি আপ্‌সেই হয়ে যাবে কোনওদিন, তবে এত তক্‌লিফ কিসের ? তবুও কী খুঁজছ এখনও ?"

"নিজেকে। বলেইছি তো।"

নিজেকে ? নিজে তো এই দাঁড়িয়েই আছ জলজ্যান্ত আমার সামনে। তোমার পাইপ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, তোমার জার্কিনের গন্ধ পাচ্ছি নাকে। নিজেকে খুঁজছ তুমি, দূরে ? অত দূরে ? মানে ?"

"ঠিক। তুরু ! নিজেকে নিজের থেকে বাইরে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার উপরে আলো ফেলে তাকে না দেখলে দেখাই হয় না, জানা হয় না। বিশ্বাস কর্ আর না-ই কর্, নিজেকেই খুঁজছি আমি। সকলেই হয়তো খোঁজে। চুরি করে। কেউ পায়, কেউ পায় না খুঁজে।"

"মরোগে যাও। তুমি কি ওই দূরের শম্বরটা, যেটাকে পুতুলের মতো দেখাচ্ছে, তার মধ্যে ঢুকে গেছ ? তুমি কি দার্‌হা ? উইক্কে বা সাইআম্-এর শক্তি কি ভর করেছে তোমার শরীরে ?"

"না, না, ওসব নয়। সব কথা যে তোর বোঝার নয় রে। এত প্রশ্ন করিস

কেন তুরু ? তার চেয়ে তুই জল খা।"

"খেয়েছি।"

"খেয়েছিস ? তো আরও খা।"

"খেয়েছি।"

"তো কফি খা।" দূরবীন থেকে চোখ না নামিয়েই বলল, সাদা-দাড়ির বুড়ো শিকারি।

"কফি নেই। ফুরিয়ে গেছে।"

"তবে হাওয়া খা, রোদ খা, জীবন খা, মরণ খা, যা খুশি কর তুই, শুধু এত কথা বলিস না, প্রশ্ন করিস না। জঙ্গলে এসে কথা বলিস না তুরু, শিকার কর্, আর না-ই কর্। জঙ্গল যে যুগযুগান্ত থেকে অনেক কথাই জমিয়ে রেখেছে তার বুকের মধ্যে। বলার জন্যে। অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক হাসি, অনেক গান, কান্নাও অনেক। অনেক রঙ আর গন্ধ বুনে-বুনে বাস্তারের ঠাসবুনোন বাইসন-হর্ন মারিয়াদের কম্বলের মতো মেলে রেখেছে বনস্থলীতে। তুই কী বোকা রে তুরু ! এতদিন হল জঙ্গলে আসছিস আর জঙ্গলকে দু' চোখ মেলে, দু' কান খুলে তোর সব বোধবুদ্ধি দিয়ে একবার অনুভবও করলি না ? তুই ব্যাটা এক নম্বরের বুদ্ধুই রয়ে গেলি। বুদ্ধু নাম্বার ওয়ান। তোর বাবা অন্য রকম ছিল।"

"আমি আমার মতো হতে চাই। অন্য কারও মতো, এমনকী বাবার মতোও হতে চাই না। আমি না হয় বুদ্ধু, জঙ্গল দেখলাম না বলে। কিন্তু তুমিও কম বুদ্ধু নও বাপ্পা।"

বুড়ো দূরবীন নামিয়ে দিল। পেটের কাছে দুলতে লাগল সেটা। পা ফেলল সামনে। একটা পাহাড়ি বাজ, ভয় পেয়ে, ভুল করে ঝোপঝাড়ের আলোছায়ার আশ্রয় ছেড়ে উপরের নীল বেআবরু আকাশে হঠাৎ উড়ে-যাওয়া একটা কালি-তিতিরকে ধাওয়া করে ধরে ফেলল। মওত্। জঙ্গলের নিয়ম। জীবনেরই মতো। ময়ূর, বনের ছায়াচ্ছন্ন গভীরে শঙ্খচূড় সাপের উদ্ধত ফণার দর্পচূর্ণ করে তাকে ধরাশায়ী করে বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া। ময়ূর বড় গর্বিত পাখি। রূপ আর গুণের গায়ে গর্ব লেগে থাকে। একটা কপারস্মিথ পাখি ঘনান্ধকার শীতার্ত উপত্যকা থেকে ডাকতে লাগল টাকু-টাকু-টাকু-টাকু। টাকু ! টাকু !

বুড়ো শিকারি দু' নাক ভরে টেনে শীতের সকালের বনের স্নিগ্ধ সুগন্ধি হিমেল নিশ্বাস নিল। তারপর বুনো গোলাপের উপর জমে-থাকা শবনমকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নাড়িয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো রামধনু করে উড়িয়ে দিল, চারিয়ে দিল সবুজের আর লালের এই দেশে। তারপর আবার পাহাড় চড়তে লাগল।

পেছন-পেছন তুরু। কিছুটা বিরক্ত, কিছুটা মন্ত্রমুগ্ধ, কিছুটা ক্লান্ত আর সব থেকে বেশি অবাক হয়ে। এই বুড়ো এবারে একটা খত্‌রা বানাবেই বানাবে।

তার জন্য তার নিজেরই কোনও বিপদ ঘটে যাবে। মা তাকে মানা করেছিল এত করে। বাবার বন্ধু এই বাপ্পা। এতদিনের সঙ্গী বাবার। মরে যাওয়া সোজা। খুব সোজা। মরতে ভয় পায় না তুরু। ভয় যদি কর্তব্য না করতে পারে! কর্তব্যবিমুখ মানুষে আর মরা মানুষে তফাত কী? তুরু তাইই বোঝে। তার বাবা তাকে তাইই শিখিয়ে গেছিল। এই বুড়োর কাছে, বাপ্পার কাছে তাদের পরিবার নানাভাবে ঋণী। অনেক নুন খেয়েছে। শুধু নুনই নয়, খেয়েছে ভালবাসা দু' আঁজলা ভরে। বুড়ো যতদিন আছে, ততদিন শোধ দিতে পারুক আর না-ই পারুক, স্বীকার তো করবে! তা নইলে মানুষ কী! তুরুর মা বলেন, দুটি হাত, দুটি পা, দুটি চোখ আর একটি মুখ থাকলেই মানুষ মানুষ হয় না। তুরু মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে চায়, যতদিনই বেঁচে থাকুক না কেন। এই মানুষ হতে গিয়ে বাঁচা যদি না-ই হয়, তবে নাই-ই বা হল!

তুরু টুপিটা রেখে গেল টেবিলে। রাইফেল, গুলি, পাইপের তামাকের টিন। সবই যেমন তেমন পড়ে রইল।

বাপ্পা যেন মনে মনে অন্য কোথাও চলে গেছে।

দূর ছাই!

মনে-মনে বলল তুরু।

এই পাহাড়টাও মস্ত। পাহাড়ে অনেক গুহা। গুহা আর রক-শেলটার। তার মধ্যে হাজার-হাজার বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক সব মানুষ বাস করত। লাল আর হলুদ রঙে তারা নানারকম ছবি এঁকে গেছিল সেই সব গুহার গায়ে গায়ে। বাইসন, শম্বর, আর বুনো বুড়ো দাঁতাল শুয়োরদের শিকারের ছবি। পাথরের অস্ত্র দিয়ে শিকার করত তখন। আগুন আবিষ্কার হয়নি। সে সব অনেক হাজার বছর আগের কথা।

যে-গুহাতে বুড়হা-বাঘার বাস, তার সামনেই মস্ত একটা কালো পাথরের চ্যাটালো চাতাল। আদিবাসী গোঁন্দ ছেলের বুকের মতো। তার উপরে দুটি থাবা মেলে বসে ছিল বুড়ো বাঘটা।

মাঘী সন্ধ্যার নরম পাট্‌কিলেরঙা রোদ পাহাড়ের গায়ের আর নীচের ঘন জঙ্গলের গায়ে শেষবারের মতো হাত রেখেছিল। একটু পরেই সূর্য পশ্চিমের পাহাড়টার আড়ালে চলে যাবে। শূন্যে তাদের আল্‌গা পাদুটি দুলিয়ে দুলিয়ে ডুবন্ত সূর্যকে ধাওয়া করে দিগন্তবেলার সূর্যের ধর্‌তি-মায়ের কপালের মস্ত এক টিপেরই মতো লাল গোলকের মধ্যে ঢুকে যাবে একদল টি-টি পাখি। কাঁপতে কাঁপতে, ডাকতে ডাকতে হট্টিটি-হুট্-টি-ট্টি-টি-হুট্।

ঔৎসুক্যের প্রতীক যেন এই পাখিগুলো!

যে-পাহাড়ে বুড়ো বাঘা বসে ছিল, সেই পাহাড়ের নীচের উপত্যকায়, একটু দূরে মেমসাহেবের মতো ফর্সা, নরম, চল্‌কে-চলা সুন্দরী বান্‌জার নদী। এঁকেবেঁকে চলে গেছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বিন্ধ্য, সাতপুরা আর মাইকাল

পর্বতশ্রেণীর মিলনস্থানের খোঁজে।

নদীর পাশে, উঁচু ডাঙায় ছির ঘাসের খোলা সুগন্ধি প্রান্তরে একটা সাদা তাঁবু। তাঁবুর সামনে ত্রিপলের ফোল্ডিং টেবলের কছে চেয়ার পেতে বসে আছে সেই বুড়ো-শিকারি। সাদা হয়ে গেছে তার চুল-দাড়ি। অথচ ছিপছিপে, মজবুত তার শরীরের গড়ন। বুড়ো বাঘারই মতো। রোদে জলে চাঁদে পুড়ে শিকারির গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেছে। মুখে একটা পাইপ। সামনে কলাই-করা মগে কফি। শিকারির কাছেই, বাঁ-দিকে আসন্ন হি-হি শীতের রাতের জন্যে তৈরি হচ্ছে তুরু, একটি হা-হা-হাসি অল্পবয়সী গোঁন্দ ছেলে। বুড়ো শিকারির একমাত্র অনুচর সে। আগুন করার বন্দোবস্ত করছে কাঠকুটো এনে। একটা জংলি আমগাছের মস্ত বড় গুঁড়ি ফেলে রাখা আছে সেখানে। গুঁড়িটার আধখানা পুড়ে গেছে গত ক'দিনের রাতের ধিকিধিকি আঁচে।

নদীর দিকে উদাস চোখে চেয়ে ছিল বুড়ো শিকারি। কন্‌কনে হাওয়ায় তার দাড়ি নড়ছে এপাশ ওপাশ। মানুষটার চেহারা দেখলে বোঝা যায় না যে, সে শিকারি। কবি বা গাইয়ের মতো হাবভাব তার। তার দু' চোখভরা ভালবাসা। পাখির জন্যে, নদীর জন্যে। এমনকী, মনে হয়, বাঘের জন্যেও।

বুড়ো বাঘটা তার গুহার ঠিক নীচের চাতালের সামনে বসে বুড়ো শিকারিকে দেখছিল। শিকারি জানে না যে, বাঘ তাকে বাজপাখির মতো পাহাড়ের উপর থেকে দেখছে। চাতালে বসে বাঘটা নীচের ঘন জঙ্গল আর নদীতে ঘেরা অনেকখানি এলাকাই দেখতে পায়। দেখতে পায়, কোথায় শম্বর বা বারাশিঙার দল চরছে ছির ঘাসের লালচে ফুলে-ভরা বনে। কোথায় বাইসনের বাচ্চা মায়ের দুধ খাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে; মাকে বিরক্ত করে। দেখছে, বান্‌জার নদীর কোন্ জায়গা দিয়ে চিতল হরিণের ঝাঁক বা বুড়ো শুয়োরের দল তাদের চঞ্চল খুরে-খুরে বান্‌জার নদীর রুপোলি জল ছিটিয়ে বনে ঢুকল। কোথায় একলা দলছুট্ বারাশিঙার বাচ্চা ভীরু পায়ে ইতিউতি ঘুরছে।

অনেকদিনই শজারু খায় না বুড়ো বাঘটা। আর বাঁদরও। বাঁদরদের উপর খুব রাগ তার। মানুষেরা নাকি সব বাঁদরেরই বাচ্চা। শুনেছিল, এক বাঘিনীর কাছে। মুখ বদলাবার জন্যে আজ সে ভাবছে যে, পাহাড়ের নীচের মস্ত ঝাঁকড়া পিপ্পলগাছটার উপরে যে বাঁদরের দলের বাসা, সেখানে গিয়ে উপরে তাকিয়ে কয়েকবার হালুম্-হুলুম্ করবে। ঘন বনের মধ্যে বড় বাঘের হালুম-হালুম্ ডাক শুনে মানুষেরই নাড়ি ছেড়ে যায়, তা তুচ্ছ মর্কটের কথা! ভয়ের চোটে হাত-পায়ের মুঠি শিথিল হয়ে যাবে বিস্তর বাঁদরের—বুড়হা বাঘার ডাক শুনেই। চি চি-চ্যা চ্যাঁ-খ্যাঁক্-খঁরর-খঁরর-খঁরর-খঁক্ করবে ঝাঁপাঝাঁপি করতে করতে বাঁদরগুলো দু'-চারটে, পাকা আমেরই মতো, ডাল-ফস্‌কে ঝরে পড়বে নীচে। তখন বুড়ো বাঘা ক্যাঁক্ করে গলা টিপে ধরবে একটার। তারপর বনের গভীর শিশিরভেজা অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়ে ভোজ লাগাবে।

"তুরু !" বুড়ো শিকারি ডাকল।

"বাপ্পা।" উত্তর দিল তুরু, আগুন জ্বালতে জ্বালতে, জড়ো-করা শুকনো পাতায়।

"কাল কিন্তু খুব ভোরে বেরোব আমি।"

"কোন্‌দিকে ?"

"যেদিকে বুড়হা বাঘার পায়ের ভাঞ্জ মিলিয়ে যেতে দেখলাম আজ। তার আস্তানাটা যে কোথায়, তা না জানলে যে হচ্ছে না। বড়ই সেয়ানা বাঘটা। বোদে বাঁধলাম, ছাগল বাঁধলাম, তাদের ছুঁল না পর্যন্ত !"

"হুঁ ! তুমি তো জানোই যে, অনেক শিকারিই ওকে মারার চেষ্টা করেছে আগে। কত সাহেব-সুবো। মুক্কির সান্‌জানা সাহেব। ঠুঠা বাইগা। দেবী সিং। জাত শিকারি সব। হুঁশিয়ার হয়ে গেছে বাঘটা। মাচা থেকে অনেক বারই গুলি চলেছে ওর উপর। চালাক হয়ে গেছে খুব। হুঁশিয়ার ! তুমিও।"

"হুঁ !" কফির কাপে চুমুক দিয়ে, শিকারি বুড়ো বলল। "মানুষের কাছাকাছি এলে সকলেই ধূর্ত হয়ে যায়। মানুষের মতো ধূর্ত জানোয়ার যে আর নেই। বুঝলি তুরু !"

"তা ঠিক। কিন্তু কী হবে ? বাপ্পা ?"

"কী, কী হবে ?"

"এই বুড়হা-বাঘাকে মেরে তোমার কী হবে ? বাঘ তো সারাজীবনে অনেকই মারলে। তোমার সাহসের কথা রাইপুরে, বিলাসপুরে, জবলপুরে, এমনকী ভোপালেও কে না জানে ? আমার বাবার সঙ্গেই তো কত শিকার করলে তুমি। শখ কি মেটেনি এখনও ? কী চাও তুমি বাপ্পা ?

বুড়ো চুপ করে রইল।

"কী চাও ? আরও নাম ? খবরের কাগজের পাতায় ছবি ছাপতে তোমার ?"

তুরু শুধোল আবার।

বুড়ো হাসল। বলল, "নাম কোনও ব্যাপারই নয় রে তুরু। যারা নামের বা যশের যোগ্যই নয়, তারাই চিরদিন নাম-যশের পেছনে মানসম্মান চুলোয় দিয়ে দৌড়োয়।"

"তবে ? কিসের ব্যাপার এটা ? তোমরা এত শিকার করলে বলেই তো শুনতে পাচ্ছি বাঘ শিকার করা একেবারেই বন্ধ করে দেবে মধ্যপ্রদেশ সরকার। এই বুড়ো বাঘ তো আমার বাবাকে খায়নি ! তোমারও তো ক্ষতি করেনি কোনও। অন্য একটা বাঘ আর বাঘিনী তো সুফ্‌কর আর মুক্কির কাছে আমাদের টোপ-দেওয়া দু'দুটো গাবদা-গোবদা বোদে মেরে এবং খেয়ে সাবড়ে দিল। না তুমি নিজে বসলে মাচায়, না আমাকে বসতে দিলে। গত দশদিনে দু'-দুটো বাঘ হুম্‌চ্‌কে পট্‌কে দেওয়া যেত। পারমিটে সময় তো আছে আর মাত্র পাঁচদিন। একমাত্র ওই বুড়ো বাঘাকেই তোমার মারতে হবে, এমন জেদ

ধরেছে যে কেন তুমি, তা তুমিই জানো। একটা ভাল বারাশিঙা মারলে না, শম্বরও মারলে না একটাও ; মুক্কি আর সুফ্‌কর বস্তির লোকেরা কত মাংস খেতে পারত। তোমাকে সত্যিই বুঝি না আমি বাপ্পা। আমার নিজের বাবা মরে গিয়ে বড়ই বিপদে ফেলে গেল আমাকে। তোমাকে বোঝা ভারী মুশকিল।"

"সব কথা সবার বোঝার নয় রে তুরু। সব কথা বোঝার চেষ্টাও করিস না কখনও, জীবনে সুখী যদি হতে চাস।"

তুরু চুপ করে রইল। উত্তর দিল না।

"এবার আগুনটা জোর হলে খিচুড়ি চাপা। কী আছে আর ?" বুড়ো শিকারি বলল।

"কী আর থাকবে ? শিকারই করলে না কিছু। আমি পয়েন্ট টু টু রাইফেল দিয়ে একটা খরগোশ মেরেছিলাম। সেটাকে ছাড়িয়ে ঝল্‌সে নেব। পাথুরে নুন আর লঙ্কা আছে।"

"আমি খাব না। তুই-ই খাস্।"

"কেন ? খাবে না কেন ?"

"মাটি-মাটি গন্ধ লাগে আমার। খরগোশের গায়ে মাটি-মাটি গন্ধ।"

"পৃথিবীর সব কিছুতেই তো মাটি-মাটি গন্ধ। পৃথিবী যে ধর্‌তি-মা।"

"তা জানি। কিন্তু মাটির গন্ধ ভাল লাগে না আমার।"

"তো খাবে কী ?"

"কেন ? খিচুড়ি !"

"শুধু-শুধু ?"

"শুধু-শুধুই। বুড়োদের বেশি খেতে নেই। আমি কি তোর মতো জোয়ান ? আমি যে তোর বাবার চেয়েও অনেক বড় রে বয়সে। আমি যে বুড়ো থুথ্‌থুরে।"

"এতই বুড়ো তো এই বুড়ো বাঘাকে মারা জন্যে দাঁতে-দাঁত দিয়ে পড়ে থাকার দরকার কী তোমার ? ফিরে যাও না রায়পুরে।"

"যাব।" বুড়ো বলল।

"তোমাকে বুঝি না একটুও।"

"কেই-বা কাকে বোঝে ? নিজেকেও কি তুই বুঝিস ? ভাবিস যে, বুঝিস ! তুই বুঝিস না তোকে। আমিও বুঝি না আমাকে।"

"জানি না, তোমার এই একগুঁয়েমি, এই জেদ, ভাল লাগে না আমার।"

"যার জেদ নেই, সে কি মানুষ ?"

"খারাপ জেদ খারাপ। ভাল জেদ ভাল। আমার মা বলে। মা তো তোমাকেও বলল সেদিন।"

"কী ?"

"বলল না ? এই বাঘটার হাতে দশজন শিকারি মারা গেছে গত পনেরো

বছরে। এই বুড়ো বয়সে একে মারার জেদ ভাল নয়। বলেনি ? কী দরকার ? সুখে থাকতে ভূতে কিলানোর ? এ-বাঘকে মারতে পারে এমন শিকারিই নেই। সারা দেশের কথা আমি জানি না। ভারতবর্ষ তো মস্ত দেশ। মুখ্যু আমি। অন্তত মধ্যপ্রদেশে নেই। মাঝখান দিয়ে তোমারই প্রাণটা যাবে।"

বুড়ো শিকারি তুরুর কথার উত্তর দিল না কোনও।

বলল, "তাঁবুর ভিতর থেকে আমার রাইফেল, গুলি, মাথার টুপিটা আর পাইপের তামাক নিয়ে আয় তো তুরু। আর কফিটা খেয়ে নে। পটে অনেক কফি আছে। বিস্কিট্ আছে প্যাকেটে। খাবি-দাবি ভাল করে তো এখন তোরাই। ছেলেমানুষ যারা।"

"কফি-টফি বেশি খাই না আমি," তুরু বলল। "বাথানে গিয়ে বিকেলে আমি মোষের দুধ খেয়ে এসেছি। বাথানের আহিররা বলল যে, একটা ছুকরি বাঘিনী আর তার দুটো বড়-হয়ে-যাওয়া বাচ্চা তাদের বাথানে কাল রাতে নাকি খুবই হাম্‌লা করেছে। ওই বাঘিনী আর বাচ্চাদুটোকে মারতে বলেছে অনেক করে। তোমার কাছে কাল ভোরে অনেক ভেট্-টেট্ নিয়ে আসবে ওরা। দুধ, ঘি, মাখন, সর, মুরগি।"

"ওরা এলে ওদের ফিরিয়ে দিস।"

"কেন ? পারমিটে তো দুটো বাঘ আছেই তোমার। দাওই না মেরে। তুমি না মারো, অন্তত আমাকে ইজাজত দাও ; কাল রাতেই সাবড়ে দিচ্ছি। বাথানের বাইরে একটা বোদে বেঁধে দিলেই হল। দেখতে হবে না আর। আসবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে কড়কে দেব। আমার বাপ কী করে সোজা করে গুলি করতে হয় তা তো শিখিয়ে গেছে। আর কিছু শেখাক্ আর না-ই শেখাক্। শুধু তোমার দোনলা বন্দুকটা ধার দিও আমাকে একরাতের জন্যে। আমার একনলাটা নিয়ে বড় বাঘের মোকাবিলা করার সাহস হয় না।'

"না।"

গম্ভীর গলায় সাদা-দাড়ি বুড়ো শিকারি বলল।

"বাপ্পা ! কেন না ? না কেন ?"

"না বলেছি, না। বড় বেশি কথা বলিস তুই তুরু। এবারে চুপ কর। রান্না হয়ে গেলে থালা করে দু'হাতা খিচুড়ি এনে দিবি আমাকে। ব্যস্স্। খেয়েই শুয়ে পড়ব। কাল ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে যাব। তোর যেতে হবে না আমার সঙ্গে। আহিররা তোর জন্যে ভেট্-টেট্ নিয়ে আসবে বলছিলি। তুই ওসব নিয়ে নিস। পরে দেখা যাবে। যদি বেঁচে থাকি তো দেব তোকে মারতে।"

"তুমি একাই যাবে ? পায়ে হেঁটে ? একা ! অত বড় বাঘ ! এ যে বুড়ো বাঘা !"

তা কী করা যাবে ? যে-বাঘ মড়ি করে না, মাচা থেকে যাকে কায়দা করার কোনওই উপায় নেই, যে হাঁকোয়া করালে হাঁকাওয়ালাদেরই মেরে দিয়ে লাইন

ক্রস্ করে বেরিয়ে যায়, তাকে হেঁটে ছাড়া আর কীভাবে মারা যেতে পারে ?"

"না। একা যাবে না বাপ্পা।"

"ঠিক করেছি, কাল থেকে একাই যাব। সময় ফুরিয়ে আসছে। আজ রাত পোয়ালে, থাকবে মোট পাঁচটা দিন। সময় বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি আর কিছুই ফুরোয় না।"

"এই পাঁচদিন শেষ হলেও তোমার জীবনে আরও অনেক সময় বাকি থাকবে বাপ্পা।"

"যে-সময় নিয়ে কিছুই করার নেই, থাকে না, তা থাকা না-থাকা সমান। সে সময় নয় ; সময়ের বোঝা।"

"কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে গেলে ক্ষতিই বা কী ? আমি কি আনাড়ি ? আমি ভিতু কি ? কোনও বিপদ হলে, একটা বেশি বন্দুক থাকলে তো ভালই। কী ? ভাল না ?"

"কিছু-কিছু ফয়সালা থাকে তুরু, কী বলব ; তোর জীবনেও হয়তো সেসব ফয়সালার দিন আসবে ; প্রত্যেক মানুষের জীবনেই আসে, একবার নয়, অনেকবারই ; যখন সেই সময় আসে, তখন একা-একাই তার মোকাবিলা করতে হয়। তখন সঙ্গে যদি একদল লোকও থাকে, তবুও তাকে একাই। সে একাই। আসলে, আমরা সকলেই একা। জানলি ! ভীষণই একা। যা-কিছুর মানে আছে, মানে থাকে একজন মানুষের জীবনে, সেই সবকিছুই তাকে একা-একাই করতে হয়।"

"বুঝি না তোমার এসব বড় বড় কথা বাপ্পা।"

"বলেছি তো। সব কথা তোর বোঝার জন্যে নয়।"

"বুড়ো শিকারির চোয়াল শক্ত হয়ে এল।

বুড়ো বলল, "এ নিয়ে আমি আর কোনও আলোচনা তোর সঙ্গে করতে চাই না তুরু। যা আমি বলব, তাইই হবে। এমন বন্দোবস্তেই আমি চিরদিন অভ্যস্ত।"

"তাই হোক্। আমার কী ? তবে, তোমার হরকত্ দেখে মনে হচ্ছে, এই বান্‌জারের বালিতেই তোমার চিতা সাজিয়ে তোমায় জ্বালিয়ে দিয়ে আমার ফিরতে হবে সীওনীতে। লোকে বলবে, কী বাহাদুর তুরু ! ধুনুয়া শিকারির ব্যাটা তুরু এমনই শিকারি যে, বাপ্পাকেও মারিয়ে ছাড়ল বুড়হা বাঘাটার হাতে !"

তারপরই রীতিমত রেগে তুরু বলল, "তুমি কি জানো না যে, বুড়হা-বাঘাকে কেউই মারতে পারেনি ? পারবেও না। শুনে নাও তুমি। আমার এই-ই শেষ কথা বাপ্পা ; তুমিও না। মরবে তুমি। তারপর যা খুশি তোমার তাই-ই কোরো।"

আগুনটা জোর হয়েছিল ততক্ষণে। বুড়ো শিকারির চোখদুটি চকচক করছিল। দু' চোখ তুলে সে আগুনের লাল হলুদ সবুজ নীল উজ্জ্বল সাদা রঙা

লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা শিখাগুলির দিকে চেয়ে রইল। বুড়ো শিকারির মুখটা স্থির। চোখের দৃষ্টি আগুনের সঙ্গে মিশে গেল।

আগুন এক দারুণ সাপুড়ে। কত রঙ্গ আর কত মাপেরই অসংখ্য সাপ যে আছে তার ঝুলিতে ! যার দেখার চোখ আছে, সেই-ই দেখতে পায়।

ভাবছিল তুরু। চুপ করে আগুনের দিকে চেয়ে।

একটা হলুদ কাঠের টুকরো দিয়ে বাড়ি মারল তুরু ধিকিধিকি-জ্বলা জংলি আমের গুঁড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে তুবড়ি জ্বলে উঠল চিড়বিড় শব্দ করে। বুড়োর স্বপ্ন ছিটকে গেল। কাঠের মধ্যেও কত লোহাচুর থাকে ! ভাবল তুরু। নইলে এমন তুবড়ি ওঠে কী করে !

বুড়ো শিকারি তবু তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে আগুনের দিকে।

তুরু মনে মনে বলল, দেখে নাও। এই আগুনেই ছাই হয়ে যাবে তুমি। ছাই হবে, তোমার ওই জেদে। শিকার তো বড়লোকদের একটা খেলাই। কত শিকারিই সে দেখল তার বাবার আমল থেকে। খাওয়া-দাওয়া, গানা-বাজনা, মজা, দল বেঁধে শিকার। হরিণ, শম্বর, পাখি ; সবরকমের। বাঘ যদি মারা যায় কোনওরকম ঝুঁকিই না নিয়ে, তবেই বাঘ। নইলে ওই সবেই তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু বুড়ো শিকারির এ আবার কী রকম শিকার ! এ যে দেখছি কার্মা-নাচা মেয়েদেরই মতো গোঁ। জেদের শেষ কথা। 'গান্ধারিয়া বা গান্ধালা ফুল খোঁপায় গুঁজব না ; আমাদের পলাশ ফুলই চাই। চাই। চাই। চাইই।'

বুড়ো নিথর হয়ে বসে ছিল আগুনের দিকে চেয়ে।

বুড়হা-বাঘাটা তখনও সেই চ্যাটালো কালো পাথরের উপরেই বসে ছিল ! এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। সূর্য ডুবলে যে-তারাটা সবচেয়ে আগে ওঠে, সেটা জ্বলজ্বল করছে। আকাশে আরও কত তারা। বাঘেদের ভাষা নেই মানুষের মতো। বাঘেদের ভাবনাগুলি তাদের মৃত্যুর সঙ্গেই গলে পচে যায়। শকুনে শেয়ালে হায়নায় ছিঁড়ে খায়। মানুষ যা ভাবে, তা লিখে রেখে যেতে পারে। সেদিক দিয়ে মানুষরা খুবই ভাগ্যবান। বাঘেদের ভাষা নেই, সাহিত্য নেই ; তাই কৃত্তিকা, রোহিণী শতভিষা, স্বাতী, কারওই নাম জানে না তারা। কিন্তু চেনে তাদের। অন্ধকার রাতে পথভোলা বাঘেরাও তারাদেরই দিকে চেয়ে পথ চিনে নেয়।

লেখাপড়া শেখেনি বুড়হা-বাঘা। মনের ভাব প্রকাশ করে বাঘেরা, অঙ্গভঙ্গি করেই। চোখ দিয়ে। অথবা কয়েকটি মাত্র শব্দ করে। মানুষেরা অবশ্য বড্ড বেশিই কথা বলে। ভাষা আছে বলেই তা নষ্ট করা ঠিক নয়। এত কথা বলার প্রয়োজন বা কী ছিল ? তাই-ই বোধ হয় খুব কমই সময় পায় ওরা ভাবনার। না ভাবলে, যে-কোনও প্রাণীই বোধহয় বুদ্ধিতে খাটো হয়ে যায়। মানুষও।

বাঘা ভাবে। বাঘেরা রাতে এবং অনেক সময় দিনের পর দিন, মাসের পর

মাস চুপ করেই থাকে। চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে। আর ভাবে। শুধু ভাবেই। বাঘের মতো নীরব জানোয়ার, কম-কথা-বলা জানোয়ার বনে-পাহাড়ে খুব কমই আছে। অথচ সে সবসময়ই সক্রিয়। সবসময়ই কিছু-না-কিছু করছে। একমাত্র ঘুমুবার সময়টা ছাড়া, এই চুপচাপ বাঘেরা।

চারধার অন্ধকার হয়ে গেছে। নীচের জঙ্গল থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছে। পাহাড়ের নীচেই, তার যাতায়াতের পথের পাশে একটা মস্ত শিমুলগাছ আছে। তার জন্মের পর থেকেই সে দেখে আসছে এই গাছটাকে। যদিও ছোটবেলায় বুড়হা-বাঘা এই গুহাতে থাকত না। থাকত, বান্জার নদীর ওপারের অন্য একটি গুহাতে। সেই গুহাটিরই কাছে, বছর পনেরো আগে সাদা মানুষদের ছুলোয়া শিকারে তার মা আর তার বোন মারা পড়ে। একই সঙ্গে। এক শীতের সকালে। কড়াকড় করে বাজ পড়ার মতো শব্দ হয়েছিল কয়েকটা। নদীর একটা সোঁতার মধ্যে গা-ডুবিয়ে দূর থেকে বুড়হা-বাঘা দেখেছিল যে, যন্ত্রণায় কাত্রাতে কাত্রাতে তার মা স্থির হয়ে গেল। রক্তে লাল হয়ে গেল জায়গাটা। ঘন লাল রক্তে ভিজে গেল বোপঝাড়ের গাঢ় সবুজ।

অনেকেই জানোয়ারের রক্ত খেয়েছে বুড়হা-বাঘা। আজ অবধি। শুধু বাঘেরই রক্ত খায়নি কখনও। যদি কাছাকাছি থাকত তখন, হয়তো খেয়ে দেখত ও। বোনটা নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারেনি। ঘাড়ে গুলি লেগেছিল তার। চিত হয়ে স্থির হয়ে শুয়ে ছিল দু'পা উপরে তুলে একটা গিলিরি ফুলের ঝোপের পাশে।

দুঃখ হয়নি বাঘটার একটুও। ভয় হয়েছিল। ভয়ের মুখে, দুঃখ-টুঃখ সব ঝড়ের মুখে ঝরাপাতার মতোই উড়ে যায়। বিলাসী মানুষের মতো দুঃখ-দুঃখ নেইও বাঘেদের। ভয় আছে। রাগ আছে। আর আনন্দও আছে। খিদে-তৃষ্ণা আছে সব রকমেরই। মান-অভিমান, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, উচ্চাশা, হতাশা, ঈর্ষা, এসব ফালতু ব্যাপার। দু'পেয়ে মানুষদেরই ব্যাপার। বাঘেদের কিছুমাত্রই নেই ওসব বাড়তি বোধ।

বড় নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ওদের।

সেই দুর্ঘটনার পরেই, একা, জোয়ান, প্রকাণ্ড বাঘটা পালিয়ে চলে এসেছিল এই গুহাতে। এই গুহাতেই বুড়ো হল জোয়ান। সব জোয়ানই বুড়ো হয় একদিন। এই গুহাটা সত্যিই খুব দুর্গম। মাত্র একদিক দিয়েই পৌঁছনো যায় এখানে। অন্য তিন দিকেই দুর্ভেদ্য ন্যাড়া পাহাড়। যেদিক দিয়ে আসা যায়, সেদিক দিয়েও কোনও শিকারি উঠে আসার অনেক আগে তার শব্দ পাওয়া যাবে। কোনও শিকারিই অবশ্য আজ অবধি আসেনি এখানে। এলে, সে বুড়ো বাঘার এগারো নম্বর হত। গত বছর, গরমের এক রাতে অন্য এলাকার একটা বাঘ এসেছিল। সমস্ত রাত এবং পরের দিন সকাল দশটা অবধি দুজনের লড়াই চলেছিল। লড়াই করতে করতে পাহাড়ে গড়িয়ে গেছিল তারা। গাছপালা,

ঘাস-পাথর সব নড়ে গেছিল। দেওতা ঘামসেনবাওয়ার ঘুম ভেঙে গেছিল। লড়াই শেষ হলে, বুড়হা-বাঘা মরা-বাঘটাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গার একটা খাঁজ থেকে নীচের উপত্যকায়। যেখানে, সাদা-দাড়ি শিকারি তার সাদা তাঁবুর সামনে কালো রাতে বসে আছে এখন ; সাদা নদীর পাশে। বুড়ো-বাঘার খুব ভাল লেগেছিল।

বাঘেরা নামেই বুড়ো হয় ; আসলে নয়। সত্যি-সত্যি বুড়ো হাওয়ার আগেই মরে যায় তারা। বুড়োদের জায়গা নেই জঙ্গলে। তা ছাড়া দুটো বড় বাঘ কখনওই এক এলাকাতে থাকতে পারে না। বাঘেরা মানুষের মতো সামাজিক নয়। দুর্বল এবং প্রত্যাশী যারা, তাদেরই দরকার সমাজকে। বড় বাঘ সমাজের তোয়াক্কা করে না, ভীরু চিতল হরিণী বা ভিখিরি, পরনির্ভর, ইতর, স্বার্থান্বেষী মানুষের মতো।

এই বুড়ো শিকারির সঙ্গে বুড়হা-বাঘার ফয়সালা আছে। মানুষের মতো দু'পেয়ে জানোয়ারের এত দম্ভ সহ্য করা যায় না। কারও দম্ভই সহ্য করেনি বুড়হা-বাঘা।

গত আটদিন ধরেই বাঘটা লক্ষ করছে যে, বুড়ো-শিকারি তাকে ছায়ারই মতো অনুসরণ করছে। গতকাল গুহা-ফিরতি পথে সে শিকারির নরম জুতোর ছাপ দেখেছিল তারই পায়ের দাগের উপর। অনেকদূর অবধি সেই কারণেই শিকারিকে ছুপ্‌কি দেওয়ার জন্যে সে ইচ্ছে করেই বান্‌জারের জলে নেমে গেছিল। যেন, পায়ের ভাঞ্জ্ দেখে শিকারির মনে হয়, নদী পেরিয়ে ওপারেই চলে গেছে বুড়হা-বাঘা। তারপর নদীর জলের মধ্যে দিয়ে, তার বুক-অবধি ভিজিয়ে, হি-হি শীতের রাতে আধ মাইলটাক্ উল্টোদিকে গিয়ে অনেক চোরাপথে চড়াই ভেঙে ফিকে এসেছিল নিজের গুহার দিকে। গুহার হদিস যদি এই বুড়ো শিকারি জেনে যায়, তাহলে বুড়হা-বাঘার বিপদ আছে।

এ-কথা না-বোঝার মতো বোকা সে নয়।

দশ-দশটা শিকারি মানুষকে টুঁটি কামড়ে মেরেছে বুড়হা-বাঘা। রাগেই। যদিও খায়নি কাউকেই। মানুষের অমন নরম প্যাত্‌পেতে নোন্‌তা মাংস খাওয়া না-খাওয়া সমান। আধঘন্টা পরই হয়তো খিদে পেয়ে যাবে। যা তার খাদ্য নয়, তা সে খেতেই বা যাবে কেন ? বাঘেদের দেওতা ঘামসেনবাওয়া, বাঘেরা কী খাবে আর খাবে না তা ঠিক করে দিয়েছেন।

বুড়হা-বাঘার মন ভাল নেই।

ওই সাদা-দাড়ি শিকারি যে কী চায় ! কেন যে সে তার পিছু নিয়েছে এমন নাছোড়বান্দার মতো, তা কিছুতেই বুড়হা-বাঘা বুঝে উঠতে পারছে না।

সে অনেকবারই মানুষের হাতে গুলি খেয়ে মরতে মরতে বেঁচে গেছে। মা, বোন এবং তার দু'বউকেও সে তার গায়ের পাশে একেবারে দাঁড়ানো অবস্থাতেই গুলি খেয়ে মরতে দেখেছে। তাদের রক্তের রঙ এখনও চোখ থেকে মোছেনি

বুড়হা-বাঘার। কুটিল ভীরু মানুষের হাতে সরল সাহসী বাঘেদের মৃত্যু বুড়হা-বাঘার কাছে নতুন কিছু নয়। অবশ্য বদলা হিসেবে, তিনজন শিকারি মানুষকেও সে তার দিকে গুলি ছোঁড়ার পরেই মাচা থেকে নামিয়ে ফেলে, শেয়াল যেমন করে বর্ষাকালের পাড়হেন মাছের মাথা চিবোয় তেমনি করে চিবিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আরও পাঁচজনকে মেরেছে ছুলোয়া শিকারের সময় মাটিতেই। তাকে মারতে এসে তারা ফওত্ হয়েছে। আরও দু'জন ঘোড়ায় চড়ে মারতে এসেছিল তাকে। তাদেরও। ভয় পেয়ে সওয়ারহীন ঘোড়া চিহাঁ-চিহাঁ করতে করতে ছুটে গেছে মুখে আতঙ্কের ফেনা তুলে।

তারপর থেকে মানুষকে সে এড়িয়েই চলে। মানুষের গোরু-মোষ-ঘোড়া কিছুই সে ধরে না আর। টোপ দিলেও না। ছাগল, কুকুর, এসব তো বড় বাঘের খাদ্যই নয়। ফিচেল্ চিতা-ফিতারা, শেয়াল-হায়েনারা, এসব ফিচ্‌লেমি করে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন জানোয়ারের মধ্যে বুড়হা-বাঘা খেতে ভালবাসত একমাত্র দিশি ঘোড়া আর গাধা। কিন্তু সেই সুস্বাদু, দিশি ঘোড়া-গাধার স্বাদও ইচ্ছে করেই ভুলে গেছে ওই ঝঞ্ঝাটিয়া মানুষদের এড়াবার জন্যে। কিন্তু তবুও এই সাদা-দাড়ি শিকারি কেন যে লেগেছে তার পিছনে ! বুড়হা-বাঘা তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না ; তার সব বুদ্ধি সামনের পায়ের দু'থাবাতে জড়ো করেও।

আজ রাতে তাঁবুর মধ্যে সামনের আগুন একটু নিভু-নিভু হলেই বুড়হা-বাঘা গুহা থেকে নেমে প্রথমে ওইদিকেই যাবে। কাল রাতে একটা বারাশিঙা মেরে আধখানা খেয়ে এসেছিল। সেইদিকেও যাবে। খুবই সাবধানে। যদি বারাশিঙার মড়িটা সাদা দাড়ির দলের কেউ দেখে ফেলে থাকে, তাহলে তারা বুড়হা-বাঘার জন্যে সেখানে ওৎ পেতে থাকতে পারে। তাই সরেজমিনে তদন্ত করতে আগে তাঁবুতে যাবে, তারপর খাওয়ার চিন্তা। আড়াল থেকে বুড়ো শিকারিকে দেখবে বুড়হা-বাঘা ভাল করে। অনেকক্ষণ ধরে। তবে, তাকে মারবে না চোরের মতো চুরি করে। শিকারি-মানুষকে মারতে হলে, সে নিজে শিকারি বলেই সামনাসামনি মারবে এবং যদি সে ক্ষতি করে কোনও, তবেই। বাঘে আর মানুষে তফাত আছে। বুড়ো-বাঘা, ল্যাংড়া খোঁড়া আদৌ নয়, অথবা শজারুর কাঁটার ঘায়ে ঘেয়ো বা মানুষের গুলি-খেয়ে কুঁকিয়ে-বেড়ানো লোম-ওঠা কোনও মানুষখেকো বাঘও সে নয়। বাঘেদের কুলাঙ্গার নয় সে। বড়-বাঘা বরং বাঘেদের গর্বই ! সব বাঘেরই ঠাকুর্দা সে। কারও কাছেই মাথা সে নোয়ায়নি। নোয়াবেও না কখনওই। না অন্য বাঘের কাছে, না অন্য কোনও জানোয়ারের কাছে ; বুড়হাদেব আর ঘামসেনবাওয়ার ধরতিতে সবচেয়ে ধূর্ত, নিকৃষ্ট, কিন্তু সবচেয়ে ক্ষমতাশালী জানোয়ার যে মানুষ, তার কাছেও মাথা সে নোয়ায়নি কখনও। মাথা নোয়াতে শেখায়নি বাঘের রক্ত। যে-বাঘ মাথা নুইয়ে বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকার জন্যে মাথা নোয়ায়, সে বাঘই নয়, বাঘের

মতো চেহারার অন্য কোনও নিকৃষ্ট জানোয়ার।

অথচ ওই সাদা-দাড়ি বুড়ো শিকারিও তো মানুষ। যারা চাকরির জন্যে, দু'মুঠো খেতে পাওয়ার জন্যে, নাম কেনার জন্যে, প্রাইজ পাওয়ার জন্যে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি তাদের মাথা এর পায়ে তার পায়ে নুইয়েই বাঁচে, সেই সব ধূর্ত বাঁদরের বংশধরেরা, ঋজু, বুড়হা-বাঘার চরিত্রর কতটুকু জানে ? এক কণাও জানে কি ?

এখন অন্ধকার। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। ভোঁর ঘাসের মাঠের মধ্যে দিয়ে বারাশিঙার দল রাত পেরিয়ে যাচ্ছে, হাঁটুতে ঝাঁকি তুলে তুলে, মানুষদের বিয়েবাড়ির সোনার বেনারসি-পরা, কোমরে রুপোর চাবির গোছা-ঝুলনো, পাঁয়জোর-পরা মেয়েদেরই মতো। নৈঃশব্দ্যের শব্দ যারা শুনতে পায়, শুধু তাদেরই কানে এই ঝুমঝুমি বাজে।

বান্‌জার নদীর ঠিক মধ্যিখানে, সাদা-দাড়ি শিকারির তাঁবুটা থেকে দু'আড়াই শো মিটার দূরে একটি আবর্ত-মতো আছে। জল সেখানে জোরে ধাক্কা খেয়েই উছলে ওঠে। অনন্তকাল থেকেই উছলে উঠছে, সমুদ্রের ঢেউ যেমন বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে চরকি-খাওয়া ঘোলের মতো। পাথরের মধ্যে মধ্যে জমে আছে আঁজলা আঁজলা নিশ্চল জল। গান্ধালা আর গাংগারিয়া ফুল ফুটে আছে সেই জলে। পাথরের খাঁজে খাঁজে। ফুলগুলোকে অন্ধকারে বোঝা যায় না। চাঁদ উঠলে তারা রুপোর ফুল হয়ে রূপের হাট মেলে বসে।

দিনের বেলা, নদীর উজানে তিন মাইল দূরের বাইগাদের গ্রাম রুজঝানি থেকে জঙ্গলের সুঁড়িপথে হেঁটে এসে একটি অথর্ব বুড়ো এবং তার শিশু নাতি ওই পাথরগুলোরই উপরে ছিপ ফেলে বসে থাকে সারাদিন। পৃথিবীর সব ঘুম চোখে নিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী বুড়ো শীতের সূর্যের দিকে কালকেউটের মতো চক্‌চকে সরু কোমর ফিরিয়ে ঝরনার মধ্যে ঝিমোয়। আর তখন মুখে দুধের-গন্ধ-ভরা তার ছোট্ট-নাতি ওম্-ধরা রোদে উবু হয়ে বসে নানারকম স্বপ্ন দেখে। মাছের স্বপ্ন। গানের স্বপ্ন। পরীর স্বপ্ন। যে-জীবন তার সামনে পড়ে আছে, বাঁকের ওপাশের অদেখা, অজানা নদীরই মতো ; সেই না-হাঁটা, না-দেখা জীবনের স্বপ্ন। যে-জীবনে সেই শিশু একদিন বয়ে যাবে এই চল্‌কে-চলা বান্‌জার নদীরই মতো, যৌবনে পৌঁছে।

বেচ্চারি ! ছোট্ট ছেলে তো ! জানে না তাই যে, নদীরই মতো বয়ে যেতে যেতে, জীবনের বেগ বাড়তে বাড়তে, একসময় নিজের আর কোনওই জারিজুরি খাটবে না নিজের জীবনেরই উপরে। জীবনের ভারে চাপা পড়ে গিয়ে হয়তো ভেসেই যাবে স্রোতের শিকড়-আলগা-হওয়া গান্ধালা ফুলেরই মতো। বেশির ভাগ মানুষই যেমন ভাসে।

তার দাদুর সব স্বপ্নই দেখা শেষ হয়ে গেছে এ-জন্মের মতো। সে কুঁজো

হয়ে বসে, জীবন আর মৃত্যুর মোহানার কাছে পৌঁছে মনে-মনে পেছন ফিরে চেয়ে এখন শুধুই ভাবে। ভাবে, ভাবে আর ভাবে। বুড়ো, অকেজো ষাঁড় যেমন করে গলকম্বলের নীচে অনেক খড়কুটোর মতো পৃথিবীর সমস্তটুকু সময় গলার মধ্যে ভরে নিয়ে জাবর কাটে ; তেমনি করে।

যে-জায়গায় বুড়ো আর নাতি বসে মাছ ধরছে সে-জায়গা থেকে অনবরত উঠে-আসা জলের ছলছলানি অন্ধকার শীতের রাতের হিমেল স্তব্ধতাকে একটানা ছলাত ছলাত শব্দে স্তব্ধতর করে তুলছে। সমস্ত শব্দের মধ্যেই শব্দহীনতা ঘুমিয়ে থাকে। সমস্ত শব্দহীনতার মধ্যেও সজাগ থাকে শব্দ। নাতি জানে না। দাদু জানে।

বুড়হা-বাঘাটা বান্‌জার নদীর পারের আড়াল দিয়ে এগিয়ে আসছিল তাঁবুটার দিকে। তাঁবুর বাইরের আগুন নিভু-নিভু হয়ে এসেছে। আগুন যখন নিভে আসে, তখন সে নিজের সঙ্গে চাপা, ফিস্‌ফিসে গলায় কথা বলে। হাতেখড়ির আগুন, বিয়ের আগুন, চিতার আগুন, সব আগুনই। রাতের আগুন লাল নীল সবুজ কমলা হাসি হাসছিল। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছিল ফুট-ফাট করে।

বুড়ো শিকারি ক্যাম্প-খাটে পাশ ফিরে শুয়ে ছিল। গায়ের উপর জলপাই-রঙা কম্বল। তাঁবুর অন্য কোণে আরেকটি ক্যাম্পখাটে তুরু শুয়ে আছে বাস্তারের বাইসন-হর্ন মারিয়াদের হাতে-বোনা কম্বলে মাথা মুড়ে। তারার আলোতে, তাঁবুর পাশে একটা মস্ত কাস্‌সিগাছের নীচে দাঁড়-করিয়ে রাখা রায়পুরের নাম্বার-প্লেট লাগানো জিপটাকে একটা ভুতুড়ে ছোট্ট কুঁড়ে বলে মনে হচ্ছে। শিশিরে ভিজে সপ্‌সপে করছে জিপের বনেট। উইন্ডস্ক্রিনের উপর শিশিরের মেঘ জমেছে। বুড়ো শিকারির মাথার কাছে বাঁশ দিয়ে বানানো গান্-র‍্যাকে ফোর-সেভেন্টি ডাবল্-ব্যারেল জেফ্‌রি নাম্বার টু রাইফেল আর হল্যান্ড-অ্যান্ড-হল্যান্ডের ডাবল্-ব্যারেল্ টুয়েলভ-বোর শট্‌গানটা দাঁড় করানো আছে। তুরুর মাথার কাছেই তাঁবুর গায়ে হেলান-দেওয়ানো আছে পয়েন্ট টু টু ব্রুনো রাইফেল আর তুরুর একনলা বন্দুকটা।

রাবারের বালিশে মাথাটা কাত হয়ে রয়েছে বুড়ো শিকারির। তুরুর নাক এমনই ডাকছে যে, মনে হচ্ছে একটা ধাড়ি শুয়োরই বুঝি ঢুকে পড়েছে তাঁবুর মধ্যে।

বুড়ো শিকারিকে সকলেই খুব সুখী লোক বলে জানে। খুবই বড় চাকরি করত সে। বুড়োর একমাত্র সন্তান, ছেলে। সে অ্যামেরিকায় থাকে। অ্যামেরিকান মেয়ে বিয়ে করে অ্যামেরিকান সিটিজেন্‌শিপ্ নিয়ে নিয়েছে। এই পোড়া দেশে আর থাকবে না ঠিক করেছে। ফিজিসিস্ট্ সে। নিউক্লিয়ার বোমা বানাতে জানে। ধ্বংসবীজ বোনে। অনেক টাকা রোজগার করে। কালো ক্যাডিলাক গাড়ি আছে তার। নিজের বাগানওয়ালা বাড়ি। বউ কম্প্যুটার প্রোগ্রামার : মৃত্যু বোনে।

এখানে আর আসে তারা। ফিরবেও না বলেছে। বুড়োকে বড়দিন আর জন্মদিনে কার্ড পাঠায় কিন্তু কর্তব্য করে।

বুড়ো শিকারি চেয়েছিল, তার ছেলে দেশে ফিরে এসে এ দেশের ভাল করুক। তার বিদ্যাবুদ্ধি দেশের কাজে লাগাক। একটু না-হয় খারাপই থাকবে, খারাপই খাবে-পরবে, না-হয় দিশি গাড়িই চড়বে। কিন্তু হয়নি তা। মাঝে-মাঝেই ওখানে যাওয়ার জন্যে লেখে ছেলে-বউ। টিকিট কেটেও পাঠিয়ে দিতে চায়। তবুও বুড়ো যায় না। অদ্ভুত টেঁটিয়া বুড়ো একটা। অ্যামেরিকায় বারবার যাওয়ার সুযোগ থাকতেও যায় না। অন্য অনেক ফোরেন্-প্রেমী ভারতীয় মানুষ এ-কথা শুনে বুড়োকে পাগল বলে।

বুড়ো দশ বছর আগে একবার শুধু গেছিল। ছেলে-বউকে দেখে এসেছিল। তারপর যায়নি আর। যাবেও না।

ভাল লাগে না বুড়োর। এই দেশ গরিব কিন্তু বড় সুন্দর। যে দেশে এই বুড়ো শিকারির জন্ম, তার বাবা ও ঠাকুর্দার জন্ম, এই জঙ্গল-পাহাড়, নদী-নালা, এই বিরাট নানা-ভাষাভাষী, নানাজাতের, নানাপথের, নানামতের দেশকেই বুড়ো শিকারি তার সব কিছু বলে জানে। ভাবে, এই দেশেই তার জন্ম, যেন এই দেশেতেই সে মরে। দেশের মানুষরা যদি নিজের দেশ ছেড়ে ভাল খাওয়া, ভাল পরার জন্যে বিদেশেই চলে যায়, তাহলে দেশের কী হবে? যে-কোনও দেশের পরিচয় তো সে-দেশের মানুষদেরই দিয়ে!

বুড়ো শিকারির ভাল লাগে না। যারা দেশ ছেড়ে অভিমানে চলে যায়, তাদের অভিমানটা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতোই এক অভিমান। ভাবে, বুড়ো। কিন্তু ছেলে বোঝেনি। দেশের কথা দশের কথা বোঝে, ভাবে, এমন লোক এখন দেশে যে বেশি নেই। বড় অভাগা এই দেশ; ভারতবর্ষ।

বুড়ো শিকারির নিজের চলে-যাওয়ার মতো টাকা পয়সা আছে। নিজের বেঁচে থাকা, এমনকী ছোটখাটো শখের জন্যেও সে কারও দয়ার ওপর নির্ভর করে না। বুড়োর বন্ধু-টন্ধু বেশি নেই। যে-মানুষ গভীর, বোধহয় তার বন্ধুবান্ধব কখনও বেশি থাকে না। যে-পাখি আকাশে উঁচুতে ওড়ে, তাকে একা-একাই উড়তে হয়। অনেক বন্ধু থাকে শুধু চড়ুই, আর কাকেদেরই। খুব উঁচুতে কালো বিন্দুর মতো যাকে দেখা যায়, সেই বাজপাখিরই বন্ধু থাকে না কোনও।

বুড়োর স্ত্রীও নেই। মারা গেছেন বহুবছর আগে। তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এবং তার একমাত্র ভাইও তাকে খারাপ বাসে না। বুড়োর জীবনে কোনও অসুখ নেই, অভাই নেই, অনুযোগ নেই। সবকিছুই ঠিকঠাক চলে। সময়মতো চা, খবরের কাগজ, ভোপালের আহমেদ্‌নগরের পথে প্রাতঃভ্রমণ, গরম জলে চান, ব্রেকফাস্ট খাওয়া, ক্লাবের লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়া,

গান-বাজনা শোনা। তারই মতো বুড়ো-হয়ে-যাওয়া দু'একজন শিকারি-বন্ধুর সঙ্গে কখনও সখনও পুরনো দিনের শিকারের গল্প, জঙ্গলের গল্প করা; এই-ই। মানসম্মান, শখ, শান্তি কোনও কিছুরই ঘাটতি ছিল না বুড়োর জীবনে। তবুও এই সাদা-দাড়ির শিকারি যে কেন এই বয়সে একেবারে একা একাই এই বুড়হা-বাঘার মোকাবিলা করতে চায়, তার কারণটা কারও জানা নেই।

কারণটা, বুড়ো শিকারি শুধু নিজেই জানে। কিন্তু বলে না কাউকেই।

শিকারি-বন্ধুদের মধ্যে দুজন নামী শিকারি সাদা-দাড়ির সঙ্গে আসতেও চেয়েছিল। বুড়োর ছোট ভাই অনেক করে মানা করেছিল। বুড়োর শালা এবং এক শালিও অনেক অনুনয় বিনয় করেছিল। কারও কথাই শোনেনি একগুঁয়ে বুড়ো। হেসেছিল শুধু, আর ভুসস্ ভুসস্ করে পাইপের ধোঁয়া ছেড়েছিল।

শিকারি, সাদা-দাড়ি বুড়োটা চিরদিনই বুনো শুয়োরেরই মতো একগুঁয়ে।

"এখনও জঙ্গলে কেন যান দাদা? কী আছে সেখানে আপনার?"

ভাইয়ের স্ত্রী অনুযোগ করে জিজ্ঞেস করেছিল।

বুড়ো হেসে বলেছিল, "আছে, আছে। এখনও বাকি আছে কিছু। সব যে পাওয়া হয়নি, সব নেওয়া হয়নি এখনও। সব দেওয়াও হয়নি; যা দেওয়ার, জঙ্গলকে। বুঝেছ রানু?"

তার জানাশোনা সব শিকারিই যে বাঘকে মারতে গিয়ে নিজেরা মরেছে, নয় কোনওক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে আতঙ্কে শিকারই ছেড়ে দিয়েছে জন্মের মতো, বন্দুক-রাইফেল পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে দু-একজন; সেই সাংঘাতিক বাঘটার চেয়েও বোধহয় অনেক বড় কিছু মারতে এসেছে এবারে বুড়ো শিকারি, এই বান্‌জারের তীরের, বিন্ধ্য, সাতপুরা আর মাইকাল পর্বতশ্রেণীর পাহারা-ঘেরা গহন জঙ্গলে।

যা সে মারতে এসেছে, সেটা কী? সেটা ভূত? না কোনও অপদেবতা? নাকি ড্রাগন বা ডাইনোসারের মতোই কোনও প্রাগৈতিহাসিক জন্তু? সে সম্বন্ধে বুড়োর পরিচিতদের কারও কোনও স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণাও নেই। এমনিতে সকলেই জানে যে, বুড়ো-শিকারি বুড়হা-বাঘাকেই মারতে এসেছে। একটা আত্মম্ভরী, জেদি, গর্বিত, খ্যাপাটে বুড়ো। বড়ই বাড় বেড়েছে মানুষটার। বুড়হা-বাঘার হাতে তার মৃত্যু অবধারিত। তার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

বুড়োর ঘুমের মধ্যে, তার ঘুমন্ত মুখের আধফোটা হাসির মধ্যে, সেই না-বলা গোপন কথাটিই যেন দুলছে গাঢ় নিশ্বাসের সঙ্গে বান্‌জার নদীর বুকের মধ্যের আধো-ফোটা গান্ধালা ফুলেরই মতো।

সব বুড়োরাই বড় মিষ্টি হয়। শিশুদেরই মতো। বুড়োদের মুখেও দুধের গন্ধ থাকে।

মাঝরাতের গা-ছমছম জঙ্গলে বুড়হা-বাঘটা নদীর পাড় ছেড়ে ঘাসবনে নেমে

এল মাঘ মাসের শিশিরভেজা বরফের মতো মাটি আর ঘাসের গভীরে। মাটি আর ঘাসের সঙ্গে যেমন করে একমাত্র বাঘেরাই মিশে যেতে পারে, তেমন করেই সে মিশে গিয়ে বুকে হেঁটে-হেঁটে তাঁবুটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, অন্ধকারের বুকে অন্ধকারতর নিঃশব্দ এক দুঃস্বপ্নের মতো, থেমে থেমে; শামুকের চেয়েও আস্তে আস্তে। বুড়হা-বাঘার পেছনে, ফ্রিজ খুললে যেমন ঠাণ্ডা ধোঁয়া বেরোয়; তেমনই বরফের ধোঁয়া উঠছে শীতের রাতে প্রায়-জমে-যাওয়া বান্‌জারের স্লেট-রঙা জল থেকে।

নদী কথা বলছে রাতের বনের সঙ্গে, তারাদের সঙ্গে; যে-ভাষা শুধু নদী, বন আর তারারাই জানে।

তাঁবুর আর নদীর ঠিক মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে এবারে বুড়হা-বাঘা। নদীর এপারের জঙ্গলের গভীর থেকে কপার-স্মিথ পাখি ডাকছে। টাকু-টাকু-টাকু-টাকু-টাকু। তার দোসর সাড়া দিচ্ছে নদীর ওপার থেকে। হঠাৎই পঞ্চমীর চাঁদ উছলে উঠল সেগুনবনের মাথার উপর। হাতির কানের মতো বড় বড় শিশিরভেজা সেগুনপাতাদের উপর পড়ে, মাঘী-পঞ্চমীর চাঁদের আলো পিছলে যেতে লাগল। কোনও কালো কুচ্‌কুচ্‌ গোঁদ্‌ যুবকের হিমেল মৃতদেহেরই মতো রাতের শিশিরভেজা ভোঁর ঘাসের মাঠটিকে, ভেজা চাঁদের ঘোলা আলো মুহূর্তের মধ্যে কোরা কাপড়ে ঢেকে দিল যেন।

সেই শীতার্ত, ভিজে, পিছল রাতে ফিস্‌ফিস্‌ করে কারা যেন বলে উঠল: রাম নাম সত্‌ হ্যায়। রাম নাম সত্‌ হ্যায়!

থমকে থেমে গেল বুড়হা-বাঘা।

আলোতে মানুষের আনন্দ, বাঘের ভয়। কিছুক্ষণ মাটি কামড়ে পড়ে থাকল সে। মৃতের চেয়েও অনেক বেশি মৃতের মতো। বড় মিষ্টি এই মাটি। বুড়হা-বাঘার দেশের মাটি। ভারতবর্ষের মাটি। যে-মাটি, একদিন প্রাগৈতিহাসিক গোঁন্দদের রূপকথার পৃথিবীর জন্ম-ইতিহাসের দারুণ-বলশালী কচ্ছপ কিচুল্‌ রাজা বয়ে এনেছিল ইন্দ্রলোক থেকে। সাপেদের রাজা বুড়হা-নাঙ্গ আর তার বউ দুধ-নাঙ্গের রাজ্য ইন্দ্রলোক। সেখানে গিয়ে কিচুল রাজা সেখানের মাটি গিলে ফেলে লুকিয়ে তার পেটের মধ্যে করে বয়ে নিয়ে এসেছিল এই প্রস্তরময় পৃথিবীতে ফুল, ফল, শস্য ফলাবে বলে। পৃথিবীর আগের নাম ছিল সিঙ্গার দ্বীপ। তখনও নাঙ্গা-বাইগা আর নাঙ্গা-বাইগিন্‌কে তৈরি করেননি ভগবান, তাঁর গায়ের ময়লা দিয়ে। তৈরি করেননি বুড়হা দেবকে, উইক্কে, কুসরো, সাইআম্‌, ঘামসেনবাওয়া ইত্যাদি দেবতাদেরও। সেই সিঙ্গার দ্বীপ, অথবা ভারতবর্ষের মাটিতে নাক ছুঁইয়ে যুগ-যুগান্তরের গন্ধ নিচ্ছিল বুড়হা-বাঘা।

হঠাৎ-ওঠা চাঁদের আলোয় ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে পৃথিবীর সব শিকারির বড় শিকারি সাবধানী বুড়হা-বাঘা অনেকক্ষণ মাটি কামড়ে মরা মাঠের উপর মড়ারই মতো পড়ে থাকল। 'নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু' হয়ে। অন্ধকারে

অভ্যস্ত দুটি চোখকে চাঁদের আলো আস্তে আস্তে সইয়ে নিয়ে ভুতুড়ে রাতে একটা ভুতুড়ে প্রায়-নিশ্চল ছায়ারই মতো ভেজা ঘাসের মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগল সে। প্রায় পৌঁছেই গেছে এখন তাঁবুর কাছে।

সাদা তাঁবুর দরজাটা বন্ধ। চাঁদের আলোয় একটা সফেদ হাতির মতো দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুটা।

বুড়হা-বাঘা আস্তে আস্তে তাঁবুটার চারদিকে ঘুরতে লাগল। ভিজে ঘাসের বনে, বনের রাজা, সব বাঘের সেরা বাঘার পায়ে কোনওই আওয়াজ হল না। বোঝা পর্যন্ত গেল না যে বাঘ এল। একজন ভালমানুষের বুকের মধ্যে খারাপত্ব যেমন করে চলে আসে চোরের মতো চুপিসাড়ে, শীতের রাতের বুড়হা-বাঘা ঠিক তেমন করেই আসে।

দেখতে পেল যে, তাঁবুর একটামাত্র জানলার পর্দাটা খোলা। বুড়ো-শিকারির হাঁপানি আছে বলে চারদিক বন্ধ করে শুতে পারে না সে। তাই তার মাথার দিকের জানলাটির পর্দা নামানো নেই। বুড়হা-বাঘা ভাবল, এই অদ্ভুত শিকারিকে একবার কাছ থেকে ভাল করে দেখবে সে। কে এই শিকারি? কী সে চায়? বুড়হা-বাঘার পায়ে-পায়ে কী কারণে সে এমন করে ছায়ার মতো ঘোরে? কেন সে হাঁকোয়া বা ছুলোয়া করাল না একবারও? সবাই যা করে, তা কেন করতে চায় না সাদা-দাড়ি? এর রহস্যটা বোঝা দরকার।

বুড়হা-বাঘা জানলার কাছে পৌঁছবে ঠিক সেই সময়ই একটা কুট্‌রা হরিণ তাকে নদীর ওপারের ছিঁ ঘাসের উঁচু ডাঙা থেকে দেখতে পেয়েই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ব্বাক্‌ ব্বাক্‌ ব্বাক্‌ করে ডাকতে লাগল। তার ডাক শুনে হনুমানের দল হুপ-হুপ-হুপ্‌-হুপ্‌-হুপ্‌ করে ডালপালা ঝাঁকিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করে সমস্ত বনের প্রাণীদের চিৎকার করে জানিয়ে দিল বুড়হা-বাঘার অস্তিত্ব। তাঁবুর পেছনের সেগুনবন থেকে শম্বরের দল ঢাংক্‌ ঢাংক করে ডাকতে ডাকতে বনের বুকের আগাছা এবং ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়ে গেল চৈত্রমাসের ঝড়ের মতো। নিরাপদ আশ্রয়ে। টিটিপাখি ডাকতে লাগল হট্টিটি-হুট্‌-টি-টি-টি-হুট্‌-টিটিটি-হুট্‌।

হঠাৎ তাঁবুর দরজা খুলে বুড়ো শিকারি বেরিয়ে এল সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে। রাইফেল হাতে। তার সাদা দাড়ি, সাদা চুল, সাদা গোঁফ সেগুনবনের পাতায় পাতায় ক্রমশ-জোর-হওয়া চাঁদের আলোয় সুন্দর দেখাচ্ছিল। বুড়হা-বাঘাটার মনে হল, মানুষটা ভাল। সেও যেন ভাল বাঘ। তবে কেন সে তার পেছনে লেগেছে? কিসের শত্রুতা বুড়োর তার সঙ্গে? ভাল মানুষ আর ভাল বাঘের মধ্যে কোনও শত্রুতা থাকা তো উচিত নয়।

বুড়ো শিকারির হাতে বগু-এর পাঁচ-ব্যাটারির টর্চ। অ্যামেরিকা থেকে কিনে নিয়ে এসেছিল, বুড়ো যখন গেছিল ছেলে-বউয়ের কাছে। টর্চ ফেলল নদীর দিকে সে। বুড়হা-বাঘা ঘাসের মধ্যে ঘাস হয়ে মিশে রইল। দেখল তাঁবু থেকে একজন আদিবাসী ছেলে বেরিয়ে এল। আরও একটা টর্চ নিয়ে। কেন, বুঝল

না বুড়হা-বাঘা, ওরা দুজনেই বান্‌জার নদীর দিকে টর্চ ফেলতে লাগল। বোধহয় কুটরাটা ঐদিক থেকে ডেকেছিল বলেই।

বুড়হা-বাঘা চাপা হাসি হাসল একবার। শব্দ না-করে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে জিপের পেছনের কাস্‌সি গাছের ছায়ায় এবং তারও পেছনের সেগুনবনের গভীরে অনেকখানি ঢুকে গিয়ে চার পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, মুখ ঘুরিয়ে একবার ডাকল—হুঁ-য়া-উঁ-উঁ...।

সমস্ত জঙ্গল থরথর করে কেঁপে উঠল। মনে হল, কামান দাগল যেন কেউ। সেগুনবনের গাছেদের হাতির কানের মতো পাতায় পাতায় চমক লেগে রুপোচুর-এর মতো শিশির ঝরতে লাগল টুপটুপ করে। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সে-ডাকের প্রতিধ্বনি ফিরে এল নদী-নালার ঠাণ্ডা বুক ধরে, ছুটে গেল আঁক-বাঁক পেরিয়ে, উঠে গেল পাহাড়চুড়োর দিকে।

চমকে উঠল বুড়ো শিকারি। ভয় পেয়ে গেল তুরু।

"কথা তো শুনলে না। দ্যাখো এবার। যার খোঁজ করো তুমি, সেই-ই খোঁজ করছে তোমার।" বলেই, টর্চের আলো ফেলল তুরু, তাঁবুর চারপাশের ঘাস-নিড়োনো পরিষ্কার জায়গার নরম ভিজে মাটিতে। আতঙ্কিত গলায় বলল, "এইই দ্যাখো! সেইই নিজে এসেছিল তোমার খোঁজে। এত বড় বাঘের পায়ের ভাঞ্জ না কেউ আজ অবধি দেখেছে, না দেখবে কখনও ভবিষ্যতে। মধ্যপ্রদেশের কোনও জঙ্গলে, কান্‌হা-কিস্‌লি, সীওনী, পেঞ্চ, বান্ধবগড় কোনও জঙ্গলেই এত বড় বাঘ আর একটিও নেই। বাঘের পায়ের দাগ তো নয়, যেন হাতির পায়ের ছাপ!

তুমি কী খুঁজবে তাকে বাপ্পা! সে তোমাকেই শুনিয়ে দিয়ে গেল যে, তাকে খোঁজার দরকার নেই। সে নিজেই হাজির। সাবধান করে দিয়ে গেল।

বলে গেল, আমি আছি। আমি অমর। মানুষের কাছে **আমি হারিনি**। হারব না কখনওই। আমিও অজেয়।

"বাঃ।" বলল শিকারি-বুড়ো।

"বাঃ কী?" তুরু উত্তেজিত হয়ে বলল।

"বাঃ।"

আবারও বলল, বুড়ো শিকারি।

রোদ উঠে গেছে। কিন্তু মাঠ-প্রান্তর পাহাড়-জঙ্গল সবই ভেজা রয়েছে এখনও। রোদ পড়ে শিশিরভেজা পাতায় আর ভোঁর আর ছিঁর ঘাসের ফিকে হলুদ মাঠে, লান্টানার ফুলে, মাকড়সার জালে অসংখ্য হিরে ঝিক্‌মিকিয়ে উঠছে।

বুড়ো শিকারি হেঁটে যাচ্ছে সেগুনবন পেরিয়ে, বাঁশের বনের পাশ দিয়ে; দূরের শান্ত শিশিরভেজা গাঢ় সবুজ শাল-জঙ্গলের দিকে।

তাঁবু থেকে অনেকই দূরে চলে এসেছে সে, ছোট ছোট সাবধানী পা ফেলে ফেলে বুড়হা-বাঘার পায়ের দাগ খুঁজে খুঁজে। বুড়োরাও শিশুর মতোই হাঁটে, অনিশ্চিত টালমাটাল পায়ে।

অনেক দূ-রে, ডানদিকে দেখা যাচ্ছে মুক্কি গ্রামটা। একটা ছোট্ট গ্রাম, বান্‌জারের তীরে। নদীর অন্য পারে আছে আরও একটি গ্রাম। যদিও অনেকখানি ভিতরে। সে-গ্রামের নাম বান্‌জার-বাম্‌নি। তা ছাড়াও আছে রুঝঝানি। কোনও কোনও রাতে বান্‌জার-বাম্‌নি থেকে ভেসে আসে মাদলের শব্দ আর মেয়ে-পুরুষের গলার ঘুমপাড়ানি গান। কার্মা নাচের গান। বুড়ো, সাদা-দাড়ি শিকারির হাড়ে হাড়ে ভোরে শিশির ভেজা এই প্রকৃতি, এই রোদ, এই নদী, সবই গেঁথে রয়েছে। সেঁধিয়ে গেছে তার মজ্জার মধ্যে এই দেশ। এই দেশের গ্রীষ্ম, এর শীত, বর্ষা এবং বসন্ত। তার কান ভরে রয়েছে এদেশের নদী-নালার ঝরঝরানি গানে, ঝরাপাতার মর্মরধ্বনিতে, মৌটুসিপাখির ফিস্‌ফিসে সুরে, বড় বাঘেদের বন পাহাড় গম্‌গমানো পুরুষালি ডাকে। এই দেশের বন-জঙ্গলের দিন ও রাতের সমস্ত স্পষ্ট ও অস্পষ্ট শব্দে। নাক ভরে রয়েছে চিতল হরিণের নীল গাইয়ের আর বসন্তবৌরি পাখির গায়ের গন্ধে।

কোনওই দুঃখ নেই বুড়োর। অনুযোগ, অভিযোগ, আক্ষেপও নেই। তবুও এই হেঁয়ালিভরা বুড়ো হেঁটে চলেছে হেঁয়ালির মতো আঁকাবাঁকা সুঁড়িপথ বেয়ে। কাঁধের স্লিপিং-এ ভারী দোনলা রাইফেলটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে, সামনে একটু ঝুঁকে, দুঃখ-সুখের বাঁচা-মরার শেষ দেখার জন্যে চলেছে সে। পিঠে তার ছোট্ট একটি র‍্যাক্-স্যাক্। জলপাই-সবুজ। তার মধ্যে জলের বোতল আর কিছু চিঁড়ে আর গুড়। পাইপের তামাকের টিন। পাইপ পরিষ্কার করার জিনিস। একটি টর্চ। আর তার প্রিয় কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের বই লীভস্ অফ্ গ্রাস'।

সকালবেলার বনের পটভূমিতে মাঝে-মাঝে সে হারিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে মুছে যাচ্ছে; যেমন করে খয়েরি ডানার চিল মুছে যায় ঝড়ের আগের খয়েরি মেঘে।

তুরু চলেছে তার পেছন পেছন। বিরক্ত মুখে। চিন্তিত মনে। যতক্ষণ না বারণ করবে বুড়ো, ততক্ষণ সে যাবেই। তুরুর হাতে বুড়োর দোনলা বন্দুকটি। ফেরার সময় অথবা এখনই যদি কায়দামতো পায়, তবে একটি নধর অল্পবয়সী চিতল বা নদ্‌নদে শুয়োর ধড়কে দেবে তুরু। নয়তো কুট্‌রা বা চিংকারা বা কৃষ্ণসার। রাতে ঝল্‌সাবে, মোষের ঘি. ঢেলে-ঢেলে; তাঁবুর সামনের আমকাঠের আগুনে। মাংস না খেলে গায়ে জোস্ত হয় না। বুড়ো কিছুই খায়ই না বলতে গেলে, তবুও এই বুড়োর পাল্লায় পড়ে জোয়ান তুরুও হাঁফিয়ে উঠেছে। ভেলকি জানে এই হেঁচকি-তোলা বুড়ো। জোয়ান তুরুর আগে আগে যেন বার্ধক্যর ভাঙা ঘর থেকে বেরিয়ে যৌবনের নতুন চক্‌চকে বাড়ির দিকে নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে বুড়ো।

আধঘন্টা পর ওরা দুজনেই ঝুঁকে পড়ে দেখল যে, কাল রাতের বুড়হা-বাঘার পায়ের দাগ মুক্কি গ্রামের দিকের পায়ে-চলা পথ ধরেই এগিয়ে গেছে। বনের ধারেই, তার মাটির ঘরের সামনেই, তামাক পাতার গাছ লাগিয়েছে বেড়া দিয়ে ঘিরে একজন গরিব গোঁন্দ। শীতের রোদ পড়ে সতেজ হল্‌দে-সবুজ বড় বড় গোল গোল তামাক পাতাগুলোকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে দূর থেকে। মোষের পিঠে চড়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে দুলে দুলে চলেছে একটি বাইগা কিশোর। জঙ্গলের গভীরে। তার মাথার উপর দিয়ে, শীতের সকালের হিমেল আড়ষ্টভাবে হঠাৎ চমকে দিয়ে চলে যাচ্ছে একঝাঁক টিয়া নীল আকাশে মুঠো মুঠো সবুজ আবির ছুঁড়ে দিয়ে।

পথটার কাছে এসে, সাদা-দাড়ির বুড়ো শিকারি থামল।

একটা খুব পুরনো শিমুলগাছের নীচের বড় সাদা পাথরে বসে, রাইফেলটা নামিয়ে রাখল পাশে বুড়ো শিকারি।

বাঁচা গেল।

ভাবল তুরু।

তুরু বলল, "খাবে নাকি একটু ? কফি ?"

"দে," বুড়ো বলল, পাইপটা খোঁচাতে খোঁচাতে। "এবার তুই তোর পথে যা। আমি যাব আমার পথে।"

বিরক্ত গলায়, থার্মোসের কাপে কফি ঢালতে ঢালতে তুরু বলল, "ঠিক আছে। তবে তুমি যে-পথে যাও সে পথে কি যেতে মানা ?"

"মানা নেই কোনও। তবে প্রত্যেকেরই পথ আলাদা আলাদা।"

"বনের মধ্যে যখন অনেকগুলো পায়ে-চলা-পথ একসঙ্গে এসে মেলে, তখন পথ চিনতে ভুল হয় না তোমার বাপ্পা ?"

"হয়। সেই জন্যেই তো ঘুরে মরা। জীবনভর। যে পথ চিনেছে, সে সে তো গন্তব্যেই পৌঁছে গেছে রে তুরু। তার আর চিন্তা কী ?"

"এই শিমুলটাতে অনেক ফুল হয় গরমের সময়।"

একটুখন চুপচাপ দুজনেই।

একসময় বুড়ো-শিকারি নিজের মনেই বলল, "তাই ?"

"হ্যাঁ।"

"তোর বাবা এই শিমুলের নীচে প্রায়ই কুটরা হরিণ মারত। শিমুলের ফুল খেতে খুব ভালবাসে তো কুটরারা।"

"জানি।" তুরু বলল।

তারপর উপরে চেয়েই বলল, "ওই দ্যাখো।"

বুড়ো শিকারিও উপরে চাইল। দেখল, একটা বুড়ো বাজ একেবারে মগডালে রোদের রঙিন বালাপোশে ডানা মেলে বসে আছে।

তুরু বলল,"বুড়ো বাজ।"

"হুঁ।"

"বুড়োদের শীত বেশি ? না ?"

"হুঁ।"

"তোমার ?"

"হুঁ।"

"তুমি একটা অদ্ভুত বুড়ো। সব বুড়োরা শুধু ভাবেই। বেশি ভাবলে, কাজ করা যায় না কোনও। ঠিক না, বাপ্পা ?"

"হুঁ।"

"তুমি বুড়ো হয়েও এমন কেন ? জোয়ানের মতো ? যাকে যেমন মানায় তেমনই হওয়া উচিত।"

"আমি আমারই মতো। আমি ঠিকই মানিয়ে যাই আমাতে।"

"জানি না। কী তুমি চাও বাপ্পা ?"

"সে তুই বুঝবি না।"

"কেন ? আমি কি বোকা ?"

"বোকা-চালাকের ব্যাপার নয় এটা।"

"তবে ?"

"এটা একটা অন্য ব্যাপার। বলেইছি তো। অন্য ব্যাপার। কিছু কিছু ব্যাপার থাকে তা পৃথিবীর সব চালাকি দিয়েও ছোঁওয়া যায় না, বুঝবি না তুই।"

"কী তুমি খুঁজছ বাপ্পা ? এমন পাগলের মতো করছ কেন ? বাঘ শিকার কি আমিও করিনি, না দেখিনি ? আমিও আমার বাবার আমল থেকেই... এ তোমার কী হর্‌কত্ ? আসলে, তুমি বাঘ শিকারে আসোনি। এসেছ, অন্য কিছু শিকার করতে।"

"হবে। কী জানি !"

বিড়বিড় করে বলল বুড়ো দূরে তাকিয়ে।

"আজই তুমি মুখ ফুটে বলো তো ভাল করে হাঁকোয়ার বন্দোবস্ত করি। বুড়হা-বাঘা ওই বড় পাহাড়টাতে থাকে যে, তা সকলেই জানে। তবে, ঠিক কোথায় যে থাকে তা কেউই জানে না। কেউ কখনও জানতে যায়ওনি। সকলকে তো আর তোমার মতো সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় না !"

"সেই তো ! ভাসা-ভাসা জানা সকলেই জানে। তলায় যায়নি কেউই। বাঘটা কোথায় থাকে সেটাই আমি সঠিক জানতে চাই। কোনও কিছুই ভাসা-ভাসা জানা আমি পছন্দ করি না। আমি ভাসমান মানুষ নই। ভেসে থাকার মধ্যে কষ্ট নেই কোনও।"

"কিন্তু তোমাকে বলছি বাপ্পা, বাঘটাকে তুমি মারতে পারবে না। শুধু দম্ভ দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। যোগ্যতা লাগে।"

"জানি।"

"সে কী ? জানো ? তবু... ?"

"হুঁ। মানুষের মতো মানুষ যারা, তাদের কিছু দম্ভ থাকেই। বাঘের মতো যে বাঘ, তারও থাকে।"

"তাহলে ? করাব হাঁকোয়া ?"

"হাঁকোয়া করাবি কী করে ? দশজন শিকারিকে মেরে বাঘটা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে সকলেরই শিরদাঁড়ায়। হাঁকোয়া করে বাঘকে বের করা সোজা। কিন্তু ভয়কে কি পারবি হাঁকোয়া করে মানুষগুলোর বুকের মধ্যে থেকে টেনে বের করতে ? রাজিই হবে না ওরা। ভয়ও রাজি হবে না। ভয় নিজেও কম ভিতু নয়।"

"সে-ভার আমার। এবার বুঝেছি, তুমি কী চাও। বুড়হা-বাঘা যেসব মানুষকে ভয় পাইয়ে এত বছর জুজু করে রেখেছে, সে ভয়টাকেই তুমি মারতে চাও, ভাঙতে চাও, তাই না ?"

"না।"

"তাও না ! তবে ?"

"তুই বুঝবি না।"

"কী খুঁজতে পারো তুমি আর ? বুড়হা-বাঘা তো কাল রাতে নিজে এসেই জানিয়ে গেল যে, সে আছে। এবং বনের রাজা হয়েই আছে। এবং থাকবেও। আরও কী খোঁজার আছে ?"

"আছে। নে, কাপ্টা ধর তুরু। তুই বড়ই বেশি কথা বলিস। বনের মধ্যে এত কথা বলতে নেই। বনের পরিবেশ তাতে নোংরা হয়ে যায়। যা এবার। ফিরে যা তুই। এবার আমি একা এগোব। আসলে একা সবাই-ই।...একা একাই..."

"রাতে কী খাবে ? শুয়োর না চিতল না চিংকারা ?"

"অনেক খেয়েছি রে তুরু এ জীবনে। অনেকই রকম খাবার। খাওয়ার সাধ আর নেই।"

শিকারি বুড়ো পাইপটা পরিষ্কার করে, তামাক ভরল নতুন করে। তারপর আগুন ধরাল পাইপে, লাইটার দিয়ে।

তুরু হাত পাতল।

বুড়ো তামাকের টিন খুলে কিছুটা সুগন্ধি তামাক দিল ডান হাতের খোলা পাতায়। তামাকটুকু নিয়ে খৈনির মতো মারতে লাগল তুরু, বাঁ হাতের তেলোতে রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে।

বুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে রাইফেলটাকে কাঁধে তুলে নিল। মাথার টুপিটা খুলে রাক্স্যাকে রাখল।

বলল, "চলি রে।"

"ফিরবে কখন বাপ্পা ?"

শিকারি আকাশের দিকে তাকাল। বলল, "দেখি...সন্ধের মুখেই ফিরব। আশা করি। যদি সন্ধে লাগার পরও না ফিরি...সন্ধের আগেই ফিরে না আসতে পারলে ফেরা মুশকিল..."

"খুঁজতে যাব তোমাকে ? যদি না ফেরো ?"

"একদম্ না। যারা না-ফেরে, তাদের খোঁজা বৃথা।"

"আমি যাবই। তুমি পাগল বলে তো আর আমি নই।"

"গেলে, একেবারে পরদিন ভোরে যাবি। অন্ধকারে একদমই না। তোর মাকে আমি কথা দিয়ে এসেছি যে, তোকে তার কাছে ফিরিয়ে দেব।"

"হুঁ ! যেন কচি-খোকা আমি। ফিরিয়ে দেব !"

"যা বলছি, তাই-ই করবি।"

"গুলির শব্দ যদি পাই, তা হলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যাব আমি। ওই পাহাড়ে ফোর্-সেভেন্টি রাইফেলের গুলি হলে তার শব্দ এখানে ঠিকই পৌঁছবে।"

"একদমই না। বলেছি, না। না, তো নাই-ই। মনে থাকে যেন !

"তাহলে আমাকে আনলে কেন ? তোমাকে রান্না করে খাওয়ার বলে ? আমি কি তোমার রাঁধুনি, না বেয়ারা ? আমিও তো শিকারি একজন। তোমার গুমোর আছে, আমার নেই ?"

অভিমানের গলায় বলল তুরু।

বুড়ো তুরুর কাঁধে হাত রেখে বলল, "নিশ্চয়ই।" তোর মতো ভাল শিকারি ক'জন আছে ? তা ছাড়া, যে-মানুষের গুমোর নেই, সে তো...। কিন্তু তুরু, এটা শিকারের ব্যাপারই যে নয় !"

"তুমি পুরোপুরিই পাগল হয়ে গেছ বাপ্পা। এটা শিকারের ব্যাপার নয় তো কিসের ব্যাপার ? অবাক করলে তুমি !"

"এটা অন্য ব্যাপার। বলেছি তো।"

"এবারে বুঝেছি। সাহসের ব্যাপার ? তা, আমার বুঝি সাহস নেই ? সব সাহস বুঝি তোমার একারই ? আমার বাবা মরেছে বাইসনের পায়ে আর শিং-এ। দশ বছর বয়স থেকে আমিও শিকার করছি বাপ্পা। অন্যকে এত ফালতু ভাবা তোমার উচিত নয়। তুমি মনে করো, তুমি একাই ভীষণ সাহসী !"

'তুত্ তুত্' করে জিভ দিয়ে একরকম বিরক্তিসূচক শব্দ করল বুড়ো। কী বলল, তা শোনা গেল না ভাল করে।

তারপর বলল, "বড়ই বিপদে ফেললি তুই। কী যে বলি তোকে ! মিছিমিছি তুই..."

বলেই বলল, "বাঘ মারাতে কোনওই বাহাদুরি নেই। সে তো ফালতু শরীরের সাহস রে। শরীরের সাহস হচ্ছে সবচেয়ে কম দামি সাহস। ওটা কোনও সাহস নয়। বুঝলি ?"

তুরু বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকল বুড়োর দিকে অনেকক্ষণ।

বিড়বিড় করে বলল, "আজই তোমার শেষদিন। কালকে তোমাকে আমি জোর করেই ফিরিয়ে নিয়ে যাব ভোপালে। তোমার চিকিৎসার দরকার। আর যদি না যাও তাহলে মুক্কি আর বানজার বামনির পাহানদেরও ডেকে নিয়ে আসব। দেখি, তুমি কেমন না ফিরে চলো। গাওয়ান্‌দেরও বল্‌ছি আমি গিয়ে।"

"ঠিক আছে রে, ঠিক আছে। কালকের কথা কালকে। আজ তো যেতে দে।"

"শেষবার বলো বাপ্পা। আমাকে নেবে কি নেবে না?"

"না। তুই যা। এগোচ্ছি আমি তাহলে। দেরি হয়ে গেল। লক্ষ্মীছেলে হয়ে থাকিস কিন্তু। রাগ করিস না বুড়োর উপরে। আমি তোর মরে-যাওয়া বাবার চেয়েও অনেক বেশি বুড়ো রে। বুড়ো বাপের উপর কোনও ছেলে রাগ করে? তোর মতো ভাল ছেলে?"

তবুও, তুরু ফিরে গেল না। বন্দুক কাঁধে, বনপথেই দু'পা ফাঁক করে টেঁটিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। বুড়ো যে পথে যাবে, সেই পথের দিকে চেয়ে।

সাদা-দাড়ি শিকারি রাইফেলটার ভারে সামনে একটুখানি কুঁজো হয়ে খুব আস্তে-আস্তে হেঁটে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে সুঁড়িপথের বাঁকে মিলিয়ে গেল বুড়ো। জঙ্গল গিলে নিল জংলিকে।

তুরু, মুক্কির দিকে পা বাড়াল। চাল, ডাল, তেল-মশলা, লঙ্কা, পেঁয়াজ যে-সবের জন্যে তুরুর মতো সাধারণ মানুষের সব খাটাখাটনি, যে-সবের জন্যে ঝগড়া মারামারি স্ট্রাইক লক্-আউট; যা-কিছু খেয়ে সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকে; সেই সব জিনিসেরই খোঁজে। তুরু একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। সাদা-দাড়ি বুড়ো শিকারির মতো পাগল তো নয়।

বনপথটি সেই উঁচু পাহাড়টির মধ্যে এমন করে সেঁধিয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে মৃত্যুর মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে জীবন, অথবা জীবনের মধ্যে মৃত্যু।

বুড়ো ভাবতে-ভাবতে চলেছে, মানুষ কী নিয়ে বাঁচে? কেন বেঁচে থাকে মানুষ? শুধু কি রোজগার করারই জন্যে? শুধুই কি চাল, ডাল, তেল মশলারই জন্যে? মানুষ হয়ে জন্মানো কি শুধু এইটুকুরই জন্যে?

বাঘেরা রাতে জাগে দিনে ঘুমোয়। বুড়হা-বাঘার ঘুম আসছিল না। যদিও কাল সারারাত রোঁদে ছিল সে। এইক্ষণে গুহার মুখটিতে গাঢ় ঘুমেই শুয়ে থাকার কথা ছিল। শরীরের আধখানাতে রোদ এসে পড়ার কথা ছিল। মুখটিকে ছায়ায় রেখে শরীরটিকে রোদে টানটান করে শুয়ে থাকারই কথা ছিল এখন।

কিন্তু...নীল আকাশের অনেক উঁচুতে ঘুরে ঘুরে উড়ে-বেড়ানো একা

বাজপাখিটা রোজই এই সময় তার তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে পায় যে ঘুমন্ত ডোরাকাটা বাঘের সাদা তুলোর নরম লোমে-ভরা পেটটা উঠছে আর নামছে। কিন্তু আজ সকালে বাঘটা জেগে আছে। সামনের দুটি থাবায় মাথা রেখে সামনে চোখ মেলে চেয়ে আছে। বুড়হা বাঘাটার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলেছে যে, আজ সকালে কিছু একটা ঘটবে। অনেক রোদ-ঝলমল্ শীত-সকালে আরামে ঘুমিয়েছে বাঘা। আজ সকাল, জেগে থাকার সকাল।

ছেলেটা বড় বোকা। এমন দেশ ছেড়ে চলে গেল একটু ভাল খাওয়া, ভাল থাকা, একটু ভাল পরার জন্যে। খাওয়া-পরাই কি সব মানুষের?

শিকারি হাঁটছিল। শীতের সকালের রোদেরও এক আলাদা গন্ধ আছে। যে-রোদে প্রজাপতি আর কাঁচপোকারা ওড়ে, যে-রোদে বন-বনানীর শিশিরভেজা মাকড়সার জালে জালে কুবের রাজার হিরে-মানিক ঝল্‌মলিয়ে ওঠে। ভিজে মাটির হিমেল গন্ধে নাক ভরে যাচ্ছে বুড়োর। পুটুস আর পাঁচমিশেলি বুনো ফুলের গন্ধে। তার পাইপের তামাকের গন্ধের সঙ্গে সেই গন্ধ মিশে যাচ্ছে।

ভারী পরিপূর্ণ, ভরন্ত একটি সকাল, প্রত্যাশাতে ভরা। মনে মনে বলল বুড়ো শিকারি।

বুড়ো কোনও দিনও কোনও পরীক্ষাতেই প্রথম হতে পারেনি। না স্কুল-কলেজের পরীক্ষাতে, না জীবনের পরীক্ষাতে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ হয়েই কাটিয়ে দিয়েছে জীবন। তার জীবনের এই গভীর গ্লানি ও লজ্জা থেকে নিজেকে সে মুক্ত করবে আজ। প্রথম না হলে, প্রথম হয়ে বাঁচতে না পারলে, বাঁচার কোনওই মানে নেই। জীবনে পারেনি, পারল না; তাই-ই প্রয়োজনে মৃত্যুতেই সেই গ্লানি থেকে বাঁচাবে আজ নিজেকে। বুড়হা-বাঘাকে মেরে, প্রথম হবে। বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়াতে যায় আসে না কিছুমাত্রই, যদি না মানুষের মতো মানুষ না হল, প্রথম-হওয়া মানুষের মতোই না বাঁচল অথবা না মরল।

চঞ্চল সাত-বোন পাখিরা শোরগোল তুলেছে শীতের আড়ষ্ট ঝোপে-ঝাড়ে। নড়ছে চড়ছে। কুঁদুলে বোনেদের মতো সরে সরে বসছে এ ওর গায়ে। শিশিরভেজা ডানা সপ্‌সপ্ করে ময়ূর উঠল জংলি সাঁওয়া ধানের খেত থেকে উড়ে। বনমোরগের ঘন লাল আর হলুদ ডানায় রোদকণা ছিট্‌কে গেল। পথের ডানদিকের বাইসন-চরুয়া মাঠে ধীর পায়ে চরে-বেড়ানো একদল বাইসনের মধ্যে একটি বুড়ো বাইসন জোরে নাক ঝাড়ল। সেই হঠাৎ-শব্দে ভয় পেয়ে গাছগাছালির মাথা ছেড়ে ছত্রাকারে ছড়িয়ে গেল ঝোড়ো-হাওয়ার মুখের ঝরাপাতার মতো নানা জাতের ছোট পাখিরা। বুড়ো-শিকারি ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা পেরিয়ে এখন পাহাড়তলির রৌদ্রালোকিত প্রান্তরে এসে পৌঁছল।

বুড়হা-বাঘা এতক্ষণে দেখতে পেল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে সাদা-দাড়ি শিকারি, তার জাত-শিকারির ষষ্ঠবোধে বুঝতে পারল; কেউ নিশ্চয়ই তার মুখে চেয়ে

আছে আড়াল থেকে।

কে ? সে কে ?

বুড়ো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে-না পাওয়া তাকে, সেই অদৃশ্য চোখ দুটিকে ভাল করে দেখে নিতে দিল। এই খেলাতে, যার যার তাস প্রতিপক্ষকে দেখাতে হয়। মৃত্যু দেখে জীবনকে ; জীবন মৃত্যুকে। বুড়হা-বাঘা ভাল করে দেখল বুড়ো শিকারিকে। গুহার সামনের চ্যাটালো কালো পাথরের আরামের বিছানা ছেড়ে বুড়হা-বাঘা সাবধানী থাবা মেলে মেলে উপর থেকে নিঃশব্দে নেমে আসতে লাগল। হলুদ-কালো আলখাল্লা পরা মযদূতেরই মতো।

মানুষ কিসে বাঁচে ?

কী নিয়ে বাঁচে মানুষ ? ডাবল-ব্যারেল্ রাইফেলের দু'ব্যারেলে দুটি সফ্ট-নোজড্ বুলেট পুরে নিতে নিতে বুড়ো শিকারি ভাবছিল। একের পর এক দিন, মাস, বছর মাড়িয়ে যাওয়ার নামই কি বেঁচে থাকা ?

এবার আবারও ঘন বনের মধ্যে ঢুকতে হবে। এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালেও সেই বন প্রায়ান্ধকার। ভিজে স্যাঁতসেঁতে। মৃত্যুর গন্ধে ভরা। জীবনের উষ্ণ এলাকায় আরও কিছুটা দূর হেঁটে গিয়েই বুড়ো ঢুকে পড়ল মৃত্যুর গা-ছমছম্ শীতার্ত অন্ধকার এলাকাতে।

হঠাৎ।

যে-কোনও দুঃসাহসিক কাজই হঠাৎ না করলে করাই হয়ে ওঠে না।

বাঘটাও নেমে এসেছে ততক্ষণে সমতলে। এবার একটা শুকনো নালার বুক ধরে বালি-পাথরের উপরে উপরে সে এগিয়ে চলেছে। হনুমান, পাখি, প্রজাপতি, কাঠবিড়ালি সম্ভ্রমের সঙ্গে চেয়ে আছে তার চলার দৃপ্ত ভঙ্গির দিকে। বুড়ো শিকারির পথও এই নালাটার সঙ্গে মিশে গেছে। বুড়ো শিকারিকেও দেখছে বনের বাসিন্দারা। সম্ভ্রমের চোখে। বয়স শরীর ক্ষয় করে, কিন্তু মর্যাদা বাড়ায়, যাদের তা থাকে। মানুষটা অন্য দশটা মানুষের মতো নয় যে !

দুটো খরগোশ ঘাস খাচ্ছিল নদীর পাশের সবুজ একফালি মাঠে। বুড়ো বাঘাকে দেখেই, দৌড়ে পালিয়ে গেল তারা।

এই-ই বুড়হা বাঘার জীবনের অভিশাপ ! ওকে দেখে সকলেই পালায়। পাখি, হরিণ, মানুষের মেয়ে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই-ই দেখে আসছে। অথচ, কখনও-সখনও ও-ও একটু ভালবাসতে চায়, গল্প করতে চায় ওদের সঙ্গে, ওদের সমান হয়ে যেতে চায় বলে, শৌর্যে।

তাই মাঝে-মাঝে বড়ই অভিমান হয়। বনের এমন রাজা হয়ে লাভ কী ? বনের সব প্রজারা যদি তাকে দেখামাত্র দৌড়তেই থাকে ? রাজত্ব যদি রাজার একার হয়, প্রজাদের না হয় তবে তার দাম কী ? এতদিনে একজন মানুষের খোঁজ পেয়েছে বুড়হা-বাঘা। যে না-পালিয়ে স্থির পায়ে তার দিকেই আসছে। তাকেই সেই মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। একথা ভেবেই ভাল লাগছে বাঘার।

উল্টো কিছু ঘটতে যাচ্ছে এতদিনে ! সত্যি সিত্য ?

বুড়ো শিকারি ভাবছিল যে, আজ দু'-দুটো বাঘকে মারবে সে। ডান দিকের ব্যারেল ফায়ার্ করে মারবে বুড়হা-বাঘাকে, আর বাঁদিকের ব্যারেল ফায়ার করে মারবে তার পানাপুকুরের মতো জীবনের এই ঘটনাবিহ্বনী একঘেয়েমিকে। যা কেউই আগে পারেনি। তাইই আজ করে, একদৌড়ে ফিনিশিং-টেপ বুক দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, অনেক নীরব হাততালি আর অভিনন্দনের মধ্যে নিঃশব্দে বুড়হা-বাঘাকে মৃত্যুর মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়ে প্রথম হবে সাদা-দাড়ি।

জীবনে যা পারেনি, মৃত্যুতে তাই-ই পারবে।

বুড়হা-বাঘাটাও বড় ক্লান্ত ছিল। অনেক বছর ধরে সেও বড় একঘেয়ে জীবনই কাটিয়ে আসছে। সেই ভিন্ এলাকার সাহসী বড় বাঘটাকে প্রচণ্ড লড়াই করে মেরে ফেলার পর তার জীবন বড়ই সাদামাঠা হয়ে গেছে। মানুষরাও কেউ ভয়ে তার কাছ মাড়ায় না। তার জীবনে কোনও ভয় নেই, অনিশ্চিতি নেই ; চ্যালেঞ্জ নেই। শিকারিরা সবাই তাকে সেলাম জানিয়েই চলে গেছে দূর থেকে। স্বীকার করে গেছে, হয় তার হাতে মরে, নয় অপমানিত হয়ে যে বুড়হা-বাঘাই শ্রেষ্ঠ। বুড়হা-বাঘার সম্মানে কেউই আর হাত দিতে আসেনি। শ্রেষ্ঠত্বর ক্লান্তিতে ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত হয়ে গেছে বুড়হা-বাঘা। একঘেয়ে এই সম্মানের ক্লান্তি বড় ক্লান্তি। চিরদিন প্রথম হওয়ার এবং প্রথম হয়েই থাকাটা বড় বেশি বাজে ; যদি না সেই প্রথমত্ব অটুট রাখতে সব সময়ই লড়াই করতে হয়। বহু বছর হয়ে গেছে কোনও শিকারিই গুলি ছোঁড়েনি তার দিকে তাক করে। তার সঙ্গে টক্কর দিতে আসেনি। আর কোনও বড় বাঘও তার এলাকায় ঢোকেনি সাহস করে। বুড়হা-বাঘার নখে মরচে পড়ে যাচ্ছে। নখ দিয়ে সে শুধুই মাংস ছিঁড়ে পেট ভরায়। এই একঘেয়ে প্রথমত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায় বাঘটা।

বুড়ো-শিকারি বড় ভালবেসেছিল তার জীবনের পরিবেশকে। যেহেতু সে মানুষ, তাই শুধুই শ্বাস নিয়ে আর নিশ্বাস ফেলে সে বেঁচে থাকতে চায়নি। বাঁচতে চেয়েছিল, সব মানুষেরই যেভাবে বাঁচা উচিত। বাঁচার চেষ্টা করা উচিত।

শিকারি বড় ভালবেসেছিল এই দেশের বৈশাখের ভোরের হাওয়াকে, গ্রীষ্মের স্নিগ্ধ নীল-সবুজ তারাভরা উদ্‌লা রাতকে, বসন্তের সকালকে, শ্রাবণের দুপুরকে আর শীতের সন্ধেকে। ভালবেসেছিল তার লাইব্রেরির বইগুলিকে, তার মৃতা স্ত্রীর চোখ দুটিকে, তাঁর নির্মল হাসিকে, তার শিশু-ছেলের হাতের পাতার উষ্ণতাকে। একসময়। অন্য কোনও মানুষের কাছেই তার চাইবার ছিল না কিছুই। অন্য দশজন মানুষ দুঃখ-কষ্ট বলতে যা বোঝে, বুড়োর জীবনে তেমন কোনও দুঃখ-কষ্ট ছিল না। তবুও এক গভীর কষ্টে বুড়ো সবসময়ই ছট্‌ফট্ করেছে। সকলে যখন বলেছে, অনেক কিছুই তো হল তোমার, আর কী চাই,

তখন বুড়ো বলেছে মনে মনে, মাথা নেড়ে ; কিছুই তো হল না।

যা-কিছুই পেয়েছে সে-সব তো সে চায়নি ! সে যে অন্য কিছু চেয়েছিল।

এবার নাকে মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছে বুড়ো শিকারি। যদিও বাঘের পায়ের শব্দ পায়নি, বাঘের গায়ের গন্ধ পায়নি। হাওয়াটা এখন স্থির। প্রকৃতি রুদ্ধ নিশ্বাসে স্তব্ধ। মাঝে-মাঝে হঠাৎ উঁচু গাছের পাতা খসে গিয়ে নীচে পড়ছে। সেই সামান্য শব্দতেই বনের আনাচকানাচ ভরে যাচ্ছে। শিশির আর বুনোফুল আর গাছেদের গায়ের সঙ্গে তার পাইপের তামাকের গন্ধ আর মৃত্যুর গন্ধ মিলেমিশে গেছে। দারুণ লাগছে বুড়োর।

এবার আবার বনপথের অন্ধকার সরে গেল।

বাঘটা মাথাটাকে নামিয়ে সামনের দু'কাঁধের মাঝে ঢুকিয়ে নিল। জমির সঙ্গে মিশে গেল। তখন মনে হচ্ছিল যেন বাঘ নয়, বিড়াল। বাঘটা ছোট্ট এক হঠাৎ-দৌড়ে, নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল কিছুটা। তারপর একটা বড় কালো পাথরের পেছনে সারা শরীরটা আড়াল করে শুধু মাথাটা একপাশে বের করে জমির সঙ্গে লেপ্‌টে গেল একেবারে। লেজটা, সোজা লাঠির মতো শক্ত হয়ে পেছনে সমান্তরাল হয়ে রইল।

খুবই আনন্দ হচ্ছিল বাঘটার : ও বেঁচে আছে কি নেই তার পরীক্ষা হবে নতুন করে আজ। বেঁচে থাকলেই কিছু বেঁচে থাকা হয় না। বুড়হা-বাঘা, বুড়ো ঘেয়ো শম্বরের মতো যে বাঁচতে চায়নি। সেরা বাঘের মতোই বাঁচতে চেয়েছিল, যেমনভাবে বাঁচার খোঁজ অন্য সব বাঘ রাখে না। সব বাঘই বুড়হা-বাঘা হতে পারে না।

আসছে। এসে গেছে সেই সাদাদাড়ি শিকারি কাছে। শুকনো পাতা, কাঠকুটো এড়িয়ে, নিঃশব্দে অভিজ্ঞ সাবধানী পা ফেলে ফেলে, রাইফেলটাকে রেডি-পজিশনে ধরে এগিয়ে আসছে বুড়ো শিকারি। তার সাদা দাড়ি, সাদা চুলে, ঋষির মতো দেখাচ্ছে তাকে। বড়ই স্পর্ধা মানুষটার। দম্ভ হয়েছে বড়। আজকে তার দুই থাবার নীচে তার সব স্পর্ধা আর দম্ভ শুকনো পাতার মতো মুচমুচিয়ে গুঁড়িয়ে দেবে বুড়হা-বাঘা।

বুড়ো শিকারির তর্জনী ট্রিগার-গার্ডে। বুড়ো আঙুল, সেফটি ক্যাচে। বুড়হা-বাঘার বড়ই বাড় বেড়েছিল। মানুষকে সে তোয়াক্কাই করে না। বাঘ, সে যত বড়ই হোক, কখনও কি মানুষের সমান হতে পারে ? রাইফেলের গুলিতে সেই গর্বিত বোকা বাঘটার বুক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে আজ শিকারি। প্রমাণ করে দেবে অন্য মানুষদের কাছে যে, বেঁচে থাকা কাকে বলে তা বুড়ো-শিকারি জানত।

হঠাৎই নিঃশব্দ বনে আলো-ছায়া আর রঙের হোলি শুরু হয়ে গেল। লাল কালো হলুদ সবুজ পাটকিলে সাদা—সব রঙই নিঃশব্দে জীবনের পিছুকিরির মুখে এসে মৃত্যুর দিকে দৌড়ে যেতে লাগল। সেই উৎসবের মধ্যে বুড়ো

শিকারি পথের বাঁকে এসে পৌঁছতেই লাফ দিল বুড়ো-বাঘা। কোনাকুনি। বুড়ো শিকারির ডান কাঁধ আর গলার মাঝামাঝি কামড়ে ধরে এক ধাক্কায় তাকে নিয়ে নীচে পড়বে বলে।

বাঘটা লাফানোর সঙ্গে-সঙ্গেই বুড়ো শিকারিও চকিতে রাইফেলসমেত গোড়ালির উপর আধপাক ঘুরে গেল। একটাই গুলি করার সুযোগ পেল শুধু। গুলির আওয়াজ আর বুড়ো বাঘার গর্জন মিশে গেল। গুলিটা লাগল বাঘার গলার আর বুকের ঠিক মাঝামাঝি। দুটি ট্রিগার টানার সময় পেল না শিকারি। বুড়ো-শিকারিকে নিয়ে বুড়হা-বাঘা আছড়ে পড়ল নীচে ঝরাপাতা বিছোনো শীতের নরম হিমেল বনপথে জড়াজড়ি করে। ভয় পেয়ে কাঠঠোকরা উড়ে গেল রঙিন ঘুড়ির মতো। কাঠবিড়ালি দৌড়ে উঠল গাছের গুঁড়ি বেয়ে। ইতিউতি চাইল উপরে উঠে। সমস্ত জঙ্গল বাঘের ডাককে আর গুলির আওয়াজকে সমীহ জানিয়ে কলকাকলিতে সেলাম জানাল।

বুড়হা-বাঘার বুক ভেসে যেতে লাগল সাহসী বাঘের রহিস্ খানদানের রক্তে। বুড়ো-শিকারির বুক গলা ঘাড় ভেসে যেতে লাগল একজন মানুষের মতো মানুষের রক্তে। বুড়োর বুকে রক্তাক্ত দুটি থাবা রেখে, বেড়াল যেমন করে সাদা কবুতর ছিন্নভিন্ন করে, তেমন করে সাদা চুল সাদা দাড়ির বুড়োকে ছিঁড়তে লাগল বুড়হা-বাঘা।

বড় ভাল লাগতে লাগল বুড়োর। এই রকমই কিছু ঘটবে যে, তা জানত মানুষটা। মৃত্যুরও তো ভালমন্দ থাকে।

রাইফেলটা বুড়োর হাত থেকে আলগা হয়ে এল। ভোরের সূর্যের আলো পড়েছিল চোখে, চোখ বন্ধ করে নিল। অনেক ঘুম জমেছিল। এখন নিজের রক্তের গন্ধের সঙ্গে নিজের দেশের মাটির গন্ধ, গাছের গন্ধ, ফুলের গন্ধ সব মিলেমিশে গেছে।

ছেলেটা...

ছেলেটা এমন সোনার দেশকে ফেলে, নিজের দেশকে ফেলে অন্য দেশে চলে গেল ? একটু ভাল খাবে, ভাল পরবে, ভাল থাকবে বলে ?...

ছিঃ ছিঃ...ছেলেটা... ! তার ছেলে !

বুড়হা-বাঘাটার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। রক্ত কুলকুচি করল সে। তারপর বুড়ো-শিকারির পাশে চিত হয়ে হঠাৎ শুয়ে পড়ল।

সূর্যটা ঠিক তার চোখেরই উপর একটা লাল বলের মতো ছোট থেকে বড় হতে হতে ক্রমশ আরও উজ্জ্বল হতে লাগল। পৃথিবীকে খেয়েই নেবে সূর্য আজ মনে হল। শীতের সূর্যকে বড় ভালবাসত বুড়হা-বাঘা। কিন্তু জীবনে আজ এই প্রথম শীতের সূর্যকে তার ভাল লাগল না। সূর্য সবকিছুকে বে-আব্রু করে দেয়। মৃত্যুর মতো গোপন কিছুকেও।

ডান থাবার এক থাপ্পড়ে মাকাল ফলের মতো ফাজিল সূর্যটাকে ছিঁড়ে নামাবে

বলে থাপ্পড় তুলল বুড়হা-বাঘা। কিন্তু থাবা উঠল না। আরাম! আঃ কী আরাম!

বুড়ো-শিকারি তার ডান পাটা বুড়হা-বাঘাটার পেটের উপর তুলে দিল। যেন্নায় নয়, ভালবাসায়।

আঃ, কী আরাম!

বুড়হা-বাঘার শরীর থেকে তার তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়গুলো এক এক করে ছুটি নিয়ে চলে যাচ্ছে। তার হালকা লাগতে লাগল খুব। বুড়হা-বাঘা বলতে গেল গভীর আরামে গর-র-র-র-র...।

কিন্তু আওয়াজ বেরুল না।

সব প্রাণী আর মানুষই তাকে দূর থেকে দেখে ভয়ে ঘেন্নায় পালিয়ে গেছে চিরদিন। একটা মানুষ, তবু তার কাছে এসেছিল ; তাকে চেয়েছিল। শেষের দিনে হলেও। ভাল, খুবই ভাল।

একটা কাঁচপোকা বুঁ-বুঁ-বুঁহইই...করে উড়ে এসে একবার মৃত বাঘটার মুখের কষে আরেকবার মৃত মানুষটার ঠোঁটের উপর বসল। উড়তে-বসতে লাগল। সামান্যক্ষণ। তারপরই বনে বনে খবর দিতে উড়ে গেল তার নীলচে পাখায় রোদ ছিটিয়ে...।

ঋজুদা এই অবধি বলে চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ হল নিভে যাওয়া পাইপটা থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলে নতুন করে আগুন জ্বালল। রুদ্র আর ভট্‌কাই চুপ করে বসেছিল। রোদটা এখন জোর হয়েছে। হাওয়াও ছেড়েছে একটা। নানারঙা শুকনো পাতা উড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে জঙ্গলের পায়ের কাছে পাথর ও রুখ্ মাটির উপর সড়সড় আওয়াজ তুলে। একটা পাহাড়ী বাজ উড়ছে নীল আকাশে ঘুরে ঘুরে।

ঋজুদা পাইপটা ভরে লাইটার জ্বেলে আগুন জ্বালাল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, আঃ। ভট্‌কাই হঠাৎই বলল, আচ্ছা ঋজুদা, তোমার এই গল্পটির মরাল কী? এ তো জাস্ট একটা গল্পই নয়। কিছু নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছ তুমি এই গল্পের মাধ্যমে।

কিছুমাত্র বলতে না চেয়েও গল্প বলা যায়। যা শুধু গল্প করার জন্যেই গল্প ; অন্যভাবে বলতে গেলে কথার কথা। গাল-গল্পও হয়তো বা। তবে এই গল্পে কিছু বলতে চেয়েছি নিশ্চয়ই। তবে আমি তো আর লেখকটেখক নই, কী করে গল্প লিখতে হয় তা তো জানা নেই, তাই পেরেছি কিনা তা তোরাই বলতে পারবি। তোরাই বল? কী বলতে চেয়েছি?

একটু ভেবে ভট্‌কাই বলল, বাঘের সঙ্গে লড়তে গেলে এইই নতিজা নিক্‌লোয়।

ঋজুদা বলল, হিন্দী ছবি একটু কম দ্যাখ্ টি-ভিতে ভট্‌কাই। "নতিজা নিক্‌লোয়"। এ আবার কী রকম বাংলা?

না কেন? হালুয়া সহজেই নিকলোতে পারে আর নতিজা নিক্‌লোতেই দোষ?

রুদ্র হেসে ফেলল ভট্‌কাই-এর কথা শুনে। ঋজুদাও। ঋজুদা বলল, নাঃ। তুই একটি ইন্‌করিজিবল্। হিন্দী-নবীশ।

তারপর বলল, তুইই বল রুদ্র এবার, কী বলতে চেয়েছি এই অলেখকের গল্পে?

প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে সে মানুষ সাধারণ অর্থে যতই সুখী হন না কেন, একধরনের অতৃপ্তি থাকেই। সেই অতৃপ্তিকে জয় করাই একজন সত্যিকারের মানুষের ধর্ম।

বাঃ, বেশ বলেছিস। হয়তো এও এই গল্পের সারমর্ম হতে পারত। কিন্তু আমি অন্যকিছু বলার চেষ্টা করেছি।

কী তা?

ভট্‌কাই বলল।

বলতে চেয়েছি যে, একজন মানুষের মতো মানুষ অথবা একটি বাঘের মতো বাঘকে মেরে ফেলা যায়, ধ্বংস করা যায় ; ছিঁড়ে টুকরো টুকরোও করে দেওয়াও যায় সহজেই কিন্তু হারানো যায় না তাদের।

ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গি বনে

TDR

"বহুদিন পরে এলাম রে। ভারী ভাল লাগছে। জানিস।" ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, "কত বছর পর?"

"এই বাংলোতে? তা প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর হবে। যদিও এর আশেপাশে এসেছি পনেরো বছর আগেও।"

"ভটকাই বলল, "জায়গার কী নাম রে বাবা! বাঘ্যমুণ্ডা। বাঘের মাথা নাকি?"

"দারুণ নাম। যাই বলিস। আরও দারুণ নাম আছে। বাঘ্যমুণ্ডা। মানুষখেকো বাঘে-খেকো মানুষদের নাম, যারা ভূত হয়ে যায়। কালাসাণ্ডি জেলাতে।" ঋজুদা বলল।

আমরা শুনে হেসে উঠলাম সকলে।

"এই বাংলোতে আমি একবার শীতকালে ছিলাম। তার আগের বছরই আমাদের বিশেষ পরিচিত মানিক, মানিক দাস, সুধীরঞ্জন দাস মশায়ের ছোট ছেলে, টেস্ট-পাইলট সুরঞ্জনদার ছোট ভাই, এই বাংলোতে ছিলেন সপরিবারে। ঢেনকানল রাজ্যের নিনিকুমারও। মানিকবাবু এখানেই মারা যান।"

"বাঘের হাতে?" তিতির উৎকণ্ঠিত হয়ে শুধোল।

"না। যদিও সেই বছরই একটি বড় বাঘ মেরেছিলেন মানিকবাবু এবং এই বাংলোতেই। সামনের ওই গাছ দুটোতে টানা দিয়ে তার চামড়া ছাড়ানো হয়েছিল রাতের বেলা হ্যাজাকের আলোতে কিন্তু বাঘের হাতে মারা যাননি।"

"তুমি জানলে কী করে কোন্ গাছটাতে টানা দিয়েছিল?" ভটকাই শুধোল।

"আমিও যে এসেছিলাম সে-বছরে। তবে বাঘ্যমুণ্ডাতে ছিলাম না। ছিলাম, অঙ্গুল শহরে। কটকের সুরবাবুদের বাড়িতে। সম্বলপুরে যে পথ চলে গেছে অঙ্গুল হয়ে, সেই পথের উপরে তাঁদের বাড়ি।"

"তা হলে? জানলে কী করে বাঘ মারার খবর?"

"অঙ্গুলের ফরেস্ট কনট্রাকটরদের মুখে খবর পেয়েই জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়া

গেল সকলে মিলে মানিকবাবুকে কনগ্রাচুলেট করতে। গিয়ে দেখি ড্রেসিং-গাউন পরে বাংলোর হাতায় বাঘের চামড়া ছাড়ানোর তদারকি করছেন মানিকবাবু আর নিনিকুমার। মানিকবাবুর স্ত্রী ও দুই মেয়েও ছিলেন। মানিকবাবুর স্ত্রী ছিলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের ইনসপেকটর জেনারেল শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকারের কন্যা। সুরঞ্জনদা এবং সরকারসাহেব আমাদের প্রথম যৌবনে টালিগঞ্জের গলফ ক্লাব রোডের রাইফেল ক্লাবে আসতেন মাঝে-মাঝেই। অনিল চ্যাটার্জি আসতেন। মহিষাদলের শক্তিপ্রসাদ গর্গ। জোর আড্ডা ছিল তখন।"

"সন্ধে হয়ে আসছিল। বাংলোর সামনে একটু দূরে কুয়ো। বাঘ্যমুণ্ডা বস্তির মেয়েরা সন্ধের আগে জল ভরে নিচ্ছিল রাতের মতো। ঘড়া-কলসির ধাতব আওয়াজ ভেসে আসছিল। এ-অঞ্চলে অনেক গাছ আছে, যেগুলোকে দেখলে মনে হবে তাল বা ইংরেজি পাম গাছ কিন্তু আসলে এগুলো অন্য গাছ।

লেসার ইন্ডিয়ান হর্নবিলসরা জোড়ায়-জোড়ায় ডানা-না-নাড়িয়ে গ্লাইডিং করে ভেসে যাচ্ছিল পশ্চিমের আকাশে। অস্তগামী সূর্যের লাল আলোতে মোহময় গা-ছমছমে দেখাচ্ছিল পাহাড়শ্রেণী আর গভীর জঙ্গলের রেখাকে। এই অঞ্চলে হাতি ও গাউর, ওড়িয়া নাম গল্ব, প্রচুর আছে। বাঘও আছে।"

ভটকাই আঙুল তুলে তালগাছের মতো গাছগুলোকে দেখিয়ে বলল, "কী গাছ ওগুলো ঋজুদা?"

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে অ্যাশট্রেতে রেখে ঋজুদা বলল, "এগুলোকে বলে সল্বপ গাছ। এর ফল থেকে স্থানীয় লোকেরা তাড়ির মতো একরকম পানীয় তৈরি করে। তার ক্রিয়া একেবারে মারাত্মক। আমি একবার দশপাল্লার বিড়িগড়ে, খন্দ্‌মাল-এর অন্তর্গত, খন্দ্‌দের বাসভূমিতে ক'জন খন্দ্‌কে দেখেছিলাম এই সল্বপ রস খেয়ে শালপাতাদের তাস করে বড় একটা শালগাছের তলায় বসে তাস খেলতে। খেলতে খেলতে হঠাৎই একজনের মনে হল, অন্যজন জোচ্চুরি করছে। আর যায় কোথায়? সঙ্গে-সঙ্গে টাঙ্গির এক কোপে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিল বেচারির। নিরুপায় সাক্ষী হিসেবে পরে থানা-পুলিশের ঝকমারিও কম পোয়াতে হয়নি আমাকে।"

তিতির বলল, "দুর্গা মহান্তি আর রাজেনদা কিন্তু এখনও ফিরল না।"

চিন্তিত গলায় ঋজুদা বলল, "তাই তো দেখছি। তবে এতক্ষণে এবিকাকু আর ফুটুদাদেরও তো ফেরা উচিত ছিল। গাড়ি বা জিপ খারাপ হল নাকি?"

"ক'ঘণ্টা লাগবে কটক থেকে আসতে?"

ভটকাই শুধোল।

"আজকাল এমন চমৎকার সব রাস্তা হয়ে গেছে। আগে অনেকক্ষণই লাগত। সময় লাগছে আসলে ফুটুদার জন্যে। ঢেঁকি স্বর্গে নিয়েও যেমন ধান ভানে ফুটুদাও তাই। ঠিকাদার মানুষ। ফেরার পথে চৌদুয়ার, হিন্দোল,

ঢেনকানল, অঙ্গুল সব জায়গাতেই একবার থামতে-থামতে আসবে তো!"

তিতির বলল, "ফেরার সময় পম্পাশরের মোড় থেকে দুর্গা মহান্তি আর রাজেনদাকে তুলে আনতে ভুলে যাবেন না তো!"

"ওরা ভুললে কী হবে, দুর্গা মহান্তিরা পথের উপরেই বসে থাকবে হয়তো। নইলে অন্ধকারে পুরুনাকোটের মুখ থেকে বাঘ্যমুণ্ডা অবধি হেঁটে আসার সাহস পাবে না ওরা। এখানে হাতি খুব।"

ভটকাই বলল, "ওদের এত সাহস আর এতেই ভয় পাবে?"

"জঙ্গলের মানুষেরা যতই সাহসী হোক, রাত নামার পর তারা ঘরের বাইরে বেরোয় না। অবশ্য শিকারে গেলে আলাদা কথা। কিন্তু শিকার তো এখন বন্ধই বলতে গেলে। খালি হাতে, বাতি ছাড়া অন্ধকারের পর কারও বনে-জঙ্গলে চলাফেরা করা উচিত নয়।"

"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো করতেন।"

তিতির বলল।

"তিনি সাধক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তা ছাড়া জঙ্গলের সমস্তরকম ভয় সম্বন্ধে উনি হয়তো সচেতন ছিলেন না। নয়তো সচেতন থেকেও হয়তো গ্রাহ্য করতেন না। ওঁর কথা আলাদা।"

"আর তুমি?"

ঋজুদা হেসে বলল, "আমার কাছে তো মন্ত্রগুপ্তি আছে।"

"বাজে কথা।"

ভটকাই বলল।

এই ভটকাইকে নিয়ে আমরা সকলেই মহা ঝামেলায় পড়েছি। ঋজুদাকে ও মোটেই মান্যগণ্য করছে না। ঋজুদার সঙ্গে নিনিকুমারীর বাঘ মারতে গিয়ে কাগা-বগা-না-মারা শিকারি বাঘিনী দিয়ে অ্যাকাউন্ট ওপেন করার পর থেকেই ভটকাই বাবাজির বোলচাল আরও 'তেজ' হয়েছে। একে নিয়ে আমরা সমস্তক্ষণ টেনশনে ভুগি। ঋজুদার হাসিই দেখেছে। রাগ তো দ্যাখেনি!

নকুল ভেতর থেকে চা নিয়ে এল আমাদের জন্যে, সঙ্গে মুচমুচে করে ভাজা বড় নিমকি, আলুর ঝাল-তরকারি আর লেবুর আচার। তিতির চা খায় না। দুগ্ধপোষ্য শিশু। তার জন্যে গ্লাসে করে দুধ।

ঋজুদা বলল, "যাই বলিস তিতির, পশুরাজ্যেও কিন্তু বড় হয়ে ওঠার পর দুধ খাওয়ার রেওয়াজ নেই। মানুষেরা কেন এই বদভ্যাস ছাড়ে না, ভেবে পাই না।"

ঋজুদার কথায় আমরা হেসে উঠলাম।

তিতিরও হাসল। তারপর বলল, "কথাটা ভাববার মতো। কিন্তু পশুদের মায়েরাই যদি না দেয়, তা হলে বেচারিরা দুধ পাবে কোত্থেকে!"

"এটাও একটা ভাববার মতো কথা।" ঋজুদা বলল।

ঋজুদার কথা শেষ হতে-না-হতে বাংলোর চওড়া বারান্দায় যেখানে আমরা

বসে ছিলাম, তার বাঁ দিক থেকে হাতির বৃংহণ ভেসে এল।

গরমের দিন। সূর্য ডোবার পরে হাওয়া যেন পাগল হয়ে উঠেছে। বনময় ঝরা পাতা, লাল ধুলো এবং ঝরা ফুল ঝাঁট দিয়ে বেড়াচ্ছে দৌড়ে-দৌড়ে। দুটো পেঁচা বাংলোর পেছনের মিটকুনিয়া গাছ থেকে প্রচণ্ড জোরে উড়ে-উড়ে ঝগড়া করতে-করতে ঘুরে-ঘুরে দূরে চলে গেল কুয়োটার কাছে।

ভটকাই আধখানা নিমকি মুখে দিয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, "টেনশান।"

"কেন ? হাতি ?"

"না রে। যদি পেঁচা দুটো কুয়োয় পড়ে যায় তা হলেই কেলো। বল ?"

ভটকাইয়ের ভাবনাচিন্তার রকমটাই এরকম। আর যাই হোক, কেউই ওর ওরিজিনালিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবে না।

এমন সময় দূর জঙ্গলের মধ্যে জিপের এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। পুরুনাকোট আর টুল্বকা যাওয়ার মোড়ের কাছ থেকে এলে পুরুনাকোট থেকে নতুন ফরেস্ট বাংলো যেদিকে, সেদিকের পথে বোস্টম নালাকে পাশে রেখে এলে কিছু চড়াই-উতরাই পড়ে। তবু এ-রাস্তাটিতে অনেক বাঁক আছে। জিপ টপ গিয়ারে দিয়েই আবার থার্ড গিয়ারে ফেলে দিচ্ছেন ফুটুদা। এঞ্জিনের শব্দে পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে। ঋজুদার গাড়িটা চালাচ্ছে ফুটুদার ড্রাইভার।

"এল ওরা।"

ভটকাই বলল।

"দেখা যাক, এখন গ্রেট দুর্গা মহান্তি কী সংবাদ নিয়ে আসে আমাদের জন্য।" ঋজুদা বলল।

দুপুরের পর থেকেই আমরা ওদের পথ চেয়ে ছিলাম। সকাল আটটাতে লবঙ্গি থেকে আট-দশজন লোক পায়ে হেঁটে এসে পৌঁছেছিল হাতির খবর দিতে। ঋজুদা বলেছিল দুঃখ করে, "আমার কপালে পৃথিবীর কোনও জঙ্গলেই অবিমিশ্র ছুটি কাটানো নেই। এসেছিলাম তোদের নিয়ে মহানদীর দু'পাশের জঙ্গলকে নতুন করে দেখতে, তোদের চেনাতে, তা না দ্যাখ, মাত্র একদিন কাটতে-না-কাটতেই এই বিপত্তি।"

লবঙ্গির মানুষেরা অনেক কাকুতি-মিনতি করল। হাতিটাকে 'রোগ' ডিক্লেয়ার করা হয়েছে জেলা কর্তৃপক্ষ থেকে। মারার চেষ্টাও করেছেন ভুবনেশ্বর ও কলকাতার দু'জন শিকারি। অঙ্গুলের ডি. এফ. ও-ও ঋজুদাকে অনুরোধ করেছেন। লবঙ্গির লোকেদের সঙ্গে পম্পাশরের লোকও ছিল পাঁচজন। হাতিটা নাকি পম্পাশরেও এসে ঝামেলা করেছে। মানুষ মেরেছে এ পর্যন্ত পাঁচজন। তিনজন পুরুষ। দু'জন মেয়ে। বাড়ি-ঘর ভেঙেছে অগুনতি। গোরু-মোষ আছড়ে মেরেছে কুড়িটা।

ওরা বড় গরিব যে, তা মনে হল ওদের জামাকাপড় আর চেহারাতেই।

ঋজুদা এসেছে যে বেড়াতে, সে-খবর ডি. এফ. ও. সাহেবের অফিস থেকে ফরেস্ট-গার্ডই এনে ওদের দিয়েছে কাল। বাস সার্ভিস আছে অঙ্গুল থেকে পম্পাশর হয়ে, পুরুনাকোট হয়ে। সেই বাস চলে যায় মহানদীর পারে টিকরপাড়াতে। তারপর টিকরপাড়াতে বাঁশের ভেলাতে মহানদী পেরিয়ে ওপারে নানান জায়গায়। বৌধ, ফুলবানী, দশপাল্লা ইত্যাদি জায়গাতে।

"ঋজুদার উপরে সকলেরই যেমন ডিম্যান্ড দেখছি তাতে মনে হচ্ছে এ-যাত্রা আমাদের ফ্যামিলিয়ারাইজেশান ট্যুরের এখানেই ইতি।" তিতির সখেদে বলল।

ফুটুদারা এসেই বললেন, "চান করতে ঢুকছি। সারাদিন গাড়িতে একেবারে ঝলসে গেছি।"

"সারাদিন মানে ?"

"ওই হল। কটক থেকে বেরিয়েছিলাম খাওয়া-দাওয়ার পর। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর গরম আরও বেশি লাগে।" এই কথা বলেই ফুটুদা বাথরুমে চলে গেলেন।

এবিকাকুও অন্য বাথরুমে।

ফুটুদার পাখির আহার। তবে এবিকাকু ঋজুদার সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে খেতে পারেন, যখন খান। আর পদেরই বা কী রকমারি !

দুর্গাদা আর রাজেনদা মালপত্র সব নামিয়ে-টামিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিল কুয়োতলায়, তারপর বারান্দায় এল।

ঋজুদা বলল, "চা-টা খেয়ে তারপরেই এসো। তারপরে শুনব। তোমাদের কাহিনী তো আর ছোট হবে না।"

ওরা চলে গেলে ঋজুদা বলল, "মুখ-চোখ দেখে মনে হল, এখানের ক্যাম্প তুলে আমাদের লবঙ্গিতেই যেতে হবে কাল-পরশু।"

"কী করে বুঝলে ?"

"বুঝলাম। অনেক বছরের সঙ্গী এরা। কিছু তো বুঝব মুখ-চোখ দেখে।"

ভটকাই বলল, "হাতি কী যে মারে লোকে ! অত বড় জানোয়ার। তাকে মারতে আর বাহাদুরি কী ? ওর চেয়ে তো স্নাইপ মারা সোজা।"

ঋজুদাকে এমন করে বলল ও, তাতে আমি বললাম, "'ফ্লুক-এ' একটা বাঘ মেরে দিয়ে তোর বোলচাল খুব বেশি হয়েছে।"

ঋজুদা বলল, "হাতি "রোগ" হয়ে গেলে তার মতো সাঙ্ঘাতিক জানোয়ার খুব কমই হয়। এ তো দলের হাতির নয় যে, ধীরেসুস্থে ভাল ট্রফি দেখে ভাল করে এইম নিয়ে নিজে অ্যাডভান্টেজাস্ পজিশন বেছে নিয়ে ভাইটাল জায়গা দেখে গুলি করলি আর পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্যরা হুড়মুড় করে পালিয়ে গেল। "রোগ" হাতিকে তোর খুঁজতে হবে না। সেই তোকে খুঁজে বের করবে। অতবড় জানোয়ার চড়াই-উতরাই সব জায়গাতে যে কী জোরে

দৌড়তে পারে আর কতখানি নিস্তব্ধ হয়ে নিঃসাড়ে জঙ্গলের মধ্যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, অনড় শুঁড়টি চকিতে বিদ্যুৎচমকের মতো নেমে এসে কখন যে কার ভবলীলা শেষ করে দেবে তা যার অভিজ্ঞতা নেই সে বুঝতেও পারবে না। হাতি-শিকার সকলের পক্ষে সহজ নয়। হাতি সম্বন্ধে জ্ঞানও বেশি লোকের নেই।"

আমি বললাম, "ঋজুদা, লালজির কথা বলো। ওরা তো জানে না।"

"অসমের গৌরীপুরের ছোটকুমার লালজির সমস্ত জীবনই কেটেছিলো হাতিদেরই সঙ্গে। গত মার্চ মাসে উনি মারা গেলেন। ওঁর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে একটি জ্ঞানভাণ্ডারও মুছে গেল। অথচ আমাদের এমনই পোড়া দেশ যে, ওঁকে নিয়ে কোনও ডকুমেন্টারি ছবি অথবা একটি টেলি-ফিল্মও হল না। ভাবলেও দুঃখ লাগে। আর কত হাজার মিটার ফিল্ম যে প্রতিদিন ফালতু নেতাদের ছবি তুলে খরচ হচ্ছে!"

"নাম কী ছিল ওঁর?"

ভাল নাম প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া। ডাক নাম লালজি। হাতি মারতেন না উনি। হাতি ধরতেন। হাতি খেদিয়ে বেড়াতেন। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রথম দিকের, সাইলেন্ট পিকচারের সময় থেকেই; একজন দিকপাল ছিলেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া; তাঁরই ছোট ভাই হলেন লালজি।"

"তাই?"

ভটকাই বলল।

"কলকাতায়ও কয়েকজন ভাল হাতি-শিকারি আছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ও আছে। যেমন, ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরি, জর্জ ট্রব্ এবং চঞ্চল সরকারের। চঞ্চলের সঙ্গে রঞ্জিতও যায়। চঞ্চল যত "রোগ" হাতি মেরেছে, তত খুব কম শিকারিই মেরেছেন। ওর বাড়িতে একদিন নিয়ে যাব তোদের। এলিয়ট রোডে থাকে। হাতির দাঁত আর পায়ের কালেকশান দেখে অবাক হয়ে যাবি। চঞ্চল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের বড় ঠিকাদার। ধৃতিকান্তবাবু অধ্যাপক, বরেন্দ্রভূমের নামী জমিদার বংশের ছেলে। চেহারাটিও চমৎকার। আর জর্জ ট্রব্ হল নামকরা ডেনটিস্ট। ওর বাবার পসার পেয়েছে ও। বাবা ছিলেন অসমের চা-বাগানগুলোর ডেনটিস্ট। এক বাগান থেকে অন্য বাগানে তখনকার দিনে মোষের গাড়িতে করে ঘুরে-ঘুরে রোগী দেখতেন। জর্জ শিশুকাল থেকেই বাবার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে শিকারি হয়েছিল।"

"ওঁদের মধ্যে ডাকবে নাকি কাউকে?"

"যদি তেমন দেখি, আমার দ্বারা যদি এই হাতি মারা না হয়, তবে ওঁদেরই কাউকে খবর পাঠাতে হবে শেষ পর্যন্ত।"

তিতির বলল, "তুমি যদি হাতির পেছনেই ঘুরে বেড়াও তা হলে আমাদের

তো এ-যাত্রা মহানদীর দু'পাশের জঙ্গল দেখাই হবে না। পনেরো দিনের জন্যে আসা, তার মধ্যে তো চারদিন চলেই গেল।"

"দেখি। তিনদিন সময় দেব। না পারলে, আমরা চলে যাব, ওঁদেরই কাউকে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানাতে বলব অঙ্গুলের ডি. এফ. ও. সাহেবকে, এবং ডিভিশনাল কমিশনারকেও।"

'রোগ্ হয়ে যাওয়া মানে কী ঋজুদা? এ কি কোনও রোগ?" ভটকাই শুধোল।

ঋজুদা হেসে উঠল ভটকাইয়ের কথা শুনে।

আমরাও হাসলাম।

তিতির বলল, "না হে বোকামশায়। "রোগ্" মানে গুণ্ডা। শুধু হাতিই নয়, যে-সমস্ত জানোয়ার যূথবদ্ধ, মানে দলে থাকে, তাদের প্রত্যেক দলে একজন করে সর্দার থাকেই। হাতি, গাউর (ইন্ডিয়ান বাইসন), শম্বর, বারাশিঙা, চিতল ইত্যাদি জানোয়ারেরা দলে থাকে। যা বললাম, তাদের প্রত্যেক দলে একজন করে সর্দার থাকে। সর্দার সবসময়েই পুরুষ হয়। মানুষের মধ্যে অবশ্য মেয়েরাও হতে পারেন, যেমন ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন। সে-কথা ভাবলে মনে হয়, জানোয়ার না হয়ে মানুষ হওয়াতে খুব বেঁচে গেছি। যাই হোক, দলে যখন কোনও উঠতি যুবক বলশালী হয়ে ওঠে, তখন দলের সর্দারি নিয়ে সর্দারের সঙ্গে তার খিটিমিটি লাগে। তারপর একদিন এক চূড়ান্ত লড়াই বা ডুয়েল হয় তাদের মধ্যে।"

" 'একদিন' বলিস না তিতির।"

ঋজুদা বলল।

"ঠিক বলেছ। ওই লড়াই একদিন আরম্ভ হয় ঠিকই, কিন্তু তা যে একদিনেই শেষ হয় এমন নয়। কখনও কখনও চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। কখনও সর্দার জেতে, কখনও-বা উঠতি-সর্দার। কখনও লড়াই শেষ হয় অন্য পক্ষের মৃত্যুতে। এক পক্ষ মরে গেলে ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু যখন এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাছে সেই সাঙ্ঘাতিক লড়াইয়ে হেরে গিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েও বেঁচে যায়, তখনই বিপদের সূত্রপাত হয়। সে শরীরের ক্ষত নিয়ে, মনের জ্বালা নিয়ে, জঙ্গলের গভীরে গিয়ে, প্রথমে বিশ্রাম নিয়ে তার ক্ষতগুলি সারিয়ে নিতে চায়। সুস্থ হয়ে গেলেও অনেক সময়ই সম্পূর্ণ সুস্থ হয় না। তবে কোনও-কোনও সময় হয়ও। কিন্তু সে যে দল-তাড়িত, অপমানিত সেই অপমান ও গ্লানির কথা সে কোনও সময়েই মন থেকে মুছতে পারে না। তখন অনেক সময় ক্ষতবিক্ষত অবস্থাতেই মানুষের বা গোরু-মোষের বা যানবাহনের কাছাকাছি এলে সে সঙ্গে-সঙ্গে আক্রমণ করে। মানুষকে মেরে ফেলে।

"হাতির কবলে পড়ে যাদের মৃত্যু হয়, বাঘ বা ভাল্লুকের হাতে মৃত্যুর চেয়েও তা বীভৎস। হাতি মানুষকে তালগোল পাকিয়ে দেয়। মুখ ঢুকে যায়, হাত-পা

ঢুকে যায় পেটের মধ্যে। কখনও শুঁড়ে জড়িয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে দেয়। কখনও-বা আছাড় মারে। তারপর্ পা দিয়ে থেঁতলে-থেঁতলে রাগ মেটায়। মানুষের বাসস্থান চালাঘর ভেঙে তছনছ করে দেয়। ছাদ-চাপা পড়ে মরে মানুষ। গোরু-মোষের অবস্থাও সেরকমই করে। জিপগাড়ি বা গাড়ি ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে দেয় বা দুমড়েমুচড়ে তাদের, তোমার ভাষায় বলতে গেলে, জিওগ্রাফিও পালটে দেয়। বাস বা ট্রাকও গুণ্ডা হাতির সামনে পড়ে গেলে রেহাই পায় না। মানুষখেকো বাঘের হাত থেকে না হয় শক্তপোক্ত ঘরের দরজা বন্ধ করে বাঁচা যায় কিন্তু হাতির বাসস্থান যেরকম জঙ্গল-পাহাড়ঘেরা এলাকাতে হয়, তা ভারতের বা আফ্রিকারও যে-কোনও অঞ্চলেই হোক না কেন ; পাকা বাড়ি প্রায় কোথাও থাকে না। সেইসব গ্রামঞ্চলের বাড়ি নামেই বাড়ি। তাই হাতির হাত থেকে ঘরে থেকেও তাদের বাঁচার উপায় থাকে না।

"দিন-রাতের কোন্ সময় যে কোন্ গ্রামে গুণ্ডা উপস্থিত হবে, তাও আগে থেকে বলা যায় না। রোগ্ হাতির আতঙ্ক সাঙ্ঘাতিক আতঙ্ক। তা ছাড়া, বাঘ-ভাল্লুককে গ্রামের লোকেরা যথেষ্ট সাহসী বলে বিষমাখানো তীর বা বল্লম দিয়ে মারলেও মারতে পারে, কিন্তু হাতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে এমন কোনও অস্ত্রই ওদের নেই। রাতের বেলা হলে হাতিকে আগুন দেখিয়ে ভয় দেখায়। কিন্তু যে হাতি রোগ্ হয়ে গেছে, তার মনে এত জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে যে, তার মৃত্যুভয়ও লোপ পেয়ে যায়।"

ঋজুদা তিতিরকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তোদের মনে আছে তিতির, সিমলিপালের জেনাবিল বাংলোর সামনে তিন-চারশো গজ দূরে একটি হাতির কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেছিলাম আমরা ?"

আমি আর তিতির একসঙ্গে বলে উঠলাম "মনে আছে।"

"তা হলে তোদের এও মনে আছে যে, জেনাবিল বস্তির লোকেরা বলেছিল যে, কোনও দলের সর্দার আর উঠতি-সর্দারের মধ্যে লড়াইয়ের ফয়সালা হয়েছিল ওখানে।"

"হ্যাঁ, বলেছিল।"

তিতির বলল।

"হাতিদের খুব বুদ্ধি হয়, না ?"

ভটকাই শুধোল।

"হাতির বুদ্ধির নানারকম গল্প শোনা যায়। সত্যিই বুদ্ধিমান প্রাণী হাতি। লালজিকেও আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম।"

"কোথায় ?"

"তখন উনি উত্তরবাংলার গোরুমারা অভয়ারণ্যের কাছে মূর্তি নদীর পাশে তাঁর একটি গণেশ এবং একটি মাকনা হাতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে ক্যাম্প করেছিলেন বুনো হাতি খেদিয়ে দেবার কড়ার নিয়ে।"

"কী বলেছিলেন লালজি ?"

আমি শুধোলাম।

ঋজুদা হেসে বলল, "লালজি বলেছিলেন, হাতির যদি এতোই বুদ্ধি থাকত, তা হলে সে তো ডি. এফ. ও-ই হত।"

আমরা সবাই হেসে উঠলাম ওই কথাতে।

এমন সময় দুর্গাদা আর রাজেনদা বারান্দায় এসে উঠল। ওদের পায়ের তলাটা কর্কশ হয়ে গেছে শিশুকাল থেকে শীত-গ্রীষ্ম পাহাড়-জঙ্গলে হেঁটে-হেঁটে। সিমেন্ট-বাঁধানো বারান্দায় খস্স্ খস্স্ শব্দ হল কর্কশ পায়ের।

ঋজুদা বলল, "দুর্গা, এই হ্যারিকেনটা ভিতরে নিয়ে যাও তো। আজ শুক্লানবমী। চাঁদটা কী দারুণ উঠেছে পাহাড়ের রেখা আর ঘন বনকে আলো করে। এই হ্যারিকেনের আলো চোখের উপর পড়াতে তা দেখা পর্যন্ত যাচ্ছে না।"

রাজেন বিড়বিড় করে বলল, "এটি সাপ্প অচ্ছি গণ্ডা গণ্ডারে।"

"কঁড় সাপ্প ?"

ঋজুদা বলল।

"কঁড় সাপ্প নাহি আঁইজ্ঞা ? তপ্প সাপ্প অছি জুড়ে।"

মানে, কী সাপ নেই তাই বলুন। একজোড়া শঙ্খচূড় সাপও আছে।

ঋজুদা বলল, "হউ ! সাপ্প মানে আচ্ছি তাংকু মনেরে, মত্বে কাঁহি কাটিবাকু আসিবি সে ? নেই যা দুর্গা, সে বত্তিটা।"

মানে হল, হোক। সাপেরা আছে তাদের মনে, খামোখা আমাকে কামড়াতে আসবে কেন ? বাতিটা নিয়ে যা দুর্গা।

বাতি নিয়ে যাওয়ার পর শুক্লানবমীর রাত যেমন স্পষ্ট উজ্জ্বল হল, নির্জনতাও যেন বেড়ে গেল অনেক। কলকাতায় লোডশেডিং হয়ে গেলেই নির্জন হয়ে যায় শহর। সেটা অবশ্য লক্ষ লক্ষ ফ্যান আর হাজার এয়ারকন্ডিশনারের শব্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যও হতে পারে। কিন্তু আলোর সঙ্গে শব্দের কোনও আপেক্ষিক সম্পর্ক আছে কি নেই এ নিয়ে গবেষণা হওয়া বোধহয় দরকার। সম্পর্ক যে আছে এই কথা কোনওদিন কোনও বিজ্ঞানী হয়তো প্রমাণও করবেন। কে জানে !

ঋজুদা বলল, "কঁড় দেখিলি দ্বিজ-জনে লবঙ্গি যাইকি, ক'। শুনিবি।"

গলা খাঁকরে নিয়ে দুর্গাদা আর রাজেনদা একসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল।

"আররে ! পিলেমানে কোরাস গীত ধরি পকাইলু যে !"

ঋজুদা হেসে বলল।

রাজেনদা একটু লাজুক প্রকৃতির। সে বলল দুর্গাদাকে, "তু সব্বে ফ্যাক্টো তাংকু কহি দে।"

'ফ্যাক্‌টো' শব্দটি ইংরেজি। রাজেনদারা কথায় কথায় ফ্যাক্‌টো শব্দটি ব্যবহার করে।

দুর্গাদা যা বলল, তা শুনেই তো নাড়ি ছেড়ে যাবার যোগাড়।

হাতিটা নাকি ধোপা যেমন পুকুরের পাটে ধাঁই-ধপাধপ্ করে কাপড় কাচে, তেমনই করে লোকজন গাই-বলদ শুঁড় জড়িয়ে তুলছে আর কাচছে।

একটার পর একটা ঘটনা বলছে দুর্গাদা তার ঠাণ্ডা একঘেয়ে গলাতে আর আমরাও তা শুনে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছি।

সব শুনেটুনে ঋজুদা শুধোল, "পায়ের ছাপ দেখলে কোথাও ?"

"হ্যাঁ। মাঠিয়াকুদু নালাতে দেখলাম। হাতিটা, মনে হয়, দিনের বেলা ওই নালার কাছের গভীর জঙ্গলে থাকে। সন্ধের পর উঠে আসে ফরেস্ট রোড ধরেই লবঙ্গির আশপাশের গ্রামে। লবঙ্গিতেও।"

"কী কী গাছ আছে নালার কাছে ?"

ঋজুদা শুধোল।

"প্রাচীন সব জংলি আম, গেণ্ডুলি, নিম, বয়ের ; শিমুল আর নানারকম জ্বালকাঠ।"

জ্বালকাঠ মানে যেসব গাছ চেলাকাঠ করে উনুনে জ্বালাবার জন্য ব্যবহার হয়। হরজাই গাছও বোঝায়, জ্বালকাঠ কথাটাতে। মানে উল্লেখযোগ্য বা দামি যা নয়, তাই জ্বালকাঠ।

"কত বড় হাতি ?"

"ও বাপ্পালো বাপ্পা। সে ষড়া তো গুট্টে ঐরাবত হেল্‌লা।"

ওরা দুজনে সমস্বরে বলে উঠল।

দুর্গাদা বলল, "গোদা হাতিটা, টুম্বকার জঙ্গলে যে দল ছিল, তারই পুরনো সর্দারটা হবে। বয়সও হবে কম করে ষাট। তাকে তো আমরা 'পিলাবেলে' অর্থাৎ শিশুকাল থেকে দেখে আসছি।"

ঋজুদা বলল, "তা হলে বল-বুদ্ধিতেই শুধু আমাদের চেয়ে বড় নয় সে, বয়সেও বড় বোঝা যাচ্ছে। তাকে গোদাদাদা বলেই ডাকা হবে তা হলে।"

"বড্ড ভয় ধরিলানি ঋজুবাবু। মো, পুও-ঝিও সব্ব সেঠি অছি। কোনদিন্ব সেমানংকু মারি সারিবে সে ষড়া হাতি তার কিছি ঠিক অছি কি ?"

দুর্গা মহাস্তির বাড়ি পম্পাশরে। পম্পাশর হয়েই লবঙ্গি যেতে হয়। সেখানে একটি ছোট্ট চালাঘরে দুর্গার বউ আর ছেলেমেয়েরা থাকে। আমি গিয়েছিলাম একবার শীতকালে অষ্টমী পুজোর সময়ে। গুলগুলা আর এণ্ডুলি পিঠে খাওয়ার উৎসব ছিল ওদের তখন। ওদের বাড়ির সামনে কন্দমূলের খেত ছিল সেই সময়টিতে। মনে আছে। সত্যিই অমন নিরাপত্তাহীন বাড়িতে বউ-বাচ্চাদের একা রাখলে ভয় হওয়া তো স্বাভাবিকই।

তিতির শুধোল, "কন্দমূল মানে কী, ঋজুদা ?"

'কন্দমূল মানে হল গিয়ে, আরে কী যেন বলে, কী যেন বলি আমরা বাংলাতে, বল না রুদ্র, ও, মনে পড়েছে, রাঙা আলু।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমাদের দেশের বন-পাহাড়ের মানুষেরা বছরের বেশিটা সময় এমন মূল আর ফল খেয়েই তো বেঁচে থাকে। পালামুতে খায় কান্দা-গেঠি। গরমের দিনে কী কষ্ট করে ভালুক, শুয়োর আর শজারুদের সঙ্গে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা সেই মূল খুঁড়ে বের করে ! কিন্তু গেঠি এতই তেতো হয় যে, ঝুড়ি ভরে তা সারারাত ঝরনার স্রোতের বা প্রপাতের নীচে রেখে দেয় ওরা। তাতেও তেতো ভাব তেমন কমে না। তারপর কোনওক্রমে খায় অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

দুর্গাদারাও কোনও কথা বলছে না।

ঋজুদা বলল, "এখানেও আমি এমন অনেক মানুষ দেখেছি যাদের গায়ের চামড়া সাপের চামড়ার মতো উঠে যায় চৈত-বৈশাখ মাসে।"

"কেন ? কেন ?"

তিতির আর ভটকাই শুধোল।

তিতির এ-অঞ্চলে আগে আসেনি, তাই ওদের অজ্ঞতা উৎসাহকেই চাগিয়ে দিচ্ছে বারবার।

"কারণ, তারা এতই গরিব যে, পুরো বছর একটি গামছাকে দু'ভাগ করে পরে আর গায়ে দেয়। ছিঁড়ে গেলে অবশ্য বছর শেষ হওয়ার আগেই আর-একখানা কেনে। ওড়িশার গামছা অবশ্য খুব বড়-বড় হয়। তবে পাতলা তো বটেই।"

"গায়ের চামড়া উঠে যায় কেন ?"

তিতির আবার শুধোল।

শীতের সময় ঘরের মধ্যে আগুন করে আগুনের দিকে বুক করে শোয়। প্রথম রাতে, তারপর অসহ্য হয়ে গেলে আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে শোয়। এমনি করে-করেই 'রোস্টেড' হয়ে যায় শীতের শেষে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তাদের সেই পুড়ে-যাওয়া চামড়া পরতের পর পরত উঠে যায়।

"সত্যি ঋজুকাকা ?"

ভটকাই বলল, অবিশ্বাসী গলায়।

"সত্যি রে। এই আমাদের আসল দেশ। কলকাতা নয়, নতুন দিল্লি বা চণ্ডীগড়ও নয়। ফ্লাইওভার আর পাতাল রেল আর ফোয়ারা নয়। যেদিন আমাদের দেশের এই সাধারণ, ভাল, গ্রামীণ মানুষরা দু'বেলা খেতে পাবে, ভদ্রভাবে পোশাক পরে থাকতে পারবে, শীতে কষ্ট পাবে না, গরমে খাবার জল আর চাষের জল পাবে, সেদিনই জানবি যে আমাদের দেশের কিছু হল।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "তোদের আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এই গরমে শুধু মহানদীর দু'পারের ভয়াবহ ও সুন্দর সব পাহাড়-জঙ্গল

দেখাবার জন্যই নয়, নিয়ে এসেছি আমাদের দেশকেও দেখাতে। কীভাবে সাধারণ মানুষেরা থাকে, কী পরে, কী খায়? মানুষকে বাদ দিলে প্রকৃতির কোনও ভূমিকাই থাকে না।"

ভটকাই বলল, "আরও বলো।"

"আমাকে আমার ছেলেবেলায় যখন প্রথম ক্যামেরা কিনে দেন আমার বাবা, তখন কোডারমার জঙ্গলে গিয়ে অনেকগুলো ছবি তুলি। বাবা ফোটোগুলি দেখে বলেছিলেন, "শুধুই প্রকৃতি, বিষয় হিসেবে বড় একঘেয়ে, ম্যাড়ম্যাড়ে। প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষ যদি না থাকে, নিদেনপক্ষে অন্য কোনও প্রাণীও ; তা হলে অন্য মানুষের চোখে তার দাম কমে যায়, প্রকৃতির বিরাটত্বকে অনুভব করতে অসুবিধে হয়। আজকে এতদিন পরে বুঝি, বাবা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন ন' বছর বয়সী আমাকে।"

ঋজুদা থেমে যেতেই আমরাও সবাই চুপ করে গেলাম।

চাঁদটা আরও অনেকখানি উপরে উঠেছে। দুটি পিউ-কাঁহা বা ব্রেইন-ফিভার পাখি পাগলের মতো ডেকে চলেছে বাংলোর দু'পাশ থেকে। আবার একবার হাতির দলের বৃংহণের আওয়াজ শোনা গেল। ওরা বোধহয় জলে যাচ্ছে। অথবা জলের মধ্যেই রয়েছে। জল খাচ্ছে, শুঁড় দিয়ে একে অন্যকে চান করাচ্ছে, বাচ্চাদের ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে।

দুর্গাদা বলল, "কঁড় করিবে বাবু? যিব্বেনি সিয়াড়ে? সে মানে বড্ড কান্দা-কাটা করিলা। সে হাতিটাকু নাশ না করিলে সে কাম্ম সারিবে। পম্পাশর আউ লবঙ্গি গাঁয়েরে আউ বাঁচিবা হেব্বনি।"

রাজেনদা হাঁটুর উপরে ধুতি তুলে দু'হাঁটু ভাঁজ করে দু'হাঁটুর উপরে দু'হাতের কনুই রেখে দু'হাতের পাতার উপর মুখ রেখে বসে ছিল বারান্দায়। সে হঠাৎ মুখ তুলে বলল, "দুর্গা যা কহিলা বাবু তা সত্য। কিছি বন্দোবস্ত করি না পারিলে আউ বাঁচা হেব্বনি সে গাঁ-দ্বিটার ঝিও-পুওংস্কু।"

"মু কঁড় করিবি, ক'।"

ঋজুদা অনেকক্ষণ পর পাইপটা তুলে নিয়ে আগুন ধরিয়ে বলল।

ডান-হিল্ তামাকের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে গেল বারান্দাময়। গ্রীষ্মবনের গা থেকে যে একটা গোড়া-পোড়া ঝাঁঝালো গন্ধ বের হয়, অথচ যে গন্ধটা উত্তরবঙ্গে বা অসমে, বা সুন্দরবনে বা বিহারে বা ওড়িশায় বা মধ্যপ্রদেশে একটু আলাদা-আলাদা, সেই গন্ধের সঙ্গে মিশে গেল টোব্যাকোর গন্ধ।

"কালই যীবী। জিপ ধরিকি। কঁড় কহিচ্ছন্তি তমমানে?"

ঋজুদা শুধোল।

"আউ কহিবি কঁড়? নিশ্চয় যীবা-হেব্ব।"

ওরা দু'জনে সমস্বরে বলল।

"লবঙ্গি ফরেস্ট বাংলোরে আম্মোমানে রহিবি আউ সারা দিনমান জঙ্গলরে

বুলিবুলিকি চালিবি সে হাতি পাঁই।"

"কেত্তেদিন রহিবে সেটি?"

রাজেনদা শুধোল।

"মু তম্বে কহি দেলু সর্বসমেত কেবল্ল তিনদিন মু রহিপারিবি সেট্টি। ঈ পিলামানংকু ঈ প্রচণ্ড গরম মধ্যে কলকাতাটু নেই কি আসিলি, সেমানংকু কোহ উঠিবে।"

"হেব্ব। হেব্ব। ঠাকুরানির দয়া হেল্বে তিনদিনই যথেষ্ট আইজ্ঞা। শুনন্তু ঋজুবাবু, তম্বপরু সে গাঁ-দ্বিটার সব্বে মানুষংকু পূর্ণ বিশ্বাস অচ্ছি। তমকু 'দেব' পাঁই সব্বে মানিছি। তমকু যীবা হব নিশ্চয়ই।"

"যীবী। কঁহিলু তো যীবী বলিকি কাল সক্কালবেলে। আউ কাঁই পাট্টি করিচি। বুঝিলু। এব্বে তমমানে যাইকি গা-ধেইকি খাই-পীকি শুই পড়। কাল সক্কালবেলে মত্বে উঠাইবি।"

"হ আইজ্ঞা। এব্বে চালিলি।"

ওরা চলে গেলে ঋজুদাকে একটু চিন্তান্বিত দেখাল। যা কথাবার্তা হল ঋজুদা আর ওদের মধ্যে আন্দাজে কিছুটা তিতির আর ভটকাইও বুঝেছিল। ওড়িয়া বড় মিষ্টি ভাষা, ওড়িয়া মানুষদেরই মতো।

"যা ভেবেছিলাম," ভটকাই বলল, "পাঁই', 'পিলামানংকু', 'ঠাকুরানি' আর 'গা-ধেইকি' শব্দগুলোর মানে বুঝলাম না ঋজুদা। অন্যগুলোর মানে আন্দাজে বুঝে নিয়েছি। ওড়িয়া আর বাংলাতে তফাত বিশেষ নেই!"

"না। নেই। তবে যে-কোনও ভাষা বলতে হলে গান গাইবারই মতো কান চাই। যার কান যত ভাল, সে তত তাড়াতাড়ি অন্য ভাষা সেই ভাষাভাষীদের মতো বলতে পারে।"

"মানেগুলো বললে না শব্দগুলোর?"

"হ্যাঁ। 'পাঁই' মানে 'জন্য'। ইংরেজি, 'ফর'। 'পিলামানংকু' মানে 'ছেলেদের' বা 'ছেলেমেয়েদের' বা 'তাদের জন্য'। 'ঠাকুরানি' হচ্ছেন 'অরণ্যদেবী'। 'গা-ধেইকি' মানে 'চান করে'।"

"একটু যত্ন করে শুনবি, তা হলেই শিখে নিতে পারবি, অন্তত বলবার মতো।"

তারপর বলল, "সরি, তিতির আর ভটকাই, তোমাদের এই বাঘ্যমুণ্ডাতেই থাকতে হবে তিনদিন। আমরা ফিরে এলে তারপর সকলে মিলে রওনা হওয়া যাবে। টুম্বকাতে দু'দিন, পুরানাকোটে একদিন, টিকরপাড়ায় একদিন, দু'দিন দু'দিন করে বৌধে আর ফুলবানীতে, তারপর দশপাল্লার কাছে টাক্‌রা গ্রামে একদিন, তারপর ওইদিক দিয়ে ফিরে কটক হয়ে কলকাতা। মহানদী, তোদের বড়সিলিডার আশ্চর্য সুন্দর জঙ্গলও দেখিয়ে আনব। মন ভরে যাবে। দেখিস।"

"আমরা কি সত্যিই যেতে পারি না তোমাদের সঙ্গে ? রোগ এলিফ্যান্টের খোঁজে ?"

তিতির বলল অনুনয় করে।

"না তিতির। লবঙ্গির যে-ফরেস্ট বাংলো সেটি বাঘমুণ্ডার মতো এইরকম হলে তোদের নিশ্চয়ই নিয়ে যেতাম। কোনও কথাই ছিল না। লবঙ্গির ফরেস্ট বাংলো খড়ের চালের গোল একটি ঘর। শীত-গ্রীষ্মের হাত থেকে বাঁচার জন্য গোল করে উলটানো বাটির মতো করে তৈরি। দেখে মনে হয়, আফ্রিকার কোনও উপজাতিদের বাড়ি। সেই বাংলোয় এত লোকের থাকাও অসুবিধেজনক হবে। দুর্গা, রাজেন, আমি আর রুদ্রই যাই। তোদের জন্য গাড়ি থাকবে। ফুটুদা আর এবিকাকুও থাকবেন। টিকরপাড়ায় কুমির বাড়ানোর জন্য যে প্রকল্প হচ্ছে, তাও দেখে আসতে পারবি। আমরা যখন এসব অঞ্চলে শিকার করেছি পঞ্চাশের দশকে এবং ষাটের দশকের গোড়ার দিকে তখন এসব কিছুই হয়নি। তিনটে দিন। দেখতে-দেখতেই তোদের সময় কেটে যাবে। আর এবিকাকু ফুটুদা যখন সঙ্গে রয়েছেন, তখন খাওয়া-দাওয়ার কোনও কষ্টের কথা তো ভাবাই যায় না। বরং খেয়েই কষ্ট পাবি। এবিকাকু তো 'মিস্টার আর-একটু খান' প্রশান্তকাকুরই ভাই। লাইক ব্রাদার, লাইক ব্রাদার। বুঝলি না!"

ঋজুদার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হতেই বারান্দায় আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল।

গ্রীষ্মবনে এখন শুক্লানবমীর চাঁদ পুরো আধিপত্য বিস্তার করেছে। দূরে জঙ্গলের সীমানা আর ঝাঁটিজঙ্গলের মধ্যে ডিড-ড্যা-ড্যু-ইট, ডিড-ড্যা-ড্যু-ইট করে ডেকে ফিরছে একজোড়া পাখি। পাহাড়, প্রান্তর, বন এবং ওই রাতপাখির ডাকের উপর চাঁদের যে প্রভাব তাতে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে, ভল্টুদা এই মুহূর্তে আমেরিকায় চাঁদের মাটি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে করেছে এবং করবে। বিজ্ঞান বোধহয় বড়ই বেশি কৌতূহলী। এর চেয়ে একটু কম হলেও বোধহয় এই পৃথিবীর এবং পৃথিবীর যারা বাসিন্দা, তাদের ক্ষতি হত না কোনওই। কিন্তু এই কৌতূহল আর জিজ্ঞাসাই অবশ্য যুগ যুগ ধরে মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে। এ না থাকলেও মানুষের মস্তিষ্কে হয়তো মরচে ধরে যেত। দৌড়ে চলার আর-এক নামই জীবন। সামনে কী আছে ? জানার বাইরে কী আছে ? তাকে জানার চেষ্টা আর বেঁচে থাকা আজকের আধুনিক মানুষের কাছে সমার্থক।

হঠাৎ গমগমে গলায় ঋজুদা বলল, "তুই আড্ডা না মেরে, এবারে যা রুদ্র। রাইফেল দুটো ঠিকঠাক করে নে। কাল অত ভোরে বেরোব। সময় পাওয়া যাবে না।"

"কোন্‌টা-কোন্‌টা দেব ?" আমি শুধালাম।

"ফোর-সেভেনটি-ফইভ ডাবল্-ব্যারেলটা, আর ফোর-ফিফটি ফোর-হান্ড্রেড

ডাবল্-ব্যারেলটা, আর গুলি। বেশির দরকার নেই। পাঁচ রাউন্ড করে নে। হার্ড নোজড্।"

"হার্ড-নোজড্ নেব ? সফট-নোজড্ নয় ?"

"না। হাতির বেলা আমি হার্ড-নোজড্ দিয়ে মারাই পছন্দ করি। যদিও অনেকে সফট-নোজড্ই পছন্দ করেন ?"

"এ-গুলিগুলো ফুটবে তো ? নিনিকুমারীর বাঘের বেলা যেমন হয়েছিল, তেমন হবে না তো ?"

"এবারে তো ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস কোম্পানির এবিকাকু, অর্থাৎ অনন্ত বিশ্বাসবাবু খোদ হাজিরই আছেন, এবারে ওঁকে ধরব না সঙ্গে-সঙ্গে।"

"তা তো ধরবে। কিন্তু নিনিকুমারীর বাঘের মতো হাতিও যদি ঠাকুরানির হাতি হয়।"

ঋজুদা বলল, "বলিস না, বলিস না। এক ঠাকুরানির বাঘেই অনেক মহাত্ম্য দেখিয়েছেন ঠাকুরানি। হাতজোড় করছি তাঁর কাছে। আর দেখতে চাই না।"

ভোর চারটেতে দুর্গাদা আর রাজেনদা চানটান করে তৈরি হয়ে আমাদের দু'জনকেই ডেকে দিল। তখনও পুবের আকাশ ভাল ফরসা হয়নি।

ভটকাই পাশ ফিরে শুয়ে বলল, "জ্বালালি। আমাকে না নিয়ে কেমন কী হয় দেখা যাবে।"

বলেই, আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আকাশে এখনও চাঁদ আছে। আমরা চান করে রাক্-স্যাকে অলিভ গ্রিন রঙের ট্রাউজার আর হাওয়াইন শার্টস-এর একটি করে চেঞ্জ, টর্চ এবং ক'টি বিস্কিটের প্যাকেট নিয়ে নিলাম।

এবিকাকু একটি মস্ত ঝুড়িতে আমাদের চারজনের জন্য তিনদিনের মতো কাঁচা রসদ, মায়-চাউচিনি পর্যন্ত গুছিয়ে দিয়েছিলেন। গত রাতে 'ফেয়ারওয়েল ডিনার' এমনই হয়েছিল যে, দুপুরের আগে আমাদের দুজনের কারও খিদে পাবে বলে মনে হয় না। এবিকাকু নিজে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করে কালকে রাঁধিয়েছিলেন। পোলাউ, মুরগির মাংস, টাটকা রুই মাছ ভাজা, স্যালাড এবং ঢেন্‌কানল থেকে আনা 'পোড়া-পিঠা'। তবু এক কাপ করে চা এবং একটি করে ডিমের পোচ খেতেই হল, চান করার পর, বেরোবার আগে, এবিকাকুর পীড়াপীড়িতে।

জিপে যখন বসলাম গিয়ে, তখন পুবের আকাশ ফরসা হয়েছে। সমস্ত বন জেগে উঠেছে। আমাদের সি-অফ করার জন্য ফুটুদা, এবিকাকু, তিতির, ভটকাই এবং বাংলোর সমুদয় খিদমদগার জিপ অবধি এলেন।

"গুড লাক" বলল মিস্টার ভটকাই। মনে-মনে ব্যাড লাক উইশ করে।

তিতির বলল, "রুদ্র, কিপ ইওর কুল।"

এবিকাকু বললেন, "হাতি তো খাওয়া যায় না, তাই হাতির মাংস আনতে বলছি না। দাঁত দুটো তো তোমাদেরই হবে। ভাল করে কেটে এনো। আর পা চারটেও গোড়ালির উপর থেকে। আমার অনেক দিনের শখ হাতির গোদা পায়ের মোড়ায় বসে লুঙ্গি পরে মুড়ি আর বাগবাজারের তেলেভাজা খাব।"

ফুটুদা অতিশয় স্বল্পভাষী। মনের মধ্যে হাজার কথা কিলবিল করলে মুখ ফুটে একটা-দুটো কষ্টেসৃষ্টে বেরোয়। চোখ দুটোই বলে, যতটুকু বলার। বললেন, "আচ্ছা, তা হলে..."

স্টিয়ারিং-এ আমিই বসে ছিলাম। পাশে ঋজুদা। মুখে সদ্য-ধরানো পাইপ নিয়ে। রাইফেল দুটি বাক্স-বন্ধ করা আছে। সেগুলো ও অন্যান্য মালপত্রসমেত পেছনে বসেছে দুর্গাদা আর রাজেনদা।

পুরানাকোটের দিকে জিপ চলেছে। বৈশাখের ভোরের হাওয়া ভারী মিষ্টি লাগে।

জঙ্গল এখনও ঠাণ্ডাই আছে। তা ছাড়া, ঘন সেগুন বনের মধ্যে দিয়ে পথ। বৈশাখের ঠাণ্ডা ভোরের হাওয়া এসে লাগছে চোখে-মুখে। আলো এসে পড়েনি এখনও পথে। বেলা দশটা বাজার পর থেকে গরম হয়ে উঠবে পথ আস্তে-আস্তে। তারপর হাওয়ার দাপাদাপি শুরু হবে। মনে হবে যেন স্কুল-পালানো ছেলের দল হুড়দাড় করে জঙ্গলময় পিটু খেলে বেড়াচ্ছে। হাওয়াটা নানারঙা শুকনো পাতাদের অগণ্য বহুরঙা ছাগলের মতো তাড়িয়ে উড়িয়ে আফ্রিকান মাসাই উপজাতির রাখাল ছেলের মতো বনময় দাপাদাপি করে বেড়াবে। বড়কি ধনেশ, কুচিলা খাঁই গাছেদের ডাল থেকে ডেকে উঠবে, হ্যাঁক্-হুঁক্, হ্যাঁক্-হ্যাঁক্। কুস্তাটুয়া পাখি, রং তার বাদামি—কালো, লেজ ঝোলা ; লাফিয়ে-লাফিয়ে বনের ছায়ায় একা-দোক্কা খেলবে একা-একা। গম্ভীর মুখে। যেন বউ মরে-যাওয়া কোনও একলা বুড়ো। কাঁচপোকা উড়বে বুঁ-বুঁ-বুঁইই আওয়াজ করে। নানারঙা প্রজাপতি স্বপ্নের বাগানে উড়বে আর বসবে। শব্দ হবে না কোনও। কাঠবেড়ালি হঠাৎ উল্লাসে চার পায়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে লেজটা ক্রমাগত ওঠাতে-নামাতে, নামাতে-ওঠাতে তারস্বরে অনেকক্ষণ ধরে ডাকবে চি-র-র-র-চিপ্-চি-র্-র্-র, চিরিররর...। সারা বন সরগরম হয়ে উঠবে তার ডাকে। জিপের সামনে দিয়ে তাড়াতাড়ি পথ পেরোবে মস্ত লেজ নিয়ে ময়ূর আর ময়ূরী। শিমুল গাছতলাতে শিমুল ফুল খেতে খেতে কোট্‌রা হরিণ হঠাৎ-আসা জিপের শব্দ শুনে চমকে উঠে সাদা লেজটি নাড়াতে-নাড়াতে দৌড়ে যাবে বনের গভীরে, তার সাবধান-বাণী ছড়াতে-ছড়াতে, ব্বাক ! ব্বাক ! ব্বাক ! ব্বাক !

বড় তেতরা বা মিটকুনিয়া গাছের উঁচু ডালে, রোদে বাদামি ঝিলিক তুলে চমকে বেড়াবে এ-ডাল থেকে ও-ডালে নেপালি ইঁদুর বা জায়ান্ট-স্কুইরেলরা। মিটকুনিয়া গাছেদের ডালের পাতায়-পাতায় ঝরনার শব্দ উঠবে ঝরঝর করে।

রোদ ছিটকে যাবে ঘন সবুজ ক্লোরোফিল-ভরা পাতায়-পাতায়।

ঋজুদা বলল, রাজেনদা, "প্রথমেই লবঙ্গি বাংলোতে যাবে ? না মাঠিয়াকুদু নালায়, যেখানে পায়ের ছাপ দেখেছ গুণ্ডাটার ?"

"সেখানেই প্রথম চলুন। মানে, নালায়। দেখেটেখে এসে তারপর বুদ্ধি আঁটা যাবে।"

"বেশ। রুদ্রকে পথ বলে দিও। আমি তো অনেক বছর পরে আসছি এদিকে।"

ঋজুদা বলল।

পুরানাকোটের মোড়ে এসে পৌঁছলাম। সামনে টুল্বকা যাবার পথ চলে গেছে। আর ডান দিকে গেলে পুরানাকোট। আমরা বাঁয়ে অঙ্গুলের পথ ধরলাম। এই পথেই পম্পাশর পৌঁছে আমরা ডাইনে মোড় নেব। তারপর পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে এগোব লবঙ্গির দিকে।

ঋজুদা বলল, "এই নালাই কি সেই নালা যেখানে ফুটুদারা একবার কাঠ কাটার জন্য ক্যাম্প করেছিল বছর কুড়ি আগে ? আমিও এসে ছিলাম ক'দিন ? এবিকাকু একদিন থেকে চলে গেছিল ?"

"হ্যাঁ, সেই নালাই তো ! মনে নেই ? ট্রাকে করে কাঠ টানার মোষ আনবার সময় একটা মোষ ট্রাক থেকে খাদে পড়ে গেছিল ? তারপর জড়িবুটির বৈদ্য কফু তাকে ধীরে-ধীরে সারিয়ে তুলল ? কফুর বউও ছিল সীতা। ছেলে কুশ।"

"আছে মনে। কফু কেমন আছে ? কোথায় আছে এখন ?"

"সে আর জিজ্ঞেস করবেন না ঋজুবাবু। তার সঙ্গে হয়তো জঙ্গলেই দেখা হয়ে যাবে আমাদের। ভাবলেই কষ্ট হয়।"

"কেন, কী হয়েছে তার ? এই গুণ্ডা হাতির জঙ্গলে কী করছে সে ?"

"কফু পাগল হয়ে গেছে ঋজুবাবু। তার বউটা তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকেই পাগল-পাগল ভাব হয়েছিল। এখন উন্মাদ। একেবারেই উন্মাদ।"

"সে কী ! থাকে কোথায় ? কোনও ডেরা-টেরা নেই ?"

"ওই লবঙ্গির জঙ্গলেই।"

"বাংলোতে, না বস্তিতে ?"

"না বাবু, জঙ্গলে। গান গায় ! কখনও খালি গায়ে চাঁদনি রাতে বনময় ঘুরে বেড়ায়। গুহাতে বা নদীর ধারে গাছের ছায়ায় থাকে। এই গরমের আর বর্ষার দিনেই ভয়। যে-কোনওদিন সাপ বা বিছের কামড়ে মারা যাবে। আর মরে গেলে কেউ জানতেও তো পারবে না। হায়েনাতে শেয়ালে শকুনে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে। জংলি জানোয়ারে আর কফুতে কোনও তফাত নেই এখন আর।"

"ইশ্‌শ্। খায় কী কফু ?"

ঋজুদা দুঃখিত গলায় বলল।

"খাবে আর কী! নদীর জল আর বনের ফলমূল। ওই অঞ্চলে খুব বড়-বড় আমগাছ যে আছে, তা তো জানেনই। গরমের সময় আম খেয়েই পেট ভরে যায়। তবে ভয়ও আছে সেখানে। আম তো হাতি আর ভালুরও প্রিয় খাদ্য। আর এখানে যে কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভালু আছে তা তো আপনি দেখছেনই। আর এখন তো হাতির দল নয়, গুণ্ডা হাতির রাজত্ব। দুটো ভালুকেও থেঁতলে দিয়েছে গুণ্ডাটা। কাল দেখে এলাম আমরা। শকুন পড়েছে তাদের তালগোল পাকানো পিণ্ডর উপরে। হাতিটা কাছেই ছিল কি না তা কে জানে! জঙ্গলে হাতি যখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, গুণ্ডা হাতি হলে তো কথাই নেই, তখন তার গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগার আগে তো বোঝা পর্যন্ত যায় না।"

"তা ঠিক।"

ঋজুদা বলল।

তারপর আমাকে বলল, "বুঝলি রুদ্র, হাতিদের পথঘাট, চড়াই-উতরাই সম্বন্ধে এমনই জ্ঞান যে এঞ্জিনিয়াররাও তাদের সম্মান করে। ঠাট্টা নয় কিন্তু। যে-কোনও জায়গাতেই পি-ডব্লু-ডি অথবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, অথবা জঙ্গলের ঠিকাদাররা কাঠ গভীর জঙ্গল থেকে বের করে নিয়ে আসবার জন্য রাস্তা যখন তৈরি করে তখন হাতিদের চলাচলের পথ ধরেই সে রাস্তা তৈরি করা হয়। বিশেষ জরিপ, 'গ্র্যাডিয়েন্টের' হিসেবপত্রের ঝামেলা অনেক কমে যায়। অবশ্য এই সুবিধা পাওয়া যায় যে-জঙ্গলে হাতি থাকে সেখানেই। কোন জংলি নদীর ঠিক কোন্‌খানে ব্রিজ হবে তাও ঠিক করা হয় অনেক সময় হাতিদের নদী-পারাপারের জায়গা দেখে।"

এবার পম্পাশরের মোড়ে এলাম আমরা। বড় রাস্তা ছেড়ে ডান দিকের পাহাড়ে চড়ালাম জিপ। খুব খাড়া নয় পাহাড়। সেকেন্ড গিয়ারেই টেনে নিল। একটু গিয়েই ডান দিকে দুর্গাদার বাড়ি। দুর্গাদা তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে বলে নামল জিপ থেকে। ঋজুদাকে বলল, "একটু কিছু খেয়ে যাবেন না? রুদ্রবাবু তো এই প্রথম পম্পাশরে এল।"

ঋজুদা বলল, "তোমাদের বাড়িতে অনেকবার খেয়েছি। আর রুদ্র তো তোমার জামাই নয়। এবার শুধু জল খাব। তাড়াতাড়ি করো।"

জামাইয়ের কথা বলায় দুর্গাদা আর আমি দুজনেই লজ্জিত হলাম।

দুর্গাদা জিপ থেকে নেমে দৌড়ল।

রাজেনদা বিড়ি খাওয়ার জন্য জিপ থেকে নেমে গাছের আড়ালে যাচ্ছিল। ঋজুদা তাকে বকে দিয়ে বলল, "তোমাকে অনেকদিন বারণ করেছি। বলেছি না, আমার সামনেই বিড়ি খাবে।"

দুর্গাদা একটু পরেই ফিরে এল ঝকঝকে করে মাজা পেতলের ঘটি হাতে করে। সঙ্গে দুর্গাদার ত্রয়োদশী, লাল শাড়ি পরা, নাকে পেতলের নোলক আর

হাতে লালরঙা কাচের চুড়ি পরা লজ্জাবতী মেয়ে। তার হাতেও ঝকঝকে করে মাজা পেতলের থালা, তাতে দুটি ঝকঝকে গ্লাস উপুড় করা আর ক'টি বাতাসা। লজ্জাবতী ঝোপের পাশে দাঁড়ানো দুর্গাদার উজ্জ্বল মেয়েকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ঋজুদা শুধোল, "তোমার নাম কী?"

সে বলল, "পঞ্চমী।"

আমি ভাবলাম, "ত্রয়োদশীর পঞ্চমী হতে আরও দু'বছর বাকি।

"দুর্গাদা বলল, "মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি। সামনের শীতে। আপনি আসবেন তো ঋজুবাবু? রুদ্রবাবুদের সকলকে নিয়ে আসবেন। তিতির দিদিমণি, ভ্যাটকালুবাবুকে।"

আমি বলল, "ওর নাম ভ্যাটকালু নয়, ভট্‌কাই।"

দুর্গাদা জিভ কাটল।

ঋজুদা বলল, "আসতে পারি আর না পারি নেমন্তন্নের চিঠি যেন অবশ্যই পাই তারিখ জানিয়ে। খুব জরুরি কাজ না থাকলে অবশ্যই আসব।"

গেলাস দুটো সোজা করে দিয়ে শক্ত হাতে থালাটা ধরল পঞ্চমী। দুর্গাদা জল ঢেলে দিল ঘটি থেকে। আঃ, কী মিষ্টি, ঠাণ্ডা জল। ঝরনার জল বোধহয়।

"জামাই করে কী? ও দুর্গা?"

দুর্গাদা বলল, "জামাই বিন্‌কেইতে থাকে। ওদের একটা নৌকো আছে। তার বাবা আর সে চৌকো চালায়। যখন ভাড়া না পায় তখন মাছ ধরে। সাতকোশিয়া গণ্ডে।"

আমি ভাবলাম, বাঃ। কলকাতার খবরের কাগজগুলোতে পাত্র-পাত্রীর কলামে বিজ্ঞাপন বেরোয় পাত্র সুদর্শন, ব্যাঙ্কের চাকুরে অথবা ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তারপর থাকে, কলিকাতায় পৈত্রিক/নিজস্ব বাড়ি। আর পঞ্চমীর বিয়ে হবে যার সঙ্গে তার পরিবারের দু'পুরুষের সম্পত্তি বলতে একখানি নৌকো। অবশ্য মাথা গোঁজার মতো ঘর ডাঙাতেও নিশ্চয়ই থাকবে একটা!

দুর্গাদা যেন আমার মনের কথাই শুনতে পেয়ে বলল, "জমিজমা থাকলে কি আর নৌকো চালিয়ে খায়। ওই গভীর গণ্ড। তাতে কুমির ভরা। কিন্তু কী করব। গরিবের তো কোনও চারা নেই। যেমন জুটল তেমনই দিলাম। তাও আবার ছেলের বাপ একটা সাইকেল চায়। দশজন বরযাত্রীকেও খাওয়াতে হবে বিয়ের রাতে। খরচ কি কম!"

ঋজুদা বলল, "তোমার জামাইয়ের সাইকেলটা না হয় আমিই দিয়ে দেব। ও নিয়ে মোটেই চিন্তা কোরো না তুমি। আর পঞ্চমীকে দেব একটা সম্বলপুরি সিল্কের শাড়ি। এইরকমই লাল। যেমন লাল ও পরেছে। লাল রং বুঝি

তোমার খুব পছন্দ ? কী পঞ্চমী ? মধ্যে হাতির কাজ করা থাকবে। কী রে, পঞ্চমী, পছন্দ হবে তো ?"

পঞ্চমী লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। মনে হল, কেউ যেন ওর পায়ের কাছে লজ্জাবতীর ঝোপে আঙুল ছুঁইয়েছে। পঞ্চমী দাঁড়িয়েই ছিল লজ্জাবতীর ঝাড়ে। এমনও কি হয় ? ভাবছিলাম আমি।

দুর্গাদাও কম খুশি নয়। বলল, "বাবু, পূর্বজন্মে আপুনি মোর বাপ্প থিলা।"

ঋজুদা হেসে ফেলে বলল, "ভালই বলেছ।"

তারপর বলল, "সময় নষ্ট না করে নাও এবার চলো। যদি এ যাত্রা বেঁচে ফিরি তো ফেরার সময় তোর আর তোর মায়ের হাতে ডাল-ভাত খেয়ে ফিরব। বুঝলি পঞ্চমী ?"

পঞ্চমী সঙ্গে-সঙ্গে হেসে মুখ সামনে করে বলল, "কী ডাল খাবে ?"

ঋজুদা বলল, "বিরি ডাল।"

পঞ্চমী মাথা হেলিয়ে বলল, "আচ্ছা। তখন "না" বললে হবে না কিন্তু।

আমি ভাবছিলাম, খুব সপ্রতিভ, ঝকঝকে মেয়ে এই পঞ্চমী।

"বিরি" ডাল মানে কলাই ডাল। গরমে ঋজুদার খুবই প্রিয়।

রাজেনদাকে, যে-ক'টা বাতাসা ছিল, দুর্গাদা জোর করে খাইয়ে দিল। ঘটি থেকে রাজেনদা ঢকঢকিয়ে জল খেল, তারপর তার নীলরঙা ফুলহাতা শার্টের হাতা দিয়ে মুখটা মুছে নিল।

আমি জিপটা স্টার্ট করলাম।

দুর্গাদা পঞ্চমীকে বলল, "মু চলিলি রে মা। সাবধানে রহিবি তমমাঘে।"

পঞ্চমী মাথা হেলাল।

মাথা হেলানো দেখে মনে হল কথা বললে ওকে অত সুন্দরী দেখাত না। আমার এই সুন্দর দেশের গরিব ঘরের ঘর-আলো-করা রাজকন্যে !

পাহাড় চড়তে-চড়তে আমি শুধোলাম, "সাতকোশিয়া গণ্ড কী ব্যাপার ঋজুদা ?"

"সে কী রে ! তুই ভুলে গেলি ?"

অবাক গলায় বলল ঋজুদা। "সেই যে প্রথমবার তুই এসেছিলি আমার কাছে, যখন আমার সাতটা দিশি কুকুর ছিল জঙ্গলে, যাদের নাম ছিল, 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি'। আর তুই তো সেবারের আসা নিয়ে 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে' না কী একটা বইও লিখেছিলি !"

"ও তাই তো ! ভুলেই গেছিলাম। নয়নামাসিরাও তখন এসেছিল টিকরপাড়া বাংলোতে। তাই না ?"

"হ্যাঁ।" ঋজুদা বললে।

তারপর বলল, "সাতকোশিয়া গণ্ড হচ্ছে সাত ক্রোশ বা চোদ্দ মাইল লম্বা 'GORGE' বা গিরিখাত, যার আরম্ভ হচ্ছে বিন্‌কেইতে। চৌদুয়ারে পৌঁছবার

আগেই হঠাৎ চওড়া হয়ে ছড়িয়ে গেছে মহানদী, তিস্তা যেমন কালিঝোরার পর করোনেশন ব্রিজ পেরিয়েই হয়েছে, জব্বলপুরের মার্বেল-রক পেরিয়েই যেমন নর্মদা। এই গণ্ডের দু'পাশেই গভীর জঙ্গল-পাহাড়। এখানের নদীতে মাছ আর কুমিরের ছড়াছড়ি। হাজার-হাজার বাঁশের ভেলা বানিয়ে ঠিকাদাররা বাঁশ চালান দেয় কাগজকলে। সেই ভেলা করে একবার গিয়েছিলাম টিকরপাড়া থেকে চৌদুয়ার। তার ডায়েরিও রেখেছিলাম একটা। খুঁজে বের করতে হবে। সে এক অভিজ্ঞতা।"

এইবার জিপ বেশ উঁচুতে চলে এসেছে। পাহাড়ের একেবারে গায়ে-গায়ে নাবাল মাটির রাস্তা আর তার ডান দিকে গভীর খাদ। গভীর জঙ্গলে ভরা তা। কিন্তু নীচের সব কটি গাছই গেণ্ডুলি। একটি শিমুলও আছে। গেণ্ডুলি গাছে এখন একটি-দুটি পাতা এসেছে, শিমুল গাছেও নতুন পাতা এসেছে। ওই ন্যাড়া, রুক্ষ পটভূমিতে শিমুল গাছগুলোর গায়ে কিছু-কিছু কিশলয় কী যে সৌন্দর্য এনে দিয়েছে তা বলবার নয়।

ঋজুদা বলল, "এই গেণ্ডুলি গাছগুলো কেন বড় করা হচ্ছে জানিস ? লালনপালন ?"

"কেন ?"

"এই গাছ দিয়ে, সম্ভবত এর আঠা দিয়ে, পলিয়েস্টার ফাইবার তৈরি হয়। নরম গাছ তো ! আঁশ থাকে এতে। যেসব মানুষ পলিয়েস্টারের জামা পরতে ভালবাসেন, তাঁদের যদি ওই গাছগুলোকে গ্রীষ্মে বা শীতে বা বর্ষায় বা বসন্তে একবার দেখবার সুযোগ দেওয়া হত, তা হলে তাঁরা সকলেই বলতেন, থাক, থাক। এই গাছগুলো বাঁচুক, বন বাঁচুক। পলিয়েস্টারের জামা আমরা পরব না। বিজ্ঞানের অগ্রগতিটুকুই আমাদের চোখ ধাঁধাঁয়, কিন্তু সমস্ত চোখ-ধাঁধানো নতুন-নতুন পণ্যের পেছনে যে প্রকৃতি চোখের জল ফেলতে-ফেলতে রিক্ত, বিবস্ত্র, নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষে-ভরা এই দেশে, তার খবর ক'জন আর রাখে বল ?"

দুর্গাদা আমাকে বলল, "রুদ্রবাবু, এবার একটু আস্তে চলো। সামনে পর পর বাঁক আছে কয়েকটা। হাতির জায়গায় তো পৌঁছেই গেছি আমরা। বিশ্বাস কী তাতে ? জিপের শব্দ শুনেই হয়তো বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়ে রইল। এক ধাক্কায় জিপকে ফেলে দেবে নীচে।"

ঋজুদা বলল, "জিপটা একটু দাঁড়ই করা রুদ্র। রাইফেল আর গুলিগুলো বের করে নে।"

রাজেনদা বলল, "পরে বের করলেও হবে। আমার হাতে তো দু'নলা বন্দুক আছে।"

ঋজুদা বলল, "এ যদি তোমার বন্দুকেরই কম্ম হত রাজেন, তবে কি আমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে আনতে তোমরা ? নিজেরাই কখন কাজ সেরে রাখতে যে, না

জানতে পেতাম আমি, না ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট !"

রাজেনদা লজ্জা পেল।

আমি জানতাম যে, রাজেনদা চোরা-শিকার করে। দুর্গাদাও করে। কিন্তু তা করে একটু মাংস খেয়ে মুখ বদলাবারই জন্যে। ন'মাসে-ছ'মাসে একটু মাংস খেতে পায় ওরা। সেজন্য বন-জঙ্গলের বেশি মানুষই প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সিতে ভোগে। সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ই রিলেটিভ, মানে আপেক্ষিক। প্রত্যেক মানুষকে তার পটভূমিতে ফেলে বিচার করে তারপরই রায় দিতে হয়। তাই বোধহয় কথায় বলে, 'ল ইজ নাথিং বাট কমন সেন্স'।

"তোর রাইফেলে গুলি ভরিস না। আমার রাইফেলটা দে। হাতে ধরে বসে থাকি।"

ঋজুদা বলল আমাকে, রাইফেল দুটো বের করার পর।

পথটা এঁকেবেঁকে চলেছে। বাঁ দিকে একেবারে সোজা পাহাড়। কোথাও-বা একটু ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখায়। সেরকম একটি ন্যাড়া জায়গাতে দেখি বাঁদরদের সভা বসেছে। ওদের পঞ্চায়েত নির্বাচন বোধহয় এসে গেছে। নেতা বক্তৃতা করছে। অন্যেরা শুনছে, কেউ গালে, কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে। কেউ-বা শুনছে মাথার উকুন বাছতে-বাছতে। অনেকেরই মুখ বাঁদরদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন। জনগণ সম্বন্ধে ভেবে ওদের নেতাদেরও রাতে ঘুম হচ্ছে না। মাথার চুলও পাতলা হয়ে গেছে।

রাজেন বলল, 'এবারে পথটা ছেড়ে ডান দিকের নীচের পথে নামতে হবে মাঠিয়াকুদু নালার দিকে।"

দেখতে-দেখতে গভীর জঙ্গলের দিকে জিপ গড়িয়ে যেতে লাগল। বেলা দশটাতে ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল।

মাঠিয়াকুদু নালার কাছাকাছি পৌঁছে জিপ থামিয়ে দিলাম।

রাজেনদা বলল, "জিপটাকে ছেড়ে যাওয়া চলবে না। রুদ্রবাবু আর দুর্গা জিপেই থাকুন। এবং জিপটা ঘুরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করান। গায়ে রোদ লাগলে লাগবে। তবু হাতি এলে তাকে দেখার সুযোগ পাবেন। জঙ্গল থেকে একটু দূরেই থাকুন। আমি আর ঋজুবাবু একটু নেমে দেখে আসি।"

রাজেনদার কথামতোই কাজ করলাম।

ঋজুদা বলল, "এবার তোর রাইফেলে গুলি ভরে নে। তবে হাতি এলেও তুই একা গুলি করবি না। জোরে জিপ চালিয়ে চলে যাবি। দুর্গা লবঙ্গির ফরেস্ট বাংলোর পথ চেনে।"

"কেন ?"

"যা বললাম তাই করিস। এখন তর্কাতর্কির সময় নয়।"

"আমরা না হয় হেঁটেই ফিরব তেমন হলে। তবে ফিরতে ফিরতে বিকেল

হয়ে যাবে। দেরি দেখলে আবার জিপ নিয়ে ফিরে আসিস, বা নালা অবধি না ফিরে, দূরে দাঁড়িয়ে থাকিস। ফাঁকায়। গুলি করতে পারিস নেহাত প্রাণ বাঁচানো জরুরি হয়ে পড়লে। ওই হাতি শিকারের জন্যে তোর রাইফেল দিয়ে গুলি করিস না আমি সঙ্গে না থাকলে। আবারও বলছি। মনে রাখিস।"

চলে যাবার আগে, ঋজুদা বলল, "হাতির কোথায় গুলি করতে হবে জানিস তো ? মনে আছে ? 'রুআহা'তে ভাল করে শিখিয়েছিলাম তোকে।"

"হ্যাঁ, মনে আছে।" বিরক্ত গলায় বললাম।

ঋজুদাটা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। একই কথা বারবার বলে আজকাল।

"গুলি কিন্তু তুই করছিস না। নেহাত প্রাণ বিপন্ন না হলে।"

"ঠিক আছে।"

আরও বিরক্ত হয়ে বললাম।

ঋজুদা আর রাজেনদা গাছগাছালির মধ্যে হারিয়ে গেল।

রোদের মধ্যে বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে ছায়াচ্ছন্ন জঙ্গলের দিকে চাইলে জঙ্গলকে আরও বেশি ছায়াচ্ছন্ন ও স্নিগ্ধ লাগে। দুর্গাদাকে বললাম, "তুমি জিপের পেছনে বসে সামনের দিকে দ্যাখো আর ডান দিকে।"

আমি বসে ছিলাম লোডেড রাইফেল নিয়ে জঙ্গলের দিকে মুখ করে, ঋজুদারা এগিয়ে গেল সেইদিকেই।

দুর্গাদা বলল, "তেষ্টা পেয়ে গেল যে। তুমি বোসো। আমি নালা থেকে একটু জল খেয়েই আসছি।"

"সাবধানে যাবে। নিজের বাড়িতে জল খেতে পারলে না ? হাতির ফুটবল হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি তোমার ?"

আমি বললাম।

দুর্গাদা বলল, "রাখো তো। হাতি সেটি মু পাঁই ঠিয়া রহিছি। হঃ।" অর্থাৎ ছাড়ো তো, হাতি যেন আমার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

"নালাটা তো দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তুমি যাচ্ছটা কোথায় ?"

"কাছেই।"

বলেই দুর্গাদা জঙ্গলের দিকে এগোল।

যাবার আগে বলে গেল, "চুপ করে থাকলে জল বয়ে যাওয়ার কলকুলানি শব্দ তুমিও শুনতে পাবে।"

ঘড়িতে চেয়ে দেখলাম, প্রায় এগারোটা বাজে। কী করে যে সময় যায় ! দুর্গাদা চলে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। জল খেয়ে ফিরে আসতে এতক্ষণ সময় লাগার কথা নয়। আমার মন কীরকম যেন করছে। কখনও এমন করে না। গুণ্ডা হাতি সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতাই আমার নেই। তিতিরটা সঙ্গে থাকলে বেশ হত।

ঋজুদার কাছে গল্প শুনেছিলাম, ডুয়ার্সের এক চা-বাগানের একজন ইংরেজ,

অল্পবয়সী অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার, সার্গেসান, একদিন বর্ষাকালের এক বিকেলে মুরগি মারতে গেছিল। ঝোপের মধ্যে মোরগের ডাক শুনেই যেই না ঢুকেছে পাশে মেঘমেদুর বিকেলে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাতি অমনি শুঁড়ের এক ঝটকানিতে তাকে তুলে নিয়ে মাটিতে ফেলে পা চাপিয়ে দিয়েছিল তার মাথার উপর। সে না ফেরাতে, রাতে দুশো কুলি নিয়ে মশাল জ্বেলে তার বাগানের এবং অন্যান্য বাগানের ম্যানেজাররা রাইফেল নিয়ে গিয়ে খুঁজতে-খুঁজতে তার বীভৎস মৃতদেহ পায়।

দুর্গাদাটা তো আচ্ছা লোক। এমন খামোখা চিন্তা করাতে পারে না। ভারী বিরক্ত লাগছে আমার। জল খেতে গেল তো ভগবানের নামেই গেল।

পথের পাশের বড়-বড় সব প্রাচীন গাছে নেপালি ইঁদুররা একে অন্যকে তাড়া করে ফিরছে। ঝরঝর শব্দ হচ্ছে পাতায়। স্নিগ্ধ বৈশাখী সকালে রোদ ছিটকে যাচ্ছে বড় গাছেদের সবুজ পাতা থেকে, তাদের দৌড়াদৌড়িতে। এমন সময় একটি বিরাট শিঙাল শম্বর বন থেকে বেরিয়ে এসেই জিপটা ও আমাকে দেখে চমকে উঠে "ঘ্যাক্" করে একবার ডেকেই বনের ভিতরে চলে গেল। জল খেতে যাচ্ছিল বোধহয়। লবঙ্গির জঙ্গল এমনিতেই অত্যন্ত গভীর এবং জনমানবশূন্য। হাতির অত্যাচার তাকে আরও ভয়াবহতা দিয়েছে। এই নির্জনে অন্ধকার নামা পর্যন্ত জলে যাবার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করছে না আর জানোয়ারেরা।

এমন সময় মনে হল, দুর্গাদার গলার স্বর শোনা গেল। তা হলে কি ঋজুদারাও ফিরে এল ? এত তাড়াতাড়ি ? কথা বলল, কার সঙ্গে ?"

উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলাম নালাটা যেখানে থাকার কথা সেদিকে।

সবুজ অন্ধকারের গভীর থেকে যে-লোকটি বেরিয়ে এল, সে কিন্তু দুর্গাদা নয়। অন্য লোক। সম্পূর্ণ নগ্ন। বড়-বড় চুল-দাড়ি। প্রকাণ্ড বড়-বড় নখ হাত-পায়ের। কানের চুলও ঝুপড়ি হয়ে আছে। নাকের চুলও। লোকটা বেশ লম্বা। আর তার চোখ দুটোতে আগুন জ্বলছে। তার হাত-পায়ের নখের মধ্যে লাল মাটি ঢুকেছে এমন করে যে মনে হচ্ছে, রক্ত খেয়েছে হাত দিয়ে কোনও কিছুর মাংস ছিঁড়ে।

লোকটা কী যেন বিড়বিড় করে বলতে-বলতে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছে আসতেই শুনলাম, বলছে, "আলো শুকিলা সারু, মন মরি গলা দ্বিপাহারু।"

বারবার এই এক কথাই বলছে।

বাক্যটির মানে হল, ওরে শুকনো কচু ! তোর মন মরে গেল দ্বিপ্রহরেই !

লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ চোখে আমার চোখে চেয়ে রইল। তারপর বলল, "মু হেল্বা বারুঙ্গা আউ তু ভদ্দরনোক। মু মারিলে তু

বাঁচিবি ? চাল্। গোগুলি বন-মধ্যরে আজি তমকু কব্বর দেবি মু।"

কী বিপদেই পড়লাম রে বাবা। বনের প্রাণীদের মোকাবিলা করতে পারি, কিন্তু বনের মানুষকে নিয়ে কী করি ?

তার ভাবগতিক দেখে আমি রাইফেলটাকে তুলে নিয়ে কোলের উপরে রাখলাম।

তা দেখেই লোকটা হাহা করে হেসে উঠল। তার হাসিতে ছায়াচ্ছন্ন বন আর রৌদ্রদগ্ধ গেণ্ডুলি বনও যেন হাহা করে উঠল।

বলল, "মত্তে মারিবি তু ? গুলি মত্তে বাজিবনি।"

বলেই দুটো হাত দু'পাশে তুলে ঝরনা খেলাল।

আমি ততক্ষণে জিপের বনেট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছি রাইফেল হাতে।

হঠাৎ লোকটা দু'হাত তার মুখের কাছে নিয়ে, যেদিকের বনে শিঙাল শম্বরটা ঢুকে গিয়েছিল, সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে খুব জোরে ডাকল, "কুয়ারে পলাইলিরে ঐরাবত্ব। চঞ্চল করিকি আ তু ! আ রে। চঞ্চল করিকি আ।"

বলতেই, ওইদিকের জঙ্গলের গভীরে একটি আলোড়নের শব্দ শুনতে পেলাম আমি। গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল আমার। উত্তেজনায়। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে পাহাড়ের মতো এক হাতি সত্যিই জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল। তার দাঁত দুটো মাটিতে লুটোচ্ছিল। এত বড় হাতি যে, মনে হল আফ্রিকাতেও দেখিনি। হতবাক হয়ে গেলাম আমি। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার চেহারা দেখেই।

হাতিটা পাঁচ মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এক দৌড়ে এগিয়ে এল খুব আস্তে-আস্তে। আমি রাইফেল তুলে তার কপালে নয়, কানের পাশে কাভার করে রইলাম। যদি সত্যিই চার্জ করে। কিন্তু ঋজুদার কথাও মনে পড়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। এক ধাক্কায় আমি সেই লোকটাকে জিপের পেছনের সিটে ফেলে স্টিয়ারিং-এ বসে যত তাড়াতাড়ি পারি এঞ্জিন স্টার্ট করে জিপ ছোটালাম রাইফেল পাশে শুইয়ে রেখে।

শিকারে যাওয়ার সময় যে জিপেই যাই, জিপের হুড খোলা থাকে। সামনের উইন্ডস্ক্রিনও শোয়ানো থাকে বনেটের উপর। এই কারণেই সেডান-বডির জিপ আমরা কখনওই নিই না। কিন্তু এতখানি পথ আসতে হবে বলে, হুড যদিও খোলা ছিল উইন্ডস্ক্রিন নামানো ছিল না চোখে হাওয়া লাগে বলে। বোধহয় কুড়ি গজও উঠিনি চড়াই-এ এমন সময় পেছন থেকে এক চিৎকার শুনে রিয়ার-ভিউ-মিররে চেয়ে দেখি, লোকটা পেছন দিক দিয়ে জিপ থেকে এক লাফ মেরে নেমে হাতিটার দিকেই দৌড়ে যাচ্ছে।

ব্রেক করে মুখ ঘুরিয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। কী হয়, কী হয় !

হাতিটা বন থেকে বেরিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এই লোকটা যে কে আমি জানি না, তবে টারজান বা

অরণ্যদেবের মতো কেউ হবে বোধহয় এইটুকু মনে হচ্ছিল, নইলে কোনও গুণ্ডা হাতি কোনও মানুষের কথা এমন শোনে !

লোকটা টালমাটাল পায়ে হাতিটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ডান হাত তুলে হাতিকে কী বোঝাতে বোঝাতে।

হাতিটা মুহূর্তের মধ্যে ক্যানাডিয়ান লোকোমোটিভ স্টিম এঞ্জিনের মতো এক দমে শুঁড় লটপটিয়ে ছুটে এসে লোকটাকে শুঁড় দিয়ে এক ঝটকাতে উপরে তুলে নিল। এবার তার পিঠে বসাবে মনে হল। কিন্তু পিঠে না বসিয়ে পথের পাশের কতগুলো বড় পাথরের স্তূপে লোকটাকে এক প্রচণ্ড আছাড় মারল হাতিটা। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই শব্দ করে লোকটার কপাল ফেটে গেল। হাড়গোড় সব চুরচুর হয়ে গেল। থকথকে ঘিলু ছিটকে গিয়ে লাগল কালো পাথরে। ই রে ! লালচে-হলদেটে রঙের ঘিলু।

তারপর হাতিটা লোকটাকে মাটিতে ফেলে প্রথমে বাঁ পা তারপর ডান পা দিয়ে তাকে যেন ঘন ঘৃণার সঙ্গে বারেবারে মাড়াল। মাড়িয়ে, জিপের দিকে এবং রাইফেল-হাতে দাঁড়িয়ে-থাকা শিকারি, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করে পথটা পেরিয়ে যেদিক দিয়ে এসেছিল, তার ঠিক উলটো দিকের পত্রশূন্য, রোদ-ঝাঁঝাঁ-করা গেণ্ডুলি বনে ঢুকে গেল। পত্রশূন্য বলেই, দেখতে পেলাম, অবিশ্বাস্য গতিতে চোখের পলকে সে এত দূরে চলে গেল যে, কিছু পরে তাকে আর দেখাই গেল না।

এমন সময় দেখলাম, ঋজুদারা দৌড়ে আসছে।

ওঁদের দেখেই আমি সঙ্গে-সঙ্গে জিপ ব্যাক করে তাড়াতাড়ি ওঁদের দিকে নিয়ে গেলাম।

নিজের উপর বড়ই ঘেন্না হচ্ছিল আমার। আর প্রচণ্ড রাগও হচ্ছিল ঋজুদার উপরে। হাতে ফোর-ফিফটি ফোর-হান্ড্রেড লোডেড ডাবল-ব্যারেল রাইফেল থাকতেও আমার সামনে একটা লোক দিনদুপুরে খুন হয়ে গেল, অথচ তাকে বাঁচাতে পারলাম না আমি। এমনকী বাঁচাবার চেষ্টাও করলাম না। ছিঃ। এই না হলে শিকারি। এবার থেকে ঋজুদার চামচেগিরি করাই ছেড়ে দেব। মনে-মনে ঠিক করলাম।

ঋজুদা একবার দ্রুত গেণ্ডুলি বনের দিকে তাকাল, তারপর পড়ে-থাকা মানুষটার দিকে। তাকে মানুষ বলে চেনার আর উপায় ছিল না কোনও। তাকে তালগোল পাকিয়ে দিয়ে হাতি তার লজ্জামোচন করছিল।

দুর্গাদা, রাজেনদা আর ঋজুদা আমাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে নিজেরা নিচু গলায় কীসব আলোচনা করল দ্রুত। পরক্ষণেই রাজেনদা আর ঋজুদা আমাকে কিছু না বলেই খুব দ্রুত গেণ্ডুলি-বনের উপত্যকাতে নেমে গেল। এবং দ্রুতগতি হাতিটারই মতো অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

দুর্গাদা গুটিগুটি ওই মানুষটার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর তাকে ভাল

করে দেখে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নালার দিকে ফিরে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। বসে পড়ে আমাকেও ডাকল ইশারাতে।

জিপের এঞ্জিন তখনও চলছিল। সেটাকে বন্ধ করে রাইফেল হাতেই আমি দুর্গাদার কাছে গিয়ে পাশে বসলাম একটা পাথরের উপরে। তারপর ফিসফিস করে বললাম, "তুমি দেরি করলে কেন ? জল খেতে কতক্ষণ লাগল তোমার ?"

দুর্গাদা বলল, "জল খেতে আর পারলাম কোথায় ?"

"সে কী ! কী করলে তা হলে এতক্ষণ !"

"নালার কাছে গিয়ে একটু পরিষ্কার জল দেখে নিচু হয়ে বসেছি, আর দেখি হাতি।"

"কোথায় ?"

"আমার ঠিক পেছনে।"

"বলো কী ! তারপর ?"

"আর কী। জল খাওয়া তো মাথায় উঠল। সামনেই একটা মস্ত আমগাছ। কিন্তু সেটা এতই মোটা যে, দু'হাতে তার বেড় পাওয়া অসম্ভব। অতএব তার পাশেই যে কস্‌সি গাছ ছিল, সেই গাছে বাঁদরের চেয়েও তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম তরতর করে। হাতি একবার শুঁড় বাড়িয়ে ধরার চেষ্টাও করল আমাকে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, সে আমার প্রতি আর মনোযোগী নয়। একটুও শব্দ করল না কিন্তু।"

"হাতি ওখানে ছিল তো ঋজুদাদের ধরল না কেন ?"

"আমিও তো তাই ভাবছি।"

"হাতি একবার শুঁড় দিয়ে ধরবার চেষ্টা করে যখন আমার নাগাল পেল না, তখনই তোমার দিক থেকে একটা শম্বর ডাকল ধ্বাক্ করে। তুমি কোনও শম্বর দেখেছিলে ?"

"হ্যাঁ। শম্বরটা বন থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখেই ডেকে আবার বনের ভিতরে চলে গেল।"

"কী শয়তান হাতি দ্যাখো। শম্বরের ডাক শুনে ও বুঝেছিল যে, শম্বরটা কিছু দেখে অবাক হয়েছে। তবে বাঘ দ্যাখেনি। বাঘ দেখলে শম্বরেরা যেমন করে ডাকে, সে ডাক অন্য।"

হাতিটা শম্বরের ডাক শুনেই সঙ্গে-সঙ্গে জঙ্গলের ছায়ায়-ছায়ায় সোজা ডান দিকে চলে গিয়ে বাঁ দিক দিয়ে গিয়ে তোমার দিকে চলে এসেছিল।"

"ওই লোকটা এল কোথা থেকে ? লোকটা কে ?"

"কোথা থেকে এল তা কী করে জানব। তবে ও তো আমাদের কম্ফু। আহা, কার কী পরিণতি ! ও কত বড় ডাক্তার ছিল, তোমরা বিশ্বাস করবে না, জানলেও। ওর কাছে কর্কট রোগের ওষুধ ছিল জানো ?"

"মানে, ক্যানসারের ওষুধ ?"

"হ্যাঁ। না তো কী !"

"আমাদের একটা মোষের ভেঙে যাওয়া পা ও যেমনভাবে সারিয়েছিল অল্প দিনে, তেমনভাবে কটকের নামী হাড়ের-ডাক্তার আর ছুরি-চালানো ডাক্তারেরাও পারত না। পুটকাসিয়া লতার গোড়া, কচি শিমুলের গোড়ার শিকড়, হাড়কঙ্কালির ছাল, জড়া তেলের সঙ্গে বেটে সেই ওষুধটা তৈরি করেছিল। তারপর সেই ওষুধ লাগিয়ে ডবা-বাঁশ কেটে স্প্রিন্টার তৈরি করে তা দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল পা। কম্ফুর মতো বদ্যি এদিকের পাহাড়-বনে কমই ছিল। সম্বপ-রস খেয়ে লোকে অসুস্থ হলে কম্ফু একটি বটি দিত আর সঙ্গে-সঙ্গে সব ঠিক। বুঝে দ্যাখো। একটি মাত্র বটি !"

"এতই বড় বদ্যি যদি সে, তা হলে তোমরা তাকে এমন করে মরতে দিলে কেন দুর্গাদা ? তাকে ঘরে কেউই জায়গা দিলে না কেন ?"

দুর্গাদা ডান হাতটা কোমর অবধি তুলল। তারপর অনেক কিছু বলতে চেয়েও থেমে গিয়ে সংক্ষেপে বলল, "বন যাকে জাদু করে, মরণ যাকে ডাকে, তাকে ঘরে ধরে রাখে এমন সাধ্যি আছে কার ? সবই আমাদের কপাল রুদ্রবাবু।"

"তা হাতিটা যদি ওখানেই ছিল, ঋজুদা আর রাজেনদাকে ধরল না কেন ? ওরাই বা দেখতে পেল না কেন ? অবাক কাণ্ড !"

"সত্যিই তাই। হাতি তো ছিলই। একেবারে ওদের পাশেই ছিল। দোষ তো রাজেনের। মাঠিয়াকুদু নালাতে হাতির পায়ের ছাপ কাল যেখানে দেখেছিল সটান সেখানেই নিয়ে যাচ্ছিল ঋজুবাবুকে। আরে, কাল যেখানে হাতি ছিল আজও যে ঠিক সেখানেই থাকবে, এ-কথা কোনও শিকারির পক্ষে কী করে বিশ্বাস করা সম্ভব হল, তা তো আমি ভেবে পাই না। আসলে ঋজুবাবুর পোশাক, হাতের রাইফেল আর পাইপের গন্ধে হাতি সামলে নিয়েছিল নিজেকে। রাজেন একা থাকলে আজ কম্ফু বেঁচে যেত। ওই মরত।"

"ঋজুদারা গেল কোথায় ?"

"হাতির পিছনে।"

"দেখা পাবে ? পেছনে-পেছনে দৌড়ে ?"

"পাগল ! হাতি ততক্ষণে দু'মাইল চলে গেছে। গেণ্ডুলি বনের বাঁ দিকে একটা বড় দহ আছে। মাঠিয়াকুদু নালাটা গিয়ে পড়েছে সেখানেই। ওই নদীতে দহমতো আছে একটা। হাতি নিশ্চয়ই দুপুরবেলাটা সেখানেই গা ডুবিয়ে থাকবে।"

"তুমি যদি জানোই তবে সঙ্গে গেলে না কেন ?"

"আমাকে নিয়ে গেলে তো। রাজেন এ-জঙ্গলের কী জানে ? ও রেড়াখোল আর ঢেন্‌কানলের জঙ্গলের মুহুরি। এই মাঠিয়াকুদুতে আমি পরপর পাঁচ বছর ক্যাম্প করে থেকেছি। ফুটুবাবুদের লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে এই জঙ্গল

থেকে। এমন ভাল কাঠ খুব বেশি জঙ্গলে নেই। তা রাজেন মাতব্বরের আমার সঙ্গে শলা করারও সময় হল না ! থাকগে ! মরুকগে ঘুরে।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু ঋজুদা কি জানে না তোমার অভিজ্ঞতার কথা ?"

"জানবে না কেন ?"

"তবে ?"

"ওই রাজেনের লোভ।"

"কিসের লোভ ?"

অবাক হয়ে বললাম আমি।

"ঋজুদা বলেছে না ওকে একটা থ্রি-ফিফটিন রাইফেল কিনে দেবে এবং ডিভিশনাল কমিশনারকে বলে লাইসেন্সও করিয়ে দেবে। তাই ও তেল দিচ্ছে ঋজুবাবুকে। তেল দিতে গিয়ে ঋজুবাবুর প্রাণটাই নিয়ে নেবে। যা মনে হচ্ছে তাতে।"

"তেল দিলে ঋজুদা কি বুঝতে পারত না ?"

"কী যে বলেন রুদ্রবাবু ! ভগবানও পর্যন্ত বুঝতে পারেন না, আর ঋজুবাবু ! তেলের মতো সাঙ্ঘাতিক বিষ আর নেই। তা ছাড়া রাজেন আমাদের হুঁশিয়ার লোক। তেল কি সকলে দিতে জানে ? মবিলের ফুটোয় পেট্রল, আর পেট্রলের ফুটোয় মবিল দিয়ে দিলেই সব গোলমাল। রাজেন তেমন ভুল করে না। চালু পার্টি।"

"রাজেনদা তো খুব ঠাণ্ডা লোক। মুখে কথাটি নেই। কারও নিন্দা করে না কখনও। তুমি তার সম্বন্ধে এমন খারাপ কথা বলছ কেন আমাকে ? শুনে আমার কী লাভ ?"

"ভাবছ তাই। ও জায়গা বুঝে চলে। হাড়কেপ্পন বদমাশ লোক। জায়গা বুঝে দাতা। জায়গা বুঝে বক্তা। নিজে হাতে পিঁপড়ে মারে না বলে মানুষে জানে। অথচ বাঘ-ভাল্লুক ওই মারে আকছার। তবে অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে। কারও জানবার জো-টি পর্যন্ত নেই। বড় সাঙ্ঘাতিক মানুষ আমাদের এই ভাজা মাছটি উলটে খেতে-না-জানা ভাব-করা রাজেন মুহুরী। আমাদের এই গুণ্ডা হাতির চেয়েও ও বেশি ভয়ের।"

"এতোই যদি খারাপ ধারণা রাজেনের সম্বন্ধে তা হলে সঙ্গে থাকো কেন ?"

"ওই তো। আমাদের মালিক যে এক। মালিক যদি চোখ বন্ধ করে থাকেন, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন, শুধুই নিজের লাভের কড়ি গোনেন তবে রাজেনের মতো মানুষের বাড় বাড়বে না ? লাভ-লোকসান ছাড়াও কিছু অঙ্ক থাকে জীবনে, যা সময়ে না মেলালে পরে আর মেলে না। বুঝেছ রুদ্রবাবু ? সেটাই আমার মালিক বুঝলেন না।"

"এতসব বড়-বড় এবং গোলমেলে কথা আমার মাথা গোলমাল করে দিল। দুর্গাদাকে আমার যেমন ভাল লাগে, তেমনই রাজেনদাকেও লাগে। এসব

শুনতে আমার ভাল লাগছিল না।"

আমার মনের কথাই যেন বুঝতে পেরে দুর্গাদা বলল, "পৃথিবীর সব মানুষ, সব জানোয়ারই ভাল ঋজুবাবু, এমনকী এই হাতিটাও ভাল। ভাল, যতক্ষণ না তোমার স্বার্থে সে হাত দিচ্ছে। স্বার্থে হাত পড়লেই শুধু বোঝা যায়, স্বার্থ ভাগাভাগি করে খাওয়ার সময়েই জানা যায় কে কত্ত ভাল। তার বাইরের ভাল-মন্দ নেহাতই পোশাকি। বুঝেছ?"

ঋজুদা আর রাজেনদার গলা শুনতে পেলাম। ওরা ফিরে আসছে।

ওদের গলা শুনে আমি ও দুর্গাদা উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

"কী হল?"

আমি বললাম।

ঋজুদা হাসছিল।

বলল, "কিছু হয়নি এখনও, তবে হতে পারে।"

দুর্গাদা বলল, "বড় নদীর দহটার দিকে গেছিলে?"

ঋজুদা অবাক হয়ে বলল, "কোন্ দহ?"

দুর্গাদা বলল, "রাজেন কি জানো দহটার কথা?"

বিরক্তির গলায় রাজেনদা বলল, "কোন্ দহ? এ-জঙ্গলে কোনও দহ-টহ নেই। মাঠিয়াকুদুতে চাকরি করেছ সুরবাবুদের ক্যাম্পে, তা বলে জঙ্গল আমার চেয়ে তুমি ভাল চেনো দুর্গা তা আমি বিশ্বাস করি না।"

দুর্গাদা চুপ করে রইল মাথা নামিয়ে।

তারপর বলল, "তবে তাই।"

ঋজুদা বলল, "রাজেন, আগে কম্ফুর কী বন্দোবস্ত করবে, তা ঠিক করো। ওর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?"

"এক ভাই আছে।"

"কোথায়?"

"চৌ-দুয়ারে।"

"সে তো অনেক দূর। এক্ষুনি নিয়ে যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া যে-ভাই দাদাকে এইভাবে আজ দু' বছর ছেড়ে রেখেছে জঙ্গলে-পাহাড়ে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়, সে মুখে আগুন দিল কি দিল না তাতে যায় আসে না কিছুই। ওকে আমরাই দাহ করব মাঠিয়াকুদু নালার ধারে। সেখানেই বহু বছর ও থেকেছে। ক্যাম্পে কাজ করেছে। চলো, আমরা ওকে সেখানেই বয়ে নিয়ে যাই। দাহ করব রাতে।"

"যদি পুলিশে গোলমাল করে? পুলিশের একমাত্র কাজই তো গোলমাল করা।"

দুর্গাদা বলল।

"না, তা না। তবে পোস্টমর্টেমের মতো দুর্গন্ধ, লজ্জাকর প্রহসনের কোনও দরকার নেই। গ্রামাঞ্চলের দু-একটি পোস্টমর্টেমের অভিজ্ঞতা আমার আছে। ওসব ভুলে যাও তোমরা। পুলিশ তো গ্রেপ্তার করবে আপনাকে এই মৃতদেহ জ্বালিয়ে দিলে। সে আমি বুঝব এখন। তোমাদের চিন্তা নেই।"

"রাজেন তুমি বন্দুক হাতে গাছে বসে ওর শব পাহারা দেবে। ততক্ষণে দুর্গাকে নিয়ে আমরা হাতিটার একটু খোঁজ করে আসি।"

"এখন যাবেন? এই রোদে! দুটো প্রায় বাজতে চলল। খাওয়াদাওয়া?"

রাজেন বলল।

এই কথাতে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে তাকাল ঋজুদা রাজেনের দিকে।

"কম্ফুকে তো আমার চেয়ে তোমরা অনেক বেশি চেনো। তোমাদেরই সহকর্মী ছিল সে। তার মৃত্যুর কারণে আমাদের সকলেরই আজ উপোস। তার আত্মার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য।"

দুর্গাদা বলল, "নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। তাই তো করা উচিত।"

ঋজুদা বলল, "চল্, নালা থেকে পেট ভরে জল খেয়ে নিই। যা রোদ। কখন আবার খাওয়া জোটে তার ঠিক কী।"

"আদৌ কোনওদিন জোটে কি না, তারই বা ঠিক কী!"

আমি বললাম, কম্ফুর দিকে চেয়ে।

"যা বলেছিস।"

বললাম, "চলো।"

ঋজুদা বলল, "তার আগে চল সকলে ধরাধরি করে কম্ফুকে ছায়াতে নিয়ে গিয়ে শোওয়াই। বড় রোদ লাগছে বেচারার। একটা মানুষের মতো মানুষ ছিল রে কম্ফু। ওর বউ ওর মতো মানুষের দাম বোঝেনি।"

আমি বললাম, "যদি নাই-বা দাম বোঝে কেউ তা হলেও চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার তো কোনও মানে নেই।"

"নিশ্চয়ই নেই।"

ঋজুদা বলল।

আগে আমরা রাইফেলগুলো জিপে রাখলাম। জিপটাকেও ছায়াতে নিয়ে এসে দাঁড় করালাম। তারপর চারজনে হাত লাগিয়ে ওই রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডকে বয়ে নিয়ে এসে নালার পাশে ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ জায়গাতে রাখলাম। রেখে, নালার জলে হাত ধুলাম ভাল করে। মানুষের রক্তেও জানোয়ারের রক্তের মতো বদ্‌গন্ধ থাকে। তারপর উজানে গিয়ে পরিষ্কার জল দেখে চোখে-মুখে-ঘাড়ে-কানের পিছনে জল দিয়ে পেট ভরে জল খেলাম।

ঋজুদা বলল, "চল এবার। ডে-লং-নাইট-লং ভিজিল্। হাতিটাকে যখন চাক্ষুষকরা গেছে এই সুযোগ নষ্ট করলে চলবে না। তা ছাড়া কম্ফুকে ও এমন করে চোখের সামনে মারাতে ওর সঙ্গে আমাদের এক ধরনের ব্যক্তিগত শত্রুতাও

জন্মে গেল। এখন 'ভেন্দেত্তা'র সময়। খুনের বদলা খুন।"

রাজেনকে নিজের পাইপের টোব্যাকো-পাউচ থেকে একটু সুগন্ধি তামাক দিয়ে ঋজুদা বলল, "আচ্ছা রাজেন, আমরা তা হলে এগোচ্ছি। তুমি পারলে কিছু জ্বাল-কাঠ কেটে রাখো এখনই। ফিরে এসে আমরা কম্ফুকে দাহ করব।"

দুর্গাদা বলল, "আমাদের মধ্যেও কাউকে করতে হতে পারে। কে বলতে পারে?"

ঋজুদা ধমকে বলল, "বাজে কথা বলবে না দুর্গা। ভাল কাজে বেরনোর আগে আজেবাজে কথা ভাল লাগে না।"

তারপর বলল "চলি আমরা রাজেন।"

"আইজ্ঞাঁ।"

রাজেনদা বলল।

আমরা তিনজনে গেণ্ডুলি বনের মধ্যে মাইলখানেক যাওয়ার পর ঋজুদা বলল, "হাতিটা কিন্তু ওই দহ না কী বলছে দুর্গা, সেদিকেই গেছে। এতক্ষণে হাতির কাছে পৌঁছে যাওয়া যেত। কেন যে রাজেন বলল না।"

"রাজেন জানতই না ঋজুবাবু।

"তা তুমি এলে না কেন? আমি তো এবার শিকার করতে আসিনি। সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করার সুযোগ পেলে ঝামেলাই মিটে যেত।"

"আমাকে তো ডাকলেনই না। ঝড়ের মতো চলে গেলেন। আমাকে তো থাকতেই বলে গেছিলেন।"

"তাও তো থাকলে না। হাতির হাতে মরার কথা তো তোমারই ছিল আজ।"

আমি বললাম।

"তাই?"

অবাক হয়ে ঋজুদা বলল।

"তাই নয়?"

মাথা নিচু করে দুর্গাদা বলল, "জল খেতে গেছিলাম আর আমগাছ থেকে কিছু কাঁচা আমও পাড়তাম। পঞ্চমী কাঁচা আম খেতে খুব ভালবাসে। বিয়ে হয়ে চলে যাবে মেয়েটা।"

ঋজুদা সহানুভূতির গলায় বলল, "যাই হোক, এমন মূখার্মি আর কোরো না।"

এটুকু বলেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল ঋজুদা।

"কী, হল?" আমি বললাম।

"হাওয়া ঘুরে গেছে।"

দুর্গা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে মাটি থেকে একমুঠো ধুলো নিয়ে উড়িয়ে দিল। ধুলোগুলো আমাদের সোজা সামনে উড়ে গেল। দুর্গাদার মুখ প্রসন্নতায়

ভরে গেল।

"কী?" ঋজুদা শুধোল।

"না ঠিক আছে। আমরা দু' মাইল গিয়ে তারপর অপেক্ষা করব। এই হাওয়াতে হাতি গন্ধ পাবে আমাদের। কারণ দহটা, আমরা যেখান থেকে বাঁয়ে মোড় নেব, সেখান থেকে প্রায় আধমাইলটাক ভেতরে।"

ঋজুদা বলল, "বাঁচালে দুর্গা। তবে কথাবার্তা এখন থেকে একদম বন্ধ। কথাবার্তা হবে মাঠিয়াকুদু নালাতে কম্ফুর মৃতদেহের কাছে ফিরে গিয়ে।"

দুর্গাদাও সে-কথাতে সায় দিল।

বৈশাখের মাঝামাঝি। রোদ বেশ কড়া। গাছে পাতা থাকলে রোদ অবশ্য বোঝাই যেত না। 'লু'-এর মতো দমকে দমকে বাতাস বইছে শুকনো পাতা আর লাল ধুলো উড়িয়ে। নাকের মধ্যে দিয়ে সে হাওয়া গিয়ে মাথার মধ্যে, যেখানে যা-কিছু আর্দ্রতা ছিল, তা শুকিয়ে দিচ্ছে।

আমরা সিঙ্গল ফরমেশনে হেঁটে চলেছি, নরম সাদা গেণ্ডুলি বনের ঝাঁঝ-ওঠা জঙ্গলে। মাথার নীচের খুলি গরম হয়ে উঠছে। গরম হয়ে উঠছে রাইফেল। যেখানে হাত লাগছে ইস্পাতে, ছেঁকা লেগে যাচ্ছে। আস্তে-আস্তে হাঁটছি আমরা। কিন্তু আস্তে হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে এই রোদে। ঘড়িতে দুটো বেজে পনেরো এখন। সকাল থেকে সেই ডিমের পোচ আর চা ছাড়া পেটেও কিছু পড়েনি।

ঋজুদা ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বলল, "এক কাপ চা পেলে বেশ হত। কী বল?"

মাথা নাড়লাম আমি। ভাবছিলাম, ভটকাই আর তিতির, এবিকাকু আর ফুটুদার তত্ত্বাবধানে জম্পেশ করে খেয়েদেয়ে এখন হয় ঘুম লাগিয়েছে, নয় ওয়ার্ড-মেকিং খেলছে। দরজা-জানলা বন্ধ ঠাণ্ডা ঘরে। এই গেণ্ডুলির বনে যদি কেউ পথ হারায় তো পথ সে খুঁজে পাবে না বছরের অন্য সময়ে। এখন ন্যাড়া বলে আমাদের ডান দিকের উঁচু পাহাড়, মায় লালমাটির রাস্তাটাসুদ্ধু দেখা যাচ্ছে। সেই শিঙাল-শম্বরটা ওই রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে একা হেঁটে যাচ্ছে শিঙ উঁচিয়ে খাঁখাঁ খর রোদে।

ভাবছিলাম, যত পাগল এসে জুটেছে এখানে, কী মানুষ, কী জানোয়ার!

কতক্ষণ হাঁটলাম, খেয়াল ছিল না। একসময় ঘড়িতে দেখলাম, সাড়ে-তিনটে বাজে।

দুর্গা ইশারাতে বলল, এবার আমাদের বাঁয়ে মোড় নিতে হবে। আধ মাইল গেলেই দহ। সেখানে গভীর জঙ্গল। ছায়াচ্ছন্ন। নিবিড়। এই গ্রীষ্মেও আরাম।

ভাবলাম, হাতিও সে-কারণেই গেছে। এয়ার কন্ডিশন্ড্ কমফর্টে।

ঋজুদা একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে কী যেন ভেবে নিল। তারপর পাইপটাকে

নিভিয়ে, ছাই ঝেড়ে বেল্টের সঙ্গে গুঁজে রাখল।

দুর্গাদা একটা বিড়ি ধরিয়েছিল। বিড়িটা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ঋজুদা। তারপর আমরা বাঁ দিকে মোড় নিয়ে আস্তে-আস্তে এগোলাম।

কিছুক্ষণ চলার পরই অন্যান্য গাছ দেখা যেতে লাগল। এমন গাছ, যাদের পাতা ঝরে না এবং ঝরলেও ঝরে শীতকালে। একটু-একটু ছায়া পেতে লাগলাম এখন। হাওয়াটাও তত গরম লাগছে না আর। জলের দিকে এগোচ্ছি বলেও হয়তো-বা। আর-একটু যেতেই লাল কাদা মেখে লালমুখো সাহেব-হয়ে-যাওয়া একদল শুয়োরের সঙ্গে দেখা হল আমাদের। তাদের মধ্যে কয়েকটি বেশ বড় দাঁতাল ছিল।

আমরা থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সম্মান দেখালাম ওদের, যোগ্য সম্মান। শুয়োর-টুঁ যেই খেয়েছে, সেই সম্মান দেখায়। আমরা সকলেই কখনও-না-কখনও খেয়েছি।

শুয়োরেরা জলের দিকে চলে গেল। আমরা যেদিক দিয়ে গেণ্ডুলি বনে ঢুকেছিলাম, ওরা তার উলটো দিক থেকে এসেছিল। তারও পর দেখা হল একদল বিরাট-বিরাট গন্ধর সঙ্গে। গাউর বা ইন্ডিয়ান বাইসন। তারা শুয়োরেরা যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে চলে গেল। মানে, দহর দিকে। তারাও আমাদের কিছু বলল না।

কোনও বার্কিং-ডিয়ার বা হনুমানের দল আমাদের দেখে ফেললেই মুশকিল ছিল। তাদের এলার্ম-কল-এ হাতি হয়তো সাবধান হয়ে যাবে। ডিড-ড্যু-ডু-ইট পাখির নজরে পড়লেও বিপদ ছিল। জানাজানি কানাকানি হয়ে যেত। মুশকিল হত ধারেকাছে অন্য হাতিরা থাকলে। তা নিশ্চয়ই নেই। থাকলে, গুণ্ডা হাতি এসে এখানে থাকত না।

ঋজুদাও বলছিল, পথে আসতে-আসতে যে, বহুবারই মাঠিয়াকুদু নালার ক্যাম্পে এসে থেকেছে ফুটুদার সঙ্গে। কিন্তু এখানে হাতি কখনওই দ্যাখেনি। জায়গাটা উপত্যকা, তায় একটা খোলের মধ্যে। এখানে ঢোকা সোজা। বেরনো মুশকিল। তা ছাড়া বসতিও খুব দূরে দূরে। খেতের ফসল, যেমন ধান, এই খোলের মধ্যে আদৌ হয় না মানুষের বসতি না থাকাতে। গুণ্ডা হয়ে গেছে বলেই বোধহয় হাতিটা এই নিরিবিলি গর্তে এসে রয়েছে। এর দৌড় এখান থেকে লবঙ্গি ও পম্পাশর।

কুড়ি মিনিট পথ খুব আস্তে-আস্তে গিয়ে আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। এতক্ষণ দুর্গাদা আর ঋজুদা হাতিটার পায়ের দাগ নজর করে-করেই আসছিল। এখন এই জায়গাটা ঘন ঘাসে ভরা থাকায় পায়ের দাগ নজর করার অতখানি সুবিধে হচ্ছিল না, কিন্তু জমি নরম বলে হাতির ওজনের কারণে সুবিধেও হচ্ছিল পায়ের দাগ খুঁজতে।

চারদিক দিনমানেই এখন অন্ধকার। আন্দাজে আর এগনোও যায় না।

সামনে শ'খানেক গজ দূরেই মস্ত দহটা। নালাটা এখানে এসে ছড়িয়ে গেছে যে, শুধু তাই-ই নয়, প্রতি বছর নানা জানোয়ারে গরমকালে এখানে এসে গা ডুবিয়ে বসতে বসতে বা ওয়ালোয়িং করতে করতে জায়গাটা খুব গভীরও হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

ঋজুদা, দুর্গাদাকে ইশারাতে বলল, ঝাঁকড়া একটা বস্‌সি গাছে চড়ে দেখতে। এবং হাতিকে দেখতে যদি পায়, তবেই আমাদের ইশারা করে জানাতে। নইলে চুপ করে থাকতে। দুর্গাদাই এখন আমাদের স্কাউট।

হাতি যতক্ষণ দহতে গা ডুবিয়ে থাকবে, যদি আদৌ এখানে থেকে থাকে, তবে তখন গুলি করা চলবে না। সেটা আনস্পোর্টসম্যানসুলভ হবে। তা ছাড়া কাদায়-থাকা অবস্থায় হাতি মারা গেলেও তাকে তোলা যাবে না। দাঁত এবং গোড়ালি কেটে নেবার অনেক অসুবিধে হবে।

দুর্গাদা খুব আস্তে-আস্তে কস্‌সি গাছটাতে চড়তে লাগল। এই গাছের ডাল খুব শক্ত হয় বলে এই গাছেরই কাঠ দিয়ে ওড়িশার গ্রামাঞ্চলে গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করে মানুষেরা।

ঋজুদা দুর্গাদাকে বলে দিয়েছিল যে, হাতিকে দেখতে পেলেই মাত্র একবারই ডান হাতটি নাড়াবে। হাতি যদি কাদায় বসে থাকে তবে দুর্গাদা নিজের মাথায় হাত দেবে। তারপর হাতি যখন কাদা ছেড়ে উঠবে, তখন দু'বার পরপর মাথায় হাত দেবে।

ভাবছিলাম, অত হাত-নাড়ানাড়ি ও মাথায় হাতাহাতি হাতির যদি চোখে পড়ে যায়? হাতি অবশ্য তেড়ে এলে দুর্গাদা চেঁচিয়েই সে বার্তা আমাদের জানাতে পারে। বড় গাছে চড়ে থাকলে হাতি কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। তা ছাড়া একলা হাতি। দলে তো নেই। চেঁচিয়ে বললে, বার্তা পাব ঠিকই, কিন্তু আমাদের কাছে বার্তা পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গে হাতিও হয়তো পৌঁছে যাবে।

আমরা দেখলাম, দুর্গাদা খুব সাবধানে একটু একটু করে উপরে উঠল। তারপর বেশ উঁচু ডালে উঠে পাতার আড়ালে বসে চারধারে ইতিউতি চাইতে লাগল। ঠাহর দেখে মনে হল, সে এখনও দেখার মতো কিছু দেখতে পায়নি।

তা হলে? হাতি কি চলে গেছে দহ ছেড়ে?

অথবা দহতে নামেইনি আদৌ?

একটুক্ষণ পর নাক উঁচিয়ে যেন অনেক দূরে তাকিয়ে হাতিকে দেখতে পেয়েছে এমন ভাব-ভঙ্গি করে একবার ডান হাত নাড়ল সে। পরক্ষণেই নিজের মাথায় হাত দিল। তখন আমাদেরও আক্ষরিকভাবে মাথায় হাত দেবারই অবস্থা।

তারপরই আমাদের দিকে চেয়ে হাত প্রসারিত করে বোঝাল যে, হাতি একটু দূরে আছে। কাছের দহে নেই।

ঋজুদা হাত নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

মানে, আমরা বুঝেছি তার সঙ্কেতের অর্থ।

ভাবছিলাম, কম্যান্ডোদেরই মতো প্রত্যেক ভাল শিকারিরই সিগন্যালিং-এ ভাল ট্রেনিং থাকা দরকার। তারপর ঋজুদা আমাকে কানে কানে বলল, "বিশ্রাম করে নে একটু।"

জায়গাটা বিশ্রাম করার উপযুক্তই বটে। কুসুম গাছের লাল ফুলে ফুলে মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে বনে বনে। চারধারে গ্রীষ্মবনের মধ্যেও নানা জলজ গন্ধ ও শব্দ। তার মধ্যে স্কার্লেট-মিনিভেট, বুলবুলি, বউ-কথা-কও, কোকিল, আরও কত পাখি যে ডাকতে-ডাকতে ফুল ঝরিয়ে ওড়াউড়ি করছে, তা কী বলব। বড় বড় সব গাছের নীচে-নীচে অর্জুন গাছ। ভারী সুন্দর দেখতে এদের পাতা। চেরা-চেরা বটল-গ্রিন রঙা এদের পাতা। কার্তিক-মাঘ মাসে সুপুরির মতো দেখতে, ফলসা-রঙা গোল-গোল ফল ধরে এই গাছগুলোতে। জলপাই-এর মতো স্বাদ। টক করে খায় পাহাড়-বনের গ্রামের লোকেরা। অর্জুনের কচি পাতাও বর্ষাকালে টক করে খায়। অর্জুন ফল বিছানাতে রাখলে ছারপোকা হয় না বিছানাতে।

কুসুম আর হরজাই বনের ওধারে শুধুই গেণ্ডুলি। শিমুল এবং পলাশও আছে। বাঁশের বনে ফুল ফোটা শেষ। মরার পালা এবার। কিন্তু জংলি আমগাছগুলোতে বোল এসেছে। জংলি কাঁঠাল গাছে মুচি। রুখু হাওয়াতে তাদের মিষ্টি গন্ধ ভাসছে। অনেক গাছে 'পন্থস' ধরে গেছে। ওড়িয়াতে কাঁঠালকে বলে পন্থস। এঁচড় এবং কাঁঠালের একই নাম। আদিগন্ত লাল ফুলের মাঝে-মাঝে আমের সাদা-সাদা ফুলগুলোকে দারুণ দেখাচ্ছে।

বেলা পড়ে আসছে। নানা জানোয়ার দলে দলে আসছে। নানা পাখি। দূর থেকে হুঁ-য়া-ও করে বাঘ ডেকে উঠল। জলে আসছে বোধহয়। এখনও দূরে আছে অনেক। বাঁশে-বাঁশে কটকটি আওয়াজ উঠছে। ঝরা পাতারা উসখুস করে ঝরে পড়ছে। মৌটুসি পাখি তারই মধ্যে ফিসফিস করছে। শেষ বিকেলের হাওয়ায় পাতা দুলছে। আলো-ছায়ার চিরুনি বুলোচ্ছে দীর্ঘ-চুলের গাছেরা সন্ধের আগে। কাঁপা-কাঁপা চিলতে চিলতে রোদ ঝলকাচ্ছে তাদের পাতায়-পাতায়। একজোড়া নীলচে-রঙা রক-পিজিয়ন গুটিগুটি পায়ে পাথরের আলসেতে পায়চারি করছে। যেন, রিটায়ার্ড বুড়োর সঙ্গে বুড়ি। চারদিকের এই গন্ধের সমারোহ ও শব্দমঞ্জরির মধ্যে আমার ক্লান্ত চোখ মুহূর্তে জড়িয়ে এল। ঋজুদা পাশে থাকলে কোনও ভয় নেই। যমদুয়ারেও ঘুমোতে পারি আমি। ঘুমিয়ে পড়লাম।

হাতিটাও কি ঘুমোচ্ছে এখন? লাল থকথকে কাদার মধ্যে গা ডুবিয়ে গাছের ছায়াতে? কী স্বপ্ন দেখছে ও কে জানে? হয়তো গাইছে নয়নামাসির মতো, সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি :

"এ পরবাসে রবে কে হায়!

কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে ॥
হেথা কে রাখিবে দুখভয়সঙ্কটে—
তেমন আপন কেহ নাহি হে প্রান্তরে হায় রে ॥

হাতিটারও একদিন সব ছিল। সবাই ছিল। আজ কেউই নেই। কম্ফুরই মতো। কম্ফুর ইতিহাস জানলে উন্মাদ হাতিটা উন্মাদ কম্ফুকে হয়তো ক্ষমা করে দিত। একজন বিতাড়িত, অপমানিত মানুষ আর একটি হাতির মধ্যে হয়তো এক-ধরনের সখ্য জন্মাত। যা জন্মালে স্বজন-বিরোধ ঘটাত না হাতিটা।

হাতির চোখ দিয়ে তো জল পড়ে দুঃখ হলে। হাতিটা কি কাঁদছে এখন? তার চোখের জল নিঃশব্দে গিয়ে মিশছে দহর জলে।

এ-ছায়াচ্ছন্ন দহর মধ্যে আমি মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছিলাম। আজ কেউ মরবে। হয় আমাদের মধ্যে কেউ। নয় হাতিটা। মৃত্যুর গন্ধটা কোনও ঝাঁঝালো নাম-না-জানা ফুলের গন্ধের মতো। হাওয়ার দমকে ভেসে আসে। নাক জ্বালা করে। পরমুহূর্তে ভেসে চলে যায়।

কতক্ষণ পরে ঠিক জানি না, যেন একযুগ পরে, ঋজুদা ঠেলা মারল আমাকে আস্তে করে। পেটে।

তাকিয়ে দেখি ঋজুদা হাঁটু গেড়ে বসে সাবধানে মাথা উঁচিয়ে দেখছে।

আমিও তাই করলাম।

শুনতে পেলাম খল্‌বল্, হাপুস-হুপুস্, পকাত্-চকাত্ বিচিত্র সব শব্দ। লাল কাদা-জল মেখে একটা লাল পাহাড়ের মতো ঘোলা, বিচ্ছিরি, লাল-কাদা দহ থেকে উঠল গুণ্ডা হাতিটা। আমাদের সামনে যে দহ, তাতে সে ছিল না, ছিল তার পেছনের দহে। তার প্রকাণ্ড দাঁত দুটোও লাল কাদাতে লাল হয়ে গিয়েছিল। হাতি শুকনো ডাঙায় উঠেই বড়-বড় পা ফেলে নালা পেরিয়ে ঘন হরজাই বনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল, আমরা যেদিক থেকে এসেছিলাম সেই দিকে মুখ করে।

বোধহয় গেণ্ডুলি বনের দিকেই যাচ্ছে।

ঋজুদা বুকে হেঁটে ঠিক নয়, নিচু হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতিটার দিকে এগোতে লাগল ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে। আমাকেও এগোতে ইশারা করে। হাতিটা প্রথম চাল্-এ অনেকখানিই এগিয়ে গিয়েছিল। হাতি জোরে চললে মানুষের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া ভার। তবে এখন চলছে বেশ আস্তে। তবুও গজেন্দ্রগমন বলে কথা।

গতি কমিয়েছে। কেন যে, সে সেই জানে।

এবারে আমরা প্রায় হাতিকে ধরে ফেলেছি। কিন্তু আমাদের আসার কথাটা সে যেন না জানে। এখানে এই দহর কাছে জঙ্গল খুবই গভীর। সব গাছেই পাতা আছে। অস্তগামী সূর্যের আলো খুব কমই পৌঁছেছে। যখন হাতিকে প্রায় ধরে ফেলেছি, হাতির বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, ঠিক তখনই হঠাৎ হাতিটা

হারিয়ে গেল।

কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল অতবড় জানোয়ারটা বুঝতে পর্যন্ত পারলাম না একটুও। আমাদের দু'জনের কেউই নয়। আর ঠিক সেই সাঙ্ঘাতিক মুহূর্তেই ঋজুদা 'আঁক্' শব্দ করে একটা বড় গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। মস্ত বড় শিমুলের শিকড়ের আঘাত লাগল কোমরে। মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। মনে হল, কোমরের হাড় ভেঙে গেছে বুঝি।

যে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঋজুদা পড়ল, তারা ঝর্‌ঝর্ শব্দ করে নড়েচড়ে উঠল। ভয়ে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। এই নিবিড় জঙ্গলে গরমের দিনে রাত নামার ঠিক আগে-আগে জলের পাশে সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে খুনি গুণ্ডা হাতিটাও ইচ্ছে করে হারিয়ে গেল আর ঋজুদাও পড়ে গেল এমনভাবে যে, শিগগিরই যে সে উঠতে পারবে, মনে হল না।

ঋজুদার দিকে আমি অসহায়ের মতো তাকালাম এক ঝলক। তখন সমবেদনা জানাবার সময় ছিল না।

ঋজুদা কথা না বলে, নিজের রাইফেলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমার রাইফেলটা নিজে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল রাইফেলটার নল সামনে করে। আমাকে ইশারাতে বলল, এগিয়ে যেতে।

কমান্ডারের আদেশ। এবং সামনে অমিত পরাক্রমশালী অদৃশ্য শত্রু। এগিয়ে যেতে লাগলাম আমি নিচু হয়ে। প্রায় লেপার্ড-ক্রলিং করে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল কম্ফু-বদ্যির তালগোল পাকানো রক্তাক্ত পিণ্ডের মতো মৃতদেহ।

ভাবছিলাম, মানুষের মৃত্যু কত বিভিন্ন রূপ ধরেই না আসে।

ঋজুদা আছাড় খেয়ে পড়বার সময় শব্দ হয়েছিল আগেই বলেছি। তার চেয়েও বড় কথা গুলি ভরা রাইফেলের গুলি ছুটে যেতেও পারত। এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তা ঘটেনি। একটাই ভরসার কথা ছিল এই যে, হাতিটাকে আমরা হারিয়ে ফেলার আগে হাতির মুখ ছিল সামনে। মানে, আমাদের ঠিক উলটো দিকে এবং ঋজুদার পড়ে যাওয়ার আওয়াজ যদি সে শুনেও থাকে তবুও সে হয়তো আমাদের অবস্থানটি দ্যাখেনি। এই ভেবেই সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম নিজেকে। হাতি শব্দ শুনলে বা ঋজুদাকে দেখতে পেলে এতক্ষণে রে ! রে ! করে তেড়ে আসত নিশ্চয়ই।

এগিয়ে তো গেলাম, কিন্তু প্রায়ান্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া গুণ্ডা হাতির পেছনে আন্দাজে যাবটা কী করে ? ঋজুদার কাছ থেকে আমি প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে এসেছি। ঋজুদাকে এখন আর দেখাও যাচ্ছে না। অতি দ্রুত আমার চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। বনের চন্দ্রাতপের নীচে আছি। বড়জোর মিনিট-পাঁচেক রাইফেল দিয়ে গুলি করার মতো আলো থাকবে আর এখানে। ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে এল। ঘাম দিতে লাগল খুব। আর না এগিয়ে উবু

হয়ে বসে আমি "ফ্রিজ" করে গেলাম রাইফেলটাকে রেডি-পজিশানে ধরে।

রাইফেলটাও তেমন। চোদ্দ পাউন্ড ওজন। ফ্রিজ করে গিয়ে খুব আস্তে-আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে দেখতে লাগলাম। এতই আস্তে যে, কোনওরকম চাঞ্চল্য যেন কারও চোখেই না পড়ে তা নিশ্চিত করে। কিন্তু কিছুই যে দেখতে পাই না। চারধারেই গাছের কাণ্ড। গাছেরা চারপাশে আমাকে ঘিরে আছে। তাদের সোঁদা গন্ধ গা নিয়ে। মোটা গাছ, মাঝারি গাছ, সরু গাছ। সার-সার নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। একটা কুটুরে ব্যাঙ ঠিক সেই সময়ে কুটুর-কুটুর ডেকে উঠল। হয়তো আমাকে ভয় পাওয়াবারই জন্য।

একবার ডাইনে থেকে বাঁয়ে আর-একবার বাঁ থেকে ডাইনে ঘাড় পুরো ঘুরিয়ে নিয়ে দেখলাম এবং ঘাড়টা ঘোরানো দ্বিতীয়বার যখন শেষ করে এনেছি প্রায় ঠিক সেই সময়েই আমার হৃৎপিণ্ড একদম বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, আমার ডান দিকে খুবই কাছে দুটো গাছের কাণ্ডর রং সাদাও নয় কালোও নয়। লাল। এবং সেই দুটি গুঁড়ি থেকে তখনও কাদা ও জল ঝরছে। চোখের দৃষ্টি যতখানি তীক্ষ্ণ করা যায়, ততখানি তীক্ষ্ণ করে আমি সেই লাল গুঁড়ি দুটিকে লক্ষ করে দেখলাম আরও একটি মড়া গুঁড়ি সামনে আছে। তারপর দুটি মোটা লাল গুঁড়ির মধ্যে এবং একটি গুঁড়ির সঙ্গেই প্রায় আরও একটা গুঁড়ি চোখে পড়ল।

আমার মধ্যে থেকে অদৃশ্য কে যেন চিৎকার করে বলে উঠতে গেল : হাতি—ই—ই—ই।

কিন্তু অদৃশ্য অন্য কেউ যেন আমার মুখ সজোরে চেপে ধরল দু'হাতে। কম্ফুর চেহারাটা আবারও মনে পড়ল।

পেশি এবং স্নায়ু যথাসাধ্য শক্ত করে আবারও আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনে চেয়ে দেখলাম। না, কেউ নেই। তখনও ঋজুদা সেই গর্ত থেকে উঠে আসতে পারেনি।

কিন্তু দুর্গাদা ?

পরমুহূর্তেই ভাবলাম, সেই-বা খালি হাতে এসে কী করবে ?

ঋজুদার সঙ্গে দেশে-বিদেশে অনেক বিপজ্জনক প্রাণীর মুখোমুখি হয়েছি, আজ অবধি কিন্তু এমনটি বিপদ আর কখনও হয়নি।

নিজেকে শক্ত করতে লাগলাম। ভটকাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। "ব্রাদার, লাইফে তোমার আসলে কেউই নেই। একা এসেছ, একা যাবে। তুমি পটল তোলার পর তোমাকে কেউ বারোটি ঘণ্টাও মনে রাখবে না। এই হচ্ছে সার কথা। তবে আর ভয়-ভাবনা করা কেন ?"

হাতিটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতিই তো ? এত কাছে ? মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা সাপ নেমে গেল। পাগুলো ও শুঁড়টাতে এতটুকুও কম্পন নেই। এত বড় একটা জানোয়ার কী করে যে এমন নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে থাকতে

পারে, তা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। হাতিটার মাথা বা কান কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শরীরের কোনও ভাইটাল অংশই নয়, যেখানে গুলি করতে পারি।

নিশ্বাস বন্ধ করে, তাকে আর-একটু ভাল করে দেখতে পাওয়ার আশায় আমি এক গজ এগোলাম। চুলচুল করে করে। যেন, একযুগ ধরে। এবং এগোতেই, ডালপালার আড়াল সরে গিয়ে হাতির শরীরটা এবারে নজরে এল। তাও লাল কাদা-মাখা। হাতিটা আমার এতই কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে, ইচ্ছে করলেই আমাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে নিতে পারে। হাতিটার শুঁড় দেখে বুঝলাম যে, ঋজুদা যেখানে গর্তে পড়েছে সেই মস্ত শিমুলের দিকেই সে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। দুর্গাদাটা আবার নড়াচড়া না করে! হাতিটা কি দেখতে পেল ঋজুদাকে?

আর ভাববার সময় নেই। হাতির মাথা বা কানের পাশে গুলি করার সুযোগ যখন নেই, তখন আমি মায়ের মুখ স্মরণ করে হাতির হার্টটা যেখানে থাকতে পারে বলে অনুমান করলাম, সেইদিকে নিশানা নিয়ে চুলচুল করে রাইফেলটা ওঠালাম। ফোর-সেভেনটি-ফাইভ ডাবল ব্যারেল রাইফেলটার ওজন চোদ্দ পাউন্ড। এ-রাইফেল কপিকলে করে তুললে মানায়। ঋজুদার মতো লম্বা-চওড়া মানুষ বলেই এই রাইফেল অবহেলায় নাড়াচাড়া করে। অত ভাবার সময় আর নেই। আমি এখন আর আমি নেই। রোবট হয়ে গেছি কোনও। রিমোট কন্ট্রোলে ঋজুদাই যেন নির্দেশ দিচ্ছে।

নিনিকুমারীর বাঘ মারতে গিয়ে ভটকাইয়ের গুলি-করা বাঘিনী যে ডান হাতটা জখম করে দিয়েছিল গত শীতে তা এখনও মাঝে-মাঝেই কষ্ট দেয়। হাতটা এখনও, এত ভারী আর বড় বোরের রাইফেল চালাবার মতো পোক্ত হয়নি। কিন্তু এখন শুধু ঋজুদার আর দুর্গাদারই নয়, আমার নিজেরও প্রাণ-সঙ্কট।

রাইফেলের নলটা সোজা হতেই ব্যাক-সাইট আর ফ্রন্ট-সাইট যতখানি ভাল করে পারি দেখে নিয়ে সেফটি ক্যাচ অন করতে-করতেই ট্রিগারে ফার্স্ট প্রেশার দিলাম এবং পর মুহূর্তেই সেকেন্ড প্রেশার।

উপত্যকার ওই ছায়াচ্ছন্ন নিবিড় বনময় ঘেরাটোপের মতো নিশ্ছিদ্র জায়গাটিতে যেন কেউ কামান ছুঁড়ল। এইরকম শব্দ হল। দহর কাছে যত জীবজন্তু ও পাখি ছিল এবং যত জীবজন্তু ও পাখিও এই রাইফেলের বজ্রনির্ঘোষ শুনল তারা সকলে মিলে একই সঙ্গে প্রচণ্ড হইচই তুলল। তাদের ভয়ার্ত চিৎকার আহত হাতির ভয়কে আরও একশো গুণ বাড়িয়ে দিল। এবং সেই 'ক্যাকোফোনি'র মধ্যে হতভম্ব আমি দেখলাম যে, হাতিটা যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। ফোর-সেভেনটি-ফাইভ-এর গুলিও হজমি-গুলির মতো হজম করে নট-নড়ন-নট-কিচ্ছু হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

গুলি কি তবে মিস করলাম? এত কাছ থেকে?

নার্ভাস হয়ে গেলে সবই হতে পারে। বড়-বড় ওলিম্পিকে কমপিট-করা শিকারি দেড় হাত দূরে খরগোশ মিস করে কিন্তু খরগোশ তো গুণ্ডা হাতি নয়। হয়তো ট্রিগার-পুলিং ঠিক হয়নি গুলি হাতির পিঠের উপর দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু গুলি মিস করলে আওয়াজ তো অন্যরকম হত। রাইফেল তুলে নিশানা নিয়েই মেরেছিলাম। তাও এত কাছ থেকে। হাতির গায়ে না লাগলে কোনও-না-কোনও গাছের ডালে লাগতই।

বাঁ দিকের ব্যারেলেও হার্ড-নোজড্ বুলেট আছে আমি জানি। কারণ দুটি রাইফেলেরই গুলি আমিই এনেছি বাঘমুণ্ডা থেকে। তবে যে গুলিটি করলাম তা সফট্-নোজড্ হলে আমার মতো সুখী কেউ হত না। জানোয়ারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে সফট্-নোজড্-এর জুড়ি নেই।

কী হল ভাবছি, আর রাইফেলের ট্রিগার গার্ডে আঙুল ছুঁইয়ে বসে একদৃষ্টে সেই ভৌতিক হাতির দিকে চেয়ে আছি। ঠাকুরানির বাঘের পরে কি ঠাকুরানির হাতির খপ্পরে পড়লাম! অবিশ্বাস্য ব্যাপারস্যাপার বেশিদিন ভাল লাগে না আমার। মন দুর্বল হয়ে যায় বড়।

একদৃষ্টে চেয়ে আছি রাইফেল হাতে। মনে হল, হাতির লাল পাগুলো একটু একটু কাঁপছে যেন। তারপরই মনে হল থরথর করে কাঁপছে। যেই অমন মনে হল সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন কোন্ মন্ত্রবলে হাতির গায়ে একটি ফোয়ারা ফুটিয়ে দিল, আর মুহূর্তে সে ফোয়ারা খুলে গেল। ঝরঝর করে ফিনকি দিয়ে নয়, ফোয়ারারই মতো মোটা এবং শব্দময় উৎসারে হাতির বুক থেকে রক্ত ছুটতে লাগল। হাতিটা আমার এতই কাছে ছিল যে যদি গুলি খেয়ে সে আমার দিকে হঠাৎ পড়ত তো আমি হাতির নীচে চাপা পড়েই মরতাম।

ওখান থেকে পালাব কি না ভাবছি, এমন সময় দেখি রক্তের ফোয়ারা আরও জোর হল এবং হাতিটা হাঁটু গেড়ে আস্তে আস্তে বসে পড়ল। যেন প্রার্থনা করবে হাতিদের দেবতাদের কাছে, স্তোত্র পড়বে যাবার বেলায়।

তখন আমি দাঁড়িয়ে উঠে কিছুটা বাঁ পাশে সরে গেলাম। মনটা ভীষণই খারাপ লাগতে লাগল। হাতিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম আবার ওঠে কি না তার উপর নজর রেখে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দুটি ছোট গাছ এবং একটি অর্জুন গাছ ভেঙে হাতিটা ডান পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। খুব জোরে নিশ্বাস নিল একবার। তারপর আরও জোরে নিশ্বাস ফেলল।

আমি রাইফেলের সেফটি ক্যাচটাকে অফ্ করে দিয়ে এবারে পেছন ফিরলাম। দেখি, দুর্গাদা সেই গর্তের মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছে, দু'হাত মাথার উপর তুলে ধেইধেই নাচ নাচছে। এবং আমার রাইফেলটাকে রেডি পজিশনে ধরে ঋজুদা শিমুলের শিকড়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখ এদিকে। তখনও যে-কোনও ইভেনচুয়ালিটির জন্য তৈরি।

হাতি যে আর কোনও দিনও উঠতে পারবে না তার ওই শয্যা ছেড়ে এই কথা বুঝতে পেরে দুর্গাদা গর্ত ছেড়ে তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আমি বললাম, "চুপ করো। কারও মৃত্যুর সময়েই গোলমাল করতে নেই। যে যাচ্ছে তাকে শান্তিতে যেতে দাও। মৃত্যুপথযাত্রী বা মৃত প্রত্যেক জীবিতর চেয়ে বেশি সম্মানের। সে যে চলে যাচ্ছে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে।"

দুর্গাদা বলল, "পিলা। তু গুট্টে কাণ্ড ঘটাইলু আজি। কঁড় কহিবি মু।"

বলেই, গুণ্ডিপানের গন্ধভরা মুখে আমার মাথায় একটা জব্বর চুমু খেল।

আমার কথা শুনল না দুর্গাদা। কী বলতে চাই বোঝে না।

ঋজুদা গর্ত থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "ব্র্যাভো রুদ্র। ওয়েল ডান্। এদিকে আয়।"

ঋজুদার কাছে যেতেই অনেকক্ষণ পর পাইপটা বের করে তাতে আগুন দিয়ে সেটা ধরিয়ে মুখে পুরে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

"আছ কেমন এখন? পারবে উঠতে?" আমি বললাম।

"ঠিক আছি। ঠিক হয়ে যাব। এখন হাতির কথা বল। এমন সময়ই আছাড়টা খেলাম, আর এমনভাবে যে, আজ তোর এবং আমাদের অবস্থাও কম্ফুর মতো হলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।"

"তুমি শেষ মুহূর্তে রাইফেল বদল করলে কেন?"

"কেন করলাম তা রাইফেলের মার দেখেও বুঝলি না? ওই গুলিটাই তোর নিজের রাইফেল দিয়ে করলে হাতি হয়তো তোকে এবং আমাদের মেরে দিত নিজে মরবার আগে। আফ্রিকার বিখ্যাত হাতি-শিকারি এবং বিশেষজ্ঞ পোণ্ডোরো-সাহেব, জন টেলর, লিখেছিলেন যে, এই ফোর-সেভেনটি-ফাইভ রাইফেল দিয়ে 'ইভন্ ইফ ড্যা শুট অ্যাট দ্য রুট অব দ্য টেইল অব অ্যান এলিফ্যান্ট, ইট উইল রান থ্রু দ্য হল লেন্থ অব ইটস বডি অ্যান্ড রিচ দ্য ব্রেইনস'। এতই ক্ষমতা এই রাইফেলের। আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, গুলি করতে হলে তোকে অত্যন্তই শর্ট-রেঞ্জ থেকে করতে হবে এবং সে-গুলি যদি হাতিকে সে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাতেই থামাতে না পারে তা হলে তোর তো নিশ্চিতই, আমাদের সকলেরও বিষম বিপদ।"

"হাতি কিন্তু তোমাদের দিকেই তাকিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দ্যাখেইনি। শোনেওনি। তোমার জন্যই আমি বেঁচে গেলাম এ-যাত্রা।"

ঋজুদা একগলা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "আমিও, মানে, আমি আর দুর্গাও তোরই জন্যে।"

দুর্গাদা হেসে বলল, "আমাকে একটু ভাল বাসনার তামাকু দাও, খৈনি করে খাব।"

ঋজুদা পাইপের টোব্যাকোর পাউচটা বের করে দিল।

ঋজুদার কোমরে চোট সত্যিই খুব জোর হয়েছিল। হাড় ভেঙেছে কি ভাঙেনি, তা অবশ্য অঙ্গুলে গিয়ে এক্স-রে না করালে বোঝা যাবে না। নিজে দু-একবার ওঠার চেষ্টা করল তারপর দুর্গাদা বলল, "আমি টাঙ্গি দিয়ে তোমার জন্যে একটা লাঠি কেটে আনছি, তারপর আমাদের দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে-আস্তে চলতে পারবে।"

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছিল। যে বাঘের ডাক অনেকক্ষণ আগে শুনেছিলাম, তারই বিরক্তির চাপা আওয়াজ শুনলাম দহর একেবারে কাছে গর-র-র-র-র করে। আমরা যে সেখানে আছি তা সে জেনেছে, কিন্তু এও জেনেছে যে, আমরা তাকে শিকার করতে আসিনি। শিকারি যারা, তারা এত অসাবধান হয়ে জোরে-জোরে কথাবার্তা বলে না। বাঘেরাও কোন্ মানুষ কী করতে কোথায় উপস্থিত, তা বিলক্ষণই জানে।

বাঘ জল ছেড়ে চলে গেল। একদল গন্ধ এল। তাদের মেজাজ শরিফ থাকলে ভয়ের কিছুই নেই।

দুর্গাদা যে কোন্ চুলোয় বাঁশ কাটতে গেল টাঙ্গি হাতে অন্ধকারে, গন্ধদের ঘাড়ে গিয়ে না পড়ে।

গন্ধরাও ওঁয়াও-বোঁয়াও আওয়াজ করে জল ছেড়ে চলে গেল। এখন এই খোলের মধ্যে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যেখানে-যেখানে সামান্য ফাঁকফোকর আছে, সেখানে-সেখানে অন্ধকার একটু হাল্কা মনে হচ্ছে। অন্য সব জায়গায় ঝুপড়ি-ঝুপড়ি অন্ধকার। এই ঘেরাটোপের বাইরে শুক্লাদশমীর চাঁদ এতক্ষণে বিশ্বচরাচর উদ্ভাসিত করে উঠেছে নিশ্চয়ই আর উঠেছে পশ্চিম দিগন্তে সন্ধ্যাতারা। কিন্তু তাতে রূপ খুলেছে মেমসাহেবদের গায়ের রঙের মতো ফরসা গেণ্ডুলি বনেরই কিন্তু সে-বনে পৌঁছতে পারলে তবেই না! বাঁশের ঝাড় আছে দূরের দহর কাছে।

বাঘ ও গন্ধদের বিদায় করার পরই বাঁশ কাটতে লাগল দুর্গাদা। বাঁশের উপর টাঙ্গির কোপ পড়ছে তো মনে হচ্ছে বোমা পড়ছে। এই খোলের মধ্যের ঘন জঙ্গলের অডিটোরিয়ামের এমনই অ্যাকুস্টিকস্।

একটু পরই একটি পোক্ত লাঠি নিয়ে ফিরে এল দুর্গাদা। যে-দিকে ঋজুদা ধরবে, সেদিকে যাতে তার হাতে না লাগে, সেজন্য নানারকম পাতা মুড়ে লতা দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে ভাল করে। আমরা দু'জনে দু'হাতে ধরে ঋজুদাকে দাঁড় করালাম। কিছুক্ষণ মুখ-বিকৃতি করে দাঁড়িয়ে রইল ঋজুদা। তারপর আমাদের দু'জনের কাঁধে হাত দিয়ে লাঠি ভর করে গর্ত থেকে উঠে দাঁড়াল। খুবই আস্তে-আস্তে।

বললাম, "দেখি, এবার হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে একটু-একটু এগোও। ব্যথা কমে আসবে।"

ঋজুদা হেসে বা হাসবার চেষ্টা করে বলল, "অসহায় একেই বলে।"

হাতি এবং গুণ্ডা-হাতির সামনেই ওই বিপজ্জনক মুহূর্তে পড়ে যাওয়াতে ব্যথার সঙ্গে শক্‌ও মিশে ছিল নিশ্চয়ই। মানুষের উপরে তার মনের প্রভাব, শরীরের প্রভাবের চেয়ে অনেকই বড়।

ঐরাবত ধরাশায়ী হওয়াতে এখন শক্‌টা চলে গেছে মনে হল। মনে হল কোমরের হাড়ও ভাঙেনি। ভাঙলে, ঋজুদা হাঁটতে পারত না আদৌ। প্রথমে দুর্গাদা ঋজুদার রাইফেল এক কাঁধে নিয়ে অন্য কাঁধে টাঙ্গি ঝুলিয়ে আগে আগে থেকে অন্ধকারে সাবধানে দেখে পা ফেলতে লাগল। পেছনে ঋজুদা। তার পেছনে আমার রাইফেল কাঁধে আমি।

কিছুদূর যেতেই গাছগাছালির কাণ্ড ও ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে যেন এক স্বপ্নরাজ্য ধীরে-ধীরে ভাস্বর হয়ে উঠতে লাগল আমাদের সকলের মুগ্ধ চোখের সামনে।

দুর্গাদা বলল, "সাপে না কাটে! গরমের দিন। তায় অন্ধকার। একটা টর্চ থাকলে ভাল হত।"

"যা নেই তার চিন্তা করে আর কী হবে।"

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, "দুর্গা, তোমার আর রাজেনের ভার, কাল ভোরে লবঙ্গি আর পম্পাশর থেকে লোক এনে দাঁত দুটো এবং চারটে গোড়ালির ব্যবস্থা করার। হাতির লেজের চুল যেন লোপাট না হয়ে যায়।"

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "বালা আর লকেট বানিয়ে দিতে হবে রুদ্রর মা'কে। নয়নাও চেয়েছিল।"

একসময় আমরা সেই অন্ধকার অডিটোরিয়াম-এর ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে গেণ্ডুলির বনে দাঁড়ালাম।

আহা!

জ্যোৎস্নার কী রূপ! মাথা ঘুরে গেল। মস্ত ন্যাড়া শিমুলের মগডালে একটি লাল-বুক ঈগল স্থবির হয়ে বসে ছিল। যেন মহাকাল। দূরের একটা ছোট গেণ্ডুলির ন্যাংটো ডালে বসে কোনও পাগলা কোকিল ডেকে যাচ্ছিল অবিরত। আর ব্রেইন-ফিভার পাখিরা উড়ে উড়ে ডাকছিল, "ব্রেইন-ফিভার' 'ব্রেইন-ফিভার', 'পিউ-কাঁহা', 'পিউ-কাঁহা'।

দূর থেকে তার দোসর সাড়া দিচ্ছিল।

আমাদের মস্তিষ্কেও জ্বর। অনেক জ্বর। অনেকই কারণে।

আমরা কোনাকুনি এগোলাম শর্টকাট করার জন্য।

ঋজুদা খুবই আস্তে-আস্তে হাঁটছিল পা টেনে টেনে। এবার আমরা পাতা ঝরা গেণ্ডুলি বনের মাঝামাঝি চলে এসেছি। এখানে শুধুই গেণ্ডুলি। যেন হাজার-হাজার মেমসাহেবদের সটান উরুর মধ্যে মধ্যে হেঁটে চলেছি আমরা। সুন্দর একরকম গন্ধ গেণ্ডুলি বনের গায়ে। জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে দশ দিক।

বাঁ দিকে দূরে নীল মেঘের মতো দাঁড়িয়ে আছে লবঙ্গির পাহাড়শ্রেণী। ডান দিকে ঘন গভীর বন। যেখানে হাতিটা পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে তার শরীরের এবং মনের সব জ্বালা নিভিয়ে দিয়ে। চিরশান্তির ঘুম।

অত বড় একটা প্রাণী, বয়সে সে হয়তো আমার ঠাকুমার বয়সীই হবে, তাকে মেরে আমার মন বড় ভারী হয়েছিল।

ঋজুদা বলল, "দুর্গা, তুমি এগিয়ে গিয়ে কস্‌ফুর দাহর বন্দোবস্ত এগিয়ে রাখো। বুঝেছ! রাজেন জ্বাল-কাঠ কেটে রেখেছে কি না কে জানে! আমাদের পৌঁছতে তো সময় লাগবে। রাইফেলটা নিয়েই যাও। বাঁদিকের ব্যারেলে গুলি আছে। সেফটি ক্যাচটা দেখিয়ে দে রুদ্র দুর্গাকে।"

"ঠিক আছে ঋজুবাবু। ভয় আর কিছুকেই করি না। এক ভালু ছাড়া। কথা নেই, বার্তা নেই খামোখা তেড়ে এসে নাক-মুখ খুবলে নেয় পাজিরা।"

আমি ওকে সেফটি ক্যাচটা কোথায় আছে দেখিয়ে দিলাম। দুর্গাদা বাঁ কাঁধে টাঙ্গি ঝুলিয়ে ডান কাঁধে ঋজুদার রাইফেলটা নিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল চাঁদের বনে। বন্যেরা বনে সত্যি সুন্দর।

একটু এগোতেই দুর্গাদার গান ভেসে এল। জ্যোৎস্নায় ভেসে এসে নির্মেঘ নীল তারাভরা আকাশে অকলুষিত, আর বাঁ দিকের লবঙ্গি পাহাড়শ্রেণীতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে সে গান ফিরে আসছিল। দুর্গাদা গাইছিল :

"ফুলরসিয়ারে মন মোর ছুঁয়ি ছুঁয়ি যা
তো লাগি বিকশি চাহিছে এ কুঞ্জে
গুঞ্জন দেই যা যা।
যা না রে ফেরি, আস্‌সি পাশে যা না
গা মন ভরি, করো না তু মনা
ঝুরিলে কি আউ আসিবে এ দিন্ব
হস্‌সি, লেটি, গাই যা যা—
সাজি কেতে কুঞ্জে, কেতে ফুল্ব সেজে
মহক ছটাই মরে নিতি লাজে
লাজ ত্যজি আজি করুছি আরতি
থরে ধীরে চাহি যা যা।"

চমৎকার সুরেলা গান।

"কী গান এটা?"

আমি শুধোলাম।

ঋজুদা হাসল।

বলল, 'টিকরপাড়ায় ঘাটের বাঁশের ভেলা-ভাসানো মাঝিরা এইসব গান গাইতে-গাইতে এমন চাঁদনি রাতে চলে সারারাত সাতকোশিরা গণ্ডে। টিকরপাড়ার ঘাসিয়ানি মেয়েরাও গায়।"

তারপরেই বলল, "জানিস, রুদ্র, ভারী চমৎকার এই আমাদের দেশ। এই ভারতবর্ষ, না রে ? অতি চমৎকার এই দেশের মানুষ।"

বলেই, চুপ করে গেল।

আমি জানতাম, কী ভাবছে ঋজুদা।

পরক্ষণেই বলল, "একটা গান গা রুদ্র।"

"কী গান ?"

"ধন ধান্য পুষ্পে ভরা।"

আমি খোলা গলায় গান ধরলাম একেবারে তারায়।

"ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি
সে-দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

ঋজুদার গলা গাঢ় হয়ে এল।

বলল, "গা-গা থামলি কেন, পুরোটা গা।"

এগিয়ে চললাম আমরা যেখানে কম্ফু পড়ে আছে সেদিকে।

কম্ফুর বউ সীতা আর ছেলে কুশ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে সেই দুঃখেই সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। কম্ফুর কথা বিস্তারিত ঋজুদা নিজেই লিখেছে "লবঙ্গীর জঙ্গলে" উপন্যাসে। অনেকদিন আগেই। বড় গুণী লোক ছিল কম্ফু।

হাতিটাও উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল প্রায় একই কারণে। তার প্রিয়জনে ভরা দল, পরিবার এবং গোষ্ঠী থেকে ক্ষতবিক্ষত অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হয়ে।

আমরা পাগলা কোকিল আর পিউ-কাঁহার অবিশ্রান্ত ডাকের মধ্যে, পরিষ্কার ধবধবে সুন্দরী গেণ্ডুলি বনের মধ্যে মধ্যে, শুক্লাদশমীর বনজ্যোৎস্নায় আর নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভেসে ভেসে হাঁটতে লাগলাম, খিদে এবং তৃষ্ণার সব কথা ভুলে গিয়ে।

ঋজুদা খুবই আস্তে-আস্তে হাঁটছিল।

আমার মনে হচ্ছিল, আমরা যেন কতদিন ধরেই চলেছি এমনি করে। উদ্ভাসিত আলোয় এবং ক্বচিৎ অন্ধকারে আমরা চলবও।

কম্ফু হাতিটা আমি ঋজুদা।

আমরা সকলেই।

ঋজুদার সঙ্গে সুফ্‌কর-এ

গত রাতেই ঋজুদার সঙ্গে তিতির আর আমি নাগপুর থেকে ঋজুদার ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের বন্ধু পরিহার সাহেবের এক পরিচিতর জীপে করে কানহারে 'মুক্কি' "ফরেস্ট লজ"-এ এসে উঠেছি সন্ধ্যের পর। "ফরেস্ট লজ"টা ইন্ডিয়ান ট্যুওরিজম ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশনের, যেমন লজ ওঁরা নানা জঙ্গলেই বানিয়েছেন। সাম্প্রতিক অতীতে বানিয়েছেন পালামৌর বেতলাতেও। লজগুলি চমৎকার। তবে দোষের মধ্যে ভীষণ এক্সপেনসিভ। ঋজুদা যদি বনবিভাগের একটি বিশেষ সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে না আসত তবে এখানে আমাদের নিয়ে উঠত না। আমাদের সব খরচ অবশ্য ঋজুদা ব্যক্তিগতভাবেই দিচ্ছে।

এই লজটা সত্যিই চমৎকার। খাওয়ার ঘরটি দোতলার ওপরে। পুরো কাঁচ দিয়ে ঘেরা একপাশ। আর সে পাশেই জঙ্গল গভীর। একটি নদী বয়ে গেছে লজ-এর একেবারে পা ছুঁয়ে। বড় বড় সাদা পাথরে পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে উচ্ছ্বসিত, উৎসারিত, চঞ্চল জল চলেছে। কলরোলে।

লজ-এর সামনে দিয়ে পথ চলে গেছে। বাঁ দিকে গেলে নানা জায়গা পেরিয়ে লতাপুর। ডানদিকে গেলে —সোজা সুফকর গ্রাম—তার কিছু আগে ডানদিকে ঘুরে গেলে মোতিনালা। সেখানে কালো হাঁলো নদী পেরুতে হয়। জব্বলপুরেও যাওয়া যায় সে নদী পেরিয়ে বাঁ দিকে গেলে—মান্দলা হয়ে। আবার কিস্‌লি হয়েও যাওয়া যায়, চিল্‌পি হয়ে। হাঁলো নদী পেরিয়ে। মান্দলার পাশে পাশে অনেক দূর অবধি নর্মদা চলেছে। আশ্চর্য সুন্দর নদ নর্মদা।

রাতে অত্যন্ত ক্লান্ত থাকাতে বেশি কথাবার্তা হয়নি আর। আমি আর ভটকাই এক ঘরে শুয়ে পড়েছি গিয়ে। তিতির এক ঘরে। আর অন্য ঘরে ঋজুদা। প্রতিটি ঘরই নদীমুখো। চমৎকার অন্দর-সজ্জা। সস্তা, স্থানীয় সব জিনিস দিয়ে করা হয়েছে, মাদুরের গালচে থেকে বাঁশের টেবল পর্যন্ত। প্রতি ঘরের লাগোয়া ছোট্ট বারান্দা। মনে হয়, হাত বাড়ালেই হাত ছোঁওয়ানো যাবে।

এখন কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদ ওঠেনি এখনও। তারাদের নীলাভ আলোতে নদীর ফেনিল সাদা জল মাঝে মাঝেই ব্যথায় নীল হয়ে উঠছে। সামান্যক্ষণের জন্যে হলেও। নদীর নাম জানা হয়নি এখনও।

যে কোনও নদীই আমাকে বড় টানে। ইচ্ছে হয়, তার গতিপথ ধরে পাথরে পাথরে, বালিতে বালিতে পা ফেলে ফেলে চলে যাই তার সঙ্গে। দেখি, সে কোথায় যায়! তবে একথা বুঝি যে, পথের মতো নয় নদী। পথ কোথাওই থামে না। অন্য কোনও পথে গিয়েই মেশে। সেখান থেকে আবারও অন্যতর পথে। কিন্তু নদী, সে উপনদী, শাখানদী বা মূল নদী যাই হোক না কেন একসময়ে স্ফীত হতে হতে সাগরে গিয়ে থামেই। তাকে থামতেই হয়। তার চলা অনন্তকালের নয়। রবীন্দ্রনাথের "শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালাতে" আছে, ঋজুদা একদিন পড়ে শুনিয়েছিল আমাদের লবঙ্গীর জঙ্গলে যাওয়ার আগে ওড়িশার বাঘমুণ্ডার বাংলোতে বসে ; যে, হারিয়ে যাওয়া বা থেমে যাওয়া মানেই মৃত্যু নয় ; ফুরিয়ে যাওয়া নয়। এই থামার মধ্যেও একধরনের শান্ত সমর্পণ আছে, পূর্ণতা আছে। স্থবিরের চলা। গাছেদের চলার মতন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এমন করে বলেননি। কিছুটা হয়তো ঋজুদার, আর কিছুটা আমার কষ্টকল্পনা।

যাই হোক কলকাতায় ফিরে বইটা জোগাড় করে পড়তে হবে জায়গাটি ভাল করে। উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে এতদিন পরে, ঋজুদা ঠিক কী বলেছিল তা মনে নেই।

সবই ভাল, কিন্তু মুশকিল হয়েছে ভটকাই প্রায় পার্মানেন্ট ফিচার হয়ে উঠেছে আমাদের দলে। ঋজুদা একটা সময় পর্যন্ত শুধুমাত্র আমারই ছিল। তারপর ঋজুদাই তিতিরকে ইনট্রোড্যুস করল আফ্রিকাতে রুআহা অ্যাডভেঞ্চারের আগে। "অ্যালবিনো", এমন কী আফ্রিকার "গুগুনোগুম্বারের দেশে" পর্যন্ত আমিই ছিলাম ঋজুদার একমাত্র সঙ্গী। তারপর আমারই বন্ধু, বন্ধুও বলব না : বলব জাস্ট অ্যাকোয়েন্টেন্স ; এই ভটকাইকে ঋজুদার প্রায় হাতে-পায়ে ধরে দলে নিতে রাজী করাই। "নিনিকুমারীর বাঘ", যে বাঘ সাংঘাতিক মানুষখেকো হয়ে গেছিল, তাকে মারবার জন্যে যখন আমরা যাই ওড়িশার এক পূর্বতন করদ রাজ্যে, তখন ভটকাই প্রথমবার আমাদের সঙ্গী হয়। তারপর থেকে সেই যে ঋজুদার ঘাড়ে 'সিন্দবাদ দ্য সেইলার'-এর মতো চেপে বসেছে আর নামার লক্ষণটি পর্যন্ত নেই। শুধু তাই নয়, ঋজুদাকে ও প্রায় "মনোপলাইজ" করেও ফেলেছে। কী জাদু যে করেছে তা ঐ জানে! কিন্তু এও মনে হচ্ছে ওই এখন ঋজুদার সবচেয়ে কাছের লোক! এ নিয়ে আমার আর তিতিরের রীতিমত গাত্রদাহ হচ্ছে আজকাল। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার, ঋজুদাকে মোটেই মান্যিগন্যি করে না সে। এমন ভাব করে যেন ঋজুদার সে ইয়ার-দোস্ত। গুগুনোগুম্বারের দেশ থেকে আহত ঋজুদাকে যদি বাঁচিয়ে না নিয়ে আসতে পারতাম দেশে, তবে

কী করে হত তারপরের আরও এত সব অ্যাডভেঞ্চার ?

ব্রেকফাস্টের পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম ঠিক সকাল নটাতে কাঁটায় কাঁটায়। সময়ের ব্যাপারে আমরা সেনাবাহিনীকেও হার মানাতে পারি। ঋজুদার নটা মানে, নটা বাজতে পাঁচ-এ আমাদের সকলের ঋজুদার কাছে রিপোর্ট করতে হবে। সকাল নটা না হয়ে যদি রাত দুটো হয়, তবেও তাই। সবচেয়ে বড় কথা ঋজুদা "গুড অ্যাডভাইস অ্যান্ড ব্যাড এগজাম্‌পল"-এ বিশ্বাস করে না। প্রতিদিনই ঋজুদা আমরা রিপোর্ট করার আগেই নিজে পুরো তৈরি হয়ে বসে থাকে। ঋজুদার কাছে থেকে থেকে, তার সঙ্গে বহু অ্যাডভেঞ্চারে গিয়ে গিয়ে নিয়মানুবর্তিতা আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। ঋজুদা কখনও কখনও স্বগতোক্তির মতো বলে যে, যে মানুষ বা যে জাতির জীবনে নিয়মানুবর্তিতা নেই তার বা তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। স্কুলেই যাও বা অফিসেই যাও, সভাতেই যাও বা গান শুনতেই যাও, গানের অনুষ্ঠান অথবা স্টাডি সার্কল যারই আয়োজন করো, অনুষ্ঠান যেন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আরম্ভ হয়। যাঁরা পরে আসবেন তাঁদের ঢুকতে দিও না। সময় মতো প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিও। তাতে যা হয় হবে।

ভটকাই প্রথম প্রথম বলত, ওর শ্যামবাজারী ভোকাব্যুলারিতে "বড় জ্ঞান দেয়রে মানুসটা"।

কিন্তু এখন বলে, ঋজুদা আমার লাইফ-স্টাইল চেঞ্জ করে দিয়েছে র‍্যা। আমার গলির সবাই আমাকে দেখে ঘড়ি মিলোয় আজকাল। পঞ্চমী নামের একজন ঠিকে কাজের লোক, ঘোষবাবুদের বাড়ি ঠিকে কাজ করে ; যে সেদিন আমাকে গলিতে দেখেই বলল, "হেই যা গো! পৌনে-নটা বেইজে গেল গো.! তুমি যে কালিজে বেইরে পইড়েচো গো দাদাবাবু।"

ভটকাই-এর কথা শুনে আমরা হেসেছিলাম খুব।

ঋজুদা বলল, তুইই চালা রুদ্র। পাইপ নিয়ে এত ঝকমারী হয় যে জীপ বার বার থামাতে হয় নিজে চালালে।

ভটকাই ফুট কাটল, আহা! রুদ্র চালালেও যেন থামতে হয় না। তোমার পাইপ খাওয়ার দরকার কী ? প্রতি পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড অন্তরই ত' নিভে যায়! তার চেয়ে তুমি থেলো-হুঁকো খাও। হুঁকোর মাথাতে টিকে দিয়ে তার উপরে টিনের চাকতি ফুটো-ফুটো করে মাপ করে বসিয়ে দেব। ফাসক্লাস হবে।

জীপ স্টার্ট করে মুক্কি লজ থেকে ডান দিকে মোড় নিতেই নদীটার উপরের কংক্রীটের ব্রিজের উপরে এসে উঠলাম আমরা।

বাঃ।

আমার মুখ ফুটে বেরিয়ে গেল।

কী সুন্দর নদীটা। মেমসাহেবের গায়ের রঙের মতো সাদা বালি, নরম,

পেলব শুয়ে রয়েছে স্রোতস্বিনীর দুপাশে। শীতের সকালের রোদে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। বড় বড় সাদা পাথর। বিজ্ঞ হনুমানের দল তাদের "ব্লন্ড" দাড়ি আর গায়ের চুল নিয়ে কী যেন এক জরুরী সভাতে বসেছে। এ ওর দাড়ি ও মাথার চুল থেকে সাবধানে সযত্নে উকুন বেছে বের করছে।

ভটকাই বলল, তোমার অফিসে ফোন করলে তোমার সেক্রেটারী যখন বলে যে, "মিঃ বোস ইজ ইন কনফারেন্স ন্যাও" তখন আমার এই ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আমরা সকলে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম। ঋজুদার মুখ থেকে হাসির তোড়ে পাইপ প্রায় ছিটকে বেরিয়ে গেল।

সকলের হাসি থামলে ঋজুদা বলল, কথাটা খুব একটা মন্দ বলিসনি ভটকাই। তিতির একটা ছবি তোলতো নেমে, আমাদের কনফারেন্স রুমের দেওয়ালে এনলার্জ করে বাঁধিয়ে রাখব। সত্যি! "কনফারেন্স", "মীটিং" কথাগুলো চালু হয়েছে বটে। ঘরে বসে হয়তো কেউ মাসতুতো দিদির মেজছেলের মাধ্যমিকে ফেল হওয়া নিয়ে আলোচনা করছে আর জরুরী ব্যাপারে যাঁরা ফোন করছেন তাঁদের বলে দিচ্ছে সেক্রেটারী "হি ইজ ইন আ কনফারেন্স।" 'কনফারেন্স' আর 'মীটিং' এ না থাকলে যেন বড় সাহেব যে কেউ হয়েছে তা প্রমাণই হয় না। এমনই ভাব হয়েছে একটা আজকাল। কাজ করার চেয়ে কাজ দেখানোটাই অনেক বড় ব্যাপার হয়ে গেছে।

বাঃ ওগুলো কী ফুল ঋজুদা? পাথরের মধ্যে মধ্যে জলের গায়ে ফুটেছে। মাছ ধরছে একটা বুড়ো লোক। কী সুন্দর দেখাচ্ছে, না, ছবিটা এই শীতের সকালে?

ঋজুদা প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল হ্যাঁ। যা বলেছিস।

তিতির ছবি তুলে ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়েই সেদিকে চেয়ে রইল। যেখানে বুড়ো বসে মাছ ধরছিল।

ভটকাই বলল, কী মাছ পায় এখানে ওরা, ঋজুদা? আর বললে না, কী ফুল ওগুলো?

ঋজুদা স্বপ্নোত্থিতর মতো বলল, ওগুলো গান্ধালা ফুল, আর ঐ যে দেখছিস ও পাশে, জলের কিনারায়, ওগুলোর নাম গাংগারিয়া। স্থানীয় নাম। এই নামেই জানি। ওদের বটানিকাল নাম বলতে পারব না।

আর মাছের নাম বললে না, কী মাছ ধরছে?

মাছ কী আর ধরছে? তবে মাছের নাম, পাড়হেন, সাওয়ার, এই সব। পাহাড়ী নদীতে হয় এই সব মাছ।

তা মাছ ধরছে না তো কী করছে ঐ বুড়ো?

ঋজুদা হাসল, হাঃ হাঃ করে।

তারপর বলল, বড় হলে জানতে পাবি বৃদ্ধদের কতরকম কষ্ট থাকে। শুধু

বৃদ্ধ কেন, সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরই থাকে। সেই সব কষ্ট থেকে পালিয়ে আসার জন্যে মাছ ধরার বাহানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাথরের ওপর রোদে বসে থাকে, জলের শব্দ, রোদের চিকমিক, গাছ পাতা লতার শব্দ, মাছেদের হঠাৎ ডিগবাজী আর মাছরাঙার হঠাৎ 'ছোঁ'তে যখন চারদিকে হাজার হাজার হীরে ছিটকোতে থাকে তখন বুড়ো দু পা জোড়া করে বসে জহুরী বনে যায়। পিটপিট চোখে হীরে দেখে, পরখ করে, জিভ দিয়ে চাটে, নাক দিয়ে গন্ধ নেয়; হীরের ফুল দেখে, হীরের মাছ দেখে, তার সারা জীবনের দারিদ্র, শীত, খিদে সব ভুলে গিয়ে উষ্ণ রোদের মধ্যে বসে এক দারুণ সুখের দেশে চলে যায়। যে দেশে মৃত্যুর আগে তার যাওয়ার কোনও উপায়ই নেই।

তারপর বলল, যখনই দেখবি কোনও মানুষ একা বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাৎনার দিকে চেয়ে আছে তখনই বুঝবি, ফাৎনা নড়াটা একটা বাহানা, ছুতো; মানুষটি অবশ্যই অন্য গভীর কিছুর সন্ধানে ঐ সাধনাতে বসেছেন। তার শিশু সন্তানের মুখ থেকে তার বৃদ্ধ বাবার মুখ, তার চাকরীর জায়গা, তার ফেলে-আসা খেলাধুলোর মাঠ, কোনও পরীক্ষায় তার ফেল করার দুঃখময় স্মৃতি, তার জীবনের পথ, সেই পথের গন্তব্য; কত কিছুই যে ফাৎনার সঙ্গে হাওয়ায় দুলতে থাকে চোখের সামনে, মনের সামনে তা যে মাছ ধরে, সেই শুধু জানে! আসলে বড় হলে বুঝতে পারবি যে সংসারে এই সত্যটাই মস্ত বড় সত্য। অ্যাপারেন্ট ইজ নট রিয়্যাল। নে, এবার চল।

বলেই বলল, এই বানজার নদীর মতো সুন্দরী নদী সত্যিই কম আছে। এখানের বানজার এর রূপ অনেকটা পালামৌ-এর লাতবনবাংলোর কাছের কোয়েলের মতো। না, বানজার বোধ হয় আরও অনেক বেশি সুন্দরী। বানজার মেমসাহেব আর হাঁলো দিশিমেয়ে। একজন ফর্সা অন্যজন কালো। তবে রূপসী দুজনেই সমান।

তিতির বলল, "এই তাঁবুগুলো কিসের?"

"এগুলো অ্যান রাইট-এর কোম্পানির তাঁবু।"

"কোন্ অ্যান রাইট?"

ভটকাই শুধোল।

"তুই যার কথা ভাবছিস, সেই।"

ঋজুদা বলল।

'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড-এর অ্যান রাইট?"

"ইয়েস স্যার।"

আমি বললাম।

"ওঁর কোম্পানি আছে। বিদেশিদের জানোয়ার দেখাতে নিয়ে আসেন। আগে বিহারের পালামৌয়ের বেতলা ন্যাশনাল পার্কেও ছিল। এখন মধ্যপ্রদেশের 'কান্হা-কিস্লি' অঞ্চলে।"

"সামনের নদীটা কী নদী ঋজুদা ?"

"এটাই তো হাঁলো রে !"

"আর কান্‌হার মুক্কি ট্যুওরিস্ট লজ-এর পাশে তো বান্‌জার, তাই না ?"

"হ্যাঁ।"

একটা বাঁক ঘুরতেই দূরে সুফ্‌কর-এর বন-বাংলোটা দেখা গেল। খড়ের চাল এর। ছবির মতো।

ঋজুদা বলল, দেখছিস তো রুদ্র।

"বাঃ।"

জীপের গতি কমিয়ে বললাম আমি। আমার মুখ থেকে ছিটকেই বেরিয়ে গেল শব্দটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

"এই হচ্ছে সুফ্‌কর।"

"দারুণ।"

তিতির আর ভট্‌কাই দুজনেই একসঙ্গে বলল।

"অ্যান রাইট কি এখানে আসছেন নাকি ? আছেন এখন ?"

"আসতে পারেন। তবে সুফ্‌কর-এ নেই। থাকলে, কান্‌হা অথবা চিল্‌পিতেই আছেন।"

"তুমি চেনো ওঁকে ?"

"ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তবে পালামৌর বিভিন্ন জঙ্গলে অনেকবারই দেখেছি যখন শিকার করতে গেছেন। পঞ্চাশের দশকে, ষাটের দশকে।"

ঋজুদা বলল।

"সে কী ! উনি শিকার করেন নাকি ? উনি তো কনসার্ভেশানিস্ট। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের একজন মাতব্বর তো।"

"তাতে কী ? যাঁরা এক সময়ে ভাল শিকারী ছিলেন তাঁরাই সবচেয়ে ভাল কনসার্ভেশানিস্ট হন। নিয়ম মেনে শিকার করাটা কখনওই পৃথিবীর কোথাওই অপরাধ বলে গণ্য হয়নি। আজও হয় না। যে-কোনও ব্যাপারেই অনিয়মানুবর্তিতা আর বাড়াবাড়িই সব কিছু সর্বনাশের মূলে। ইংরেজ আমলে তো এমন কনসার্ভেশানের প্রয়োজন হয়নি ! আমরা যেই স্বাধীন হলাম, সঙ্গে-সঙ্গে ভাবলাম অনিয়মানুবর্তিতাই স্বাধীনতার চরম প্রকাশ। অকাট্য প্রমাণ ! ফলে, যা হবার তাই হল।"

"বোদ্ধা কাকু যে বলেন, শিকার করার মতো পাপ আর নেই ? শিকারিরা ঘৃণ্য।"

ভট্‌কাই বলল।

"বোদ্ধা কাকুটি কে ?"

"বাঃ। বোদ্ধা কাকুকে চিনিস না ? তাঁকে কেনা চেনে ! কলকাতার অ্যানাদার আঁতেল !

"তাই ?"

তিতির বলল, ইমপ্রেসড হয়ে।

"তাই।"

"ভালই তো। এমন মানুষ দু-চারজন ধারে কাছে থাকলেও নিজেদের জ্ঞানের সঙ্গে তাঁদের জ্ঞানের ঠোকাঠুকি লেগে সকলেরই জ্ঞানের দীপ্তি বাড়ে।"

ঋজুদা বলল।

হ্যাঁ, 'ঘৃণ্য' শব্দটা অনেককেই ব্যবহার করতে দেখি আজকাল। অথচ ভদ্রলোকমাত্রেরই জানা উচিত যে, ঘৃণ্য শব্দটাই ঘৃণ্য। যাঁরা 'ঘৃণ্য' শব্দটি ব্যবহার করেন তাঁরাই ঘৃণ্য। তবে সব দেশেই অশিক্ষিত, সবজান্তা মানুষেরা অমন অনেক কিছুই বলেন। সকলের কথাই যদি শুনতে হয় তবে তো নিজেদেরই পাগল হয়ে যেতে হয়।

"অ্যান রাইট একা যেতেন পালামৌতে ? শিকারে ?"

"একা কখনওই আমি দেখিনি। ওঁর স্বামী বব্ রাইট তখন বেঙ্গল পেপার মিল, (আনন্ডু উইল) কোম্পানিতে চাকরি করতেন। ডালটনগঞ্জের এম এল বিশ্বাস অ্যান্ড কোম্পানি তাঁদের কাগজের কলের জন্যে বাঁশ সাপ্লাই করতেন। পালামৌ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্রতি বছরই ইজারা নিতেন ওঁরা, বাঁশ সাপ্লাই করার জন্যে। প্রতি বছর শীতকালে বব এবং অ্যান রাইট আসতেন শিকারে। একবার অ্যান রাইটকে দেখেছিলাম, জন নামের এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গেও। যতদূর মনে পড়ে, শীতকালেই।"

"তুমি কী করতে যেতে ?"

"আমিও শিকারেই যেতাম। টেঁকি তো ধান ভানতেই যাবে। যেতাম বিশ্বাসদেরই অতিথি হয়ে। আমার জন্যেও অন্য ফরেস্ট ব্লক এবং ফরেস্ট বাংলো "বুক" করা থাকত। শিকারের পারমিটও। রাইট-দম্পতির প্রিয় জায়গা ছিল গাড়ু আর মারুমার। তখন গাড়ুর বাংলো ছিল ছোট্ট। কোয়েল নদীর পাশে। নতুন বাংলোটা তো এই সেদিন হল।"

ততক্ষণে জিপটা সুফ্‌কর-এর বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়ল।

ভট্‌কাই বলল, "চা তো আমাদের সঙ্গে ফ্লাস্কেই আছে। বাংলোর বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতে তোমার সুফ্‌কর-এর সেই জোড়া-বাঘের গল্পটা আমাদের বলতে হবে কিন্তু। উ্য প্রমিসড আস।"

"হ্যাঁ। তবে বাঘ তো আমার নয়। আমার কৃতিত্ব ও ব্যাপারে কিছুমাত্রই ছিল না। অকৃতিত্বও অবশ্য ছিল না। বলব'খন।"

তিতির বলল, "না বললে কিন্তু কথার খেলাপ হবে।"

জীপটা থামতেই ঋজুদা নামল। আর নামতেই, চৌকিদার এসে সেলাম করল। চৌকিদারের কোয়ার্টার থেকে একজন বুড়ো মানুষ ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে ঋজুদাকে বলল, "পররনাম হুজৌর।"

ঋজুদা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, "কেমন আছ হিরু পানকা ?"

"ভাল হুজৌর। আপনি ?"

"চলে যাচ্ছে হিরু। ঠুঠা বাইগা আর দেবী সিং কেমন আছে ?"

"কোনও খোঁজ জানি না হুজৌর। কতদিনের কথা ! কে যে কোথায় চলে গেছে ছট্‌কে-ছাট্‌কে।"

"নাম দুটি চেনা চেনা লাগছে যেন !"

তিতির বলল।

বলেই বলল, "মনে পড়েছে। কোনও উপন্যাসে এই চরিত্রদুটি আছে। তাই না ?"

"আছে নাকি ? হতে পারে। অনেকেই হয়তো চেনেন এঁদের। জঙ্গলের গভীরে যাঁরা ঘোরেন তাঁরা তো চিনবেনই।"

তারপরই ঋজুদা আমাদের দিকে ঘুরে বলল, "বুঝেছিস। সুফকর-এর জোড়া-বাঘের নাটকে এই মানুষটিই প্রধান-চরিত্র ছিল। এই হিরু পানকা। আমি আসব খবর পেয়েই দেখা করতে এসেছে। দ্যাখ। হাউ নাইস অব হিম ! আর কতদূর থেকে এসেছে ! একসময়ে ওর বাড়ি ছিল এই সুফকর গ্রামেই। এখন দূরে চলে যেতে হয়েছে 'কোর-এরিয়া' ছেড়ে, উদ্বাস্তু হয়ে ; বনবিভাগের নির্দেশে। পুরো এলাকাটাই তো টাইগার-প্রোজেক্ট নিয়ে নিয়েছে, খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে "বৃহত্তর স্বার্থে।"

একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, "আমরা পূর্ববঙ্গের মানুষ তো ! উদ্বাস্তু হতে কেমন যে লাগে, তা বুঝি।"

তিতির বেতের চৌকো বাস্কেটটা নামিয়ে ফ্লাস্ক খুলে চা ঢেলে দিল ঋজুদা ও আমাদের। ও নিজে তো এখনও দুগ্ধপোষ্য। তাও আবার সকালে ও বিকেলে ঘড়ি ধরে দুধ খায়।

আমরা সকলে ঋজুদার দু' পাশে চেয়ার টেনে বসলাম। ঋজুদা চা খেতে খেতে পাইপটাতে তামাক পুরল। তারপর চা শেষ করে ধরাল পাইপটা।

ভট্‌কাই অর্ডার করল, "এই তোরা কথা বলবি না আর একটাও। স্টার্ট ঋজুদা।"

ভট্‌কাইয়ের দুঃসাহস কমবার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরং দিনকে দিন তা বেড়েই চলেছে। ঋজুদাকেও ও এমনভাবে ট্যাক্‌ল করে, যেন মারাদোনার পায়ে বল পড়েছে ! জানি, উপমাটা ভাল হল না। আমরা ওর সাহস দেখে সত্যিই অবাক হয়ে যাই। তিতিরের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে আলোচনাও হয় এই নিয়ে কিন্তু করার কিছুই নেই। ঋজুদাই ওকে লাই দিয়ে মাথায় চড়িয়েছে।

একরাশ ধোয়া ছাড়ল ঋজুদা। ইংলিশ গোল্ড-ব্লক টোব্যাকোর মিষ্টি গন্ধে

ভরে গেল বারান্দাটা। ঋজুদার বন্ধু জ্যাক হিগিন্‌স আগে পাপুয়া আইল্যান্ডে থাকতেন। এখন লন্ডনেই থাকেন। তিনিই পাঠান ওই টোব্যাকো ওখান থেকে। প্রতি মাসে একটি করে পার্সেল আসে।

শুরু করল ঋজুদা।

"শীতকাল। জানুয়ারির শেষ। প্রতি বছরই জানুয়ারির শেষে একপশলা বৃষ্টি হয়ই ভারতের সব বনে জঙ্গলে। তোরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিস। আসলে এমন বৃষ্টি ঝড়-বাদল প্রত্যেকটা ঋতু পরিবর্তনের আগেই হয়। থুড়ি, বলা উচিত ছিল যে, হত। আজকাল তো কোথাওই আবহাওয়ার কোনওই মাথামুণ্ডু নেই। আমাদের নিজেদের কৃতিত্বও কম নয় এর পেছনে।"

"তারপর ?"

"আগের রাতে প্রচণ্ড দুর্যোগ গেছিল। সকালেও ঝোড়ো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে টিপটিপে বৃষ্টি। এই যে বাংলোর গেট-এর প্রায় সামনেই পাহাড়টা দেখছিস, যখনকার কথা বলছি ; তখন এতে ঘন সেগুন-জঙ্গল ছিল। বছর কুড়ি হল ক্লিয়ার-ফেলিং করে এখানে নতুন শালের প্ল্যানটেশান করা হয়েছে। তখনকার সেই সেগুন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা গেম-ট্র্যাক, মানে জানোয়ার-চলা শুঁড়িপথ, পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে এসেছিল। বাংলোর গেটের প্রায় কাছাকাছি এসে বাংলোটা এড়িয়ে গিয়ে পেছনের গভীর বনে ঢুকে গেছিল পথটা। তারপর সুফকর গ্রামের দিকে।

গ্রামে ফসল লাগলে হরিণ, শম্বর, বারাশিঙারা সব কুলথি, চানা, তিল, মকাই এসব খেতে আসত ওই শুঁড়িপথ বেয়েই, সামনের দিকের ঘন জঙ্গলে ঘেরা পাহাড় থেকে।"

"তারপর ?" তিতির বলল।

"সকালের চা-জলখাবার খেয়েছিলাম আগের রাতের বাসি খিচুড়ি, কড়কড়ে করে আলু ভাজা আর শুকনো লঙ্কার সঙ্গে। ব্রেকফাস্ট খাবার পরে এই বারান্দাতেই ইজিচেয়ারে বসে পাইপ টানছিলাম। হঠাৎ সেই মাতাল হাওয়া আর সুগন্ধি বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে একটি অদ্ভুত শব্দ আমার কানে এল। চমকে উঠে সোজা হয়ে বসে, যেদিক থেকে শব্দটা এল মনে হল, সেদিকে তাকিয়ে দেখি একটি অতিকায় পুরুষ-বারাশিঙা ওই গেম-ট্র্যাক দিয়েই হড়বড়-খড়বড় করে নেমে আসছে আতঙ্কিত হয়ে।

"প্রথমে ভেবেছিলাম জংলী কুকুর বা ঢোল, এই বুঝি তাড়া করেছে তাদের। কিন্তু সে ভুল তক্ষুনি ভেঙে গেল বড় বাঘের প্রলয়ংকর গর্জনে। বনজঙ্গল, ঝোড়ো হাওয়া, সুফকর বাংলো সব যেন থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল বনরাজের ওই গর্জনে। বাঘটা বোধহয় ওদেরই তাড়া করে আসছিল। বারাশিঙারা কাছে আসতেই দেখি, তাদের পেছনেই বাঘ। আর সে বাঘের কী

প্রলয়ংকর মূর্তি।

চিন্তা কর একবার, জলখাবার খাবার পরে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে, ইজিচেয়ারে বসে দিব্যি আরাম করে পাইপ টানছি যখন ঠিক তখনই এমন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-বিঘ্নকারী ঘটনাপ্রবাহ!

"তুমি কী করলে?"

কী কেলো রে বাবা! বলেই, ভট্‌কাই শুধোল।

"কী আর করব। খবরের কাগজের ভাষায়, যাকে বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়', তাই হয়ে ইজিচেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে ব্যাপারটা বোঝার জন্যে সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। এবং ঠিক সেই সময়েই বাঘটা অন্য বারাশিঙাগুলোকে প্রায় ঝড়ের বেগে টপ্‌কে এসে অতিকায় প্রাচীন পুরুষ শিঙালটার ওপর লাফিয়ে উঠেই তার পিঠ ও পেটের মাঝামাঝি জায়গা একেবারে ফালাফালা করে দিল। যেন কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশেই!

"অন্যরা দুদ্দাড় করে খুরে খুরে খটাখট শব্দ করে পাথুরে, পিছল, ঘাস-ঢাকা জমি পেরিয়ে প্রায় বাংলোর গেটের পাশ দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে উড়ে গেল, আর ঠিক সেই সময়েই বাঘটা শিঙালের পিঠ থেকে নেমেই পাশ থেকে কোনাকুনি এক লাফ মেরে তার ঘাড় কামড়ে টুঁটি টিপে মাটিতে "পট্‌কে" দিল। এক "পট্‌কান" খেয়েই তো অত বড় জানোয়ারটা শিঙের শাখা-প্রশাখা নিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে অসহায়ভাবে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। তার নাকের পাটা ফুলে উঠল। চোখ দুটি উজ্জ্বলতর হল। তারপরই দুটি চোখ যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল। জিভটা আগেই বেরিয়ে গেছিল। দাঁতে-কামড়ানো ছিল। কিছুক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ থাকার পর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

"বাঘটা, বারাশিঙাটা যতক্ষণ না মরে গেল ততক্ষণ ওর টুঁটি কামড়েই শুয়ে রইল ঘাড়ের পাশে। ঘাড়ের কাছে মুখ আর শরীরটা তার পেটের পাশে শুইয়ে, যেন তার সঙ্গে খুবই ভাব-ভালবাসার সম্পর্ক। বারাশিঙাটা নিস্পন্দ হয়নি তখনও। মৃত্যুর পরও অনেকক্ষণ রাইগার-মর্টিস-এর কারণে হাতে-পায়ে স্পন্দন থাকে। মানুষেরও থাকে, এমন হঠাৎ আঘাতে মৃত্যু হলে; মৃত্যুর সময়ে।

"কিন্তু বাঘ সেজন্য অপেক্ষা না করে দাঁড়িয়ে উঠে পাহাড়ের দিকে চেয়ে এক প্রচণ্ড হুঙ্কার দিল। ভাবখানা, যেন বলে গেল, আমি এসেছিলাম। তা বলে, আমার খোঁজ করার সাহস যেন কারও না হয়!

"পরমুহূর্তেই ওই গেম-ট্র্যাকেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে, বৃষ্টিভেজা ঘন সেগুনের নিবিড় বনের আড়ালে। পুরো ঘটনাটা ঘটে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। আমার তোদের বলতে যে সময় নিল তার অর্ধেক সময়ে।

"তারপর?"

"বাঘের ঠিক এরকম হরকত্ আমি তার আগে তো বটেই, তার পরেও কোনওদিনও দেখিনি। বিস্ময়াভিভূত ভাবটা কেটে যেতেই চেয়ারে বসে

পাইপটা ধরালাম।"

"হিরু পান্‌কা তখন কোথায় ছিল?"

তিতির শুধোল।

"হিরু পান্‌কা সেদিন সকালে আজকেরই মতো চৌকিদারের ঘরেই বসে ছিল। সেই সময়ে এই বন-বাংলোর যে চৌকিদার ছিল তার নাম ছিল বহেড়া বাইগা। বেচারা কানে একটু কম শুনত আর জাতে ছিল বাইগা।

"বহেড়া আর হিরু দুজনেই দৌড়ে এল আমার কাছে বারান্দাতে বাঘের ঐ তর্জন-গর্জন শুনে।

"কী ব্যাপার?"

"আমি শুধোলাম ওদের।"

ওরা আতঙ্কিত গলায় সমস্বরে বলল, "হুজৌর, এই বাঘটাকে মারতে না পারলে আমাদের সুফ্‌কর গ্রামে থাকাই মুশকিল হবে। গ্রামের পেছনের জঙ্গলে মোষের বাথান আছে পাহাড়ীদের। তাদের বাথানে দিন পনেরো আগে রাতে এসে বাথানের দরজা ভেঙে দিয়ে দু-দুটো মোষকে মারে, চারটেকে আহত করে ফেলে যায়। পরে, তাদের মধ্যে তিনটিই মরে যায়।"

"বলো কী? অতগুলো মোষ একসঙ্গে থাকতেও বাঘ অমন করতে পারল? বাঘকেও তাদের ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার কথা ছিল।"

"তার কারণ ছিল। মোষেদের তো নড়াচড়া করারই উপায় ছিল না কোনও। এমনই গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে তাদের রেখেছিল পাহাড়ীরা বাথানে। আপনারা, বাঙালিবাবুরা যেমন করে হাঁড়িতে কইমাছ নিয়ে যান।"

"তাই বলো!"

হিরু বলল, "এই বাঘ দুটির 'মস্তী' শেষ হতে-হতে আমরাই শেষ হয়ে যাব।"

ওরা দুজনে যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তখন সুফ্‌কর গ্রাম থেকে গ্রামের পনেরো-কুড়িজন মানুষ ওই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা, দমক দমক ছুঁচ-ফুটোনো হাওয়া আর বৃষ্টি উপেক্ষা করে, লাইন করে বাংলোর হাতায় এসে ঢুকল।

"সকলেই একই সঙ্গে কথা বলছে। কারও মুখে চুট্টা, কারও ঠোঁটের নীচে খৈনি, কারও হাতে খেলো হুঁকো। আমি সকলকেই বারান্দায় ভেতরে ডেকে বহেড়া বাইগাকে সকলের জন্য চা করতে বললাম। আদা, দারচিনি আর তেজপাতা দিয়ে। যা ঠাণ্ডা পড়েছিল না সেদিন! এখনও ভাবলে কুঁকড়ে যাই।"

তারপর ঋজুদা স্বগতোক্তির মতো বলল, "বুঝলি না, ওরাই তো আমাদের দেশের আসল মানুষ। আসল ভারতবাসী। ওরাই হনুমানকে দেবতা বলে পুজো করে। রামের নামে প্রাণ দিয়ে দিতে পারে। আমি তুই; আমরা এই দেশের ক'জন? রামচরিতমানস, রামায়ণ আর মহাভারতের শিক্ষাই ওদের

একমাত্র শিক্ষা। বয়সে ছোট হলেও এমন কি শিশু এবং মেয়েদেরও "পান্‌কা" পুরুষেরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। আত্মীয়স্বজনের মেয়েদেরও। আমাদের মতো চারপাতা ইংরিজি পড়ে তারা সবজান্তা আঁতেল হয় না। যা-কিছুই ভারতীয় তার সবকিছুকেই অস্বীকার করে নিজেদের অন্যরকম বলে প্রমাণ করতে সবসময়ে এমন ধড়ফড় করে না।"

আমরা সকলেই চুপ করে রইলাম। ভট্‌কাই ঋজুদা সম্বন্ধে অত কিছু জানে না। কিন্তু আমি আর তিতির জানি যে, স্বদেশ বা স্বদেশের মানুষের কথা উঠলেই ঋজুদার চোখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গলার স্বর গাঢ় ও গভীর হয়ে ওঠে।

ঋজুদা বলল, "জানিস, মাঝে-মাঝেই ভাবি, যদি ছেলেবেলা থেকেই শিকার না করতাম বনে-পাহাড়ে, নদী-বিলে, আমার এই বিরাট দেশের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে এমন কাছ থেকে সমান্তরাল জমিতে দাঁড়িয়ে মেশবার সুযোগ না হত, তবে হয়তো আমিও কলকাতা শহরে বাস-করা অনেক ভারতীয় নামী দামি মানুষদেরই মতো স্বদেশের সঙ্গে কোনওরকম প্রকৃত সম্পর্করহিত হতাম। লজ্জাবোধ যে আমাদের নেই, তার জন্য লজ্জিত হতাম না, কর্তব্যবোধ যে রাখি না, সেজন্য বিবেকদংশিত হতাম না। তোরা সবাই, প্রত্যেকেই, পুরোপুরি দিশি-মানুষ হোস, বুঝলি রে! নিজের দেশকে ভাল করে জানিস। নিজের দেশের মানুষকে ভালবাসিস।"

"ওরা তারপর কী বলল? মানে, গাঁয়ের মানুষেরা?"

তিতির শুধোল, ঋজুদাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে।

"ওরা বলল, বাঘ একটা নয়, দুটো আছে।"

"ওই সময়ে দুটো কেন একসঙ্গে? পেয়ার?"

সুফকর গ্রামের লোকেরা তারপরে সমস্বরে বলল, ওই বাঘ দুটোকে না মারা গেলে ছেলে-মেয়ে গাই-বলদ নিয়ে সুফ্‌কর গ্রামে থাকাই ওদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। মেরে যদি আমি দিতে পারি তো ওরা চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে।

"গ্রামের পাহান্‌ যে, সে সুন্দর সৌম্য পুরুষ। তার দু'কানে পেতলের মাকড়ি। হাতে পেতলের বালা। বুনোট তুলোর জামা গায়ে। বহুবর্ণ চৌখুপি কাপড়ে বানানো সেই জামার আস্তরণ। হাতে তার কুচকুচে কালো থেলো হুঁকো। চুল সাদা ধবধবে। গোঁফ সল্ট-অ্যান্ড-পেপার। তার সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ আমার। পাহান বলল, 'আমার বয়স হল চার কুড়ি। এই বন-পাহাড়ে আজ অবধি অসংখ্য বাঘ দেখেছি, কিন্তু আমি বাঘেদের এই ধরনের হরকত কখনওই দেখিনি। অজীব বাত বোস সাহাব।"

"তুমি কী বললে ওদের উত্তরে? ঋজুদা?"

কী আর বলব! বললাম, রাতে ওই মৃত বারাশিঙাটার ওপরে বসব এবং বাঘ

মেরে দেব। আমার পারমিটে একটি বাঘ, একটি চিতা, এবং একটি করে শম্বর ও বারাশিঙাও ছিল। আর বন-শুয়োরতো ছিলই, যত খুশি। তোমাদের এতবার করে আমাকে অনুরোধ করতে হবে না।

ওরা হাতজোড় করে বলল, যদি দয়া করেন।

লজ্জিত হয়ে আমি বললাম, দয়া-টয়ার কথা আসছে কিসে? আমি তো শিকার করতেই এসেছি। অবশ্য পারমিটে থাকলেই কী। কোনও শিকারীই পারমিটে যা থাকে তার সবই শিকার করেন না। অবশ্য শিকারও তো আর বাঁধা থাকে না। অনেক সময়ে এমনও হয় যে, পনেরোদিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারমিটে উল্লিখিত জানোয়ারের একটির সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারা যায় না। জানোয়ারদের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট লালবাজারের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকেও অনেক দড়।"

"তুমি কিন্তু আবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছ।"

ভট্‌কাই বলল।

"সরি।"

বলো ঋজুদা, আগে বাড়ো।

পাহান্‌, হিরু পান্‌কা আর বহেড়া বাইগা প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল যে, এই বাঘ ও বাঘিনী কখনওই কোনও মড়িতে ফিরে আসে না। মড়িতেই যদি ফিরে আসত, তবে ওরা, যারা অনাদিকাল থেকে শিকার করেই জীবিকা নির্বাহ করছে, আর গাদা-বন্দুক বা একনলা কার্তুজ-বন্দুক বা বিষমাখানো তীর নিয়ে; গাছে বসে কি এতদিনে জোড়া বাঘকে "পটকে" দিতে পারত না?

"ওই বাঘ দুটো বনদেওতার বাঘ।"

পাহান বলল গম্ভীর গলাতে।

তারপর বলল, মানে, তাদের এতদিনের হরকৎ দেখে তেমনই মনে হচ্ছে। নইলে কেউই তাদের মারতে পারছে না কেন?

"আমি চুপ করে শুনলাম। সংস্কার এমনই একটা জিনিস, অনেকটা গলায়-বেঁধা মাছের কাঁটার মতো; যখন যাবার তখন এমনিই যাবে। জোর করে তুলতে গেলেই চিত্তির!"

তারপর ওদেরই মধ্যে একজন বলল, আরে! খামোখা তক্‌রার-এ গিয়ে লাভ কী! কথা কম বলো! হুজৌরকে বলতে দাও। শোনো, উনি কী বলেন!

"আমি বললাম, তোমরা কী বলো তাই শুনি।"

"আমরা বলি, নরম মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ এখনও টাটকা আছে। এখনই বাঘেদের "পিছা" করে তাদের মারা উচিত। যত মাইল যেতে হয়, সে যমের দুয়ারে যেতে হলেও গিয়ে এদের "সামনা" করা উচিত। নইলে এই দুই বাঘ মারা কোনদিনও সম্ভব হবে না। আমাদেরই উদ্বাস্তু হতে হবে। এদের এইরকম বদমায়েশি চলছে দীর্ঘদিন হল। গত বছরও নভেম্বর মাসে এরা

এইরকম করেছে। নানু বাইগা তো মারাই গেল ওদের হাতে। নাগপুর থেকে মালহোত্রা সাহেব এসেছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও মারতে পারলেন না। ফিরে গেলেন কুড়ি দিন পরে।

"আমি ইজিচেয়ারের ওপরে আবার সোজা হয়ে বসলাম। ইতিমধ্যে বহেড়া বাইগা তো চা নিয়ে এল সকলের জন্য।

তখন জানিনি যে, কথাটা এমন সত্যি হবে। ওই বাঘেদেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্বিঘ্ন করার জন্যে সেই সকালের অনেক সকাল পরে তাদের বাবা-ঠাকুরদাদার ভিটেমাটি ছেড়ে তাদের উদ্বাস্তু হয়েই চলে যেতে হবে! বললাম, "তোমাদের এই গ্রামে ক'টা এবং কী কী বন্দুক আছে? পাশী কি বেপাশী? আমি ফরেস্টার সাহেব বা পুলিশ সাহেব, কাউকেই বলব না।"

"পাশী দোনলা বন্দুক আছে একমাত্র রাজুপ্রসাদের। কিন্তু সে তো ডাকাতের মোকাবিলার জন্যেই বন্দুক রাখে। বাঘের জন্যে তো নয়! সে বন্দুক দেবে না।"

হিরু বলল।

"তবে তার বন্দুক ডাকাতি করেই নিতে হবে। তার বন্দুক ছাড়া আর কারও আছে?

" 'আছে। কিন্তু বেপাশী। গাদা বন্দুকও আছে দুটি। কিন্তু তা দিয়ে পায়ে হেঁটে অমন দুশমনের মতো জোড়া-বাঘকে চোট করতে কি সাহস হয়? এক চোট-এর বেশি তো করা যাবে না। তারপর? হায় রাম!'

"যা বললে তোমরা তাতে আমারও মনে হয় যে, এখুনি বেরিয়ে পড়ে বাঘেদের "রাহান-সাহান"-এর খবর করাটা অত্যন্ত দরকার। 'তোমরা এবারে যাও। রাজুপ্রসাদের বন্দুকটি ডাকাতি করেই হোক, আর যে-করেই হোক, নিয়ে এসো। আর কার্তুজও। বল্ আর এল. জি. এনো শুধু। যে-কোনও বল্ হলেই চলবে। কনটাক্ট, রোটাক্স, লেথাল্, স্ফেরিক্যাল। আলফামাক্স এর যদি থাকে, তাই আনবে। কার্তুজ যেন টাটকা হয়। বাজে কার্তুজ নিয়ে বাঘের পেছনে যাওয়া মানেই আত্মহত্যা করা। দাম আমি দিয়ে দেব, বলে দেবে রাজুপ্রসাদকে। দাম যদি না নিতে চায়, তা হলে পরে টাটকা কার্ট্রিজ পাঠিয়ে দেব কলকাতায় ফিরে।'

আমার কথা শুনে পাহানের নির্দেশে ওরা সবাই চলে গেল তখনকার মতো।

"পাহান বলল, 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

" 'তোমায় যেতে হবে না পাহান্। বয়স হয়েছে।'

" 'কিসের বয়স? মোটে তো আশি। যে বছর দুটো দাঁতাল হাতিতে লড়াই হয়েছিল মোতিনালার ধারে, সে বছরেই তো জন্মেছিলাম আমি। আমি শরীরে এখনও পঁচিশ বছরের জোয়ানের বল রাখি। প্রমাণ চাও? পাঞ্জা লড়বে?'

আমি বে-ইজ্জৎ হবার ভয়ে পেছিয়ে গিয়ে বললাম, তা ঠিক আছে। কিন্তু এই ঝড়-বৃষ্টি ঠাণ্ডাতে কী দরকার। তাছাড়া আমার কিন্তু কথা বলে সময় নষ্ট করার সময় নেই। আমি যাই। এবারে, তৈরি হই গিয়ে।'

"বলেই, ঘরের ভেতর যেতে গিয়েও বললাম, 'আমার সঙ্গে শুধু হিরু পান্‌কা গেলেই হবে। রাজুপ্রসাদের বন্দুক না পেলেও চলবে। আমার কাছে তো এক্সট্রা ডাবল-ব্যারেল বন্দুক একটা আছেই। তবে বড় গুলি মাত্র দুটি রয়েছে। মুরগি, তিতির মারার জন্যেই বন্দুকটাকে এনেছিলাম। নইলে, বড় জানোয়ার তো রাইফেলেই মারি।' আর কারোরই যাবার দরকার নেই।

"পাহান্ বলল, 'না না, তা কী হয়। আমাদের গ্রামেরই তো এত বড় বিপদ। আমাদের তংক্ করে মারছে শয়তান দুটো। আর গ্রামেরই কেউ যাবে না, তা কী হয়! আমার নাতি অবশ্যই যাবে আপনার সঙ্গে হুজৌর। তার নাম হাজো। চিতার মতো ক্ষিপ্র সে। বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ তার চোখ। বন্দুকে, তীর-ধনুকে তার "আন্দাজ" একেবারে নির্ভুল।'

" 'আমি লোক বেশি বাড়াতে চাইছি না পাহান্। পায়ে হেঁটে বাঘকে 'পিছা' করে বাঘের বাড়িতে গিয়ে তাকে মারতে হবে। তাও একটি বাঘ নয়, দু-দুটি বাঘ। তুমি তো বোঝো সবই! তুমিও তো শিকারী কিছু ছোট মাপের নও!' আমার চেয়ে অনেক বেশি তোমাদের অভিজ্ঞতা।

" 'সবই বুঝি। কিন্তু বড়জোর কী হবে, আমার নাতি হাজো মারা যাবে; এই তো! তা গেলে যাবে। আমার আরও চার নাতি আছে। শত্রুর সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে, দুশমনের সঙ্গে লড়তে গিয়ে যদি কেউ মরেই তার জন্যে তো শোক করার কিছু নেই। আনন্দই করব আমরা। ও নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না হুজৌর। উলটে ভাবুন, আপনার যদি কিছু হয়? সুফ্‌কর গ্রামের মানুষ কারও কাছেই কি মুখ দেখাতে পারবে আর?"

" 'আরে, আমার কিছুই হবে না। আমার মাংস বাঘের কেন, শকুনেরও অখাদ্য।'

পাহান্ বলল, 'আমি আসছি একটু।'

" 'ঠিক আছে।'

"ঘরে গিয়ে ফোর-ফিফ্‌টি ফোর হান্ড্রেড জেফ্‌রী নাম্বার টু ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটাকে একবার 'পুল-থ্রু' করে নিলাম। জার্কিন পরে নিলাম চামড়ার। বৃষ্টি যদি চলতেই থাকে তবু যতক্ষণ না বাইরেটা ভিজে সপ্‌সপে হচ্ছে ততক্ষণ ভেতরটা গরম থাকবে। পাঁচ ব্যাটারির বল্ড-এর টর্চটাও ব্যাগে নিলাম। ফেরার তো কোনওই ঠিক নেই। কোমরের বেল্টের কাছে লাগানো হোলস্টারে আমার পিস্তলটাতে গুলি ভরে নিলাম। ম্যাগাজিনে। একটি বাদে। পুরো আটটি গুলি ভরলে অনেক সময় আটকে যায় গুলি। টুপি নিলাম। টোব্যাকোর পাউচ। পাইপ।

"ততক্ষণে হিরুও তৈরি হয়ে গিয়েছে। পায়ে গামবুট। তার ওপরে ডাকব্যাক-এর ওয়াটারপ্রুফ। তাকে হঠাৎই এমন সাহেব-রোগাক্রান্ত দেখে বললাম, এক্ষুনি ওসব ছেড়ে আসতে। খালি পায়েই যাওয়া ভাল। কারণ, হিরু এমনিতে জুতো কখনওই পরে না। ওই পোশাকে বনে ঢুকলে আধ মাইল দূর থেকেই জেনে যাবে বাঘেরা, মিঃ পান্‌কা আসছেন তার জুতোর "কপাত্‌-ঠপাত" শব্দে।

"ইতিমধ্যে রাজুপ্রসাদের বন্দুক হাতে একটি ভারী সুন্দর ছেলে এসে হাজির। তার পেছনে-পেছনে অন্যরাও। ছেলেটির মাথায় বড়-বড় বাবরি চুল, ঘাড় অবধি নেমে এসেছে। কেষ্ঠ ঠাকুরের মতো গায়ের রং। খুব ভাল "কার্মা" নাচে বোধ হয়। টিকলো নাক। টানা-টানা চোখ। তার পরনে ধুতি আর গায়ে একটি খাকি ফুলশার্ট। কারও দেওয়া। মুখে হাসি।

"মনে হল, সবসময়ই ওই হাসিটি ও পরে থাকে।

"পাহান্‌ বলল, 'এই আমার নাতি, হাজো।'

"ঘড়িতে দেখলাম প্রায় এগারোটা বাজে। আর কথা না বাড়িয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

গ্রামের লোকেরা বিদায় জানাতে পাহাড়ের কিছুটা পর্যন্ত এল সঙ্গে সঙ্গে।

"সেই গেম-ট্র্যাকটাতে পড়তেই দেখা গেল যে একটি বাঘেরই পায়ের দাগ আছে সেখানে। খুব বড়, পুরুষ বাঘ। যাকে দেখেছি। একা এসেছে। এই বারাশিঙার দলকে প্রায় ধাওয়া করেই এসেছে বাঘটা বহুদূর থেকে। অথচ কেন যে, তা আদৌ বোঝা গেল না।

আমাদের বাঘ জানোয়ারদের দূর থেকে ধাওয়া করে, আফ্রিকার সিংহ বা চিতার মতো কখনওই মারে না। তাছাড়া, খাওয়ার জন্যে ধাওয়া যে আদৌ করেনি, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। মারার পর খায় না এবং পরেও তারা কোনও মড়িতেই যদি ফিরে না আসে, তা হলে বুঝতে হবে মারার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই খাওয়া নয়। তাও যদি-বা বোঝা গেল যে, বাঘ ব্যতিক্রমী ব্যবহার করছে, তা বারাশিঙার দলই বা জঙ্গলের দু'পাশে দলছুট হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে কেন গেল না? কোনও মাংসাশী জানোয়ার তাড়া করেছে বলেই যে তাদেরও লাইন করেই দৌড়ে পালাতে হবে, জঙ্গলের আইনে এমন বে-নিয়ম আছে বলেও তো কখনও জানিনি!

"বাঘের ও বারাশিঙাদের পায়ের চিহ্ন দেখবার পর আমি, হিরু পান্‌কা আর হাজো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মুখে না বলে নিরুচ্চারে সেই কথাই বললাম।

"একটু উঠেই পাহাড়টা ঢালু হয়ে গড়িয়ে নেমে গেছে একটি উপত্যকাতে। এখানে হয়তো আগে কোনও হরজাই জঙ্গল ছিল। কখনও ক্লিয়ার-ফেলিং হয়েছিল। তারপরই কোনও অজ্ঞাত কারণে অথবা হয়তো শম্বর-বারাশিঙার

বিচরণভূমি করে গড়ে তোলার জন্যেই এখানে আর কোনও বড় গাছ লাগানো হয়নি বনবিভাগ থেকে।

একটু থেমে, নিভে যাওয়া পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে ঋজুদা বলল, তবে তোরা এত এত বন ঘুরে একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিস যে, বনবিভাগ কী করবেন না করবেন তার জন্যে বনদেবীর মাথাব্যথা নেই আদৌ। তিনি এলাকা ফাঁকা পেলেই নিপুণ জমিদারের মতো সঙ্গে-সঙ্গে সেই এলাকার জবরদখল নিয়ে নেন। দিকে-দিকে সবুজ আর লাল আর বেগুনির পতাকা তুলে দেন।"

"তারপর কী হল বলো?"

"বৃষ্টিভেজা নরম চাপ-চাপ দূর্বা ঘাসের আর ঘাস-বনের ওপর দিয়ে, ভেতর দিয়ে, হাওয়া বয়ে যাচ্ছে অদৃশ্য নদীর মতো। আর আমার সামনে দুই আদিবাসী শিকারী, তাদের সুন্দর সুঠাম শরীর নিয়ে সামনের মাটিতে চোখ রেখে সাবলীল ছন্দে হেঁটে যাচ্ছে একলয়ে, একতালে। মনে হচ্ছে, আমরা যেন কোনও অনাদিকালের শিকারযাত্রায় চলেছি। যেন প্রাগৈতিহাসিক দিনের কোনও গুহাগাত্রে সিঁদুরে-লাল রঙে আঁকা তিনজন শিকারি গুহা ছেড়ে নেমে এই শীতের বনের বৃষ্টিভেজা প্রান্তরে, বাঘের থাবা বা তার চলার চিহ্ন নয়; অন্য কোনও ভয়াবহ প্রাগৈতিহাসিক অপদেবতারই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলেছি, তাকে ধরাশায়ী করব বলে। যুগ-যুগান্ত ধরেই যেন চলেছি আমরা।

তারপর?

ঋজুদাকে থামতে দেখে আমি বললাম।

বাঘ যদি সোজা যেত, তবে তার পথ শেষ হত গিয়ে প্রান্তর পেরিয়ে অন্য শুঁড়িপথে। আর পথ পেরুনোর পর, গভীর সেগুন জঙ্গলে। অথচ কোনও বাঘেরই স্বভাব নয় এমন আড়াল-বর্জিত প্রান্তর দিয়ে দিনমানে হাঁটা। এই বাঘ আদৌ স্বাভাবিক নয় যে, তা বোঝাই যাচ্ছে।

"হাজো হঠাৎ থেমে পড়ে আমার দিকে চাইল। তারপরই হাসল, একেবারে স্বর্গীয়, দেবদুর্লভ হাসি। সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। হাওয়া থেমে গেল। যেন হাজোর হাসিতে খুশি হয়েই।

"হাজো ডান দিকে ঘুরেই দ্রুত এগোল। এদিকে প্রান্তরটি মিশেছে গিয়ে একটি পাহাড়শ্রেণীর সানুদেশে। ইতিমধ্যে, দেখতে-দেখতে আমরা চার ঘণ্টা হেঁটে এসেছি প্রায়। এখন বেলা প্রায় দুটো বাজে। পদচিহ্ন দেখে এগোতে অনেক সময়ে এক মাইল পথ পেরোতেও বহু ঘণ্টা লেগে যায়। রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করার সময়েও তাই। চিহ্ন যখন লোপাট হয়ে যায়, তখন তাকে খুঁজে বের করতে সময় লাগে। মনোযোগ দিয়ে চেয়ে দেখতে হয়, উল্টোনো ঘাসে, ঝোপের ছেঁড়া পাতায়; রক্তের ফোঁটায়। চার ঘণ্টা পরে দূরত্ব অতিক্রান্ত হয় হয়তো এক কি.মি.।

"হাজো এবার কথা বলল, ডান হাতের তর্জনী ঐ নীল পাহাড়শ্রেণীর দিকে

নির্দেশ করে। বলল, 'বাঘ ঐ দিকেই গেছে। ঐ পাহাড়ে গুহাও আছে অনেক। ঐখানেই ডেরা ওদের।'

"এদিকে প্রান্তরে নেমে আসার পর থেকেই ঘন ঘাসের জন্যে বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না আর। ঘাসে-পাতায় তার চলে যাওয়ার ক্বচিৎ চিহ্ন। তার থাবার নীচে ঘাস বা মাটি উপড়ে বা উলটে যাওয়ার আভাস। এখন এমন করেই পিছু নিতে হবে।

"আমি হতাশ হয়ে গেলাম।

"ওদের দুজনকে বললাম, 'এইভাবে কি বাঘ শিকার হয়? তাও একটি নয়, দুটি। তোমরা একেবারে পাগলামি করছ। ঐ পাহাড়তলিতে পৌঁছে ঘন হরজাই বনের মধ্যে ঢুকতে-ঢুকতেই তো অন্ধকার হয়ে যাবে। আসলে সূর্য তো আজকে নেইই। অন্ধকারে কোথায় পায়ের দাগ খুঁজতে যাবে? দেখাই তো যাবে না কিছু।

"ওরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। হাজোর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল।

"উঠতি-যুবকেরা তাদের উৎসাহের বাড়াবাড়িতে এবং অভিজ্ঞতার অভাবেও বয়স্কদের অনেক সময়েই যেমন বোকা-বোকা বিদ্রূপ করে, সেইরকমই বিদ্রূপের হাসি। এতে অভিজ্ঞদের গা জ্বলে। ভট্‌কাই-এর এ কথাটা জেনে রাখা উচিত। বিশেষ করে, ভট্‌কাইএরই। আমি আর তিতির ঋজুদার এই কথাতে দ্রুত মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। তবে কি ভট্‌কাইএর দিন ফুরোল? কথাটা ভেবেই বড় আনন্দ হল মনে।

"হিরু পান্‌কা কিন্তু কিছুই না বলে চুপ করে ঐ ঘন বন আর পাহাড়ের দিকেই চেয়ে রইল।"

"তুমি বকে দিলে না কেন? হাজোকে?"

নির্লজ্জ ভট্‌কাই ইন্টারাপ্ট করে বলল।

"যে-সম্পর্কে সম্মান নেই সেখানে বকাঝকা করতে যাওয়া মানেই নিজেকে আরও অসম্মানিত করা।

"হাজোর মুখ দেখে মনে হল, ও নিশ্চয়ই মনে করেছে যে, আমি ভয় পেয়েছি। ভয় যে আমি, এই অধম ঋজু বোস কখনও-কখনও পাইনি বা ভবিষ্যতেও পাব না এমন নয়। আমি তো অতিমানব নই! ভয়ের কারণ ঘটলে, ভয় বিলক্ষণই পাই। তবে বাহাদুরিপ্রবণতা, অবিমৃষ্যকারিতা আর সাহস তো এক কথা নয়।"

"কী বললে কথাটা? অবিমিশ্রকারিতা?"

তিতির শুধোল।

ভট্‌কাই তিতিরকে "স্নাব" করে বলল, মিস্রি-ফিস্রি নয়। ষ এর ব্যাপার। "ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মেয়ে, তুমি ইন্টারাপ্ট কোরো না। বানানটা লিখে

দেব। সংসদের বেঙ্গলি টু বেঙ্গলি অভিধানে দেখে নিয়ো। আগে বাড়ো ঋজুদা।"

ভট্‌কাই সত্যিই একেবারে ইনকরিজিবল হয়ে উঠছে। অথচ ঋজুদাও তেমন কিছুই বলে না। ভট্‌কাইয়ের মধ্যে কোথায় যেন এক ধরনের অথরিটির ব্যাপারও আছে। মনে হয়, ঋজুদা সেটা সপ্রশংস চোখে দেখে। আমার ভয়টা সেই কারণেই। এতদিনের ঋজুদাকে কি রুদ্রর কাছ থেকে কেড়েই নেবে এই নন-ডেসক্রিপ্ট—ভট্‌কাই, যাকে আমি এনে ঋজুদার কাছে হাজির করেছিলাম। এই নইলে বাঙালি। যার হাতে খায় তার হাতেই কামড়ায়।

"হাজো যখন কথা শুনবে বলে মনে হল না, তখন হিরুকে শুধোলাম, 'কী করবে?'

"হিরু বলল, 'এমনি-এমনি ফিরে গেলে গাঁয়ের লোকে কী বলবে?'

"কী বলবে আমার দাদু, পাহান?"

হাজো বলল। উত্তেজিত গলায়।

"বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, 'বাঘ-বাঘিনী কি সেখানে বাঁধা আছে? না, গুহার সামনে থিতু হয়ে বসে আছে কখন তোমরা গিয়ে তাদের গুলি ঠুকবে সেই অপেক্ষায়? তোমাদের মধ্যপ্রদেশের বাঘেরা যে এমন গুলিখোর তা তো আগে জানা ছিল না।'

"হিরু বলল, 'না হুজৌর, সে-কথা নয়। ফিরে গেলে, ওরা আপনাকে কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু আমাদের গাঁয়ে টেঁকাই দায় হবে টিটকিরির চোটে। আপনি তো চলে যাবেন সময় ফুরোলেই। রাজুপ্রসাদও আর কোনওদিন বন্দুক দেবে না হাজোকে। আপনার জন্যেই দিয়েছিল।'

" 'টিটকিরি খাবে এই ভয়ে প্রাণটাই দেবে? টিটকিরি দেখছি বাঘের চেয়েও ভয়াবহ।

" 'আপনি সঙ্গে আছেন, প্রাণ নেয় কে? আগে তো মান হুজৌর। তার অনেক পরে তো জান।

"কী করতে চাও এখন?"

" 'এগিয়ে যেতে চাই।'

হাজো বলল।

"বলেই বলল, 'আমি জানি, জঙ্গলে ঢোকার পরই পাহাড়ের পায়ের কাছে একটি দোলা মতো জায়গা আছে। গরমের সময়েও সেখানে জল থাকে। বাঘেরা সেখানে গলা ডুবিয়ে বসে থাকে। তার পরেই পাহাড়ে একটা গুহাও আছে। ওই বাঘ-বাঘিনী সম্ভবত ওখানেই থাকে। জলে, অন্য কোনও জানোয়ার এলে গুহার সামনের চ্যাটালো পাথরে বসে-বসেই ওরা দেখতে পায়, কোন জানোয়ার এল বা গেল। তারপর পাহাড় ঘুরে এসে পেছন দিক দিয়ে তাকে অনুসরণ করে।'

"শেষ কবে দেখেছ বাঘেদের ঐখানে। কখনও কি নিজ চোখে দেখেছ ?"

"মাত্র পাঁচদিন আগেই। আমার মামাবাড়ির পথ এই পাহাড়েরই তলে-তলে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। সুফ্‌কর থেকে পাঁচ ক্রোশ পথ। সেদিন আমি মামাবাড়ি থেকে ফিরছিলাম। বেরোতে দেরী হওয়াতে বিকেল হয়ে গেছিল। পশ্চিমের আলো এসে পড়েছিল পুবে। সেই দিনশেষের নরম আলোতে দেখি বাঘ আর বাঘিনী ইয়া-ইয়া গোঁফ নিয়ে পাথরের ওপরে বসে-বসে কী যেন ভাবছে। মনে হচ্ছিল যেন, ছবি। এতটুকু নড়াচড়া নেই। আমি বলি কী, ওই জলে পৌঁছে যদি আমরা তার পাশে পায়ের দাগ দেখতে পাই তা হলেই তো বুঝতে পারব যে, যে-বাঘকে অনুসরণ করে আমরা এসেছি সেই বাঘই এই বাঘ কি না। মানে, মদ্দাটার পায়ের ছাপ যদি একইরকম হয়। বুঝলেন তো হুজৌর !

"মনে-মনে দ্রুত একটা হিসাব নিলাম সময়ের। হাজো যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তা হলে অন্ধকার নামার আগেই আমরা ঐ জায়গাটাতে পৌঁছতে পারব। যদি সুযোগ পাওয়া যায় একটা। না পেলে, না-হয় ফিরেই যাব। বৃষ্টি অনেকক্ষণই থেমে গেছে। ফিরে যেতে কোনও কষ্ট বা অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। টর্চ ওদের দুজনের কাছেও আছে।

" 'কী করবেন হুজৌর ?'

"হিরু পান্‌কা বলল।

"চলো, হাজো কী বলছে দেখাই যাক।

"জয়ের আনন্দে হাজোর মুখ হাসিতে ভরে গেল।"

" 'তোমরাও কি বারাশিঙাদেরই মতো প্রসেশন করেই বাঘের গুহাতে ঢুকতে চাইছিলে নাকি ?"

তিতির শুধোল।

ঋজুদা বলল, "না, সে-বিষয়েও পরামর্শ করে নিলাম। পাইপটা ধরিয়ে একবার বুদ্ধির গোড়াতে ধোঁয়াও দিয়ে নিলাম। ঠিক হল, প্রান্তর ছেড়ে জঙ্গলে ঢোকার অনেক আগেই আমরা তিন দিকে ছড়িয়ে যাব। ঐ বাঘের পায়ের দাগ আমরা তিনজনে দেখেছি। অতএব সেই দাগ দেখলেই চিনতে পারব। যদি ঐ বাঘটিই হয়, তবে আমরা তিনজনে সুবিধেমতো তিনটি জায়গাতে, গাছেই হোক কি মাটিতে বা পাথরেই হোক, বসে চোখ-কান খোলা রেখে শুনব, দেখব। সুযোগ যদি পাওয়া যায় তবে গুলি করার চেষ্টাও করা হবে। কিন্তু ওখানে থাকব ঠিক রাত আটটা অবধিই। তার পরে এক মিনিটও নয়। জঙ্গলে গরু-খোঁজার মতো করে বাঘ খোঁজার অভ্যেস আমার নেই।

"ওদের ঘড়ি ছিল না, আমার ছিল। ওদের বললাম, ঘড়ির রেডিয়াম লাগানো ডায়ালে আটটা বাজলেই আমি টি টি পাখির ডাক ডেকে উঠব। আর হাজো উত্তর দেবে পেঁচার ডাক ডেকে। হিরু উত্তর দেবে শুয়োরের

ঘোঁতঘোঁতানি আওয়াজ করে। তারপর যে জায়গাতে আমরা প্রান্তর ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকব ঠিক সেই জায়গাতেই আবার ফিরে আসব। সেখান থেকে তিনজনে একসঙ্গে হয়ে সুফ্‌করে ফেরার পথ ধরব।

"আমরা যখন প্রান্তর ছেড়ে আলাদা হয়ে গেলাম তখন কী মনে হওয়াতে আমি ফিসফিস করে বললাম, 'তোমরা দুজনে বরং একসঙ্গেই থেকো। মাটিতে না বসে, কোনও গাছেই উঠো।' তারপরই হাজোকে বললাম, 'যদি একেবারেই কাছে না পাও, পাশ থেকে না পাও, তবে গুলি মোটেই করবে না। একটি বাঘই যথেষ্ট। তার ওপর দুটি। এবং এদের যা মেজাজ ! গুলির শব্দ শোনামাত্রই অন্যজন সঙ্গে-সঙ্গে আক্রমণ করতে পারে। গুলি করার আগেও ঘুণাক্ষরে আমাদের উপস্থিতি জানতে পেলেও আক্রমণ করতে পারে। গুলি করলে, বাঘ মরেছে যে, সে-বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়ে তারপরই নামবে গাছ থেকে।'

"ওরা মাথা নেড়ে আমার কথাতে সায় দিল। আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আমার মনে হল ওরা দুজনে একসঙ্গে থাকলে সঙ্কেতটা কী হবে তা বলা হল না। তখন আর সময়ও ছিল না নতুন করে কিছু বলার।

"ওরা দুজনে একসঙ্গে বাঁদিকে গেল আর আমি ডানদিকে। বনের মধ্যে অনেকখানি ডানদিকে গিয়ে পাহাড়ের একেবারে কোল ঘেঁষে ওই জলাটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

তখনও সন্ধ্যে হতে ঘণ্টাখানেক বাকি কিন্তু নানা পাখি ও জন্তু-জানোয়ারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। খুব সাবধানে মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজতে খুঁজতে এবং মাটির ওপরে মনোমতো বসার জায়গা নজর করতে-করতে এগোচ্ছিলাম। রাইফেলটাতে গুলি ভরে নিলেও রাইফেল ডান হাতে ধরা এবং ডান কাঁধের ওপরেই রাখা ছিল।

"জায়গাটা দেখলে মনে হয়, চিতাবাঘের আসল জায়গা। বড় বাঘের নয়। ভাবছিলাম, হাজো চিতাবাঘই দেখেনি তো ? জোড়ে ? চিতাবাঘকে বড় বাঘ বলে ভুল করছে না তো ?

"অবশ্য ওরা বনশিশু। বনই ওদের খেলাঘর, বনই সব। আমি ভুল করতে পারি, কিন্তু হাজো কি ভুল করবে ?

"একটু পরেই হঠাৎই নরম মাটিতে একটি বাঘিনীর পায়ের দাগ দেখলাম। বেশ বড় বাঘিনী। এবং তার একটু পরেই বাঘেরও। এবং সেই বাঘটারই। আমার হৃৎপিণ্ড অর্ধেক ভয়ে এবং অর্ধেক আনন্দে বন্ধ হয়ে গেল। নাঃ, হাজো ভুল করেনি !

"কোথায় উঠে বসা যায় ভাবছি, ঠিক সেই সময়েই চোখে পড়ল পাহাড়ের

গায়ে একটি অসন গাছের ডালে একটি মাচা বাঁধা। এবং সেটি আদৌ পুরনো নয়, কাঠগুলো টাটকা-কাটা। আশ্চর্য! সেই মাচার একটি খুঁটির উপরিভাগ থেকে একটি বড় থার্মোফ্লাস্ক নীচে ঝুলে আছে। মাচাটা একদিকে বেঁকেও গেছে অনেকখানি। কোনও কিছুর ভারে! খুবই চিন্তায় পড়লাম। রাইফেলটা এক হাতেই রেডি-পজিশানে ধরে এগোতে লাগলাম সেদিকে।

"গাছটার ঠিক পেছনেই, একটি বড় কালো পাথর ছিল, ল্যানটানার ঝোপে প্রায় আধ-ঢাকা হয়ে। সেই পাথরটির ওপরে উঠতে-উঠতে ভাবছিলাম যে, যে-জঙ্গলে বাঘ আছে সেখানে এইরকমভাবে গাধার মতো মাচা কেউ বানায়? বাঘ তো এই পাথরে উঠে, আমি যেদিক দিয়ে উঠছি, অথবা পেছন দিক দিয়ে; সহজেই মাচায়-বসা শিকারিকে নামিয়ে নিতে অথবা মাচাতেই খতম করে দিতে পারে। যদি সে চায়।

"মাচাটা দৃষ্টিগোচর হতেই আমার মাথা ঘুরে গেল। দেখি, তার একপাশে একটি কম্বল, একটু রক্তও লেগে আছে তাতে। রক্তাক্ত জায়গাটা তখনও ভেজা। একটি থ্রি-ফিফ্‌টিন রাইফেল, ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স কোম্পানির।

"রাইফেলের বোল্টটি আস্তে করে খুলে দেখলাম, চেম্বারের মধ্যে একটি ফোটা-কার্তুজ। ম্যাগাজিনে আরও চারটে গুলি আছে।

গা-ছমছম করে উঠল।

"রাইফেলটি যথাস্থানে নামিয়ে রেখে থার্মোসটা কাঁধে ঝুলিয়ে যতখানি নিঃশব্দে পারি মাচার দিকে পেছন ফিরতেই, ভয়ে প্রায় চিৎকারই করে উঠতাম, কী করে যে সামলে নিলাম জানি না। এখনও দৃশ্যটার কথা ভাবলে নিজেই নিজের কাঁধ চাপড়াই।

কী দেখলে কী?

তিতির উৎকণ্ঠিত হয়ে জিগ্যেস করল।

দেখি, সার্জের কুর্তা আর কালো-পাজামা পরা একজন মানুষ চিত হয়ে শুয়ে আছেন পাহাড়ের দিকে ল্যানটানার ঝোপের ভেতরে। তাঁর হাঁ-করা মুখটি আকাশের দিকে করা। আর তাঁর মাথার বাঁদিকে এবং ঘাড়ে বাঘের দাঁতের দাগ আর চারটি ফুটো। রক্তে পুরো জায়গাটা থিকথিক করছে। কোনও খানদানি ঘরের সৌখিন শিকারী। তবে যুবক নয়। মধ্যবয়সী। শেখার বয়সে শেখেননি। অথচ তোদের বোদ্ধাকাকু যাই বলুন, না-শিখে এসব খেলা, খেলার নয়। শিক্ষানবিশির চেয়ে, অভিজ্ঞতার চেয়ে, শখের পরিমাণ বেশি থাকাতেই বোধ হয় এই বিপত্তি।

"ব্যাপারটা কতক্ষণ ঘটেছে তা নির্ভুলভাবে অনুমান করা যাচ্ছে না। আমি চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে ওঁর বুকের শুকনো জায়গাতে হাত ছুঁইয়ে দেখলাম যে, বুক ওই ঠাণ্ডায় তখনও গরমই আছে। বহুমূল্য শাহ্‌তুষ-এর আলোয়ানটি ছিন্নভিন্ন হয়ে কোমরে আর পায়ে জড়িয়ে রয়েছে।

"ঘটনা তা হলে বেশিক্ষণ ঘটেনি! মাচার নীচে কিন্তু বাঘের থাবার দাগ নেই। শুধুই বাঘিনীর। রক্ত, মাটিতে কোথাওই দেখলাম না। তবে কি গুলি লাগেনি? নাকি রক্ত বেয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ার আগেই এইসব মুহূর্তবাহী ঘটনাসমূহ ঘটে গেছে পর পর?

"এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে দ্রুত। এই পরিবেশে, এই নতুন, হঠাৎ-জানা পরিস্থিতিতে হিরু বা হাজোর সঙ্গে যে কথা বলব তারও কোনও সম্ভাবনা নেই। কী করে কী ঘটল এবং কী ঘটবে, সেই চিন্তায় রীতিমত ঘেমে উঠলাম।"

"ভেরি গুড। জমে গেছে ঋজুদা। আগে বাড়ো। ওর আগে।"

ঐ টেনশানের মধ্যেও সকলকে চমকে দিয়ে বলে উঠল ভট্‌কাই।

"কী ইয়ার্কি হচ্ছে ভট্‌কাই?"

আমি আর তিতির একসঙ্গেই বললাম।

ঋজুদা ভট্‌কাইয়ের বাধা পেয়ে চুপ করে গিয়ে, নিভে-যাওয়া পাইপটাতে দেশলাই ঠুকে দু'বার ভুড়ুক-ভুড়ুক করে টান লাগাল। মুখ দেখে মনে হল, এই বিরতিতে খুশিই হয়েছে যেন। অনেকক্ষণ ধরে বলছে তো!

আবার শুরু করল ঋজুদা একটু পরে।

"হাজো-বর্ণিত গুহাটার আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের একটি খাঁজে, যে-খাঁজটিকে ওপরের গুহা বা তারও সামনের পাথরটি থেকে দেখা যাবে না, সেখানে উঠে বসলাম। মাটি থেকে দশ ফিট মতো ওপরে। বসে, রাইফেলটাকে কোলে শুইয়ে থার্মোফ্লাস্কটি পাশে রেখে, স্ট্যাচু হয়ে গেলাম।

"ঠিক সেই সময়েই আমার শরীরে একটা ঝাঁকুনি এল। থরথর করে কাঁপতে লাগলাম আমি। আর তার সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম। এতক্ষণ হাঁটাতে, গরমে ঘেমে গেছিলাম। শীত লাগে চলা থামালে। কিন্তু সেই শীত আসার আগেই এই হঠাৎ হিমেল ঘামে ভিজে গেলাম নতুন করে। কে জানে কেন!

"বেশ কিছুক্ষণ পরে কাঁপুনিটা ছাড়ল। তার একটু পরই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে বৃষ্টিভেজা জানুয়ারির শীত এসে দু'কানের পেছন মোচড়াতে লাগল। খুব আস্তে বাঁ হাতটি তুলে টুপিটাকে চেপে বসালাম মাথার ওপরে। এমন সময়ে হঠাৎই একটি হাওয়া বইতে শুরু করল পশ্চিম থেকে পুবে। প্রান্তর থেকে গুহার দিকে। মনে হতে লাগল, হিমকণা বয়ে আনছে হাওয়াটা।

"জায়গাটাতে অগণ্য বড়-বড় হরজাই গাছ মাথার ওপরে চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেছিল। মনে হচ্ছিল, যেন কোনও অডিটোরিয়ামের ভেতরে বসে আছি। দূরে, জঙ্গলের ফাঁক-ফোকর দিয়ে প্রান্তরের দিক থেকে একটু "উজলার" আভাস আসছে। সেটিই যেন স্টেজ। সন্ধের আগে সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণীর সানুদেশের এই বনস্থলীর মধ্যে যে কোন্ পুজোর আগমনী বাজছে, তা কে বলবে! আগমনী না বিসর্জন? সেই পুজোর ঘণ্টা কানে বাজে না, বুকের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে

বাজে। তবে এই পুজো কাপালিকের পুজোরই মতো। বড় ভয় করে এই অদেখা বনদেবতার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর এই সংহারমূর্তি দেখে।

"ভদ্রলোক কি একাই এসেছিলেন? তাঁর সঙ্গী কি কেউই ছিল না? সঙ্গীকেও কি বাঘ বা বাঘিনী... ?

"ভাবছিলাম, কিন্তু ভাবতেও ভয় করছে। মাঝে-মাঝেই মনে হচ্ছে ওই বারাশিঙার দল বোধ হয় অস্বাভাবিক বা আধিভৌতিক কোনও ব্যাপার। আমাদের ছলে বলে এখানে নিয়ে আসার জন্যেই বোধ হয় ওই ঘটনা কেউ ঘটিয়েছিল। ফিরে গিয়ে সুফ্‌কর-এ হয়তো শুনব, যে-বারাশিঙাটি মরে পড়ে ছিল সেও উঠে পড়ে দৌড়ে বনে চলে গেছে। শুকিয়ে গেছে তার ক্ষত। মুছে গেছে তার গা থেকে রক্তের দাগ। কে জানে!

"হিরু আর হাজো যে কোনদিকে আছে ঠাহর করা যাচ্ছে না। অবশ্য আমি যে খাঁজে বসেছিলাম সেখান থেকে বেশিদূর দেখাও যায় না। মুরগি, ময়ূর, তিতির, খুদে-খুদে বটেরের ঝাঁক, কোটরা হরিণ, জোড়া ভালুক, সঙ্গে কালো ফুটবলের মতো দুটি ছানা; শম্বরের একটি দল, মস্ত শিঙাল একটি, মাঝারি শিঙাল একটি আর পাঁচটি মেয়ে-শম্বর সবাই জল খেয়ে চলে গেল।

"শীতকালে কোনও জানোয়ারদেরই এমন তাড়াতাড়ি তৃষ্ণা পায় না। কে জানে! প্রকৃতির কথা, আবহাওয়ার কথা এরা সব আগেভাগেই বুঝতে পারে। বৃষ্টি থেমে গেছে। এর পরে হয়তো দুর্যোগ আসবে। যে-কোনও কারণেই হোক তারা সকলেই অন্ধকার হওয়ার আগেই এসেছে।

"দূর থেকে একটি চিতাবাঘ ডাকল। তারপর পাহাড়ের ওপর থেকে হনুমানের হুপ্-হাপ্ আওয়াজ ভেসে এল। মনে হচ্ছে পাহাড়ের ওপরে কোনও সমতল মালভূমি আছে।

"তারপরেই, বুঝলি, ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত, তায় আকাশে একটি তারা পর্যন্ত নেই। রাত যত অন্ধকারই হোক না কেন, খোলা জায়গায় তবুও একরকমের চাপা আলোর উদ্ভাস থাকেই। গাঁ-গঞ্জের, জঙ্গল-পাহাড়ের মানুষমাত্রই তা জানেন। কিন্তু এতো খোলা জায়গা নয়! এ যে জঙ্গলের শামিয়ানার নীচে ঘোরান্ধকারে বসে থাকা!

"অন্ধকার চোখে মুখে যেন থাপ্পড় মারছে। দুটি পেঁচা ডাকতে-ডাকতে ঝগড়া করতে-করতে অন্ধকার ছেড়ে আলোর দিকে উড়ে গেল। হিরুর সংকেত নয় তো? না, এখন তো সবে সাড়ে পাঁচটা!

"প্রান্তরের ওপরে দুটি টিটি পাখি টিটিরটি-টিটিটিটি-টিট্টিটি করে ডাকতে ডাকতে উড়ে বেড়াতে লাগল। কী দেখেছে, তা ওরাই জানে।

"বাঘেরা যদি ঐ গুহাতেই থেকে থাকে তবে তারা মালভূমিতে উঠে না গেলে এদিক দিয়েই নামবে মনে হয়। জলের এ-পাশটা তাদের পায়ের দাগে-দাগে ভরা। বড়-বড় গাছে তাদের নখের আঁচড়ের দাগ। আর বাঘেদের

শরীরে যে তীব্র গন্ধ আছে, তারই নিশান দিকে-দিকে।

"একটি পাহাড়ি ঈগল ওপরের মালভূমির কোণে উঁচু গাছ থেকে উড়ে এসে একটি প্রাচীন শিমুলের ডালে বসল। যখন বসল তখন আর দেখা গেল না। কিন্তু বোঝা গেল তাদের ডানার বিশেষ শব্দে এবং গলার কর্কশ পৌনঃপুনিক তীক্ষ্ণ বাঁশিতে। ডানদিক থেকে, জমাটবাঁধা নিকষকালো তীব্র মিষ্ট-কটু-গন্ধী অন্ধকারকে হঠাৎ নাড়িয়ে দিয়ে একটা কোটরা, তার ভয়ার্ত ব্বাক-ব্বাক ডাকে তার ভয়কে জঙ্গলের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছড়িয়ে দিয়ে, চারিয়ে দিয়ে, দৌড়ে চলে গেল জঙ্গলের গভীরে। জলের ধার থেকে।

"তারপরেই একেবারে চুপচাপ। কোনওই শব্দ নেই। কে বা কারা যেন বনের সব শব্দ ও গন্ধ চুরি করে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে চলে গেল।

"কতক্ষণ সময় কাটল, বোঝা গেল না এমনিতে। তবে আমার হাত-ঘড়ির ডায়ালের রেডিয়ামে তখন সাতটা দেখাচ্ছিল। ঘড়ির দিক থেকে চোখ তুলেছি সবে, এমন সময়ে হঠাৎই আমার মাথার ঠিক ওপরের পাথর থেকে একটি নুড়ি, পাথরে-পাথরে গড়িয়ে একেবারে নাকের সামনে দিয়ে গিয়ে নীচে পড়ল। গড়িয়ে যাওয়ার সময়ে শব্দ হয়েছিল কিন্তু নরম মাটিতে পড়াতে শব্দ হল না।

"আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। নিজেই নিজের মুণ্ডপাত করতে লাগলাম।

"অনেক ভুল ইতিমধ্যেই হয়ে গেছিল।

"প্রথমত, এই ঘন ছায়াচ্ছন্ন চন্দ্রাতপের নীচে এমন মেক-শিফ্‌ট বন্দোবস্তের মধ্যে হঠকারিতা করে বাঘের জন্যে বসাটাই উচিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, হাজো এবং হিরু জানে না যে, এই বাঘ ও বাঘিনী মানুষও মারছে বা মেরেছে। তৃতীয়ত, অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে আমি এবং ওরা কোথায় যে কে বসে রয়েছি তাও বুঝতে পারছিলাম না। বাঘ যদি আমার মাথার ঠিক ওপরের খাঁজে নেমে থাকে এবং যদি ওদের মধ্যে কেউ বাঘের দিকে গুলি করে বসে তবে সে গুলি আমার গায়েও লাগতে পারে। আমার গুলিও ওদের কারও গায়ে লাগতে পারে। চতুর্থত, এইরকম সম্পূর্ণ অচেনা অজানা পরিবেশে, রাতের বেলা আক্ষরিক অর্থে "আন্দাজেই" জোড়া-বাঘের মোকাবিলা করতে যাওয়ার মতো মুর্খামি করতে যাওয়াটা অত্যন্তই অনুচিত হয়েছিল।"

"আর একটু চা নেবে নাকি?"

তিতির বলল, ঋজুদাকে ইন্টারাপ্ট করে।

ভট্‌কাই বলল, "দাও, দাও তিতির। ঋজুদাকে চা দাও। আমাদেরও থাকলে দিতে পারো। একে ঠাণ্ডা, তায় টেনশান। হাত-পা জমে যাচ্ছে ঠাণ্ডাতে"।

ঋজুদা, তিতির চা ঢালতে-ঢালতে, নিভে যাওয়া পাইপটা আরেকবার ধরিয়ে নিল। পাইপ কেন যে মানুষে খায়। এ যেন ধৈর্যর পরীক্ষা!

তারপর, চা-টা খেয়ে নিয়েই আবার শুরু করতে যাবে ঠিক এমন সময়

তিতির বলল, "তোমার মাথার ওপরের পাথর থেকে নুড়ি গড়িয়ে পড়ল। নাও, তোমাকে "কিউ" দিয়ে দিলাম। বলো, তারপর থেকে।"

"হ্যাঁ। তবে আগেই বলেছি, তোদের যে, আমি বসেছিলাম পাথরের একটা খাঁজের ভেতরে। ওপর থেকে সেখানে সাপের পক্ষে আসা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু বাঘের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই তখনকার মতো আমার নিজের বিপদের ভয় ছিল না। তবু যে-বাঘ একজন শিকারির ঘাড় মটকেছে কিছুক্ষণ আগেই সেই বাঘই মাথার ওপরে এসে "হরকৎ" করছে এমনটি জানলে ভয় তো একটু হওয়ারই কথা! তা ছাড়া, আমাকে যদি ঐ খাঁজের আশ্রয় ছেড়ে বেরোতে হতোই তবে তো বাঘবাবাজির এক চাঁটিতেই এত যত্নের কেয়ো-কার্পিন-মাখা টেরিটি-সমেত চাঁদিখানিই 'কাপুত্' হয়ে যেতে পারত। ইন্তেকাল ঘটে যেত। এমনকী একবার—

'আলম দুল্লিলাহে য়হ্ দিনম্ সিরাতল মুস্তকিমা
রব্বিলে আলোমিন সিরাতল লাজিনা
আঃ রহ্মানে রহিম আমতাম আলেহিম্...'

"ইত্যাদি-ইত্যাদি বলে খুদাহর তারিফ পর্যন্ত করার সময় পেতাম না।

"কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে?

"হিরু পান্কা দু'হাতের তেলোতে একদলা খৈনী মেরে চটাপট করে দু' তালি দিয়েই নীচের ঠোঁটের আর নীচের পাটির দাঁতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল, 'হাঁ। উসকো বাদ্ যো হুয়াথা, ওহি বাতাইয়ে না বোস সাহাব।

"ঋজুদা হিরু পানকার দিকে চেয়ে বলল, ওহি তো বতা রহা হ্যায় হিরু।

হিরু পানকাও যে বাংলা একটু একটু বোঝে তা জেনে আমরা সকলেই বেশ অবাক হলাম। আমাদের মুখ দেখে মন পড়ে নিয়ে ঋজুদা বলল, আরে এই কান্হা-কিসলির পেছনে কনসার্ভেটর দত্ত সাহেবের অবদান ছিল অসামান্য। পরে দত্ত সাহেব চিফ-কনসার্ভেটর তো হয়েই ছিলেন তারও পরে দিল্লিতে সবচেয়ে বড় সাহেব হয়েছিলেন। ওরা সবাই দত্ত সাহেব এবং আরও অনেক বাঙালি অফিসারের সঙ্গে কাজ করেছে, তাঁদের খিদমদগারী করেছে। তাই বাংলা একটু-আধটু অনেকেই বোঝে। বাঙালি শিকারিও আসতেন অনেকেই, আমারই মতো।

বলো, তারপর।

আমি বললাম।

"নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছি। রাইফেলের স্মল অব দ্য বাট-এ ডানহাতের পাতা আর ট্রিগার গার্ড-এ তর্জনী ছোয়ানো রয়েছে। বাঁহাতে ব্যারেলের নীচের দিকটা শক্ত করে ধরে আছি। ঐ শীতেও হাতের পাতা ঘেমে উঠেছে। ততক্ষণে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে আবার।

"এদিকে কোনও সময়ে আটটা তো বাজবেই। ঘড়িকে তো ঠেকিয়ে রাখা যাবে না মোটেই। আটটা বাজলে ওদের সঙ্কেতও দিতে হবে। তারপর তিনজনে মিলে বাঘেদের খাদ্যও হতে হবে হয়তো।

"এমন সময়ে হঠাৎই একটা জোর হাওয়া এল। বৃষ্টি থেমে গেছিল অনেকক্ষণই। শীতকাল। কোথা থেকে অমন হাওয়া এল কে জানে। আফ্রিকার উপজাতি বান্টুদের দেবতা 'উনকুলুনকুলু', না সিংভূম জেলার মুণ্ডাদের 'মুয়া' ভূতেই এমন খেল দেখাচ্ছে, বোঝা গেল না।

সেই হাওয়াটা প্রান্তরের দিক থেকে এসে বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে আমার সমান্তরালে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে যেন নিঃশব্দে চুরচুর হয়ে, আজকালকার মোটরগাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে-ভাঙা উইন্ডস্ক্রিনের মতোই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল। আর সঙ্গে-সঙ্গে আরম্ভ হল বিদ্যুৎ-চমক।

এরকম বিদ্যুৎ-চমক ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম গারো পাহাড়ের রাজধানী তুরা থেকে গৌহাটিতে নেমে আসবার সময়ে। জেঠুমনি সঙ্গে ছিলেন। চমকাতে থাকল তো চমকাতেই থাকল। এক মুহূর্ত অন্ধকার থাকে, তো পাঁচ মুহূর্ত আলো।

"আটটা বাজা অবধি আর অপেক্ষা না করে আমি খুব জোরেই টিটি পাখির ডাক ডেকে উঠলাম। যেন পাখি, অতর্কিতে ভয় পেয়ে ডেকে উঠেছে। সঙ্গে-সঙ্গেই হাজোর পেঁচা বলল, দুরগুম্, দুরগুম্, দুরগুম্ আর হিরুর শুয়োরও ঘোঁতঘোঁতানি তুলে জাহির করল যে, সেও সামিল।

"দুর্গা! দুর্গা! মনে-মনে বলে, পাথরের খাঁজটি থেকে নামতে যাব এমন সময়ে মালভূমির ওপরেই, কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে প্রায় একশো মিটার দূরের বড় গাছের ডালে-ডালে হুটোপাটি তুলে হনুমানের দল হু-উ-প হুপ্-হুউপ্ হু-উ-প করে ডেকে উঠল। আর একটা কোট্রা, আরও দূরে; মালভূমির ওপরেই, হনুমানদের গাছের দিক থেকে মালভূমির অন্য প্রান্তের দিকে ডাকতে-ডাকতে দৌড়ে যেতে লাগল।

"স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাবধানে তো নামলাম নীচে। তারপর টর্চও জ্বাললাম। কিন্তু টর্চের প্রয়োজন ছিল না। তিনজনে একত্র হয়ে ওই চন্দ্রাতপের ঘেরাটোপ ছেড়ে অতি ধীরে-ধীরে সাবধানে এগিয়ে গিয়ে প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়ালাম। অবশ্য হনুমানদের ডাক আর কোটরার ডাক নির্ভুলভাবেই বলে দিচ্ছিল যে, বাঘ বা জোড়া-বাঘ মালভূমির অন্য দিকে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, যদিও একটু আগেই কোনও অজ্ঞাত কারণে তারা আমাদের এদিকেই এসেছিল। তবে আমাদের অস্তিত্ব অবশ্য টের না পাওয়ারই কথা তাদের।

"প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াতেই বাক্রোধ হয়ে গেল। সে কী অপূর্ব দৃশ্য। চতুর্দিকে বিস্তৃত ঘন সবুজ বৃষ্টিভেজা প্রান্তরে সেই শব্দহীন অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ-চমকের বিভা নিঃশব্দে যে কী শালীন স্নিগ্ধ শোভা এনে দিল তা

ঠিকভাবে তোদের কাছে প্রকাশ করি এমন ভাষা আমার নেই।"

বলেই, থেমে গেল ঋজুদা।

তিতির সম্মোহিতর মতো বলল, "তারপর ?"

"তখনকার মতো বাঘ-বাঘিনী, মৃত মানুষ এবং আমাদের বিপদের কথাও সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে অতি সাবধানে সেই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আবিষ্ট হয়ে চেয়ে রইলাম ঈশ্বরের সেই নীল-সবুজে মেশা প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন রংমশালের দিকে। আহা, কী অবর্ণনীয় সেই দৃশ্যর অনুভূতি, তোদের কী বলব !"

তিতির বলল, "শিকারে না এলে কি তা দেখতে পেতে ?"

"পেতামই না তো ! শিকার তো একটা বাহানা, ছুতো ; অ্যালিবাই। শিকারে ট্রিগার টানাটাই হচ্ছে লিস্ট ইমপর্ট্যান্ট। শিকারের এই সব আনুষঙ্গিকই তো সব। সঙ্গী, সাথী, পটভূমি, প্রকৃতি, বন্য প্রাণীদের কুদরতি "হরকৎ", এই সবই তো আসল। তোদের বোদ্ধাকাকু এইটাই হয়তো বোঝে না।

"ছাড়ো তো !"

"সবাই যদি সব বুঝতো তাহলে দুঃখ ছিল কি ?"

বলেই বলল, "আবার অন্য লাইনে চলে যাচ্ছ ঋজুদা ! আগে বাড়ো।"

মিস্টার ভট্‌কাই দৈবাদেশ দিলেন।

"হ্যাঁ। হাজো আর হিরু এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবার পরেই হাজো বলল, 'বড়া ভুখ লাগা হুজৌর।'

"মনে-মনে বললাম, তা তো লাগবেই ! আমারও কি আর লাগেনি ?

"মুখে বললাম, চলো, ফেরা যাক এবারে সুফকর-এর দিকে। আজকের মতো।

"কিন্তু মানুষটির কী হবে ? মানে ঐ মৃতদেহের ?

"আমিই প্রশ্ন করলাম ওদের দুজনকে।

বলল, ঋজুদা।

" 'কোন মানুষটি ?'

"ওরা দুজনে সমস্বরে বলল।

ওহো ! নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললাম, তোমাদের বলা হয়নি। আমি যেখানে বসেছিলাম, তার পাশেই একজন মানুষের লাশ পড়ে আছে। বাঘে মেরেছে মাচারই ওপরে।

" 'তাই ?'

হ্যাঁ কিন্তু কে সে ?

"তা, আমরা জানব কী করে ?

" 'দেখতে কেমন ?'

"মানুষটির চেহারার ও পোশাকের বর্ণনা দিলাম আমি ওদের। বললাম, বড়া খানদান-এর মুসলমান।

"ওরা বর্ণনা শুনেই চিনে ফেলল।

" 'বলল, বুঝেছি, বুঝেছি। ইনি চিল্‌পির রইস আদমি মহম্মদ বদরুদ্দিনের বড় শ্যালক হচ্ছেন। এঁর নাম ফকরুদ্দিন। প্রতি বছরই তো এই সময়ে উনি আসেন। শিকারের খুব শখ। কিন্তু গুলিতে জানোয়ারে কোনওদিনই যোগাযোগ হয় না। আমরা কতবার ছুলোয়া করেছি জঙ্গল, ওঁর জন্য। অথচ উনি নাকি চাঁদমারিতে উস্তাদ। অনেক মিডেল পেয়েছেন। খরগোস দেখলেও এমনই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে খরগোস-এর গায়েও গুলি ঠেকাতে পারেন না।

ভটকাই বলল, এই ইনফরমেশানটাও বোদ্ধাকাকুকে দেওয়া দরকার। বাঘ তো দূরের কথা, খরগোস মারাও সোজা কথা নয়।

হাজো বলল, তবে মানুষটি বড় ভাল। দিলদার। ইসস্ তার এই হাল করল বাঘে !

"হিরু বলল, 'কিন্তু ফকরুদ্দিন মিঞা তো আর বাঘ মারার পার্টি নয় আদৌ ! তিনি বাঘ মারতে এলেনই বা কেন ? খামোখা প্রাণটাই গেল।'

"হাজো বলল, 'বাঘ আছে জেনে কি আর এসেছিলেন ? ভেবেছিলেন জলের পাশে শম্বর বা বারাশিঙা মওকামতো ধড়কে দেবেন। চিল্‌পিতে ভোজ হবে।'

"আমার ব্লক-এ সে আসেই বা কী করে ? এই ব্লক তো আমারই রিজার্ভ করা।

আমি বিরক্ত হয়ে শুধোলাম।

ঋজুদা বলল।

" 'হুজৌর, এখানে মিঞা বদরুদ্দিনেরই রাজ। মস্ত বড়লোক সে। বাঘ তো কিছুই নয়। বদরুদ্দিনের শ্যালক ফকরুদ্দিন ইচ্ছে করলে ফরেস্টার, রেঞ্জার, মায় আপনাকেও মেরে তার হাভেলির ঘন সবুজরঙা দেয়ালে আপনার চামড়া বাঁধিয়ে রাখতে পারে। বদরু মিঞার শ্যালকের গায়ে হাত দেয় কে ? কারও ঘাড়েই অত মাথা নেই।'

"আচ্ছা ! এ কথা বাঘ বেচারা জানত না নিশ্চয়ই। তাই...

"তারপরই ভাবলাম, মরে-যাওয়া মানুষের ওপর রাগ করাটা ঠিক নয়।

"তা হলে তো বদরুদ্দিন না কাকে বললে ; একটা খবর এখুনি দিতে হয়। পুলিশকেও খবর দিতে হয়। নইলে পরে তোমরা এবং আমিও ঝামেলাতে পড়ে যাব।

"পুলিশে খবর দিলেই তো "বাঘে ছুঁলে আঠারো-ঘা"। বনের বাঘে ছোঁয়াতে তো মামুজান জানে-মরেও বেঁচে গেছেন আর পুলিশে ছুঁলে আমরা যে জানে বেঁচেও মরে যাব। তখন আমাদের জন্যে তো আর মামুনীজান কাঁদবে না !

" 'তাহলে কী করবে ? মানুষটাকে হায়েনা-শেয়ালে তো এমনিতেই ছিঁড়ে

খাবে। এমন করে কি ফেলে যাওয়া যায় ? মানুষ তো !'

" 'এদিকে হায়েনা-শেয়াল নেই। তবে শকুন আছে। কিন্তু এই ঘন জঙ্গলের নীচে শকুনের দৃষ্টি পৌঁছবে না। রাতে তো পৌঁছবেই না।'

" 'সে যাই হোক, কিছু একটা করো। পুলিশ জানলে আমাদের নিয়ে টানাটানি তো করবেই, কিন্তু না জানালেও তো নয়।'

" 'না, সরাসরি গিয়ে বলার দরকার নেই। গ্রামে ফিরে গিয়ে পাহান্‌কে বলব। সেই ফরেস্ট গার্ডকে বলে যা হয় করবে।'

হিরু বলল।

" 'তাই ভাল। নানাকে সকলেই মানে।'

'সেটাই ভাল।'

হাজোও বলল।

"সঙ্গে আর কে ছিল ? মানুষটার ? মাচা তো দেখেছিলাম আরও একটা। তোমরা যেদিকে ছিলে, সেদিকে। কি, তোমরা দ্যাখোনি ?

"আমি ওদের শুধোলাম।"

ঋজুদা বলল।

" 'দেখেছি। ছিল, নিশ্চয়ই কেউ। হুজৌর, আমরা তো সেই মাচাতেই বসে ছিলাম। মাচাটি ভাল। কোনও শিকারির বসার চিহ্নও পেলাম। কিন্তু শিকারিকে পেলাম না।

" 'তবে কি বাঘ ? বাঘেরা, তাকেও নিয়ে গেছে ?'

" 'যেতে পারে।'

"তখন এই হিরু পানকাই বলল, 'চলুন না হুজৌর, গিয়ে আরেকবার ভাল করে দেখে আসি।'

"আমি বললাম, 'বাঘকে যদি কাল মারতে চাও, তবে আজ আর ওখানে গিয়ে হল্লাগুল্লা কোরো না। তা ছাড়া, আমার মনে হয় তোমরা যার মাচাতে বসেছিলে সেই মাচার শিকারি পালিয়েছে। বাঘে তাকে ধরলে, তার চিহ্ন থাকত মাচার আশেপাশে। মাচার ওপরেও। তোমরাও কি আর বুঝতে পারতে না ? সেই গিয়ে অনেকক্ষণ আগে খবর দিয়েছে নিশ্চয়ই, এই অঘটনের।

"চলো, এবারে এগোনো যাক।'

"হাজো বলল।

"শীতের রাতের আশ্চর্য নিঃশব্দ বিদ্যুতের কোনও বিরতিই নেই। কোটি-কোটি ওয়াট-এর সেই দেবদুর্লভ নীলচে-সবুজ আলোর বুকের কোরকটিকেই, হালকা-সবুজ ঘাসে-ভরা প্রান্তরের আর সীমান্তের গাঢ়-সবুজ অরণ্যানীর গায়ে ; কারও অদৃশ্য হাত যেন সহস্র আঙুলে মাখিয়ে দিচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই গা-শিউরানো দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা হাঁটতে লাগলাম

সুফ্‌কর-এর দিকে। তখন সেই তিনমূর্তিকে যদি কেউ দেখতে পেত, তবে সে অবশ্যই ভাবত যে ; স্বর্গপুরীর কোনও রঙ্গমঞ্চে উঁচুদরের কোনও নতুন-আঙ্গিকের একাঙ্ক নাটকের মূকাভিনয় চলেছে।

"সুফ্‌কর-এর বাংলোতে যখন আমরা খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে ফিরলাম তখন রাত প্রায় বারোটা বাজে।

"বহেড়া বাইগা মুরগীর মাংস গরম করে দিল মুহূর্তের মধ্যে। আর করে দিল গরম-গরম হাত-রুটি। হিরুদেরও খাইয়ে দিলাম জোর করে। ইতিমধ্যেই বারাশিঙাটার মাংস গ্রামের সকলে ভাগ করে নিয়েছিল, বাঘের নখ-লাগা, মুখ-লাগা জায়গাগুলো ফেলে দিয়ে। এই শিকারই হল বন-পাহাড়ের মানুষদের একমাত্র অ্যানিম্যাল প্রোটিন। বুঝলি। তাও ন'মাসে ছ'মাসে একবার জোটে কোনও শিকারী এলে। কারণ, ভারতের বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-কন্দরে মাংসর নামই "শিকার"। কারণ, শিকার করা মাংস ছাড়া অন্য কোনওরকম মাংসর কথা তাদের ধারনার বাইরে। পয়সা দিয়ে কিনে মাংস খায় এমন সামর্থ্য ওদের কারোরই ছিল না। তোরা সকলেই কম "ক্যালোরির" খাবারের জন্যে হন্যে হয়ে থাকিস 'ফিগার-ফিগার' করে আর এই হিরুরা, আর হাজারো অপুষ্টি রোগে ভোগে ভিটামিন আর প্রোটিনের অভাবে। বুঝলি তিতির। কী প্যারাডক্স।"

ভট্‌কাই বলল, সত্যই কইছে দাদায়। বড় বিচিত্র এই দ্যাশ !

ওর কথার ধরনে হেসে ফেললাম আমরা। ঋজুদাও হাসল ফিক্ করে। ভট্‌কাই নিজে পেডিগ্রীড ঘটি কিন্তু ঋজুদা পেডিগ্রীধারী বাঙাল বলেই রসিকতাটা করল।

ঋজুদা থেমে গিয়ে পাইপ ধরাল।

মিস্টার ভট্‌কাই বলল, "এতবার থামলে গল্পের টেম্পোটাই যে মাটি হয়ে যায় ঋজুদা। মিস্টার রুদ্র রায় যে কী করে তোমার গল্প শোনে আর তোমাকে নিয়ে কী করে বই লেখে ; তা সে মক্কেলই জানে।"

ঋজুদা আমার রেসক্যুতে এল না বলে আমিই বললাম, "সে-কথা রুদ্র রায়কেই ভাবতে দে।"

"তা তো একশোবার। আমি ও লাইনেই নেই। লিখলে পদ্য লিখব, মানে ছড়া।"

"হ্যাঁ। সে আর কঠিন কাজ কী।"

আমি বললাম, টন্টিং টোন-এ।

তিতির কথার পিঠে কথা বসিয়ে ভট্‌কাইকে বলল, "বলো দেখি, ছড়াই একখানা ? অত্ত সোজা !"

"কার সঙ্গে কথা বলছ, ভেবে বলবে। আমার ক্লাসের ছেলেরা আমার নাম দিয়েছে বিচিত্রবীর্য। শব্দটির মানে জানো ?"

ভট্‌কাই অন্য দিকে মুখ করে, তিতিরকে বিন্দুমাত্র ইম্পর্ট্যান্স না দিয়ে বলল।

"সে তো একটি চরিত্রের নাম...মহাভারতের..."

আমি বললাম।

সে-কথার জবাব না দিয়ে ভটকাই সত্যিই মুখে-মুখে ছড়া বানিয়ে দিল আমাকে নিয়ে :

"ইট-চাপা লাল-ঘাস রুদ্দুর রায়
গায়ে দিয়ে আঁটো-জামা শিকারেতে যায়।
থেমে থেমে, ভয়ে ভয়ে, পথেতে চলে
'ঋজুদার ল্যাংবোট' সকলে বলে।
রংরুট হেঁটে চলে কাঁধে বন্দুক
পাছে বাঘ, পথে পড়ে ; মনে নেই সুখ।"

তিতির বলল, "ফাইন ! কনগ্রাট্স।"

বলেই হাত বাড়িয়ে দিল ভট্কাই-এর দিকে।

ঋজুদা মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে হাসল।

আমার মুখ লাল হয়ে গেল। ভট্কাই-এর অফট্- রিপিটেড কথাই ওকে ফেরত দিয়ে বললাম, "ওক্কে। ওয়ান মাঘ গান, বাট উইনটার উইল কাম এগেইন।"

ঋজুদা হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বলল, "সেটা কী ?"

"কী আবার। এক মাঘে শীত যায় না। এই রুদ্দুর বাবুদের মতো ইংরিজি-মিডিয়াম স্কুলে-পড়া হাফ-সায়েব হাফ-বাঙালিরা তো বাংলা প্রবাদটা জানেই না। তাই সময় পেলেই ওদের শেখাই। ইংরিজির ক্যাপসুল-এ ভরে দিয়ে।"

তিতির বলল, "এটাকে ইংরিজি ক্যাপসুল-এ ভরে দাও তো দেখি ?"

"কোনটা ?"

হকচকিয়ে গিয়ে বলল ভট্কাই।

"একদিনের বোস্টম, ভাতকে বলে পেরসাদ।"

ভট্কাই সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "খেলব না। ডোন্ট হিট মি বিলো দ্য বেল্ট।"

আমি দু আঙুলে ময়দা চটকানোর মতো ভঙ্গি করে বললাম, "ওরে ওরে ভট্কাই। আয় তোরে চটকাই।"

ঋজুদা ও তিতির হো হো করে হেসে উঠল।

হাসি থামলে বললাম, "ছড়াকার সকলেই, ভেবো না তোমার একারই বিশেষ পারদর্শিতা আছে এতে।"

ভট্কাই বলল, "ঠিক আছে। পরে কখনও ছড়া-কম্পিটিশন হবে।

"থাক। অন্য কথা বল। এনাফ ইজ এনাফ।"

তিতির বলল।

আমি বললাম, "ঋজুদার গল্পের রেশই তো নষ্ট করে দিলি।'

"এবারে শুরু করো ঋজুদা। লাঞ্চ তো কান্হাতে ফিরেই। তার আগে গল্প শেষ করো। তুমি এমন এমন জায়গাতে থামো যে, কোনও মানেই হয় না। এদিকে ইতিমধ্যেই খিদে-খিদে পাচ্ছে।

তিতির বলল।

"ইয়েস। এটা তিতির ঠিকই বলেছে। গল্পের টানটাই নষ্ট হয়ে যায়।"

ভট্কাই বলল।

"পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম দেরি করে। উঠেই দেখি পাহান্ বসে আছে বারান্দাতে। হলুদ-কালো আর লালরঙা চৌখুপি চৌখুপি কাপড়ের তুলোর কোট আজ তার গায়ে। হাত-কাটা।

"আকাশ তখনও মেঘলা। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বাংলোর হাতার কোণের অমলতাস গাছের নীচে আগুন করেছে ওরা অসমান পাথরের ঘের দিয়ে, উনুন বানিয়ে। তার চারপাশে গ্রামের চার-পাঁচজন মাতব্বরমতো লোক দু'পা আগুনের দিকে দিয়ে, স্টেশনে কুলিরা যেমন করে দু' হাত আর গামছা দিয়ে হাঁটু বেঁধে দুপা শূন্যে তুলে বসে, তেমনই করে বসে-বসে আগুন পোয়াচ্ছে আর চুট্টা খাচ্ছে। পাহানও বোধহয় ওদের ওখানেই ছিল। একটু আগেই বারান্দাতে এসেছে।

"পাহান্ বলল, 'সেলাম হুজৌর।.'

"সেলাম।

আমি বললাম।

" 'কাল রাতেই ফরেস্টারবাবুকে খবর দিয়েছিলাম লঠন নিয়ে গিয়ে। সে আজ কাকভোরে চিল্পিতে খবর দিয়েছে পাকদণ্ডী দিয়ে গিয়ে, ঘোড়ায় চেপে। সেখান থেকে ফোনে খবর দেওয়া হয়েছে, কান্হাতেও যে সঙ্গী ছিল মিঞা ফকরুদ্দিনের সঙ্গে, সেও রাত দশটা নাগাদ খতরার জায়গা থেকে ফিরে চিল্পিতে পৌঁছে খবর দিয়েছে। আবোলতাবোল বকছে নাকি সে। পাগলই না হয়ে যায়।'

"তাই ?

"চায়ের কাপ হাতে ধরে ড্রেসিং-গাউন পরে বারান্দার বেতের চেয়ারে এসে বসে আমি বললাম।

"পাহান্ বলল, 'মিঞা বদরুদ্দিন আজই ঢের শিকারি নিয়ে গিয়ে বাঘ মারার চেষ্টা করবে। শালার মৃত্যুর বদলা নিতে।'

"আজই ? তবে তো আর আমাকে দরকারই নেই তোমাদের। আমি অন্যদিকেই যাব বরং আজ। দেখি, কিছু মোরগা-তিতির-বটের পাই, তো কাবাব হবে।

"পাহান্ বলল, 'ওতে আর কতটুকু মাংস হবে হুজৌর। একটা বড়কা শম্বর

মেরে দিন, শিঙাল। তাতে আমাদের গ্রামের সকলের ভাগেই কিছু কিছু করে মাংস পড়বে। আমরা আপনার মারা শম্বরের শিং ও মাথা, চামড়া এমন করে ছাড়িয়ে নুন দিয়ে ঠিকঠাক করে দেব যে, কলকাতায় গিয়ে সোজা কার্পারের দোকানে দিয়ে দেবেন।'

"সেটা আবার কোন দোকান?"

তিতির শুধোল।

ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, "কার্থবার্টসন হার্পার। কলকাতার নামী ট্যাক্সিডার্মিস্ট। পাহান্ সবই জানত। মালিক ছিলেন এক আর্মেনিয়ান ভদ্রলোক। নাম, মিস্টার ফ্লেভিয়ান। আর ম্যানেজার ছিলেন হালদারবাবু।

"পাহান একটা চুট্টা ধরিয়ে বলল, 'ওরা কিন্তু বাঘ আদৌ মারতে পারবে না হুজৌর। মধ্যে দিয়ে আরও দু-চারজন বাঘেদের হাতে ফওত্ হবে। আর এত ঘন-ঘন মানুষ মারলে, কারও মাংস খেয়ে, ঐ জোড়া-বাঘ শেষে মানুষখেকোই না হয়ে যায়। এই আমার ভয়। বাঘ কি আর টাকা থাকলেই মারা যায়? না, যাত্রাপার্টি নিয়ে এসে মারা যায়? বাঘ নিজেও একা-শিকারি, তাকে যে মারবে তাকেও একা-শিকারিই হতে হবে; হতে হবে, তার মতোই ক্ষমতাবান। বুদ্ধিমান। শিকারি কি আর সবাই হতে পারে?'

"পাহান্ আবারও একবার তার সেই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করে চলে গেল। আমিও ভাবলাম যে মিঞা বদরুদ্দিন অ্যান্ড পার্টি কী করবে না করবে সেটা তাদেরই ব্যাপার কিন্তু সুফকর ব্লক আমার নামে রিসার্ভ করা আছে। এই ব্লকেরই বাঘ যাচ্ছেতাই করবে, মানুষ মারবে আর আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব সেটা আদৌ উচিত হবে না। তাছাড়া গ্রামের মানুষেরা যখন এমনভাবে বারবার বলছে। তবে বদরুদ্দিনের শিকারীরা আজ আসবে বলে আমার মনে হয় না কারণ আজ সারাদিন তো কবর দিতেই চলে যাবে। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এলেও তারা আগামীকালের আগে আসতে পারবে না "বদলা" নিতে।

ভাবলাম বটে কিন্তু সেদিন বাঘেদের ডেরাতে যাওয়া হল না। পাহান্-এর পীড়াপীড়িতে ওদের জন্যেই শিকারে বেরোতে হল। এরকমই হয়। ম্যান প্রোপোজেস, গড ডিজ্‌পোজেস।

"চান করে, ব্রেকফাস্ট সেরে তো বেরোলাম হাজো আর বহেড়া বাইগাকে নিয়ে। হিরু পানকা বলল, 'আমি আজ ছাতুর লিট্টি বানাব ভালবেসে। পান্‌কার বাড়ি থেকে খাঁটি ঘি আনিয়েছি।"

ভট্‌কাই বলল, "আমরা কিন্তু শম্বর শিকারের গল্প শুনতে চাই না। আগেই বলে দিচ্ছি। তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ ঋজুদা আজকাল।"

ঋজুদা বাঁ হাতের পাতা দিয়ে স্বভাবোচিত এক অসহিষ্ণু ভঙ্গি করে ভট্‌কাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আরে, সেদিন শুধু শম্বরই শিকার হয়নি, একজোড়া ভাল্লুকের খপ্পরেও পড়েছিলাম, সে...। তা ছাড়া, সব শিকারের গল্পই

শোনার মতো হতে পারে। খরগোস শিকারের গল্পও কি হয় না? হাঁস শিকার?"

"সে যাই হোক স্যার, বাঘে ফেরো।"

ভট্‌কাই বলল।

"ঠিক আছে।"

ঋজুদা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল।

"পরদিন সারা সকাল ও দুপুরেরও মাঝামাঝি পর্যন্ত ঘুমিয়ে, আর্লি-লাঞ্চ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।"

"আমরা মানে?"

"আমরা মানে, আমি, হাজো আর হিরু পান্‌কা। বহেড়া বাইগা বাংলোতেই থাকল।

"গতকাল খবর যা পাওয়া গেছিল গ্রামের বিভিন্ন মানুষ এবং ফরেস্ট গার্ড, নানার কাছে তাতে জানা গেল যে আমার অনুমান মিথ্যে প্রমাণিত করে প্রায় বারোজন শিকারি বিভিন্নরকম দেশি-বিদেশি অস্ত্র নিয়ে পুরো জায়গাটা ঘিরে গাছে-গাছে বসেছিল। মালভূমির ওপরের অন্য প্রান্ত থেকে শুরু করে, মালভূমির দু' পাশে স্টপারদের দশ-পনেরো হাত অন্তর গাছে-গাছে বসিয়ে ছুলোয়া করেছিল একশ বিটারদের দিয়ে যাতে বাঘেরা তাড়া খেয়ে মালভূমি থেকে নেমে নীচে আসে, রাইফেল-বন্দুকের নলের সামনে। নীচে এলে, যেদিকেই যাক না কেন, একাধিক শিকারীর সামনে তাদের পড়তেই হত।"

"তারপর?"

"বাঘ এসেও ছিল। কিন্তু দুজন শিকারী আগ-বাড়িয়ে হড়বড়িয়ে গুলি করে দেয় গাদা-বন্দুক দিয়ে। বড় বাঘটির ওপরে। অনেকেই দূর থেকে। গুলি লেগেছে কি লাগেনি তা নিশ্চিতভাবে বলতেও পারেনি তারা। বাঘ এক লাফে সোঁতা পার হয়ে বাঁ দিকের বনে ঢুকে গেছিল।

"তবে, মস্ত বাঘ। যারা দেখেছে, তারা সকলেই বলেছে। মানে, ঐ বাঘটিই।

"অন্য বাঘটা? মানে বাঘিনী?"

"সে যে কোথায় ছিল, দেখেনি কেউই। সে বেরোয়ইনি। বা হয়তো তখন মালভূমিতে ছিলই না।

চমৎকার!

মনে মনে বললাম, আমি।

"আজও সকাল থেকেই বৃষ্টি। শনশনে হাওয়া। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। পরশুদিনেরই মতো ওয়েদার। পৌঁছলামও গিয়ে অকুস্থলে প্রায় সেই পরশুদিনেরই সময়ে। তবে, আজ আমরা সারারাত থাকব বলে তৈরি হয়েই

এসেছি।'

"সঙ্গে কোনও বেইট নিলে না ঋজুদা ? মোষ বা বলদ ?'

আমি শুধোলাম।

"না। ওই বাঘেরা অত্যন্তই সন্দিগ্ধ ছিল। বাঁধা বেইট-এর ধারেকাছেও আসে নাকি কখনও। আর ভুল করে যদি কখনও বাঁধা বেইট্ মেরেও দেয় তবুও কখনওই ফেরে না মড়িতে। বাঁধা জানোয়ার ধরার নজির নেই এদের। ভারী সেয়ানা। পাহান্ তো সে কথা আমাকে আগেই বলে দিয়েছিল।"

"তারপর ?"

ভট্‌কাই বলল, "কনসেনট্রেট ঋজুদা, প্লীজ কনসেনট্রেট।"

"এবারে তুই কিন্তু সত্যিই ডিসটার্ব করছিস ভট্‌কাই।"

ঋজুদা বলল।

"সেদিনও আমার পরশুদিনের সেই জায়গাটিতে উঠে বসতে বসতেই অন্ধকার করে এল। ওরা যে কোথায় বসল, মানে অন্য মাচাটা যে কোথায়, তা আজ ঠিকঠাক দেখে নিয়েছিলাম। তবে অন্ধকার হয়ে গেলে এখানে দেখা যাবে না কিছুই। শব্দ শুনেই সব কিছু বুঝতে হবে। শ্রবণেন্দ্রিয়ই হবে একমাত্র ইন্দ্রিয়। সঙ্কেত আজও একই আছে। পরশুরই মতো।

"আমি সেই খাঁজটাতে কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসেছি পাথরজড়ানো মোটা শিকড়ে পা রেখে-রেখে। সেদিনেরই মতো পাহাড়ি ঈগলটি মালভূমির কোনও উঁচু গাছ থেকে উড়ে এসে বসল আজও একটি প্রাচীন শিমুলের ডালে। তার তীক্ষ্ণ ডাকে সেই সন্ধেরই মতো রাতের হিমেল বনের নিস্তব্ধতাকে ফালাফালা করে দিয়ে অন্ধকারকে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে এলোমেলো করে দিল। করে দিয়েই, যখন উড়ে গেল উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে, তখন তাকে দেখা গেল। খরগোশ বা সাপ বা বড় মেঠো ইঁদুরের খোঁজে। এই শীতে সাপ পাবে না হয়তো। তবু, চেষ্টাই তো জীবন।

"ঈগলটি চলে যেতেই একটি কোট্‌রা হরিণ ওই চন্দ্রাতপের নীচের কোনও জায়গা থেকেই ভয় পেয়ে ডাকতে-ডাকতে জঙ্গলের গভীরে চলে গেল। হাজো আর হিরুরা যেদিকে বসবে বলে গেছে, সেদিকে। একটু পরই মনে হল যে, কোট্‌রাটা ওদের মাচার পেছনে পৌঁছে গেছে।

"এখন একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চোখেমুখে থাবড়া মারছে পরশু রাতেই মতো। অন্ধকার যেন জলের নীচের জলেরই মতো ভারী। জলের নীচে তলিয়ে গিয়ে চোখের পাতা খুলতে যেমন জোর লাগে এই অন্ধকারেরও তেমনই ভার আছে। চোখ খুলতে বিষম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে সেই ভার।

"হঠাৎই আবারও একটা কোট্‌রা ডাকতে লাগল, যেদিকে হাজোরা বসে ছিল সেদিক থেকেই। আগের কোট্‌রাটাই কি না তা বোঝা গেল না। পরক্ষণেই

সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ডাকতে-ডাকতে দ্রুত দৌড়ে গেল ওদের মাচার পেছনের গভীরে ঝোপঝাড় ভেঙে। ফারদার এওয়ে ফ্রম দ্য মাচান।

"কোট্‌রাটার ডাক থামার কিছুটা পরেই একটা গুলির শব্দ হল। তার পরক্ষণেই আরও একটা সেটা অন্য জায়গা থেকে। তবে প্রথম গুলিটির কাছ থেকেই।

"ওরা কিসের ওপরে চাঁদমারি করছে কে জানে ?

ভাবছিলাম আমি। কিছুমাত্রই দেখিনি বা শুনিনি আমি।

"তারপরই নিস্তব্ধতাটা আরও গভীর হল। কিসের ওপর যে গুলি হল এবং গুলির ফলাফল যে কী হল তাও বোঝার উপায় রইল না কোনও। অন্ধকারে গুলি করলই বা কী করে ওরা, দু'জনে দু'জায়গা থেকে ? টর্চ না জ্বেলে ? টর্চ সঙ্গে থাকতেও কেন অন্ধকারে গুলি করল ?

ওরা অবশ্য জঙ্গলেরই মানুষ। আমাদের চোখের দৃষ্টি-ক্ষমতার সঙ্গে ওদের চোখের দৃষ্টি ক্ষমতার তুলনা চলে না। অন্ধকারেও দেখতে পায় ওরা বনের প্রাণীদেরই মতো। তা ছাড়া, শট্‌গান দিয়ে মারতে অত নির্ভুল নিশানার দরকারও হয় না। আন্দাজেও মারা চলে।

"গুলির শব্দ হওয়ার সামান্য পরেই কুলকুচি করার মতো একটি আওয়াজ আমার ডান দিকে, উঠে-যাওয়া পাহাড়ের একেবারে পাড়ের কাছ থেকে হল। বাঘের মুখে রক্ত ওঠার আওয়াজ। মৃত্যুর আগে এরকম শব্দ হয় অনেক সময়ে। বুকে গুলি লাগলে। ওই শব্দটা কোথা থেকে এল তা অনুমান করে নিয়ে বুঝলাম যে, গুলি খুব কাছ থেকে করা হয়েছে, যেই করে থাকুক না কেন। একজন অথবা ওরা দু'জনেই পর-পর লক্ষ্যভেদ করাতে বাঘ বা বাঘিনী যে-ই হোক, সে সম্ভবত নড়তেই পারেনি তার জায়গা থেকে। মার, মোক্ষম হয়েছে।

"আসলে বুঝলি, এই হিরু, হাজো, এরা শিকারি তো আমাদের চেয়ে অনেক, অনেক গুণই ভাল। শিকার ওদের ধমনীতে বইছে অনাদিকাল থেকে। আমাদের বাহাদুরি বলতে কিছুমাত্রই নেই। আমাদের মতো হাতিয়ার ওদের যদি থাকত তবে আমাদের কোনও দামই থাকত না। তবে এ কথাও সত্যি যে, এইরকম সব আগ্নেয়াস্ত্র ওদের সকলের বা কিছু মানুষের কাছে থাকলে বন্যপ্রাণীও হয়তো অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে যেত। ওদের খিদে যে সর্বগ্রাসী। তোদের বোদ্ধাকাকুরা জানেন না যে বন্যপ্রাণী শেষ হয়েছে আসলে বুনোদেরই হাতে। শিক্ষিত শহুরে শিকারীরা আইন মেনে আর কটি প্রাণী শিকার করেছেন তাদের তুলনাতে, সারা ভারতবর্ষে ? গাদা-বন্দুক, তীর-ধনুক, বিষ, ফলিডল, জাল ইত্যাদি দিয়ে যে-সংখ্যক বন্যপ্রাণী মারা হয়েছে স্বাধীনতার পর তা অবিশ্বাস্যই। মানুষের সংখ্যা এতই বেড়েছে, সঙ্গে মানুষের খিদে এবং লোভও এবং অপ্রয়োজনের প্রয়োজন যে ; যা-কিছুই সুন্দর তার সব কিছুকেই

শেষ করে দেওয়ার যজ্ঞে মেতে উঠেছে গ্রামীণ ও বন্য সব মানুষই। এইখানেই হিরু এবং হাজোদের সঙ্গে আমাদের তফাত। আমাদের শিক্ষা, আইনের প্রতি জন্মগত শ্রদ্ধাবোধ, বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ; আমাদের হয়তো সংযমী করেছে। অন্তত কিছুটা। সব ব্যাপারেই কোথায় যে থামা উচিত, সেই বোধটি আমাদের মধ্যে আমাদের শিক্ষা অন্তত কিছুমাত্রায় সঞ্চারিত করেছে অবশ্যই।'

"না-করে থাকলেও, সকলের মধ্যেই করা উচিত।"

"কন্টিনিউ।"

ভটকাই বলে উঠল।

ঋজুদা রীতিমত হকচকিয়ে গেল।

আমি বললাম, "বুঝলি ভটকাই ঐ জ্ঞানের কিছুটা তোর সবজান্তা বোদ্ধাকাকুকে দিস। 'বিলিতি রাইফেলের ঘোড়া টানলুম আর বাঘ মারলুম' গোছের ধারণা যাদের, তাদেরও জ্ঞানের দরকার।"

"জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল, কিন্তু মূর্খামির সীমা তো ছিল না কোনওদিনই!"

ভটকাই বলল।

তিতির বলে উঠল, "তাই মূর্খদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ না করাই ভাল।"

আমি বললাম, "নাটকের শেষ অঙ্কে এসে তোরা এমন আরম্ভ করলি! সত্যি! তোদের কোনও সেন্সই নেই। বলো, ঋজুদা।"

"বলছি। চুপ কর আগে তোরা সকলে।

এই করলাম চুপ।

ভটকাই বলল।

"দেখতে দেখতে রাত সোয়া সাতটা বেজে গেল। সন্ধে হয়েছিল, প্রায় পৌনে পাঁচটার সময়ে। পর-পর দুটি গুলির শব্দ এবং শব্দের প্রতিধ্বনি পাহাড়ে মালভূমিতে দৌড়ে গিয়ে থেমে যাওয়ার পর এখন নিস্তব্ধতা আরও গভীর হয়েছে। শীত এবারে একেবারে স্বরাট সম্রাট হয়ে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছে। কোনওদিকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। শিশির ঝরছে গাছপালা থেকে এখনই। শুধু তারই টুপ টাপ শব্দ। থেমে থেমে হচ্ছে। কোনওরকম জানোয়ারের নড়াচড়ার সঙ্কেতও নেই, কাছে কি দূরে! জংলি ইঁদুর শুধু সির-সির তির-তির শব্দ করে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে বৃষ্টিভেজা লাল-হলুদ-সবুজ, ঝরা-পাতা, ঘাস-পাতার মধ্যে-মধ্যে।

"আশ্চর্য!

থার্মোফ্লাস্কটা গতরাতে যেখানে রেখেছিলাম, সেখানেই আছে। তার মানে, এখানে কালকে কোনও শিকারী বসেনি। অথচ বসলে ভাল করত। জায়গাটা খুবই ভাল। থার্মোফ্লাস্কটাতে কি চা-কফি কিছু ছিল? সাবধানে, নিঃশব্দে খুলে গন্ধ শুকলাম একটু।

"নিশ্চয়ই অন্য কিছু হবে। চা-কফি নয়। কড়া পানীয়।

"আবার সাবধানে বন্ধ করে রাখলাম। "পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়" যদিও, তবু হিরু আর হাজো এই বস্তু পেলে একেবারে লাফিয়ে উঠবে এই ঠাণ্ডাতে এই ভেবেই, সযত্নে রাখলাম সেটাকে।

"ঘড়িতে ঠিক ক'টা বেজেছে জানি না। হঠাৎ ওরা পেঁচার ডাক ডাকল, আর শুয়োরের ঘোঁত-ঘোঁত করল।

কিন্তু কেন? আমিও টি-টি পাখির ডাক ডাকলাম। এবং নামার উদ্যোগ করলাম। খাঁজটা থেকে আমি নামতে যাব, টর্চ জ্বালব ; ঠিক সেই সময়েই যেখানে ওদের মাচাটা থাকার কথা সেখান থেকে ধপ করে একটা আওয়াজ হল।

"বুঝলাম, গাছ থেকে লাফিয়ে নামল কেউ। এবং হাজো চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি আইয়ে হুজৌর। বাঘকো ভুঁঞ্জ দিয়া গোল্লিসে।'

"তাহলে হাজোই নামল গাছ থেকে লাফিয়ে!

"কিন্তু হাজোর কথা শেষ হল না। একটা আঁ-আঁ-আক্ শব্দ যেন ওর কথাকটি গিলে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গেই টর্চটা জ্বেলে সেদিকে ফেললাম। দেখি, বিরাট একটা বাঘ হাজোর কাঁধ আর ডান হাতের মধ্যে কামড়ে ধরেছে। হিরু পানকাও গাছে বসেই সঙ্গে সঙ্গেই টর্চ জ্বালিয়ে আলো ফেলল হাজো আর বাঘের ওপরে। আর তুমুল গালাগালি করতে লাগল বাঘকে। বিচ্ছিরিভাবে। অশ্লীল ভাষাতে।

গুলি করলে হাজোর গায়ে লেগে যাবার আশঙ্কা ছিল। আসলে ও সেইজন্যেই চিৎকার করে বাঘকে তার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছিল। ঐ উচ্চাসনে বসে ঐ একই কারণে আমার পক্ষেও গুলি করার উপায় ছিল না।

"আমি ফ্লাস্কটা ফেলে রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নীচে নেমে এসেই বাঁ হাতে টর্চ আর ডানহাতে রাইফেল ধরে দৌড়ে গেলাম ওদিকে। দৌড়ে গেলাম এই জন্যে যে, মাচা থেকে গুলি করলেও গুলি হাজোর গায়ে লাগতে পারত।

"আমার ওই মারমূর্তি দেখেও বাঘ একটুও ভয় পেল না।

'ভয়' ব্যাপারটা তাদের চরিত্রেই নেই আদৌ। সে এক ঝলক মুখ ফিরিয়ে দেখেই হাজোকে এক ঝটকায় মাটিতে নামিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে একবার হুঙ্কার দিল। সেই হুঙ্কার অন্ধকার শীতার্ত রাতের বৃষ্টিভেজা বনপাহাড়ের মধ্যে গহন জঙ্গলের সেই ঘেরাটোপের, চন্দ্রাতপের নীচে যেন নিউক্লিয়ার বোমা ফাটাল।

"রেগে-যাওয়া বাঘের গর্জন যে বনে-পাহাড়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে না শুনেছে, সে কখনওই জানবে না যে, সে কী ভয়ানক ব্যাপার! ঘাসপাতা, ঝোপ ঝাড় মহীরূহ, পাহাড় সব যেন ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল সেই হুঙ্কারে। দুর্গন্ধ থুতু যেন ছিটকে এল আমার মুখে।

আমি ওখানেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, (সে আমার কাছেই ছিল। মানে, এমন কাছে যে, তার আর আমার দুজনেরই দুজনকে মারতে কোনও অসুবিধে ছিল না।) রাইফেলটা ডান হাতে তুলে কাঁধ-বরাবর করলাম বাঁ হাতে টর্চ ধরে। ফোর-ফিফ্‌টি ফোর-হান্ড্রেড জেফ্‌রি নাম্বার টু রাইফেলটা ভারীও তো কম নয়! তবে শরীরে তখন শক্তিও তেমনই ছিল। নিয়মিত স্কোয়াশ খেলতাম। তেমন-তেমন সময়ে শক্তি যেন উড়েও আসত কোনও অদৃশ্য উৎস থেকে।

"হাজোকে মাটিতে নামিয়ে যেই বাঘ আমার দিকে ফিরে দ্বিতীয় বার হুঙ্কার দিয়েছে এবং আমি রাইফেল তুলেছি, তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাঘের প্রায় ঘাড়েরই ওপরের কেঁদ গাছে বসে-থাকা হিরু পান্‌কাও বাঘের ঘাড় লক্ষ্য করে গুলি করল। ততক্ষণে আমার হেভি রাইফেলের সফ্‌ট-নোজড্‌ গুলিও গিয়ে আমারই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা বাঘের সামনের দু'পায়ের মধ্যে এবং গলার ঠিক নীচে, বুকে ঢুকে গেল। কিন্তু হলে কী হয়! তার মুখ যে ছিল আমারই দিকে। রিফ্লেক্স অ্যাক্‌শানে সে আমাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল গুলি করার সঙ্গে-সঙ্গেই। কিন্তু হিরুর গুলিটা ঠিক ঘাড় আর মেরুদণ্ডের সংযোগস্থলে গিয়ে পড়াতে তার বাঘত্ব আর ছিল না।

"মানুষেরই মতো, বাঘেরও মেরুদণ্ডই চলে গেলে আর কী থাকে? কিছু থাকে কি?"

"জোড়া বাঘ ছিল কোথায়? তারা দুজনে তোমাদের কাছে এলই বা কোথা থেকে? তোমরা তিন শিকারি জানতেই পেলে না?"

ভট্‌কাই শুধোল।

হিরু পান্‌কা ভট্‌কাই-এর কথা শুনে মাথা নাড়তে লাগল। যেন, বলতে চাইল, চুপ করো না বাপু। মেলা কথা বোলো না। কতদিনের সব ঘটনা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

ঋজুদা বলল, "বাঘিনী তো হিরু ও হাজোর গুলি খেয়ে পট্‌কেই গেছিল আগেই। কিন্তু সেইটেই তো কথা! একেই বলে বাঘ! আমরা তিনজন অভিজ্ঞ শিকারী অতি সামান্য একফালি জায়গাতে নজরদারি করছিলাম, তবু টেরই পেলাম না! কী করে বাঘ এল, কোথা দিয়ে এল! এবং একটি নয়, দু দুটি।

ভট্‌কাই বলল, "অবশ্য ঘুটঘুটে অন্ধকারে, দেখবেই বা কী করে?"

'সেটা কোনও কথাই নয়।"

ঋজুদা বলল।

"ঘুটেঘুটে অন্ধকারেও ইঁদুর নড়লেও শব্দ হয়! ঝোপের মধ্যে পাখি সরে বসলেও তার শব্দ কানে আসে বনের মধ্যের নিস্তব্ধ রাতে। গাছের ওপরের হনুমান দীর্ঘশ্বাস ফেললে তাও স্পষ্ট শোনা যায়, কিন্তু শোনা যায় না, যে-জানোয়ারের অত ওজন, যে-জানোয়ার একটি পূর্ণবয়স্ক মোষ বা শম্বর বা

বারাশিঙাকে মেরে তাকে টেনে-হিঁচড়ে বা পিঠে চাপিয়ে উঠে যেতে পারে পাহাড়চুড়োয় অথবা নেমে যেতে পারে পাহাড়তলিতে, (মাইলের পর মাইল কখনও কখনও) তারই কোনওই শব্দ পাওয়া যায় না।

আলো থাকলেও তাকে দেখা যায় না। পৃথিবীর সব আলোছায়ার রহস্যই শিশুকাল থেকেই আয়ত্ত করতে হয় প্রতিটি বাঘের। সব শব্দ-গন্ধের রহস্যও। পৃথিবীতে শিকারি যদি কেউ থাকে, সব শিকারির সেরা শিকারি; সে আমাদের ভারতের বন-জঙ্গলের বাঘ!"

"হাজোর কী হল? আর ওই লোকটির। কুর্তা-পাজামা পরা শিকারীর? তাঁর মৃতদেহ তো নিয়ে গেছিল গোর দেওয়ার জন্য।'

তিতির শুধোল।

"হ্যাঁ।"

ঋজুদা বলল।

"এইজন্যেই বিখ্যাত ব্যারিস্টার শিকারী কুমুদনাথ চৌধুরী বারবার লিখে গিয়েছিলেন তাঁর বইয়ে যে, রাতে বাঘকে গুলি করে কখনই মাচা থেকে নেমো না। অথচ তাঁকেও বাঘেই খেয়েছিল ওড়িশার কালাহান্ডির জঙ্গলে এবং রাতের বেলা বাঘকে গুলি করে মাচা থেকে নামতেই।

"বলো ঋজুদা। তাই নয়!"

তিতির বলল।

"তাই তো।"

ঋজুদা বলল।

ভট্‌কাই বলল, "হাজোকে কুমুদ চৌধুরীর বইটা আগে পড়িয়ে নেওয়া উচিত ছিল।"

আমি বললাম, "বাকিটা শোন। এত ফাজলামি ভাল লাগে না।"

"তারপর কী করলে?"

তিতির বলল।

"আমি আর হিরু হাজোকে বয়ে নিয়ে এলাম বাইরের প্রান্তরে কয়েকটি পাথরের আড়ালে, যাতে হাওয়াটা কম লাগে অথচ খোলা হাওয়াও লাগে এমন জায়গাতে। ওকে একটি চ্যাটালো পাথরের ওপর শুইয়ে দিয়ে হিরুকে বললাম, 'সোজা দৌড় লাগাও। হাজোর টর্চটাও নিয়ে যাও। আর....'

"আর, বললাম, আমি যে খাঁজে বসে ছিলাম তাতে একটি ফ্লাস্ক আছে, সেটি নিয়ে এসে হাজোর মুখে ঢেলে দাও কিছুটা। 'শক্'টা কেটে যাবে। যদি অবশ্য এখনও প্রাণে বেঁচে থাকে। হাজোর জ্ঞান ছিল না তখন। তারপর বাকিটা তুমি সঙ্গে নিয়ে দৌড়তে থাকো। সুফ্‌কর থেকে খাটিয়া নিয়ে এসো, লোকজন নিয়ে এসো। গ্রামের মধ্যে যা পাও ওষুধপত্র বদ্যি, তাই নিয়ে এসো।

"হিরু গেল এক দৌড়ে ফ্লাস্কের খোঁজে টর্চ হাতে, আমি কাঠকুঠো জোগাড়

করে নিয়ে এসে এই জঙ্গলের মধ্যেই পাথরের আড়াল দেখে নিয়ে একটু আগুন করলাম। বড় শীত। ছেলেটা যে বাঁচবে, তা মনে হচ্ছে না। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর ; চারধার।

"মানুষের রক্তে বড় বদগন্ধ। বুঝলি। সারাজীবন অনেক পশুপাখির রক্ত মেখেছি। দু' হাতে, কিন্তু মানুষের রক্তের মতো বিচ্ছিরি বদ্‌বু জিনিস আর কিছুই নেই।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কী ? হিরু ফিরে এসে মুখে ঢেলে দিল ওই ওষুধ। অনেকখানি। ফ্লাস্ক থেকে। কিন্তু হাজোর মুখে ঢালামাত্রই সেই তরল পদার্থ তার কাঁধের পাশের বাঘের দাঁত ফুটোনোতে যে ফুটো হয়েছিল, তা দিয়ে গড়িয়ে বাইরে চলে এল।"

কথাটা বলতে বলতে ঋজুদা যেন অনেক বছর আগে দেখা সেই দৃশ্যটা মনে করে শিউরে উঠল। বাঘের দাঁতের কথা তোমরা, যারা কিছুমাত্রও জানো তারাই অনুমান করতে পারবে দৃশ্যটা।

তারপর ঋজুদা বলল, "আমি হিরুকে বললাম, 'দৌড়োও হিরু পান্‌কা। যত জোরে পারো দৌড়োও।'

হিরু পান্‌কা ফটাফট শব্দ করে আরেকবার খৈনী মেরে মুখে দিল। পুরনো দিনের উত্তেজনাময় দুঃসাহসিকতা তাকে রোমাঞ্চিত করছিল।

ঋজুদাও আবার পাইপে আগুন দিল। একটুক্ষণ পাইপ টেনে, তারপর যেন সেই রাতকে চোখের সামনে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, এমনভাবেই আবার বলা শুরু করল।

"হিরু দৌড়ে যাচ্ছিল প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। দৌড়তে-দৌড়তে নিশ্চয়ই মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে ফ্লাস্ক থেকে একটু করে উগ্রগন্ধের সেই ওষুধ খাচ্ছিল। দূর থেকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ওর টর্চের আলোটা একটা ছোট্ট বৃত্ত রচনা করে অন্ধকারে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিল ওর সামনে-সামনে। যেন, গ্রাম-বাংলার জলা-কাদা অঞ্চলে রাতের অন্ধকারে আলেয়ার আলো।

"পাইপটা ধরালাম আগুন থেকে একটি জ্বলন্ত কাঠি নিয়ে আগুনের সামনে বসে। হাজোর দুটি চোখই বন্ধ ছিল। খেয়েদেয়ে দুপুর দুটোতে সুফ্‌কর থেকে বেরিয়েছিলাম। তখন কী ছিল হাজো এখন কী হল !

যাঁরা শিকার সম্বন্ধে কিছুমাত্রই জানেন না, তাঁরাই শুধু বলতে পারেন শিকার ? ফুঃ !"

"হাজো বেঁচে গেছিল ?"

তিতির শুধোল !

"হ্যাঁ। প্রাণে বেঁচে গেছিল। থ্যাঙ্কস্ টু ড্রক্টর জ্যামখিন্ডিকার। তবে ন' মাস জব্বলপুরের হাসপাতালেই ছিল। রাখে কেষ্ট মারে কে ! সেই হাজো

এখন হাঁটচান্দ্রার লাক্ষার কোম্পানিতে কাজ করে। যেখানে ঠুঠা বাহগা কাজ করত। বিয়ে করেছে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। কোয়ার্টার পেয়েছে। চল্, কাল নিয়ে যাব তোদের হাজোর কাছে।

তুমি কী বলো, হিরু ? যাবে ?"

"জি, হুজৌর।" চলুন, আমিও যাব। দেখা হয়নি বহুদিন।

চলো। তোমাকেও নিয়ে যাব।

"আচ্ছা ঋজুদা, এই বাঘ-বাঘিনীর, মানে, সুফ্‌কর-এর জোড়া বাঘের আশ্চর্য ব্যবহারের তো কোনওই ব্যাখ্যা দিলে না ?"

"তা দিতে হলে বাঘেদের বিহেভরিয়াল সায়ান্স নিয়ে একদিন পড়তে হয়। হবেও। অন্য কোনও সময়ে।"

তারপর পাইপে দুঁটান লাগিয়ে বলল, "ঐ জোড়া-বাঘের ব্যাপার-স্যাপার সত্যিই আগাগোড়াই রহস্যময়। তবে তোর বোদ্ধা কাকুকে বলে দিস যে, যাঁরা বাঘ মারতেন আগে, আইন মেনে ; তাঁদের চরিত্রের সঙ্গে বাঘেদের চরিত্রেরও কিছু মিল থাকতই ! লার্জ-হার্টেড জেন্টল্‌মেন ছিলেন তাঁরাও, বাঘেদেরই মতো।"

"তারপর ?"

"ঐ বাঘ আর বাঘিনীকে মেরে মস্ত বড় একটি উপকার আমরা করেছিলাম ঐ অঞ্চলের, না জেনেই ; তা ভেবে আজও খুব ভাল লাগে।"

"কী উপকার ঋজুদা ?"

আমি শুধোলাম।

"ঐ রাতেই ওই বাঘ ও বাঘিনী দুটিকেই না মারতে পারলে হয়তো মানুষখেকোই হয়ে যেত তারা।

এ কথা বলছ কেন ?

ঐ অঞ্চলে আগে কখনও মানুষ খেয়েছিল কি না তারা, তা স্পষ্ট জানা যায়নি। কিন্তু বাঘিনীর পেট থেকে একটি আংটি বেরিয়েছিল। মেয়েদের আংটি। ঐ জোড়া-বাঘের ব্যবহার সত্যিই আশ্চর্য করেছিল আমাকে ! বাঘেদের ঠিক এমন ব্যবহার মধ্যপ্রদেশ কেন, আর কোথাওই দেখিনি। এখনও মনে করলে অবাক লাগে।"

"আর-এক কাপ করে চা হয়ে যাক, কী বলো ঋজুদা। তারপর ঐ পাহাড়টাতে গিয়ে তোমার গল্পের প্রান্তরটা দেখে আসা যাবে।"

মিস্টার ভট্‌কাই বলল।

আমি আর তিতির এখন সুফ্‌কর-এর জোড়া বাঘের চেয়েও, সত্যি কথা বলতে কী ; বেশি বিপজ্জনক মনে করছি, মিঃ ভট্‌কাইকেই !

তিতির এমন চোখে তাকাল ভট্‌কাইয়ের দিকে, যেন ওকে ভস্মই করে দেবে।

ঋজুদা বলল, "ভালই হয়েছে ভট্‌কাই। এক কাপ করে চা বরং হয়েই যাক। শীতটা বড় জাঁকিয়ে পড়েছে। হিরু পান্‌কাকেও দিতে ভুলিস না এক কাপ।"

হিরু দু'হাতে খৈনী মারতে মারতে, অতীতের স্মৃতিচারণ এমন করে করার জন্যে স্মিতহাসি দিয়ে, নীরবে যেন ধন্যবাদ জানাল ঋজুদাকে!

এবং ধন্যবাদ জানাল চায়ের জন্যেও।

গ্রন্থ-পরিচয়

ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। সপ্তম মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯১। পৃ. [৪]+৭২। মূল্য ১২·০০।
প্রথম সংস্করণ— এপ্রিল ১৯৭৩।
উৎসর্গ ॥ শান্ত মালিনী এবং দুরন্ত সোহিনীকে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ সুধীর মৈত্র।

মউলির রাত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পঞ্চম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০০। পৃ. [৮]+৮৮। মূল্য ১৫·০০।
প্রথম সংস্করণ— ১ বৈশাখ ১৩৮৫।
উৎসর্গ ॥ সোহিনীকে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ সুধীর মৈত্র।
সূচী ॥ কাড়ুয়া, মউলির রাত, তিনকিড়, টেনাগড়ে টেনশন, লাওয়ালঙের বাঘ, ঋজুদার সঙ্গে সিমলিপালে, হলঙ।

বনবিবির বনে। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। চতুর্থ মুদ্রণ, মে ১৯৮৯। [৪]+১০৩। মূল্য ১২·০০।
প্রথম সংস্করণ— অগস্ট ১৯৭৯।
উৎসর্গ ॥ সোহিনী সোনাকে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ সুধীর মৈত্র।

টাঁড়বাঘোয়া। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চতুর্থ মুদ্রণ, অক্টোবর ১৯৯৩। পৃ. [৪]+৮৬। মূল্য ১৫·০০।
প্রথম সংস্করণ— নভেম্বর ১৯৮১।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

খাজুদা সমগ্র ২

বুদ্ধদেব গুহ